ময়মনসিংহের গীতিকা : জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য

M.Phil.

সৈয়দ আজিজুল হক

…বিদ্যালয়ের এম, ফিল, ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
অক্টোবর ১৯৮৮

RB
B
398.2
HAM
C-2

Dhaka University Institutional Repository

ময়মনসিংহের গীতিকা : জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য

সৈয়দ আজিজুল হক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল.ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

অক্টোবর ১৯৮৮

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম.ফিল. বৃত্তির অধীনে
বাংলা বিভাগের প্রফেসর সৈয়দ আকরম হোসেন,
এম.এ. (ঢাকা), পিএইচ.ডি. (ঢাকা) - এর
তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায়
এ-অভিসন্দর্ভ রচিত হয়েছে ।

384588

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচনা

384588

আমার অভিসন্দর্ভের শিরোনামা 'ময়মনসিংহের গীতিকা : জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য' । প্রথমেই 'ময়মনসিংহের গীতিকা' শব্দগুচ্ছটি সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রয়োজন । বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা-অঞ্চলে উদ্ভূত, প্রচলিত এবং সেখান থেকে এ-শতাব্দীতে সংগৃহীত গীতিকাসমূহকে আমরা 'ময়মনসিংহের গীতিকা' অভিধাভুক্ত করেছি । দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' সহ 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র চারটি খন্ডে, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক কর্তৃক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সাতটি খন্ডে এবং বদিউজ্জামান কর্তৃক সম্পাদিত 'মোমেনশাহী গীতিকা'য় ময়মনসিংহের যে-গীতিকাসমূহ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোই আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ।

দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত চারটি খন্ডে মোট চুয়ান্নটি গীতিকা রয়েছে । এরমধ্যে ময়মনসিংহ-অঞ্চলের গীতিকা ঊনচল্লিশটি । ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক কর্তৃক সম্পাদিত সাতটি খন্ডে গাথার সংখ্যা আটচল্লিশ । তারমধ্যে ময়মনসিংহ-অঞ্চলের গাথার সংখ্যা তেত্রিশ । এই তেত্রিশটি গাথাই দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় রয়েছে । অর্থাৎ ময়মনসিংহের নতুন কোনো গীতিকা ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনায় নেই । এদিক থেকে বদিউজ্জামান কর্তৃক সম্পাদিত 'মোমেনশাহী গীতিকা'র ছয়টি গাথাই নতুন । অতএব মোট পঁয়তাল্লিশটি গীতিকা আমাদের মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ।

এরমধ্যে সাতটি গাথা সামগ্রিক বিশ্লেষণে স্বল্প গুরুত্ব লাভ করেছে, এবং 'চরিত্র-চরিত্রায়ণ, সংগঠন ও রসনিষ্পত্তি' শীর্ষক পরিচ্ছেদের আলোচনায় আদৌ অন্তর্ভুক্ত হয়নি । পুরোপুরি রূপকথা-ধর্মিতা, প্রচলিত ধর্মীয় কাহিনীর আঞ্চলিক ভাষ্যরূপ, বাস্তববিবর্জিত ধর্মনিষ্ঠা এবং কাহিনীগত অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যই সংশ্লিষ্ট না হওয়ার কারণ । এগুলোর নাম : 'দস্যু কেনারামের পালা', 'কাজলরেখা', 'কাঞ্চনমালা', 'মদনকুমার ও মধুমালা', 'গোপিনীকীর্তন', 'চন্দ্রাবতীর রামায়ণ' ও 'রাজা তিলক বসন্ত' ।

'ময়মনসিংহের গীতিকা : জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য' শীর্ষক এ-অভিসন্দর্ভের মূল বিষয়বস্তু দুটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে । ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের অভ্যন্তর বিশ্লেষণের পূর্বে অভিসন্দর্ভের ভূমিকা-অংশে এসব গীতিকা ঐ বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে শিল্পসার্থকরূপে বিকশিত হওয়ার পেছনে কী আর্থ-সামাজিক-ভৌগোলিক-রাজনৈতিক কারণ জড়িত, তার স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে । লোকসাহিত্যের মৃত্তিকাসংলগ্নতা, ময়মনসিংহের গীতিকায় বিধৃত নারীর স্বাধীন প্রণয়াবেগ ও সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ জীবনবোধের ভৌগোলিক-রাজনৈতিক কারণ, উপজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব প্রভৃতি সূত্রাকারে

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপিত হয়েছে ভূমিকা-অংশে ।

'ময়মনসিংহের গীতিকায় জীবনধর্ম' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে উত্থাপিত হয়েছে । প্রথম পরিচ্ছেদ 'সমাজ ও সংস্কৃতি'তে গীতিকায় বিধৃত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও বৃত্তিজীবী মানুষকে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা হয়েছে । শাসক শ্রেণী (যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নবাব, দেওয়ান, রাজা বা জমিদার, কাজী ও চাকলাদার), বণিক শ্রেণী, কৃষক সমাজ ও বৃত্তিজীবী সম্প্রদায় — এই চার প্রধান সামাজিক বিভাগে বিন্যস্ত করে মানুষগুলির জীবনধারা ও জীবনবৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে । 'জীবনোপকরণ ও জীবনাচরণ' শীর্ষক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই বিভাজন অনুযায়ীই সমাজস্থ মানুষের আচার-আচরণ-অভ্যাসের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে । তৃতীয় পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় 'নীতিবোধ ও নৈতিকতা' । ময়মনসিংহের গীতিকার জীবনধর্ম আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ঐ বিশেষ অঞ্চলের নরনারীর জীবনবোধ কোনোপ্রকার ধর্মবিশ্বাস বা সম্প্রদায়-মানসিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলনা, ছিল একান্তই ব্যক্তি-জীবনাশ্রয়ী বা ব্যক্তি অভিরুচি-আশ্রয়ী । এ-পরিচ্ছেদে তাদের নৈতিক ভিত্তির বৈশিষ্ট্য সন্ধান করা হয়েছে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোণামা 'ময়মনসিংহের গীতিকার কাব্যমূল্য' । এ-অধ্যায়ের আলোচনাও তিনটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে । প্রথম পরিচ্ছেদে 'চরিত্র-চরিত্রায়ণ, সংগঠন ও রসনিষ্পত্তি' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । ইতঃপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে ময়মনসিংহ-অঞ্চল থেকে সংগৃহীত পয়তাল্লিশটি গীতিকার মধ্যে আটত্রিশটি গীতিকার চরিত্রায়ণ বৈশিষ্ট্য, ঘটনাবিন্যাস পদ্ধতি ও পরিণতি এ-পরিচ্ছেদে স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হয়েছে । সাতটি গীতিকা রূপকথাধর্মিতা, প্রচলিত ধর্ম-কাহিনীর অনুসৃতি ও আখ্যানগত অসম্পূর্ণতার কারণে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিশ্লেষণ করা হয়েছে 'ময়মনসিংহের গীতিকায় অলঙ্কার' বৈশিষ্ট্য । ব্যবহার-বৈচিত্র ও অভিনবত্বের দিক থেকে অলঙ্কার হয়ে উঠেছে গীতিকাসমূহের শিল্পসফলতার এক উজ্জ্বলতম প্রান্ত । প্রকৃতি-ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তৃতীয় পরিচ্ছেদে । নারীর দুঃখ-ময়তা উপস্থাপনে কিংবা সামগ্রিক গ্রামীণ জীবনধারায় প্রকৃতির প্রভাব আজও অনস্বীকার্য । বিশেষত নারীজীবনের বিষাদময়তা উপস্থাপনে প্রকৃতি-ব্যবহারের সার্থকতা গীতিকাসমূহের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ।

সবশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলা টাইপ রাইটারের যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু কিছু শব্দের বানান বিশ্লিষ্টভাবে মুদ্রিত হয়েছে । অনিচ্ছাকৃত এ-ত্রুটির জন্য আমি দুঃখিত ।

---

* ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সপ্তম খন্ডের ভূমিকায় তাঁর সাতটি খন্ডে সংকলিত গীতিকার সংখ্যা ঊনপঞ্চাশ বলে উল্লেখ করেছেন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সংখ্যা আটচল্লিশ ।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

ভূমিকা
ময়মনসিংহের গীতিকা : ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত ১

প্রথম অধ্যায়
ময়মনসিংহের গীতিকায় জীবনধর্ম ১৯
প্রথম পরিচ্ছেদ : সমাজ ও সংস্কৃতি ২২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জীবনোপকরণ ও জীবনাচরণ ৬৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নীতিবোধ ও নৈতিকতা ৯৭

দ্বিতীয় অধ্যায়
ময়মনসিংহের গীতিকার কাব্যমূল্য ১০৫
প্রথম পরিচ্ছেদ : চরিত্র-চরিত্রায়ণ, সংগঠন ও রসনিষ্পত্তি ১০৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ময়মনসিংহের গীতিকায় অলঙ্কার ২২৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ময়মনসিংহের গীতিকায় প্রকৃতির ব্যবহার ২৬৪

উপসংহার ২৮২
গ্রন্থপঞ্জী ২৮৬

Dhaka University Institutional Repository

ভূ মি কা

ময়মনসিংহের গীতিকা : ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত

মানবিক আবেদন, সত্যভাষণ, প্রণয়ের অমর মহিমা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, অপূর্ব সৌন্দর্য ও কাব্যমূল্য প্রভৃতির দিক থেকে ময়মনসিংহের গীতিকাগুলো বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল সংযোজন। সামনুরূপ এক স্থবির-অচঞ্চল-গতিহীন সমাজকাঠামোর সীমাবদ্ধ গন্ডির মধ্যে আবর্তিত এ-অঞ্চলের মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনার বাস্তবতা এবং মননমুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা গীতিকাগুলোতে পরম আন্তরিকভাবে বিধৃত হয়েছে। উত্তরে শৈলশ্রেণী, বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে হাওড়, পাহাড়ের দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ টিলার গাত্র বেয়ে প্রবাহিত ছোট ছোট নদী প্রভৃতি বিশেষ ভৌগোলিক-প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে গীতিকাগুলোর উদ্ভব, পরিপুষ্টি ও বিকাশ। কৃষি ও কৃষক-জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে ঘনিষ্ঠ সহজ-সরল-প্রকৃতির গ্রামীণ মানুষের হৃদয়ানুর্গত ভাবগুলি ঐতিহ্যসূত্রে মিশে এখানে বিশেষ সংবেদনা সৃষ্টি করেছে।

বিষয়বস্তু ও ভাবগত — উভয় দিক থেকে ময়মনসিংহের গীতিকাগুলো বাংলা লোকসাহিত্যের এক ঐশ্বর্যময় সম্পদ। শিল্পের সকল প্রকরণের সঙ্গে সমাজচৈতন্যের যে-নিগূঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান, লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় ঘটার কারণ নেই। বরং শিল্পের এই প্রাচীন ও ক্রম-অবলুপ্ত শাখাটির সঙ্গে সমাজ-সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে গভীর ও দৃঢ়মূল। ময়মনসিংহের গীতিকাগুলোর অভ্যন্তরীণ জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য যথার্থভাবে উপলব্ধির জন্য এসব গীতিকা রচনার সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রীয় জীবনের চরিত্রধর্ম বিশ্লেষণ অপরিহার্য। প্রসঙ্গত শিল্পের সঙ্গে সমাজের, বিশেষত লোকসাহিত্যের সঙ্গে সমাজজীবনের, স্বতঃস্ফূর্ত-সম্পর্কের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন আবশ্যক।

১

'শিল্প একটি সামাজিক ক্রিয়া'[১], এবং শিল্পী হচ্ছেন সমাজচৈতন্যের রূপকার। মানবচৈতন্যের সামাজিক রূপই সমাজচৈতন্য। প্রত্যেক শিল্পী বা ব্যক্তিই চেতনাগত দিক থেকে সমাজের অবিচ্ছিন্ন প্রতিনিধি। কেননা তার মানসভূমিতে দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুপুঞ্জের প্রতিফলন, অধীতবিদ্যাজাত অভিজ্ঞতাসমষ্টি এবং সহজাত-প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সুসমন্বয়ের ফলেই সৃষ্টি হয় চেতনা নামক একটি অদৃশ্য, আকারহীন, অনুভবগ্রাহ্য, বস্তু-অতিরিক্ত ভাবের। শিল্প যেহেতু সৃজনশীল কোনো ব্যক্তিমানসচৈতন্যের

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পিত অভিপ্রকাশ-রূপ সেহেতু তা কোনো-না-কোনোভাবে সমাজচিত্রের প্রতিফলন ঘটাবে — সেটাই স্বাভাবিক ।

শিল্প মানবসভ্যতার উপরিকাঠামোর এক মৌলস্তম্ভ । কল্পনা ও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ স্বপ্নময় সংবেদনশীল মানবমনের উৎকৃষ্ট অনুভূতিপুঞ্জের প্রকাশরূপ এই শিল্প । সভ্যতার উষালগ্ন থেকে শিল্প মানবভাবনার পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে পরিপুষ্ট ও বিকশিত হয়ে মানবজীবন ও মানবসভ্যতার এক অবিচ্ছিন্ন উপাদানে পরিণতি লাভ করেছে । একারণে "শিল্প একটি মানবিক ক্রিয়া । ... কোনো ব্যক্তি আপন হৃদয়ে উপলব্ধ অনুভূতিকে যখন বাহ্য অভিজ্ঞানের সাহায্যে অপরের চিত্তে সঞ্চারিত করেন এবং অপরেও যখন অনুরূপ ভাবানুভূতির দ্বারা সংক্রমিত হন এবং আপন হৃদয়ে অনুরূপভাবে উপলব্ধি করেন, তখনই হয় শিল্পের জন্ম"।[২] তাই শিল্পী ও ভোক্তার পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রেই মানুষের সামাজিক সত্তা হিসেবে অস্তিত্বের বিষয়টি বিচার্য । স্মর্তব্য যে মানুষের সামাজিক সত্তাই চৈতন্যের নির্ধারক উপাদান । শিল্প সমাজচৈতন্যেরই অভিপ্রকাশের এক ঘনীভূত রূপ । তবে শিল্পীর সামাজিক সত্তাও স্বয়ম্ভু নয়, তা কতকগুলো সামাজিক-সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল । এই সামাজিক-সম্পর্ক বস্তুগত ও ভাবগত --- উভয়বিধ সম্পর্কেরই সম্মিলিত রূপ এবং তা পরস্পরনিরপেক্ষ কিংবা কোনো স্থিরবিন্দুতে অচঞ্চল নয় ।

শিল্পী যে সমাজচৈতন্যের রূপকার — এ-কথাটির গভীর সত্য মানুষের সৃষ্টি, বিকাশ ও সচেতন জীবনোপলব্ধির সঙ্গে বিজড়িত । মানুষ বংশগতির ধারায় নির্দিষ্ট কতকগুলো সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে ইতিহাস-নির্দিষ্ট কোনো পরিবেশে জন্মলাভ করে । সচেতন অস্তিত্বকালে এই সহজাত প্রবৃত্তি, সামাজিক পরিবেশ এবং স্বোপার্জিত অধিতবিদ্যাজাত অভিজ্ঞতাপুঞ্জের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় তাঁর চেতনা রূপ গ্রহণ করে । "যে-কারণে প্রত্যেক মানুষের সম্বন্ধেই আমরা বলতে পারি যে তার সচেতন জীবন তার সমগ্র অস্তিত্বে বস্তুপুঞ্জের উপর এক সদাচঞ্চল দ্যুতি ।"[৩] তাই শিল্পী যেহেতু সমাজের অবিচ্ছিন্ন প্রতিনিধি এবং তাঁর চেতনাও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সমকালীন বস্তুপুঞ্জ, অতীত-অভিজ্ঞতা ও স্বীয় জীবন-ধারার সহজাত প্রবৃত্তির ফল সেহেতু তাঁর সৃষ্ট শিল্প-প্রকরণসমূহও সামাজিক উপাদানসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সংযুক্ত । যদিও সামাজিক উপাদানসমগ্র কোনো শিল্প-কাঠামোয়ই অনুরূপ বিন্যাসে রূপায়িত হয়না, বরং শিল্পীমনের পরিণত বিবেচনায় জারিত হয়ে নির্দিষ্ট শিল্প-আঙ্গিকের বাস্তবতায় তা এক নতুনতর রূপ ধারণ করে, তবু শিল্প সামাজিক উপাদানেরই এক পরিশীলিত রূপায়ণ ।

> স্বপ্ন দ্রষ্টার অলীক কল্পনাগুলি শিল্প নয় । সেগুলিকে যখন সঙ্গীত, রূপ বা ভাষা দেওয়া হয়, সামাজিকভাবে স্বীকৃত প্রতীকে যখন সেগুলিকে সজ্জিত করা হয় তখনই মাত্র সেগুলি শিল্প হয়ে ওঠে । ... শিল্প হল কেবল শিল্পই এবং যে-পরিমাণে তা সামাজিক ভূমিকা পালন করে সেই পরিমাণেই তা শিল্প হিসাবে স্বীকৃতিযোগ্য ।[৪]

এজন্য কোনো শিল্প-প্রকরণের সামগ্রিক পর্যালোচনার জন্য সমকালীন সামাজিক কাঠামোর গভীরতর বিবেচনাও অনিবার্য হয়ে পড়ে । বিশেষত আমাদের বিবেচিত বিষয় যেহেতু 'ময়মনসিংহের গীতিকা' সেহেতু গীতিকাগুলো উদ্ভবের সময়কালে ঐ বিশেষ ভূখন্ডের আর্থ-সামাজিক-ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থার একটি সামগ্রিক রূপ অন্বেষা অপরিহার্য । কেননা অন্যান্য শিল্প-প্রকরণের তুলনায় লোকসাহিত্যের সঙ্গে সমাজচৈতন্যের সম্পর্ক অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

স্মর্তব্য যে লোকসাহিত্য কোনো ব্যক্তিমানসচেতন্য থেকে উদ্ভূত নয় ; তা সৃষ্টি হয়েছে সমাজচৈতন্য থেকে । লোকসাহিত্য একটি সমগ্র জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-বেদনাকে মূর্ত করেছে । শিল্পের এক প্রাচীন ধারা হিসেবে এর রচয়িতাদের চেতনালোক আধুনিক জটিল জীবনের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত না-হওয়ায় তাতে সমাজচিত্রের প্রতিফলন তুলনামূলকভাবে সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ ও অমার্জিত ।

চিরন্তন মানবিক বৃত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই লোকসাহিত্য রচিত । রচনার বহিরঙ্গগত কাঠামো আধুনিকতার বিচারে ব্যক্তি-অপরিশীলিত নিঃসন্দেহে, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত ভাবের সর্বজনীন আবেদনের বিষয়টি অনস্বীকার্য । এই সর্বজনীন আবেদনের কারণ : লোকসাহিত্য বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমনের সৃষ্ট নয়, সামষ্টিক বা সামাজিক মনের প্রতিফলন ঘটেছে তাতে । ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কিত তথ্যাবলী পর্যালোচনা করলে একটি বিশেষ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর আবেগ-অভ্যাস, তাদের জীবন-ধারার বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ যে এর রচনার পেছনে ক্রিয়াশীল, তা প্রত্যক্ষ করা যাবে । কবিতার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় নিদর্শনসমূহে সমাজচৈতন্যের প্রবহমান ধারার উপস্থিতির বিষয়টি আজ সর্বমহলস্বীকৃত :

> আদিম মানুষ প্রথমে যবে নানা প্রকার ছন্দোবদ্ধ ধ্বনিকে বিবিধ বস্তু ও বিভিন্ন আবেগের সঙ্গে দুশ্ছেদ্য সূত্রে বেঁধেছিল, সেইদিনই কাব্যের জন্মতিথি । ...
> প্রথম কবিতার আবির্ভাব হয়েছিল কোনও ব্যক্তিবিশেষের মনে নয়, একটা মানবসমষ্টির মনে ; প্রথম কবিতার প্রসার শুধু একটি মানুষের উপরে নয়, সমগ্র জীবনের উপরে ; প্রাথমিক কবিতার উদ্দেশ্য বিকলন নয়, সঙ্কলন ।[৫]

প্রাচীন যুগে যূথবদ্ধ মানুষের সংগ্রামশীল জীবনধারাই তখনকার শিল্প-কাঠামো লোকসাহিত্যে বাণীরূপ পেয়েছে । সেকারণে শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর কল্পকথাই রূপকথায় রূপলাভ করেছে । প্রকৃতপক্ষে আধুনিক শহুরে সভ্যতার উদ্ভব-পূর্ব যুগে কৃষি-জীবনকেন্দ্রিক গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রমজীবী জনসমষ্টির বিনোদনের কিংবা প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের অনুপ্রেরণার উপায় ছিল অলিখিত স্মৃতিচারণ-বাহিত লোকসাহিত্য । প্রত্যক্ষভাবে শ্রমজীবী জনগণ নয়, তবে তাদেরই জীবনঘনিষ্ঠ একশ্রেণীর সৃজনশীল মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট এই সাহিত্য ছিল শ্রমজীবীদেরই জীবন-সংলগ্ন বিষয় অবলম্বনে রচিত । মধ্যযুগের শ্লথগতিমান গন্ডিবদ্ধ গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনের কালচক্রে আবর্তন-বিবর্তনের যে-উল্লেখঅযোগ্য বৈচিত্র্যময়-অথচ-বৈচিত্র্যহীন ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে, তারই মধ্যে বিকশিত হয়েছে লোকসাহিত্যের সমৃদ্ধ ধারা ।

> আধুনিক তত্ত্ব একথাটাই জোর দিয়ে বলতে চায় যে, লোকসাহিত্য এবং লোকশিল্পকলা যুগ-যুগান্তরের বিপ্লবের স্বাক্ষর বয়ে নিয়ে চলেছে ।[৬]

সকল দেশের লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রেই উপর্যুক্ত বক্তব্যটি সত্য । সংগ্রামশীল মানবগোষ্ঠীর ঘটনাদীর্ণ বিবর্তনশীল জীবনধারার সকল স্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করেই লোকসাহিত্য পৃথিবীর সর্বত্র বিকশিত ও পরিপুষ্ট হয়েছে । ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহও এর ব্যতিক্রম নয় ।

উপর্যুক্ত আলোচনায় শিল্পের সকল প্রকরণের মতো লোকসাহিত্য-কাঠামোর সঙ্গে সমাজের সর্বমুখী আবেগ-অভ্যাস-আচরণের ঘনিষ্ঠ সাধর্ম্যের যে-বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে তাতে ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহ বিশ্লেষণে সামগ্রিকতা আনয়নের জন্য গীতিকাসমূহ রচনাকালে ঐ বিশেষ অঞ্চলটির আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রীয় ও ভৌগোলিক অবস্থার সার্বিক তথ্য উপস্থাপন অপরিহার্য ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমেই স্মর্তব্য যে মতামতের ভিন্নতার মধ্যেও ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের অধিকাংশের উদ্ভবকাল বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ চিহ্নিত কালপর্বে সীমিত ।[৭] তবে কেবলমাত্র এই ছয় শতাব্দীকালের সীমায় ময়মনসিংহ অঞ্চলের রাষ্ট্রীয়-রাজনৈতিক-সামাজিক-ভৌগোলিক-প্রাকৃতিক পরিবেশের আলোচনাই আমাদের অভিপ্রেত হলে খন্ডিত ধারণালাভের আশংকা থাকবে । কেননা সকল ইতিহাসেরই রয়েছে পূর্ব-ইতিহাস । একটি ঘটনাকে সার্বিকভাবে উপলব্ধির জন্যে কার্যকারণ-সম্পর্কিত সূত্রগুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন । সেকারণে ইতিহাসের পটভূমির প্রতি সতর্ক দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন রয়েছে ।

আরও স্মর্তব্য যে ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের উদ্ভব বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা-অঞ্চলের সর্বত্র ঘটেনি । ব্রহ্মপুত্র নদ বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলকে যে প্রধান দুই অংশে অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে বিভক্ত করেছে তা রাজনৈতিক-ভৌগোলিক-প্রাকৃতিক পরিবেশগত দিক থেকেও ভিন্নমাত্রায় চিহ্নিত । পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলই ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের উর্বর উদ্ভবক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃত — বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাংশ, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলা এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত :

> 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' মৈমনসিংহ জেলার পূর্বভাগ বিশেষতঃ নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ মহকুমাতেই প্রচলিত, সদর মহকুমার পূর্বাংশও এই সীমার সহিত সংযুক্ত । যে ব্রহ্মপুত্র নদ মৈমনসিংহ জিলাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে, সাধারণভাবে বলিতে গেলে, তাহার পূর্বভাগই মৈমনসিংহ-গীতিকার উৎপত্তি ও প্রচারস্থল, পশ্চিমভাগ নহে ।[৮]

খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ময়মনসিংহ জেলার সমগ্র ভূভাগ (টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জসহ) কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল ।[৯] কামরূপ-শাসনে এই দেশ সেসময়ে হিন্দু ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল । সমুদ্র গুপ্তের শাসনামলে — অর্থাৎ খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে — বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলসহ কামরূপ রাজ্যাধীন সমগ্র এলাকা মগধের অধীন হয় ।[১০] গুপ্ত-সম্রাটেরা ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । ফলে গুপ্ত-সাম্রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্মের অবাধ প্রসার ঘটেছিল । গুপ্ত বংশের শাসনাধীনে থাকার ফলে ময়মনসিংহ অঞ্চলেও ধর্মীয় সংযম ও সহনশীলতা স্থিতিলাভ করেছিল । চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ্গ -এর বিবরণ থেকে জানা যায়[১১] (পরিভ্রমণকাল : সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগ), ঐ সময় পূর্ব-ময়মনসিংহ কামরূপের অধীন ছিল এবং পশ্চিম-ময়মনসিংহ পৌন্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল । সপ্তম শতাব্দীতে ময়মনসিংহের যেসব অঞ্চল পৌন্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে সেসব অঞ্চল পুনরায় কামরূপের অধীন হয়েছিল ।[১২]

বৌদ্ধ শাসনের পরবর্তীসময়ে ব্রাহ্মণ্য শাসনকালে ধর্মীয় অনুশাসন সমাজে কঠোরভাবে আরোপিত হওয়ার পাশাপাশি বিধর্মীর প্রতি বিদ্বেষও চরমরূপ ধারণ করেছিল । বিশেষত এই বিদ্বেষের শিকার হয়েছিল সংযত ধর্মাচরণে সিদ্ধ বৌদ্ধরা । তবে সৌভাগ্য যে ময়মনসিংহের সমগ্র অঞ্চল কখনও ব্রাহ্মণ্য শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়নি ।[১৩] খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকে একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

একশবিশ বছরকাল পালরাজগণ কর্তৃক বঙ্গভাষী অঞ্চল শাসনের সময় ময়মনসিংহের সর্বদক্ষিণ-অঞ্চলই (বর্তমান কাপাসিয়া, রায়পুরা, ধামরাই) কেবলমাত্র পাল বংশের শাসনাধীন হয়েছিল । পাল বংশের রাজত্বকালেই সেন রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটে । সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বীর সেনের প্রপৌত্র বিজয় সেন (১০৯৫ - ১১৫৮ খ্রীস্টাব্দ) মদ্র, কলিঙ্গ এবং কামরূপেও তাঁর অধিকার বিস্তৃত করেন । কামরূপ রাজ্যের অংশ ময়মনসিংহের কিছু অঞ্চলে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় । বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেনের শাসনামলে (১১৫৮ - ১১৭৯) সেন রাজত্বের আরও বিস্তৃতি ঘটে । তবে তখনও পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চল কামরূপের অধীন ছিল, কেবল পশ্চিম-ময়মনসিংহ অঞ্চলই সেন রাজত্বের তথা ব্রাহ্মণ্য শাসনের অনুর্ভুক্ত হয় ।[১৪]

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলাদেশে সেন রাজত্বের অবসান ঘটায় তুর্কি মুসলিম শাসক ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি । কিন্তু পুরো ত্রয়োদশ শতাব্দী জুড়ে পশ্চিম-ময়মনসিংহ অঞ্চল ব্রাহ্মণ্য শাসনেরই অধীন ছিল । সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ্-র শাসনকালে (১৩০১ - ১৩২২) ব্রাহ্মণ্য শাসনাধীন অঞ্চল মুসলিম রাজত্বের অনুর্ভুক্ত হয় ।[১৫] তখনও পর্যন্ত পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চল মুসলিম শাসন-বহির্ভূতই ছিল ।[১৬] ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে জনৈক মুসলিম শাসক পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চল আক্রমণ করে অল্প কিছুদিনের জন্য মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেও পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চল স্থানীয় রাজাদের শাসনাধীনেই ছিল ।[১৭] খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্-র শাসনামলে (১৪৯৩ - ১৫১৯) সমগ্র ময়মনসিংহ অঞ্চল মুসলিম রাজত্বের অনুর্ভুক্ত হয় ।[১৮]

আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্-র শাসন বাংলাদেশের ইতিহাসে গৌরবজনক অধ্যায় হিসেবে স্বীকৃত । মুসলিম শাসনের উগ্রতা পরিহার করে হুসেন শাহ্ সংযত আচরণের পরিচয় দিয়েছিলেন । তাঁর শাসনামলে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল ।[১৯] সেন বংশের উগ্র ব্রাহ্মণ্য শাসন ও প্রথম তিন শতাব্দীকালের মুসলিম শাসনের উগ্রতা থেকে পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চল রক্ষা পেয়েছিল — এমন ইতিহাস-সাক্ষ্যই পাওয়া যায় । হুসেন শাহ্-র শাসনামল থেকে অনুকূল পরিস্থিতিতে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্নমুখী বিকাশ যেমন ত্বরান্বিত হয়েছিল তেমনি এসময়েই ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহেরও বিকাশ গতি-ময়তা লাভ করেছিল, এমন ঐতিহাসিক সাক্ষ্য পাওয়া যায় ।[২০]

হুসেন শাহ্-র পুত্র নুসরত শাহ্-র শাসনামলে (১৫১৯ - ১৫৩২) দু'একবার বিদ্রোহ সংগঠিত হলেও তা সফল হয়নি এবং সমগ্র ময়মনসিংহ অঞ্চলের ওপর তাঁর শাসন বলবৎ ছিল । নুসরত শাহ্ও পিতার ন্যায় বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন ।[২১]

নুসরত শাহ্-র উত্তরাধিকারীরা (১৫৩৩ - ১৫৩৮) কিংবা তারও পরে লক্ষণাবতীর অন্য শাসকেরা ময়মনসিংহ অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হন । ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চল বিশু সিংহ নামক জনৈক কোচ রাজার অধীন হয় ; অন্যদিকে বাকী অঞ্চল দিল্লির পাঠান সুলতান শেরশাহ্-র (১৫৩৯ - ১৫৪৫) করতলগত হয় । শেরশাহ্-র শাসনামল নিরুদ্বিগ্ন ও শান্তিপূর্ণ থাকলেও তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ্-র শাসনকাল (১৫৪৫ - ১৫৫৩) ছিল বিভিন্ন বিদ্রোহ ও অস্থিতিশীলতায় পূর্ণ । এসময়ে

Dhaka University Institutional Repository

কয়েকজন অভিলাষী আফগান ও অন্যান্য দেশীয় ব্যক্তি এতদঞ্চল দখলে প্রয়াসী হন। এরমধ্যে সোলায়মান খান নামক একজনের প্রয়াস সফল হয়। ময়মনসিংহের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভাটী অঞ্চল তিনি দখল করেন। অবশ্য ইসলাম শাহ্-র সৈন্যরা পরবর্তী সময়ে তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। সোলায়মান খানের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ঈসা খান পরবর্তীকালে এতদঞ্চলের শাসক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন।

ইসলাম শাহ্-র মৃত্যুর (অক্টোবর ১৫৫৩) পরও সমগ্র ময়মনসিংহ অঞ্চল লক্ষ্মণাবতীর শাসনাধীন হয়নি। তখন লক্ষ্মণাবতীর শাসক ছিলেন স্বাধীন ভাইসরয় মোহাম্মদ খান শুর। এমনকি তাঁর উত্তরাধিকারীগণের শাসনামলে, তাজ খান কররানী যিনি ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় কররানী শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর শাসনামলেও, সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্মণাবতীর শাসনাধীন হয়নি। জেলার একটি অংশে কোচ রাজার কর্তৃত্ব তখন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সোলায়মান কররানীর শাসনামলে (১৫৬৫-১৫৭২) কোচ রাজার দখলকৃত ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলে একাধিকবার বিঘ্ন সৃষ্টির ঘটনা ঘটলেও ঐ অঞ্চল কররানী শাসনের অধীন হয়নি। সোলায়মান কররানীর পুত্র দাউদ [illegible] মৃত্যু পর্যন্ত (জুলাই ১৫৭৬) ময়মনসিংহের অধিকাংশ অঞ্চলে পিতৃপ্রদত্ত শাসন অব্যাহত রেখেছিলেন।

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা-ভাষী অঞ্চল মোগল-অধিকারভুক্ত হলেও ময়মনসিংহ এলাকা মোগল শাসনভুক্ত হয়নি। ঐ অঞ্চল তখন বার ভুঁইয়াদের শাসনাধীন ছিল।[২২] ঈসা খান স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও শক্তিবলে তখন ময়মনসিংহের বৃহত্তম অঞ্চলের শাসক ছিলেন। ইতঃপূর্বে কররানী বংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে তিনি বৃহৎ জমিদারে পরিণত হয়েছিলেন। দাউদ কররানী কর্তৃক তিনি মসনদ-ই-আলা খেতাবে ভূষিত হন। মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টিকারী বার ভুঁইয়াদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। শক্তি ও বুদ্ধিমত্তায় শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই বিশাল অঞ্চল তাঁর শাসনাধীনে ছিল এবং তাঁর শাসনকালও ছিল তুলনামূলক সুদীর্ঘ। ঈসা খাঁর বিরুদ্ধে একাধিকবার মোগল অভিযান পরিচালিত হলেও মৃত্যু পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর ১৫৯৯) তিনি তাঁর স্বাধীন শাসন অব্যাহত রেখেছিলেন। ঈসা খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুসা খাঁর শাসনাধীনে ছিল বৃহত্তর ঢাকা জেলার প্রায় অর্ধেক অঞ্চল, বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার প্রায় অর্ধেক অঞ্চল, প্রায় সমগ্র ময়মনসিংহ-অঞ্চল এবং পাবনা, বগুড়া ও রংপুর জেলার অংশবিশেষ। ময়মনসিংহের সুসং অঞ্চল শুধু তাঁর শাসনাধীন ছিল না। ঐ অঞ্চল তখন খাজা ওসমান নামক এক মোগল-বিদ্রোহীর শাসনাধীন ছিল। তবে এই মোগল-বিদ্রোহীর সঙ্গে মুসা খাঁর বৈরিতা ছিল না।

আকবর-পুত্র জাহাঙ্গীরের শাসনামলে (১৬০৫-১৬২৭) ময়মনসিংহ অঞ্চল মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তখন বাংলার গভর্ণর ছিলেন ইসলাম খান (১৬০৮-১৬১৩)। ইসলাম খান বলপ্রয়োগে প্রথমে মুসা খান এবং পরে খাজা ওসমানকে পরাভূত করেন। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলা পুরোপুরি মোগল শাসনাধীন হয়।[২৩] ১৬১৩ সাল থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক পলাশীর যুদ্ধজয় পর্যন্ত) একুশ জন মোগল গভর্ণর বাংলাদেশ শাসন করেন। মোগল শাসনাধীনে ময়মনসিংহসহ সমগ্র বাংলাদেশ শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়। বার ভুঁইয়াদের শাসনামলে দ্বৈত শাসনের অরাজকতায় সাধারণ মানুষের যে-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল, মোগল শাসন সেই অরাজকতার অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

পাহাড়, নদী, জঙ্গল, হাওড় প্রভৃতির সমাবেশে পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চল বিচিত্র ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ।[২৫] উত্তরে গারো, খাসিয়া, জয়ন্তা পর্বতশ্রেণী, পূর্বে বিভিন্ন হাওড় (তলার হাওড়, জেলের হাওড়, বাবারার হাওড় প্রভৃতি) এবং বহু নদ-নদী (ব্রহ্মপুত্র, সোমেশ্বরী, কংস, ধনু, ফুলেশ্বরী, রাজেশ্বরী, ঘোড়া উৎরা, সুরমা, মেঘনা প্রভৃতি) নিয়ে ময়মনসিংহ অঞ্চল সমৃদ্ধ । পর্বতগাত্র বেয়ে যেমন নেমেছে নদী, তেমনি নেমেছে হিংস্র সর্প-ব্যাঘ্রসঙ্কুল ঘন অরণ্যভূমি । ঝিল ও তড়াগ, চুড়া পাখীর গুরু-গম্ভীর শব্দে নিনাদিত আকাশ, বারদুয়ারি ঘর, সানবাঁধা পুকুর ঘাট, স্বর্ণপ্রসূ শালী ধানের ক্ষেত, সুরভী-ময় কেয়াবন[২৬]— সব মিলে এক বিচিত্র বহুবর্ণিল নিসর্গ-শোভা । পূর্ব-ময়মনসিংহের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশ সেখানকার মানুষের হৃদয়াবেগকে স্ফীত ও গতিময় করেছে ।

এই অঞ্চলের আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখানে উপজাতীয় জনগণের বসবাস অধিকমাত্রায় ।[২৭] গারো, হাজং, কোচ, হাদি প্রভৃতি উপ-জাতীয় জনগোষ্ঠী সুপ্রাচীনকাল থেকে এখানকার পাহাড়বেষ্টিত অঞ্চলে বসবাস করছে । বাংলাদেশের হাজং সম্প্রদায়ের প্রায় শতভাগ এবং গারো জনসংখ্যার প্রায় নব্বইভাগের বসবাস এই অঞ্চলে । এসব আদিবাসী জনগণের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনাচরণ, ধর্মীয় বিশ্বাস, তাদের পরিবর্তনহীন কৃষি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রভৃতি লোকসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে অনুকূল উপাদান হিসেবে ক্রিয়াশীল থেকেছে ।

আদিবাসীদের জীবনবৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি এতদঞ্চলের জনসাধারণের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যও তাৎপর্যপূর্ণ । দ্রাবিড়ীয় নয়, তবে এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী অনার্য বংশোদ্ভূত । তিব্বতী-বার্মার সংমিশ্রণও লক্ষণীয় । দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য : ইন্দো-আর্য উপাদান । শারীরিক গঠন, চুলের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি আর্য আগমনের চিহ্ন বহন করছে । এতদঞ্চলের অধিবাসীগণের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে তুরস্ক ও পারস্য উপাদানও লক্ষণীয় ।[২৮]

৩

উপর্যুক্ত ইতিহাস-আলোচনা থেকে একটি সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে যে ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের উদ্ভব-ক্ষেত্র পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চল সেন বংশীয় নব্য ব্রাহ্মণ্য শাসনের কঠোর-অনুশাসনধর্ম ও কৌলিন্য প্রথা এবং মুসলমান শাসনের প্রারম্ভকালীন উগ্রতা থেকে মুক্ত ছিল । ব্রাহ্মণ্য শাসন ঐ অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করতেই পারেনি । অন্যদিকে যে-মুসলমান শাসক, আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্, কর্তৃক প্রথম ঐ অঞ্চল অধিকৃত হয় তিনি ছিলেন তুলনামূলকভাবে অনেক নমনীয় ও সংযতমনস্ক । বাংলা সাহিত্যের বিকাশে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্র শাসনামলেই এদেশে চৈতন্যদেব কর্তৃক বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার বিস্তৃত হয় । ময়মনসিংহ অঞ্চলে একজন প্রধান চৈতন্য-ভক্তের বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ইতিহাস-সাক্ষ্য পাওয়া যায় ।[২৯] স্মর্তব্য যে ইসলাম ধর্মের আগমন ও বিস্তার লাভের প্রেক্ষাপটে হিন্দু ধর্মের পৌরাণিক ও লোকায়ত মানস, আর্য ও অনার্য চিন্তার ব্যবধান এবং কৌলিন্য প্রথার বৈষম্যবাদের ক্ষেত্রে সমন্বয়-সাধনের যে আন্তঃধর্মীয় প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, তারই পরিণতি হিসেবে বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব ঘটে । ধর্মীয় উগ্রতামুক্ত শিথিল-অনুশাসন-নির্ভর এই ধর্মের অন্তর্নিহিত সুর ছিল অসাম্প্রদায়িক, সমন্বয়বাদী, প্রণয়াবেগী, হার্দ্য অনুভূতিমূলক ও শান্তিধর্মী ।

ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে প্রণয়াবেগের স্বাধীনমনস্কতা, ধর্মীয় ও আন্তঃধর্মীয় জাতপাত-বৈষম্যের

Dhaka University Institutional Repository

শিথিল বিন্যাস, ধর্মীয় অনুশাসন-ঊর্ধ্ব হৃদয়াবেগের প্রাধান্য এবং সর্বোপরি সম্প্রদায়-ঊর্ধ্ব মানবীয় ঔদার্যগুণের যে-পরিচয় প্রত্যক্ষ করা যায়, তার পেছনে ঐ অঞ্চলে নব্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ইসলাম ধর্মের উগ্রতা-মুক্ত পরিবেশ অব্যাহত থাকা এবং সমন্বয়মূলক বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের বিশিষ্ট ভূমিকা সহজেই অনুভব করা যায়। তবে কেবলমাত্র পূর্ব-ময়মনসিংহের ক্ষেত্রেই যে একথা প্রযোজ্য, তা নয়, বাংলা-ভাষী যেসব অঞ্চল ব্রাহ্মণ্য শাসন-বহির্ভূত ছিল সেইসব অঞ্চলেই গীতিকার উদ্ভব লক্ষণীয়।[৩০] এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চল ব্রাহ্মণ্য-শাসনের প্রভাবমুক্ত থাকলেও সেখানে ব্রাহ্মণ-সমাজের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে দুর্লক্ষ্য ছিলনা। তবে সেই অস্তিত্ব ছিল যেমন সংখ্যাগত বিচারে সীমিত তেমনি তাঁদের প্রভাবও ছিল নিয়ন্ত্রিত। পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চলে সেন বংশ প্রবর্তিত নব্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও কৌলিন্য প্রথার কঠোর অনুশাসন প্রবর্তিত না-হওয়ার ফলাফল সম্পর্কে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> সেনবংশীয় রাজগণ পশ্চিম-মৈমনসিংহ অধিকার করিলেও বহু বিল-সমন্বিত, নদীমাতৃক, বর্ষায় দুর্গম ও অরণ্যবহুল পূর্ব্ব প্রদেশ কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। সুতরাং এই পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ চিরকালই সেনবংশ-প্রতিষ্ঠিত নব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও কৌলিন্য হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজনৈতিক প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াও রাজবংশীয় নৃপতিগণ তদ্দেশ-প্রচলিত প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ বিস্মৃত হয় নাই। কামরূপ শেষকালে তান্ত্রিকতার কেন্দ্রে পরিণত হয়, কিন্তু তখন পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ সে দেশ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। তন্ত্রাধিকারের পূর্ব্বে কামরূপে যে হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ ছিল, পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ তাহাই গ্রহণ করিয়াছিল। সেই হিন্দু ধর্ম্ম উদার, তাহাতে বৌদ্ধ কর্ম্মবাদ ও হিন্দু নিষ্ঠার অপূর্ব্ব মিশ্রণ ছিল। এই হিন্দুধর্ম্মে বল্লাল সেন-প্রবর্তিত 'গৌরীদান', আচারবিচারের চুলচেরা হিসাব, ছোঁয়াচে রোগ ও ভক্তিবাদের আতিশয্য ছিলনা।[৩১]

কঠোর জাতিভেদ প্রথা বা দৈনন্দিন জীবনাচরণে ধর্মীয় অনুশাসনের অনুপস্থিতিই যে পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকায়ত জনজীবনকে স্বাধীন প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিধিনিষেধের শিথিল বিন্যাসই ছিল সেখানকার সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তা-ও শ্রীযুক্ত সেনের দৃষ্টি এড়ায়নি :

> শত শত আচারবিচার, খাদ্যাখাদ্যের তালিকা ও দুরন্ত পাঁজির আইনকানুনে বাঁধা এই প্রাচীন জীর্ণ হিন্দুসমাজের যে মূর্তি কৃত্রিমতাকে জীবন্ত করিয়া খাড়াহাতে বর্তমানকালে আমাদিগকে শাসাইতেছে, — এই পল্লীগাথাবর্ণিত সমাজ তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।[৩২]

মুক্ত জীবনাকাঙ্ক্ষা কিংবা স্বাধীন প্রণয়বাসনা ছাড়াও নারীধর্মের দৃঢ়চিত্ত ও ব্যক্তিত্বময় রূপের অভিপ্রকাশ ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কুমারী নারী কর্তৃক স্বাধীনভাবে পতি নির্বাচন, বাল্যবিবাহের পরিবর্তে পরিণত বয়সে বিবাহ-উদ্যোগ, সতীত্ব সম্পর্কে নারীমনে শাস্ত্র-ঊর্ধ্ব বাস্তব বিবেচনাবোধ, স্বীয় স্বাধীন প্রণয়বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য দৃঢ়চিত্ততা, বুদ্ধিমত্তাসহ সর্বাত্মক প্রয়াসে ব্রতী হওয়া প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে নারীসমাজের যে বৈচিত্র্যময় ও স্বাতন্ত্র্যধর্মী রূপ পরিস্ফুটিত হয়েছে তাতে পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চলে আদিবাসী জনসাধারণের জীবনাচরণ ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর প্রত্যক্ষ প্রভাবের পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট। ময়মনসিংহের গীতিকা সম্পর্কে আলোচনায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় আদিবাসী সংস্কৃতি ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভাবের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব-মৈমনসিংহের সাধারণ জন-সমাজ কয়েকটি প্রবল আর্যেতর জাতি দ্বারা গঠিত — তাহাদের মধ্যে প্রধানই কোচ। ইহা মূল ইন্দো-মোঙ্গলয়েড (Indo-Mongoloid) জাতির অন্যতম শাখা বোড়ো জাতি হইতে উদ্ভূত — এই বোড়ো জাতিরই অন্যান্য শাখা গারো, হাজং ও রাজবংশী; ইহারাও কোচ শাখার মতই এই অঞ্চলের মৌলিক মানব-সমাজ গঠনে সহায়তা করিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, ইন্দো-মোঙ্গলয়েড জাতির একটি প্রধান শাখা বোড়ো জাতিরই মৌলিক ভিত্তির উপর এই অঞ্চলের মানব-সমাজ গঠিত। বোড়ো জাতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, ইহা মাতৃ-তান্ত্রিক (Matriarchal)। এখনও ইহারই অন্যান্য শাখা গারো ও খাসি ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবলতম মাতৃতান্ত্রিক জাতি বলিয়া পরিচিত। এই গারো জাতিরই বাংলা-ভাষাভাষী ও মৈমনসিংহ জিলার সমতল ভূমির অধিবাসী শাখা হাজং নামে পরিচিত। হাজংদিগের বাসভূমি হইতেই 'মৈমনসিংহ-গীতিকার' অভিনয়-ক্ষেত্র আরম্ভ হইয়া তাহা দক্ষিণ দিকে মেঘনা নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। অতএব একটি প্রবল মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজের সংস্কার ইহার ভিত্তিমূলে কার্যকর রহিয়াছে। সুতরাং মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা সম্যক্ বুঝিতে পারা গেলেই গীতিকাগুলির কয়েকটি প্রধান তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইবে।[৩৩]

স্ত্রী-প্রধান মাতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর সমাজ-স্বীকৃত স্বাধীন প্রণয়াধিকার, সেকারণে সংগতভাবে বাল্যবিবাহের পরিবর্তে পরিণত বয়সে বিবাহ-উদ্যোগ, পতিনির্বাচনে সম্প্রদায়-ঊর্ধ্ব বিবেচনাবোধ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে আশুতোষ ভট্টাচার্য ময়মনসিংহ গীতিকাসমূহে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব আবিষ্কার করেছেন।[৩৪]

ইতঃপূর্বে আদিবাসী জনগণের সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসাহিত্যের অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশে আদিবাসী সংস্কৃতির গবেষক জনাব আবদুস্ সাত্তারও লোকসাহিত্যের সঙ্গে এর গভীরতর সাযুজ্যের সন্ধান পেয়েছেন :

> বাংলার লোকসাহিত্য যে সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের আদিবাসী সাহিত্যও তা থেকে ভিন্ন নয়; বরঞ্চ বলা যেতে পারে আদিবাসী সাহিত্য লোকসাহিত্যের উৎসমুখ — যে উৎসমুখের স্রোতধারা এসে লোকসাহিত্যে স্থিতিলাভ করেছে।[৩৫]

ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের মৌল উপজীব্য : বিষয়গত দিক থেকে প্রণয়ভাবনা এবং সুরের দিক থেকে সঙ্গীতময়তা। এক্ষেত্রে আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের নৈকট্য অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। প্রেম এবং সঙ্গীত উপজাতীয় সংস্কৃতিরও একটি মুখ্য উপাদান। আবদুস্ সাত্তারের গবেষণামূলক আবিষ্কার: "আদিম সমাজের সঙ্গীতের মধ্যে প্রেম সঙ্গীতের আবেদনই সবচেয়ে ব্যাপক। কেননা, এতে নরনারীর মনের গভীরতম প্রদেশের আর্তিই ব্যক্ত হতে দেখা যায়। আদিম সমাজে পারলৌকিক জীবনে [illegible] ও দেবতাদের তুষ্টিসাধনের জন্য যেমন সংগীতের সৃষ্টি তেমনি জৈব প্রয়োজনের তাগিদেই প্রেম সঙ্গীতের উদ্ভব।"[৩৬] এসব মৌল উপাদানের পাশাপাশি আদিবাসী সংস্কৃতির অন্তর্গত বিভিন্নপ্রকার গৌণ উপাদানের সঙ্গে ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের সহধর্মিতা লক্ষণীয়।[৩৭]

নব্য ব্রাহ্মণ্য শাসন ও কৌলিন্য প্রথা এবং অনুপ্রবেশ-পর্বের মুসলিম শাসনের উগ্রতা-মুক্ত সমাজ-পরিবেশে

Dhaka University Institutional Repository

বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার, আদিবাসী জনগণের সংস্কৃতি এবং বিশেষ জীবনাচরণ ও সমাজকাঠামোর প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রভৃতি রাষ্ট্রীয়-রাজনৈতিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট যেমন ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের ভাবজগত নির্মাণে তাৎপর্যময় অবদান সৃষ্টি করেছে তেমনি নদীবহুল, পর্বতসঙ্কুল, বিশালায়তনের নিস্তরঙ্গ জলাশয় এবং জঙ্গলাকীর্ণ ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ এর ভাবজগতকে বিশেষ আবেগময় ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে জীবন্ময় স্পন্দন হিসেবে ক্রিয়াশীল থেকেছে। ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের শিথিলতা এবং আদিবাসী জীবনাবেগ ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজবৈশিষ্ট্যের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে গীতিকাসমূহে যেমন মুক্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষা তথা জীবনাকাঙ্ক্ষায় উচ্ছকিত দৃঢ়চিত্ত, সাহসী, প্রতিবাদী, প্রণয়ে একনিষ্ঠ, বীর্যবতী নারীচরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ ঘটেছে তেমনি পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্যধর্মী, রোমাঞ্চকর এবং হার্দ্য অনুভূতিকে উদাসীন ও গীতময় করে তোলে এমন ভৌগোলিক-প্রাকৃতিক পরিবেশ এই স্বাধীন প্রণয়াবেগকে করে তুলেছে প্রাণস্পন্দনময়, গতিময় ও সংবেদনশীল।

তথ্যনির্দেশ

১. স্টাডিজ ইন এ ডায়িং কালচার, ক্রিস্টোফার কডওয়েল, অনুবাদ : রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পপুলার লাইব্রেরী, কলিকাতা, এপ্রিল ১৯৮৫, পৃ ৬৭

২. শিল্পের স্বরূপ, লিও টলস্টয়, অনুবাদ : দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, পৃ ৪৫ - ৪৬

৩. স্টাডিজ ইন এ ডায়িং কালচার, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫

৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭

৫. সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফাউন্ডেশন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, সম্পাদক : অমিয় দেব, কার্তিক ১৩৯০, পৃ ১৩

৬. আলো দিয়ে আলো জ্বালা, রণেশ দাশগুপ্ত, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭০, পৃ ৩৩

৭. ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের রচনাকাল সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর বক্তব্য সুসংহত ও সুশৃঙ্খল নয়। তবে তাঁদের বক্তব্য থেকে অধিকাংশ গীতিকার রচনাকাল বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ চিহ্নিত সময়পর্ব বলে অনুমান করা যায়।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ও ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক উভয়ে কোনো কোনো গীতিকার রচনাকাল প্রাক-মুসলিম পর্ব, আবার কোনো কোনো গীতিকার রচনাকাল ব্রিটিশ শাসনযুগ বলেও মত ব্যক্ত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে (নবম সংস্করণ : ১৯৮৬, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ) বলেছেন, "পল্লী-গীতিকাগুলির মধ্যে 'শ্যামরায়', 'আধাবধু' ও 'ধোপার পাঠ' ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয় । কাজলরেখা, কানুনমালা তাহারও অনেক পূর্ব্বের রচনা । এই সকল সুপ্রাচীন পল্লীগাথায় গুপ্তযুগের আদর্শ পাওয়া যায় ।" (পৃ ১২৬) । একই গ্রন্থে অন্যত্র বলেছেন, "এই পল্লী-গীতিকাগুলির মধ্যে "মহুয়া", "মলুর মা" ও "ধোপার পাট", "কাজলরেখা", "শ্যামরায়" প্রভৃতি কয়েকটি এমন পালা-গান আছে, যাহা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় ।" (পৃ ৬৯১) । শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন তাঁর সম্পাদিত পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, তৃতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৯৩০) সংকলিত "গোপিনী-কীর্ত্তন" গাথার ভূমিকায় এর রচয়িতা সম্পর্কে বলেছেন, "এই রমনী আনুমানিক ইংরাজি ১৭৭৬ খৃস্টাব্দে নমঃশূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন ;" (পৃ ৪৪৩) । অর্থাৎ এই গাথাটির রচনাকাল ব্রিটিশ শাসন যুগ । এটি একটি বিচ্ছিন্ন উদাহরণ, ব্রিটিশ যুগে রচিত গাথার সংখ্যা খুবই কম ।

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক তাঁর সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার ১ম খন্ডের (১৯৭০, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা) ভূমিকায় সাধারণভাবে বলেছেন, "এইসব পালাগানের অনেকগুলির রচনাকাল খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ।" তবে তিনি গীতিকাসমূহের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র ভূমিকা-আলোচনায় এর রচনাকাল সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন, তাতে তাঁর এই বক্তব্য খন্ডিত হয়ে যায় । প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার চতুর্থ খন্ডে (১৯৭২) 'মইষাল বন্ধু-সাধুতী কন্যার পালা' শীর্ষক গাথার ভূমিকায় বলেছেন, "পালাটি বোধ হয় প্রাক্ মুসলিম যুগের কাহিনী অবলম্বনে রচিত ।" (পৃ ৩৪৫) । ষষ্ঠ খন্ডে (১৯৭৪) 'বীর নারায়ণের পালা' গাথার ভূমিকায় বলেছেন, "এই পালার ঘটনাকাল যে প্রাগমুসলিম-শাসনযুগ তাহাতে সন্দেহ করিবার মত বিশেষ কোনো হেতু নাই ;" (পৃ ৮) । তবে তিনি অধিকাংশ গাথার রচনাকাল মুসলিম যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন । অন্য গবেষকদের বক্তব্যও এক্ষেত্রে উদ্ধৃতিযোগ্য :

(ক) "... These ballads are the best specimens of folk-literature of Bangladesh of the 17th and 18th centuries." Bangladesh District Gazetteers MYMENSINGH, General Editor : Nurul Islam Khan, former CSP, published by Bangladesh Government Press, Dacca, 1978, P. 266.

(খ) "...সংগ্রাহকরা এগুলিকে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা বলে প্রচার করেছেন ।" বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা - ১২, দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৮, ১৯৫৮, পৃ ৪৩

(গ) "কোন কোন গীতিকায় যেসকল ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ইহারা খ্রীস্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম রচিত হইয়াছিল । যদিও ইহাদের ভাষায় এই প্রাচীনতা রক্ষা পাইবার কথা নহে এবং তাহা পায়ও নাই, তথাপি ইহাদের বিষয়বস্তু হইতেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে ।..." বাংলার লোক-সাহিত্য, (প্রথম খন্ড : আলোচনা) শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা - ১২, তৃতীয় সংস্করণ : ১৯৬২ (প্রথম সংস্করণ : ১৯৫৪), পৃ ৩৭১

Dhaka University Institutional Repository

৮. বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খন্ড : আলোচনা), প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৯

৯. ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ, কেদারনাথ মজুমদার, জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ, পুনর্মুদ্রিত : জানুয়ারি ১৯৮৭, ইতিহাসাংশ : পৃ ৫ ও ৬ দ্রষ্টব্য ।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ ৬ দ্রষ্টব্য ।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ ৬ দ্রষ্টব্য । কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় তাঁর গ্রন্থে R.C. Dutt - এর A History of Civilization in Ancient India গ্রন্থ থেকে হিউ-এন-সাঙ্গ-এর বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন ।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ ৮ দ্রষ্টব্য ।

১৩. The district, if not the whole of it, most probably came under the authority of the senas during the reign of Vijaysena (C. 1097 - 1160 A.D.) ...
"From all evidences it is clear that he (Lakshmanasena (C. 1178-1206 A.D), son of Vallalasena and grandson of Vijayasena) exercised his authority over this district during the early period of his reign. But it is doubtful whether he could maintain his authority over the district toward the closing period of his reign. There were signs of disintegration within the Sena Kingdom itself towards the close of the 12th century A.D. The rise of the independent chiefs in different parts of the empire hastened the process of decline and downfall of the Senas."
Bangladesh District Gazetteers, MYMENSINGH, Ibid, P 23-24.

তবে সেন রাজত্ব কখনওই যে সমগ্র ময়মনসিংহ অঞ্চলে কায়েম হয়নি, তার বহু প্রমাণ ইতিহাসগ্রন্থে বিদ্যমান । মূলত বল্লাল সেনের সময়কালেই সেন-রাজত্ব সবচেয়ে বিস্তৃত হয়েছিল । বল্লাল সেন তাঁর শাসনাধীন বঙ্গদেশকে যে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেন তার একটি অংশ ছিল বঙ্গ । ময়মনসিংহ অঞ্চল এই বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল । তবে ময়মনসিংহের সমগ্র অঞ্চল নয়, কেবলমাত্র পশ্চিমাংশই সেন রাজত্বের বঙ্গ-অংশের অন্তর্ভুক্ত ছিল । পূর্ব ময়মনসিংহ সেন আমলেও কামরূপের অধীনে ছিল ।

১৪. "বল্লাল সেন তৎপিতা বিজয়সেনের জিত রাজ্য কামরূপের সম্পূর্ণ অংশ তাঁহার শাসনাধীন

Dhaka University Institutional Repository

করিতে সক্ষম হন নাই । কেবল পশ্চিমে করতোয়া পর্যন্ত কামরূপের যে-সীমা যোগিনীতন্ত্রে নির্দিষ্ট ছিল, সেই সীমা ব্রহ্মপুত্র নদ নির্দিষ্ট করিয়া, ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তটদেশ হইতে করতোয়া পর্যন্ত স্বীয় বঙ্গবিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন । অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের পূর্বভাগ কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল ও পশ্চিমভাগ, — পশ্চিম ময়মনসিংহ বঙ্গ বিভাগে ভুক্ত হইয়া সেন রাজগণের শাসনাধীন হইয়াছিল ।" ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ, প্রাগুক্ত, ইতিহাসাংশ ঃ পৃ ১০

১৫. " The authority of Muhammed Bakhtiyar Khaliji was not, however, established over the district of Mymensingh in that year(1204 A.D). ...

This district first came under the authority of the Muslim ruler of Lakshmanavati in the beginning of the 14th century A.D. It was during the reign of Sultan Shamsuddin Firoz Shah (1301-1322 A.D.), the district of Mymensingh was conquered by him. ...But it is doubtful whether the authority of the Muslim rulers of Lakshmanavati was absolutely established over the northern part of the district in the fourteenth and fifteenth centuries." Bangladesh District Gazetteers MYMENSINGH, Ibid, P.25.

১৬. "খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব ময়মনসিংহের উত্তরভাগ, সুসঙ্গ "পাহাড় মুল্লুকে" বৈশ্য গারো নামক এক গারো রাজত্ব করিতেছিল । সোমেশ্বর পাঠক নামক জনৈক পরাক্রান্ত ভ্রমণকারী বহু অনুচর সমভিব্যাহারে আসিয়া বৈশ্য গারোকে বিধ্বস্ত করিয়া তৎপ্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন । এই সোমেশ্বর পাঠকই সম্মানিত সুসঙ্গ রাজবংশের আদি পুরুষ । ইনি ১২৮০ খ্রীস্টাব্দে (৬৮৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে) কান্যকুব্জ হইতে এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন । এইরূপে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই পূর্ব ময়মনসিংহের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ অসভ্যদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া যায় ।

"...অতঃপর চতুর্দশ শতাব্দীতে জিতারী নামক জনৈক ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী কর্তৃক কামরূপের তৎকালীন রাজধানী 'ভাটী' আক্রান্ত ও অধিকৃত হয় । ...এই সময় পর্যন্ত মুসলমান অধিবাসী বর্তমান ময়মনসিংহে প্রবেশ করে নাই ।" ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ, প্রাগুক্ত, ইতিহাসাংশ ঃ পৃ ১৪ - ১৫

১৭. "বখতিয়ার বাঙালা জয় করিয়া কামরূপ জয়মানসে অগ্রসর হন ও ব্রহ্মপুত্রের অপ্রতিহত প্রভাবে বিপন্ন হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন ।....বখতিয়ারের পর, ১২৫৮ খ্রীস্টাব্দে ইখ্তিয়ার উদ্দীন উজবেগ তুগ্রলখাঁ পুনরায় কামরূপ আক্রমণ করেন । তিনিও রাঙ্গামাটীর দিক হইতেই আক্রমণ করিয়াছিলেন । এই আক্রমণে কামরূপ রাজ পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন ; কামরূপ

Dhaka University Institutional Repository

রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় । এই সুযোগেই গারো পর্বতের দক্ষিণভাগে বা বর্তমান পূর্ব ময়মনসিংহে সুসঙ্গ, মদনপুর, বোকাই নগর, গড়দলিপা, জাফী, জঙ্গলবাড়ী প্রভৃতি স্থানে কএকটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত হয় । অতঃপর পলায়মান কামরূপাধিপতি তুগ্রল খাঁকে হত্যা করিয়া রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন ; তুগ্রল খাঁর হত্যার পর যখন পূর্ব-ময়মনসিংহে পূর্বোক্ত কতিপয় স্থানে, কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসনকর্তা নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময় পশ্চিম ময়মনসিংহ সেন রাজাদিগের শাসনানুর্গত থাকিয়া স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছিল ।" প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬

১৮. "...১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে হুসেনসাহ বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করেন । হুসেন সাহের সময়, সমগ্র ময়মনসিংহে মুসলমান শাসন প্রবর্তিত হইয়াছিল ;..." প্রাগুক্ত, পৃ ১৯
অন্যত্রও এমন প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ

"The whole of the district of Mymensingh formed part of the kingdom of Lakshamanabati during the reign of Alauddin Husain Shah (1493-1519 A.D.), the founder of the Husain Shahi rule in Bengal ..." Bangladesh District Gazetteers, MYMENSINGH, Ibid, P. 27-28

১৯. "Alauddin Husain Shah was undoubtedly one of the greatest of the mediaeval rulers of Bengal. He whole-heartedly identified himself with the hopes and aspirations of his subjects. His reign witnessed both material and cultural development of the Kingdom. The district also shared the general prosperity of it. He was a great patron of Bengali literature." Bangladesh District Gazetteers, MYMENSINGH, Ibid, P. 28

২০. সংগ্রাহক, সঙ্কলক, সমালোচক—প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন যে ষোড়শ শতক থেকে ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহ উদ্ভবের শুরু । আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনামলের সঙ্গে সংযোগ রেখেই একথাটি যে উচ্চারিত হয়েছে তা সংকলক-সম্পাদকগণ তাঁদের আলোচনায় ঐতিহাসিক তথ্য সহযোগে স্পষ্ট করেছেন ।

২১. "...he (Nusrat Shah) maintained his authority over the district till his death in 1532 A.D. Like his father he continued to watch with sympathy the progress of Bengali literature. It has been said that Pargana Nasratshahi and Pargana Momenshahi had been named after him and his General, Momen Shah." Ibid,

Dhaka University Institutional Repository

২২. "The conquest of Bengal by the Mughals in 1576 did not mean the effective Mughal occupation of Bengal in that year. The Province and naturally the district of Mymensingh remained for many years a scene of anarchy and confusion. The greater part of Bengal and the district were then ruled by the local Hindu and Muslim Zamindars, who were collectively called the Bara Bhuiyas." Ibid, P. 30

২৩. "Towards the beginning of 1611 A.D. Islam Khan gathered a large army for the campaign against Osman. ... The authority of Khwaja Osman was totally crushed after his defeat and death in the battle of Daulatpur in March 1612 (It was probably a village four or five miles south of Moulvi-bazar) at the hands of the Imperialists. Thus the district of Mymensingh came under the authority of the Mughals in the year 1612 A.D." Ibid, P. 31-32

২৪. প্রাগুক্ত পৃ ৩২ দ্রষ্টব্য ।

২৫. "উত্তরে গারো পাহাড়, জয়ন্তা ও খাসিয়ার অসম শৈলশ্রেণী, — তাহাদের পদদেশন করিয়া একদিকে সোমেশ্বরী ও অপরদিকে কংস ছুটিয়াছে । এই বিস্তৃত ভূখণ্ড ফাড়িয়া দক্ষিণ-পূর্বে নানা ধারায় ধনু, ফুলেশ্বরী, রাজেশ্বরী, ঘোড়া-উৎরা, সুরমা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র ক্বচিৎ ভৈরব রবে, ক্বচিৎ বীনার ন্যায় মধুর নিক্কণে প্রবাহিত হইয়াছে । এই সকল নদ-নদীর অনুবর্তী দেশসমূহ এককালে জলের নীচে ছিল । এ সমস্ত প্রদেশটিই এখনও বহু বিল ও জলাশয়াকীর্ণ ।" মৈমনসিংহ-গীতিকা, শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন, রায় বাহাদুর, বি.এ.,ডিলিট, কর্তৃক সঙ্কলিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,চতুর্থ সংস্করণঃ ১৯৭৩, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য ।

২৬. প্রাগুক্ত, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য ।

২৭. "One peculiarity of the district is the number of representatives of aboriginal tribes. They are mainly confined to a strip running parallel to the hills and varying in width from three to eight miles. There is evidence that they were being gradually pushed back towards the hills by pressure of nonaboriginals from the south. Apart from the belief of the Garos that they formerly used to occupy the whole of the area, the

Dhaka University Institutional Repository

villages to the south of the area are now mostly occupied by the aboriginals. The aboriginal tribes of the districts are the Garos, Hadis, Hajangs and Koches. The tribal people are ethnically very different from the local population. They are of Mongoloid origin and are akin to the tribes of Assam (India) the opposite side of the Garo Hills." Bangladesh District Gazetteers, MYMENSINGH, Ibid, P. 57

২৮. "On the basis of the available sources it may be stated that the majority belong to a pre-Aryan Stock, not necessarily Dravidian, with a strong admixture of Tibeto-Burman element. The next important element is the Indo-Aryan Stock. The fair complexion, prominent nose and fore head, straight and soft hair and the formation of the skull give sure indication of the Aryan anastry of a large number of the inhabitants. There are also Turkish and Persian elements, the introduction of which roughly corresponds to the Muslim domination over the area." Ibid, P. 52

২৯. (ক) "ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম এজেলায় প্রবেশ করিয়াছিল। ভক্ত প্রধান মাধবাচার্য সর্বপ্রথমে এতদ্দেশে চৈতন্যধর্ম প্রচার করেন। আটীয়ার নিবিড় অরণ্যে গুপ্ত বৃন্দাবন নামক স্থানে শ্রী শ্রী মহাপ্রভুর নামের স্মৃতি আজও বহন করিতেছে।" ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ, প্রাগুক্ত, বিবরণাংশ: পৃ ২৪
(খ) "ষোড়শ শতাব্দীতে এ জেলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবল বাতাস আসিয়া জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হয়। এবং হিন্দু ও মুসলমান সমাজকে কিছুদিনের জন্য আংশিকভাবে বিব্রত করিয়া তোলে। তখন মুসলমান রাজ্য জেতা, হিন্দু বিজিত। সুতরাং বৈষ্ণব মতের আবির্ভাব হিন্দু সমাজকেই অধিক পরিমাণে দুর্বল করিয়া ফেলিল। এই সংঘর্ষণ কিছু দিন চলিয়াছিল। ইতিমধ্যে সাম্য নীতির দোহাই দিয়া বহু অন্ত্যজ জাতি আসিয়া বৈষ্ণব সমাজের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া দেয়।..." প্রাগুক্ত, ইতিহাসাংশ, পৃ ৯০

৩০. "The ballads are chiefly formed in those districts of Bengal which the Sen dynasty could not conquer,— in Sylhet, Chittagong and mainly in Mymensingh. ... ...
"The Sens could not penetrate into the back-woods of Eastern Bengal where the Hinduism of the old School flourished for a long time. These places adhered to the old custom of giving education by folklore and ballads, Mymensingh — especially the

Dhaka University Institutional Repository

the eastern part of the district - successfully combated the Imperial march of the Sens. ... Eastern Bengal Ballads, volume iv:part I, compiled and edited by Dineschandra Sen, Rai Bahadur, B.A., D.Lit(Hon), University of Calcutta, 1932, General Introduction.

৩১. মৈমনসিংহ - গীতিকা, প্রাগুক্ত, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য । ভূমিকাংশে তিনি এ-সম্পর্কে আরও বলেছেন: "পূর্ব্ব-মৈমনসিংহে সেনরাজ - প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রভাব অথবা সংস্কৃতের আনুগত্য বিশেষরূপে দেখিতে পাই না । পূর্ব্ব-মৈমনসিংহের সাহিত্য বঙ্গদেশের অপরাপর স্থানের সাহিত্যের মত নহে । এখানে শাস্ত্রের অনুশাসন বাঙ্গালীর ঘরগুলিকে এতটা আঁটাআঁটি করিয়া বাঁধে নাই । এখানে পাষাণচাপা অত্যাচারের ফলে প্রেমে বিদ্রোহবাদের সৃষ্টি নাই । এখানে ঘরের জিনিসকে শিকল দিয়া ঘরে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা দেখা যায় নাই এবং রমণীদের জন্য পিঁজরা তৈরী হয় নাই ।" ...

৩২. প্রাগুক্ত, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য ।

৩৩. বাংলার লোক - সাহিত্য (প্রথম খন্ড : আলোচনা), প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৪ - ১৫

৩৪. "মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজ স্ত্রী-প্রধান, ইহাতে নারীর স্বাধীন প্রেমের অধিকার সামাজিকভাবেই স্বীকার করা হয় । অবশ্য স্বাধীন প্রেমের স্বীকৃতির অর্থ নারীর স্বৈরাচার - প্রবৃত্তির স্বীকৃতি নহে । কুমারী নারীর যে প্রেম বিবাহেই পরিণতি লাভ করিতে পারে, সেই প্রেমই ইহাতে স্বীকার করা হয়, কিন্তু তাহার পরিবর্তে বিবাহিতা নারীর ব্যভিচার কিংবা স্বৈরাচার কঠিন দন্ডে শাসিত হয় । এই জন্যই পরিণত বয়স্ক কুমারীগণই বিবাহের অধিকারিণী হয়, বাল্যবিবাহ কিংবা গৌরীদান মাতৃ - তান্ত্রিক সমাজে সম্পূর্ণ অপরিচিত ; শুধু মাতৃ - তান্ত্রিক সমাজেই নহে, পৃথিবীর কোনও আদিম অধিবাসীর সমাজেই বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই । পূর্বমৈমনসিংহের গীতিকাগুলি প্রধানতঃ পরিণত বয়স্কা কুমারীর স্বাধীন প্রেমের অধিকার ও ব্যক্তিগত হৃদয় - বেদনা লইয়াই রচিত । ইহাদের এই প্রেরণা হিন্দু - মুসলমান সমাজ - নিরপেক্ষ ; ইহা এই মৌলিক মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি হইতেই আসিয়াছে ।" ... বাংলার লোক - সাহিত্য (প্রথম খন্ড : আলোচনা), প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৫

ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকীও এ-বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন :

"আমাদের পূর্ব মৈমনসিংহ গীতিকাগুলির প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে তাদের মধ্যে এইসব প্রাচীন সমাজের বহু বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাবে । ইচ্ছামত বর গ্রহণ, বয়সকালে বিবাহ, স্বাধীন প্রেম ইত্যাদি সবই মাতৃতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য । এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চল কামরূপ কামাখ্যারও অংশ ছিল — যেখানে মাতৃতান্ত্রিকতাই ছিল সামাজিক রীতি ।" লোক-সাহিত্য (দ্বিতীয় খন্ড), ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, মুক্তধারা, ঢাকা, দ্বি.স. জুলাই ১৯৮০, প্র.স. নভেম্বর ১৯৬৩, পৃ ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

৩৫. আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য , আবদুস্ সাত্তার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ : জুন ১৯৭৮ , পৃ ২৩৩

৩৬. আরণ্য সংস্কৃতি, আবদুস্ সাত্তার, মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৭৭, পৃ ১৭১

৩৭. "আদিম সমাজের বারোমাসীর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা প্রকৃতি এমনকি আরণ্য জগতের পশু পাখীর সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করে । সেক্ষেত্রে মানুষ, প্রকৃতি এবং জীবজগতের মধ্যে কোন তফাত নির্ণয় করা যায় না । আদিম সমাজের বারোমাসী জগতের মানুষ মেঘকে পুরুষ এবং মৃত্তিকাকে নারী কল্পনা করে নিজেদের সুখ - দুঃখের সঙ্গে তাদের একাত্ম করে দেখতেও বাদ দেয়নি ।" আরণ্য সংস্কৃতি , প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ময়মনসিংহের গীতিকায় জীবনধর্ম

মানুষ হিসেবে জীবনের অবিশ্রান্ত সাধনা হল আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মোপলব্ধির সাধনা । প্রতিকূল পরিবেশকে অতিক্রম করে নিজের পরিপূর্ণ শক্তি-সৌন্দর্যে আত্ম-উন্মোচন বা আত্মবিকাশের সাধনাই মানুষের নিরন্তর জীবন-সংগ্রামের অন্তর্প্রেরণা । ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, একটি বিশেষ অঞ্চলের নর-নারীর স্বাধীন প্রণয়বাসনা তথা মুক্ত জীবনাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য তাদের জীবনসংগ্রাম অন্তর্গত-সৌন্দর্য-সাধনায় দীপ্তিস্নাত হয়েছে । এই সংগ্রাম গোষ্ঠী-বা-সমষ্টি নিয়ন্ত্রিত সমাজশাসনকে অস্বীকার কিংবা অতিক্রম করার প্রয়াস দ্বারা চিহ্নিত । ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে বিধৃত মানব-মানবীর মুক্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষা একান্তভাবেই ব্যক্তি-আশ্রয়ী, ব্যক্তিজীবনবোধউদ্দীপিত । স্মর্তব্য যে মধ্যযুগের এই ব্যক্তি-আশ্রয়ী উপলব্ধি কোনোভাবেই আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা-যুগের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের অনুরূপ নয় । তবে দেবভাবনা ও ধর্মভাবনানির্ভর মধ্যযুগীয় মানসজগতে এই ব্যক্তি-জীবনবোধউদ্দীপনা নিঃসন্দেহে বিবর্তনধর্মী ।

ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের নর-নারীরা মানবীয় সৌন্দর্য-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য যেকোনো ধরনের জীবন-পরিণামকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যে-ব্যক্তি-অভীপ্সা ব্যক্ত করেছে, তা বাংলা সাহিত্যে এক দুর্লভ উপাদান । গীতিকাসমূহে বিষয়বস্তুর ভিন্নতা কিংবা স্পন্দনময়তা পরিলক্ষিত হলেও সর্বত্র প্রণয়াকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতাকল্পে এই ব্যক্তি-অভীপ্সার সুর ব্যঞ্জিত হয়েছে । এর মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবনপ্রবৃত্তির দ্বন্দ্বসমূহ পরিস্ফুটিত হওয়ার পাশাপাশি মানবীয় সহজাত প্রবৃত্তির উন্মোচনও পরিলক্ষিত হয় । স্মর্তব্য যে ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে বিধৃত জীবনবোধ কোনোভাবেই মনসার ঈর্ষামূলক প্রতিষ্ঠাপ্রয়াস কিংবা লোকায়ত জনগোষ্ঠীর সম্পদ ও প্রতিপত্তি লাভের দেবী হিসেবে কল্পিত চণ্ডীর মাহাত্ম্যসূচক লৌকিক জীবনকাহিনী দ্বারা প্রভাবিত নয়; অধিকন্তু বৈষ্ণব ধর্মের সমাজ-গর্হিত প্রেমাকাঙ্ক্ষায় জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্মিলন-সন্ধানও গীতিকাসমূহের উপজীব্য বিষয়কে স্পন্দিত করতে পারেনি । একান্তই ব্যক্তি-আশ্রয়ী সংবেদনাময় জীবনাদর্শ ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের চরিত্রগুলোকে সংঘাত ও সংগ্রামের দ্বন্দ্বে উজ্জীবিত ও উচ্চকিত করে তুলেছে ।

বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, সমগ্র মধ্যযুগের মানসজগত বা শিল্পীচেতন্য যেখানে গভীরতরভাবে ধর্মান্ধতায় আচ্ছন্ন সেখানে এই সময়কালের পরিধিতে সৃষ্টি-হওয়া-সত্ত্বেও গীতিকাসমূহে বিধৃত জীবনবোধ সম্পূর্ণভাবে ধর্মাচ্ছন্নতামুক্ত । আরও স্মর্তব্য যে কোনো পরিশীলিত ব্যক্তিমানসচেতনা থেকে এই জীবনবোধের উদ্ভব

Dhaka University Institutional Repository

ঘটেনি, মধ্যযুগের বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ অর্থনৈতিক পরিমন্ডলের আবহে লালিত, কৃষিজীবী জনগণের জীবনঘনিষ্ঠ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবঞ্চিত সাধারণ ব্যক্তিচৈতন্য থেকে উৎসারিত হয়েছে এই জীবন-জতীপ্সার। ধর্মবোধ-উর্ধ্ব এই জীবনচৈতন্য উদ্ভবের কারণ অনুসন্ধান করতে হলে গীতিকাসমূহের দেশকালগত বিচার আবশ্যক। একটি বিশেষ কাল-পরিধিতে ময়মনসিংহ অঞ্চলের রাষ্ট্রীয়-রাজনৈতিক-সামাজিক-আদর্শগত ঘটনাপ্রবাহ ইতঃপূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। এ-পর্বে মধ্যযুগীয় সমাজমানসের ভাবাদর্শপ্রবাহের সামগ্রিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

আমাদের সাহিত্যে মধ্যযুগ হিসেবে চিহ্নিত কালপর্বটি মুসলমান শাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। আর মুসলমান শাসনের সঙ্গে সমানুপাতভাবে সংঘটিত হয়েছে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার। নব্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে বৌদ্ধধর্মের ক্রমক্ষয়িষ্ণু প্রবহমানতা এবং বর্ণাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্যবাদের কঠোর অনুশাসন ও বৈষম্যমূলক কৌলীন্যপ্রথার পটভূমিতে ইসলামের আগমন এদেশের লোকায়ত জীবনপ্রবাহে যে প্রবল জাগরণ সৃষ্টি করেছিল, তা আজ সর্বজনস্বীকৃত। ব্রাহ্মণ্যবাদের সীমাবদ্ধতা, অনুদার আত্মকেন্দ্রিকতা এবং জীবনবিমুখ শাস্ত্রানুশীলনপ্রিয়তা প্রভৃতির ফলে বাংলা ভাষার সাহিত্যিক প্রসারের ক্ষেত্রে এক অনতিক্রম্য অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছিল। ইসলামের উদার ও মানবতামূলক আধুনিক জীবনদৃষ্টি এই অন্তরায় অপসারণে যে অনুকূল ভূমিকা পালন করেছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রসঙ্গত এই যুগে ইসলামের প্রভাবের ফল সম্পর্কে কয়েকজন মনীষীর মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য।

দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "...ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ ভাষা-গ্রন্থ প্রচারের বিরোধী ছিলেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে ইঁহারা 'সর্ব্বনেশে' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এবং অষ্টাদশ পুরাণ অনুবাদকগণের জন্য ইঁহারা রৌরব নামক নরকে স্থান নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। এদিকে গৌড়েশ্বরগণের সভায় সংস্কৃত পুরাণ পাঠ ও 'ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে'-র ন্যায় পদাবলী প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইত। সেখানে 'তৈলাধার পাত্র' কিংবা পাত্রাধার তৈল প্রভৃতি ন্যায়ের কূট মীমাংসিত হইত, এবং নৈষধাদি কাব্যের অলঙ্কার-রহস্য ও দর্শনের সূক্ষ্মগ্রন্থি মোচনের জন্য বুদ্ধিজীবিগণ সর্ব্বদা তৎপর থাকিতেন। এই সমৃদ্ধ সভাগৃহে বঙ্গভাষা কি প্রকারে প্রবেশ লাভ করিল? ব্রাহ্মণগণ ইহাকে কিরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা কি কারণে এই ভাষার প্রতি সদয় হইয়া উঠিলেন?
আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"[১]

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক এ জন্য এ-যুগকে 'চিৎপ্রকর্ষের যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির দেবভাষায় বর্ণিত কথা ও কাহিনী বাংলা-ভাষায় শুনলেই কথক, শ্রোতা ও বক্তা সকলের জন্যই যাঁরা 'রৌরব'-নরকের ব্যবস্থা করেছিলেন, মুসলিম তুর্কী কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের কিছুকাল পরেই তাঁদের বংশধরেরা যখন সব নতুন করে বাংলা ভাষায় লিখতে শুরু করলেন, তখন বুঝতে হয়, তাঁদের মনে চিন্তার বিপ্লব ঘটেছে, অর্থাৎ তাঁদের মনে 'রেনেসাঁ' এসেছে – চিৎপ্রকর্ষ সাধিত হয়েছে।"[২]

Dhaka University Institutional Repository

হুমায়ুন কবির বলেছেন, " মায়াবাদী, নৈর্ব্যক্তিক ও পরিবর্তনবিমুখ নব্যব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে ইসলামের মায়াবিরোধী, ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং বিপ্লবী সংঘাত যখন লাগল তখন সে সংঘর্ষে ব্যক্তি ও সমাজজীবনের ভিত্তিমূল পর্যন্ত নড়ে উঠল ।" [৩]

অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন, "বাংলার মধ্যযুগ লৌকিক জীবনের জাগরণ ও অভিব্যক্তিতে চঞ্চল ও মুখর । এই জাগরণ ব্রাহ্মণ্য সংস্কার সংস্কৃতির কিছুটা স্বীকার করে কিছুটা অস্বীকার করে আত্ম-প্রকাশ করে । আর এও স্বীকার্য যে, এই স্বীকার-অস্বীকার একটা মূলগত সংঘাতের ফল ; এই সংঘাত ব্রাহ্মণ্য আদর্শের বিরুদ্ধে লৌকিক আদর্শের সংঘাত, ব্রাহ্মণ্য জীবনাদর্শের সঙ্গে লৌকিক জীবন-দর্শনের সংঘাত ।" [৪]

বলা বাহুল্য, ইসলাম ধর্মের তুলনামূলক আধুনিক নিয়মনীতি ব্রাহ্মণ্য জীবনাদর্শে এই সংঘাতের সূত্রপাত ঘটিয়েছে । হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে পারস্পরিক গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ, পরিশুদ্ধ ও জীবনঘনিষ্ঠ হয়েছে । পারস্পরিক এই বিনিময়ের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে মধ্যযুগের সমাজমানসে ভাববিপ্লব সাধিত হয়েছে । ইসলামের সামাজিক সাম্যের আদর্শ, একেশ্বরবাদী ও অনাড়ম্বর জীবনাচরণের আদর্শ মধ্যযুগীয় সমাজচৈতন্যে সেসময় যে অভিনব তরঙ্গাভিঘাত সৃষ্টি করেছিল সে কথা অরবিন্দ পোদ্দার স্বীকার করেছেন । ইসলামের আগমনের ফলে আর্যের প্রজ্ঞাধর্মী মননসমৃদ্ধ জীবনবাদের সঙ্গে অনার্যের বস্তুনিষ্ঠ প্রাণধর্মিতা ও সজীব ক্রিয়াশীলতার এক অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছিল । এই সমন্বয়ের ফলে বল্লালী কৌলীন্যপ্রথার অন্তর্গত সমাজ-বৈষম্য ভেঙে যে আবেগমুক্তি সংসাধিত হয়েছিল ষোড়শশতকীয় বৈষ্ণব-জাগরণ কিংবা মঙ্গলকাব্যে লৌকিক দেবতাগণের সমাজপ্রতিষ্ঠা লাভের সফল সংগ্রামের প্রেরণা তারই প্রত্যক্ষ ফল ।

ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে যে একান্ত ব্যক্তি-আগ্রহী ধর্মমোহবিচ্ছিন্ন প্রণয়াকাঙ্ক্ষা এবং সে-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতাকল্পে জীবনসংগ্রামে ব্যাপৃত হওয়ার ব্যক্তি-অভীপ্সা বিধৃত হয়েছে তার পেছনে মধ্যযুগীয় সমাজের এই 'চিৎপ্রকর্ষ', আবেগমুক্তি, ধর্মীয় সংঘাত ও সমন্বয় এবং ভাবজগতের তরঙ্গাভিঘাত প্রভৃতি ক্রিয়াশীল ছিল । অধিকন্তু পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে নব্য ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুশাসন ও মুসলিম শাসনের প্রথম পর্বের বিশৃঙ্খলামুক্ত থাকা এবং ঐ অঞ্চলের বিশেষ ভৌগোলিক, নৈসর্গিক ও নৃতাত্ত্বিক প্রতিবেশ এই ব্যক্তি-অভীপ্সা উৎসারণের মুখ্য পটভূমিমূলক উপাদান হিসেবে সক্রিয় থেকেছে ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমাজ ও সংস্কৃতি

দেশকালনিরপেক্ষ বস্তু-অস্তিত্ব যেমন অকল্পনীয় তেমনি সমাজনিরপেক্ষ মানবীয় অস্তিত্বের ধারণাও অমূলক। মানুষের জীবনপ্রবাহ সর্বদা সমাজসাপেক্ষ। সেকারণে মানুষ-সৃষ্ট সংস্কৃতিও সমাজ থেকে অবিচ্ছিন্ন। সমাজ ও সংস্কৃতির এইরূপ হরিহর-আত্মা-বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিজীবন উৎসারণেও ব্যাপ্ত। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে ব্যক্তিচেতনানিরপেক্ষ সমাজচৈতন্যের অস্তিত্ব অসম্ভব, কেননা সমাজে মানুষ ভিন্ন কোনো সচেতন সত্তার অস্তিত্ব নেই। ব্যক্তি-চেতনার সঙ্গে সমাজচৈতন্যের রয়েছে এক দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক। ব্যক্তি-চেতনার দ্বিবিধ সত্তার বিকাশের বিযুক্তিও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বস্তুলোকবিস্তৃত ও ভাবলোক-বিস্তৃত হয়ে বিকাশের দ্বিবিধ জীবনসত্তার পরিচয় অতি সহজেই ধারণীয়। ব্যক্তিজীবনবিকাশের এইরূপ দ্বিমাত্রিক উৎসারণই সমাজ ও সংস্কৃতিতে রূপলাভ করে। ব্যক্তিজীবনবোধের অস্তিত্বও তাই সমাজ ও সংস্কৃতিনিরপেক্ষ নয়।

ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে বিধৃত সমাজচিত্রের বাস্তবতা সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচকের উক্তি প্রথমেই স্মর্তব্য। গীতিকাসমূহের উদ্ভবকাল কিংবা এর ভাষা সম্পর্কে সংগ্রাহক-সমালোচকদের মধ্যে বিতর্ক থাকলেও এর কাহিনী নির্বাচন, ঘটনাবিন্যাস ও বর্ণনায় সমাজবাস্তবতার প্রতিফলন বিষয়ে সকলেই একমত হয়েছেন। সংগ্রাহক- সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "পালাগানের অধিকাংশই পূর্ব্ব-মৈমনসিংহের কোন কোন যথার্থ ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। যে সকল ঘটনা অশ্রুসিক্ত হইয়া লোকেরা শুনিয়াছে, সকল অবাধ ও অপ্রতিহত যমের দুর্জয় চক্রের ন্যায় সরল নিরীহ প্রাণকে পিষিয়া চলিয়া গিয়াছে — সেই সকল অপরূপ করুণ কথা গ্রাম্য কবিরা পয়ারে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন।"[৫] সমাজে সংঘটিত বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে কিংবা ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে গীতিকা-রচয়িতাগণ তাঁদের কাহিনী নির্মাণ করেছেন — এ-সত্য অবলোকনের পর দীনেশচন্দ্র সেন কাহিনী বর্ণনায় কিংবা চরিত্র নির্মাণে সমাজসত্যের প্রতিফলনও প্রত্যক্ষ করেছেন। যেমন,

> এই শ্যামল শস্যদোলনা ধনধান্যময়ী, রাজরাজেশ্বরী বঙ্গপ্রকৃতি, যাহা দেখিয়া কৃষকের প্রাণ অপূর্ব্ব কবিত্বে মন্ডিত হইয়া উঠিত এবং যাহা এই মৈমনসিংহ-গীতিকায় উজ্জ্বলভাবে দেখা দিয়াছে[৬]—

কিংবা,
> এই গীতিকাগুলির নারীচরিত্রসমূহ প্রেমের দুর্জয় শক্তি, আত্মমর্য্যাদার অলঙ্ঘ্য পবিত্রতা ও অত্যাচারীর হীন পরাজয় নিপুণভাবে দেখাইতেছে। নারীপ্রকৃতি মন্ত্র মুখস্থ করিয়া বড় হয় নাই, — চিরকাল প্রেমে বড় হইয়াছে। জননীরূপে তিনি জগতের বরেণ্যা, স্ত্রীরূপে তিনি জগতের প্রাণ। প্রকৃতি যেখানে সেই প্রাণ দান করেন, সেখানে সে প্রাণ অপূর্ব্ব হইয়া দাঁড়ায়।[৭]

ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্যও এতে বিধৃত জীবন ও সমাজচিত্রের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর ভাষায়, "ইহার জীবন বাস্তব, জগৎ সত্য ও ভাষা জীবন্ত।"[৮] তিনি লোক-কাহিনীর জীবনবাস্তবতায় কল্পজগতের প্রভাব আবিষ্কার করলেও গীতিকা-সমূহে রোমান্স-স্পর্শহীন প্রমূর্ত জীবনসত্যের প্রতিফলনের কথা স্বীকার করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

> ... আধুনিক উপন্যাস সৃষ্টি হইবার পূর্বে লোক-কথা (folk-tale) ও গীতিকার মধ্য দিয়াই মানবিক জীবনের বাস্তব কাহিনী বর্ণনা করা হইত । ইহাদের মধ্যে লোক-কথার উপর একটু কল্প-জগতের আবরণ থাকিত । ... কিন্তু গীতিকার মধ্য দিয়া মানবিক সুখদুঃখের অনুভূতি অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে রূপায়িত হইয়াছে ।...[৯]

ডক্টর মযহারুল ইসলাম এই বিষয়টি আরও সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেছেন, "বাংলা লোককাহিনীগুলোকে যদি বাঙালীর কল্পনার রঙীন আলোকে রঙীন বলা চলে, তবে ময়মনসিংহ গীতিকাগুলোকে বলতে হয় সমাজের বাস্তব জীবনালেখ্য ।"[১০] অন্যত্র তিনি এ-প্রসঙ্গে বলেছেন, "কলঙ্ক আত প্রত্যয়োন্মুখ নারীর জীবনে সমাজের উৎপীড়নের ফলে যে দুর্দৈব নেমে এসেছে, গীতিকাগুলো যেন তারি মর্মবেদনায় মুখর ।"[১১]

ডক্টর সেন গুপ্ত ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে সর্বত্রই রোমান্সের আবহ লক্ষ্য করেছেন । তবে তিনিও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে রোমান্সের হালকা আস্তরণ সরিয়ে দিলে সহজেই সমাজের সরল বাস্তবতা পরিদৃষ্ট হয় । তাঁর ভাষায়,

> ...রোমান্সের বর্ণাঢ্যতার আশপাশ থেকে সমাজ ও যে মানুষগুলো উঁকি মারে তা একান্তভাবেই বাংলার নিজস্ব প্রাণ । এখানে সপত্নী পুত্রকে হত্যার চক্রান্ত আছে, মুক্ত প্রেমের জয়গানের পাশে পাশেই চলেছে সমাজ-প্রধানদের কুৎসা-রটনা, — সমাজের মানুষের প্রেমধারণাকে
>
> ? বারবার (ক্লিষ্ট) করে ট্রাজেডি ঘটিয়েছে এই কাব্যে । মুসলমান কাজি বা দেওয়ানের লালসা ও অত্যাচারের নখর বহুস্থানে উদ্যত, কিন্তু কোথাও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ব্যাহত নয় । হিন্দু মুসলমানের প্রেমচিত্রকে দরদের সঙ্গে এঁকেছেন কবিরা । আর এই দেশের কর্মশীল মানুষ — কাঙালিয়া, ভাঙালিয়া, মৈষাল বন্ধু প্রভৃতি চরিত্রের মাহাত্ম্যতো নিখুঁত বাস্তবতার সঙ্গেই মূর্ত হয়েছে ।
>
> কেবল কাহিনী ও চরিত্রেই নয়, প্রকৃতি-চিত্রণেও বর্ণাঢ্যতার পেছনেই এই গ্রাম-বাংলা জীবন্ত —[১২]

এ-বিষয়ে ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকীর মতামত গুরুত্বপূর্ণ । তিনি গীতিকাগুলো সৃষ্টির পেছনে রচয়িতাদের মধ্যে সামাজিক প্রেরণার ক্রিয়াশীলতা উল্লেখ করে পরোক্ষে এই যুক্তিই প্রতিষ্ঠা করেছেন যে কোনো সৃষ্টির পেছনে সামাজিক প্রেরণা ক্রিয়াশীল থাকলে সেই সৃষ্টির অভ্যন্তরে সামাজিক চিত্রের বাস্তব প্রতিফলন অনিবার্য । তিনি বলেছেন,

> এমন একটা যুগ ছিল যখন গীতিকা তৈরীর পেছনে একটা সামাজিক প্রেরণা ছিল ।... কোন একজন গায়ক একটি গীতিকা তৈরী করতেন সামাজিক প্রয়োজনে । সামাজিক প্রয়োজনেই তাতে নানা পাঠভেদ ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতো । এসমাজ ছিল গ্রামীণ — এর সংস্কৃতিও ছিল গ্রামীণ —[১৩]

উপর্যুক্ত মন্তব্যগুলি ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের সমাজবাস্তবতা সম্পর্কে যথার্থ ইঙ্গিত প্রদান করলেও এযাবৎকালে তার বিস্তার, গভীরতা ও বৈচিত্র্য অবিশ্লেষিত রয়ে গেছে ।

Dhaka University Institutional Repository

শাসকশ্রেণী

ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে চার শ্রেণীর মানুষের অস্তিত্ব বিদ্যমান । প্রথম পর্যায়ে রয়েছে নবাব-রাজা-দেওয়ান-জমিদার-কাজী-চাকলাদার শ্রেণীর মানুষ । সমাজের সর্ব-উপরিতলের এসব অভিধাযুক্ত মানুষ যেনো-না-কোনোভাবে সমগ্র সমাজের শাসক ও শোষকের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত । এঁদের মধ্যে পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাতময় সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও শাসকসুলভ এক সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ধারক তাঁরা । অত্যাচার-নিপীড়নের একটি সাধারণ উপাদানও তাদের চরিত্রে পরিস্ফুটিত । এখানে রাজা ও জমিদার শব্দগুচ্ছদ্বয় হয়ত-বা সমার্থক । অত্যাচার-নিপীড়নের বাইরে রিরংসাবৃত্তির ক্ষেত্রে রাজা-জমিদারদের সঙ্গে নবাব-দেওয়ান-কাজীর মৌলিক ভিন্নতা রয়েছে । রাজপুত্র চরিত্রে রিরংসাবৃত্তিজাত ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ পরিলক্ষিত হলেও গীতিকাসমূহে রাজা-জমিদারগণ রিরংসাবৃত্তির কলুষতা থেকে মুক্ত । মূলতঃ নবাব-দেওয়ান-কাজী চরিত্রেই রূপলালসা, বহুনারীসম্ভোগ ও রিরংসাবৃত্তির উদাহরণ পরিলক্ষিত হয় । এসব উদাহরণ ভারতবর্ষে মুসলিম শাসকদের বৈশিষ্ট্যকেই শুধু স্মরণ করিয়ে দেয় । উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আভিজাত্যবোধের গৌরব, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, নির্যাতনপ্রিয়তা, ষড়যন্ত্রপ্রয়াস প্রভৃতির পাশাপাশি এই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রজাবৎসলতা, উন্নত চরিত্রগুণ, মানবীয় ঔদার্য, সংবেদনশীলতা, আন্তরিক প্রণয়াবেগও সমানভাবে ক্রিয়াশীল ।

'মলুয়া', 'দেওয়ান-ভাবনা' ও 'রূপবতী' গাথায় কাজী, দেওয়ান ও নবাবের রূপলালসা, বহুনারীসম্ভোগ ও রিরংসাবৃত্তির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় । কাজী, দেওয়ান, নবাব – সকলেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী । কিন্তু যারা তাদের অন্যায় কামনার শিকার হয়েছে তারা কেউই তাদের স্বধর্মীয় নয় । তবে এদ্বারা তাদের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচয় পরিস্ফুট হয় না । বরং তাদের অনাচার-তৎপরতায় যে ধর্মাধর্মজ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছিল তারই ঐতিহাসিক প্রমাণ সুস্পষ্ট হয় ।

প্রথমেই 'মলুয়া' গাথায় বিধৃত কাজীর রূপলালসা ও তা চরিতার্থতাকল্পে নানা প্রকার ষড়যন্ত্রের আশ্রয়গ্রহণ, ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । কেননা কাজীর অন্যায় আচরণের মধ্য দিয়েই প্রস্ফুটিত হয়েছে এধরনের চরিত্রের ক্রুর-কুটিল-অপরাধপ্রবণতার সামগ্রিক রূপ । চান্দ বিনোদের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী মলুয়ার দেহসৌন্দর্য কাজীর মনে রূপলালসার সৃষ্টি করে । তিনি গ্রামের কুটনীর শরণাপন্ন হয়ে তাকে বিচারের ভয় থেকে আশ্বস্ত করেন এবং কার্যসিদ্ধি হলে মূল্যবান পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন ঃ

> কাজী কয় "কুটুনিলো তরে দিয়াম সোনা ।
> করিবা আমার কাজ হইয়া সাথিনা ।।
> সাতখুন মাপ তোমার কাজীর বিচারে ।
> এই কাম করলে তোমার কপাল যাইব ফিরে ।। (মৈ.গী. পৃ ৭৩)[১৪]

কাজীর গৃহে রয়েছে একাধিক স্ত্রী, কিন্তু তবুও তিনি মলুয়াকে স্ত্রী হিসাবে লাভ করতে আগ্রহী । কুটনীর মাধ্যমে তিনি মলুয়ার সামনে একটি সমৃদ্ধ ঐশ্বর্যময় ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তাব প্রেরণ করে বলছেন, তাকে স্বামী হিসেবে বরণ করলে অসীম সম্পদের অধিকারী হবে মলুয়া, তার অন্য স্ত্রীরা

Dhaka University Institutional Repository

মলুয়ার সেবায় নিয়োজিত হবে । কিন্তু এসব প্রস্তাব মলুয়ার মনে আশার পরিবর্তে ক্রোধের সঞ্চার করে । প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে কাজীর অবমানিত হৃদয়ে জাগ্রত হয় প্রতিশোধস্পৃহা । কাজী তার অন্যায় বাসনা চরিতার্থকল্পে স্বীয় প্রশাসনিক অবস্থান এবং সম্পদ ও প্রতিপত্তি — এই উভয় শক্তিকে ব্যবহার করার জন্যে বদ্ধপরিকর হয় । প্রথমে লোভ প্রদর্শনে ব্যর্থ ও অপমানিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণের কুটিল ষড়যন্ত্রের পথে অগ্রসর হয় সে । চান্দ বিনোদের ওপর এই মর্মে এক পরওয়ানা জারী করা হয় যে বিবাহ-উত্তর ছয়মাসকাল অতিবাহিত হলেও সে বিবাহজনিত কর সরকারী তহবিলে জমা দেয়নি । এজন্য সপ্তাহকাল সময় দিয়ে বলা হয়, অন্যথায় তার জমি ও বাড়ির স্বত্ব লুপ্ত হবে ।

আজি হইতে হপ্তা মধ্যে আমারি বিচারে ।
নজর মরেচা তুমি দিবা দেওয়ানেরে ।।
নজর মরেচা যদি নাহি দেও তুমি ।
বাজেপ্ত হইবে তোমার যত বাড়ী জমী ।। (মৈ. গী. পৃ ৭৭)

চান্দবিনোদকে শ্বশুর সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করেই কাজীর প্রতিশোধস্পৃহা ক্ষান্ত হয়নি । কাজী মলুয়াকে দেওয়ানের তত্ত্বাবধানে প্রেরণ করেছে এবং চান্দ বিনোদকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে । নিজে ভোগ করতে ব্যর্থ হয়ে প্রভু কর্তৃক ভোগ করিয়ে আনন্দ লাভের এক চরম বিকৃত মানসিকতার পরিচয় কাজী চরিত্রে উন্মোচিত হয়েছে ।

'দেওয়ান ভাবনা' গাথায় দেওয়ান চরিত্রে এ-ধরনেরই এক অকল্যুষিত মানসিকতার পরিচয় বিধৃত হয়েছে । দেওয়ান ভাবনা সুন্দরী যুবতী অনুসন্ধানের জন্যে গ্রামে কর্মচারী নিয়োগ করে রেখেছেন । 'বাঘরা' নামক এমনই একজন কর্মচারীর মাধ্যমে দেওয়ান ভাবনা ব্রাহ্মণ ভাটুক ঠাকুরের ভগ্নী-কন্যা সোনাই সম্পর্কে অবহিত হন । সংবাদ প্রদানের পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়ান বাঘরাকে কয়েক মন ধান প্রদান করেন । অতঃপর বাঘরার মাধ্যমে দেওয়ান ভাটুক ঠাকুরের নিকট বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করেন । দেওয়ানের গৃহেও রয়েছে বহু স্ত্রী, ভাটুক ঠাকুর তার ভগ্নী-কন্যাকে দেওয়ানের নিকট সমর্পন করলে অন্য স্ত্রীগণ সোনাইয়ের দাসী হিসেবে কাজ করবে, তাছাড়া ভাটুক ঠাকুরকে দেওয়া হবে বিশ 'পুরা' জমি — এমন লোভনীয় প্রস্তাব মূলত দেওয়ানের ছলনা । বাঘরার মাধ্যমে প্রস্তাব প্রেরণের পাশাপাশি তিনি তাঁর লাঠিয়াল বাহিনীর মাধ্যমে সোনাইকে অপহরণ করেন ।

বান্ধা আছে পানসী নাও কেওয়া বনের ধারে ।
সোনাইরে ধরিয়া লইল দেওয়ান ভাবনার চরে ।। (মৈ. গী. পৃ ১৮৪)

কিন্তু ইতোমধ্যে অপহরণের সংবাদ পৌঁছায় সোনাইয়ের প্রণয়ী জমিদার-পুত্র মাধবের নিকট । দেওয়ানের লাঠিয়াল বাহিনীকে পরাস্ত করে পথিমধ্যে মাধব সোনাইকে উদ্ধার করে । অতঃপর মাধবের পরিবারের ওপর নেমে আসে দেওয়ানের চরম নির্যাতন । প্রথমে মাধবের পিতাকে কারারুদ্ধ করা হয় । মাধব দেওয়ানের নিকট আত্মসমর্পণ করলে তার পিতাকে মুক্তি দেওয়া হয় ঠিকই, কিন্তু দেওয়ান প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে যে সোনাই দেওয়ান-গৃহে প্রত্যাবর্তন না করলে মাধবের মুক্তি অসম্ভব ।

দুরন্ত দুর্জন ভাবনা পরতিজ্ঞা যে করে ।
তোমারে পাইলে ছাইড়া দিব মাধবেরে ।। (মৈ. গী. পৃ ১৮৯)

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ানের প্রবল উৎপীড়নের ফলেই তার আমলাঃসার নিকট নিরুপায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয় সোনাইকে। 'রূপবতী' গাথায় নবাবের অনুরূপ রূপলালসাদীর্ণ চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। মুর্শিদাবাদের নবাব তার অধীনস্থ রামপুরের রাজা জয়চন্দ্রের কন্যা রূপবতীর অপূর্ব দেহ-সৌন্দর্যের তথ্য অবহিত হয়ে তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। জয়চন্দ্রের নিকট এই কন্যা সমর্পণের প্রস্তাব করে বলেন, নবাবের নিকট কন্যা সমর্পণ করলে জয়চন্দ্র নবাবের খেতাব এবং নবাবের দরবারে সম্মান লাভ করবে।

শুন্যাছি তোমার কন্যা ছুরৎ কামালী।
আমার কাছে বিয়া দিয়া ভোগ ঠাকুরালী।।
খেতাব হইবে তুমি মোর ছাহেবান।
দরবারে পাইবা তুমি আমার ছেলাম।। (মৈ. গী. পৃ ২৪৫)

মুসলিম শাসকশ্রেণীর বহুনারী সম্ভোগের এধরনের অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার তথ্য ইতিহাসসম্মত ও বিতর্ক-উর্ধ্ব। মধ্যযুগে মুসলিম শাসকেরা রাজ্য ও খেতাব দান এবং সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে যে বহু হিন্দু রাজকন্যাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতেন তার ঐতিহাসিক প্রমাণও এই গাথার কাহিনীতে স্পষ্ট

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শাসকশক্তির পীড়ন-মানসিকতা তাদের স্বভাবধর্মের অনুগত। কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, কর আদায়, অন্যায় আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থকরণ, রূপলালসা পূরণ প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে তারা প্রজাপীড়নে নিস্ফুক্ত ছিল। 'মলুয়া' গাথার কাজীর চরিত্রটি পীড়নকারী হিসেবে উদাহরণীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী অন্যায়ের বিচারের দায়িত্ব সরকার তার ওপর ন্যস্ত করলেও অন্যায়কারীকে প্রশ্রয়দান এবং ন্যায়কারীকে শাস্তিদানই তার চরিত্রবৈশিষ্ট্য। অবিচার ও ক্ষমতা অপব্যবহারের চমৎকার উদাহরণ কাজী-চরিত্রে পরিস্ফুটিত হয়েছে। শ্রেণীবৈষম্যমূলক সমাজপদ্ধতিতে প্রশাসনযন্ত্রের নীতিহীনতা, অনাচারের একটি শাশ্বত-রূপ কাজী-চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়ঃ

বড়ই দুরন্ত কাজী ক্ষেমতা অপার।
চোরে আশ্রা দিয়া মিয়া সাউদেরে দেয় কার।।
ভালামন্দ নাহি জানে বিচার আচার।
কুলের বধূ বাহির করে অতি দুরাচার।। (মৈ. গী. পৃ ৭২)

'কমলা' গাথায় জমিদার কর্তৃক তার অধীনস্থ চাকলাদারের ওপর অন্যায় জুলুমের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। চাকলাদার মাটির তলদেশে বিপুল পরিমাণ ধন পেয়েছে, কিন্তু জমিদারকে সেই সম্পদের অংশ দিচ্ছে না — কর্মচারী কর্তৃক প্রতিহিংসাবশত প্রচারিত এমন এক মিথ্যা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে জমিদার চাকলাদার ও তার পুত্রকে কারারুদ্ধ করে, পাষাণচাপা দেয়, এমনকি প্রাণসংহারে উদ্যত হয়। কেবল-মাত্র সাধারণ প্রজারাই নয়, শাসক-শক্তির প্রান্তিক অংশের লোকেরাও যে অন্যায় নিপীড়নের শিকার হত, এখানে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

পিতাপুত্রে এক সঙ্গে দেও পাষাণ-চাপ ।
মোহর না দিলে আন্য নাহি ইতে যাপ ।। (মৈ. গী. পৃ ১৪১)

'দেওয়ান ভাবনা' গাথায় দেওয়ান ভাবনা রূপলালসা চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে জমিদার ও জমিদার-পুত্রকে হত্যা করে, এ-কথা ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে । নির্যাতনের ভিন্ন রূপ চিত্রায়িত হয়েছে 'ধোপার পাট' ও 'শ্যাম রায়ের পালা' গাথায় । পুত্রের অন্যায়াসক্তির জন্য রাজা বা জমিদার পুত্রকে শাসন না করে যার প্রতি আসক্ত হয়েছে তার পরিবারের ওপর নিপীড়ন করার কাহিনী বিবৃত হয়েছে এই দুই গাথায় । 'ধোপার পাট' গাথায় জমিদার যখন শুনতে পেলেন যে তার পুত্র তারই ধোপার কন্যার প্রতি অনুরক্ত তখন ক্রোধে অধীর হয়ে পুত্রের পরিবর্তে ধোপাকে ডেকে এক দিনের মধ্যে কন্যার বিবাহ আয়োজনের নির্দেশ দেন ।

ক্রোধেতে কাঁপিতে অঙ্গ কি কহিবাম তোরে ।
রাগের সঙ্গে কহে রাজা হাটকাইল্যা ধোপারে ।।
বয়স হইয়াছে কন্যার না দিস বিয়া ।
আমার পুত্র পাগল হইল কন্যারে দেখিয়া ।।
আইজ যদি না দেও বিয়া রাত্রি পোয়াইলে ।
আমার লস্করে গিয়া ধইরা আনব চুলে ।। (পূ. গী. দ্বি. খ. দ্বি. স. পৃ ১১

দরিদ্র-জীবনে বিবাহ-যোগ্যা কন্যার বিবাহ-আয়োজনে অপারগ হওয়াই স্বাভাবিক । অন্যের যুবতী কন্যার প্রতি আসক্তির জন্য পুত্রকে দায়ী না করে দরিদ্র ধোপাকে বিবাহ-আয়োজনের অপারগতার জন্য দায়ী করা জমিদার-চরিত্রেরই যেন সঙ্গত আচরণ । অনুরূপ চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে 'শ্যাম রায়ের পালা'য় । সেখানে শ্যাম রায় এক ডোম-বধূর প্রতি আসক্ত হলে তার পিতা ডোমের গৃহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ।

কানাকানি জানাজানি লোক মুখে শুনি ।
গুস্সায় জ্বলিল রায় জ্বলন্ত আগুনে ।।
লোক লাট্যালে ডাক্যা রায় কোন কাম করিল ।
বাড়ী ঘর ভাইঙ্গা ডোমের সায়রে ভাসাইল ।। (পূ. গী. তৃ. খ. দ্বি. স. পৃ ২৮৩)

এসব বৈশিষ্ট্য মোগল শাসকদের চরিত্রের অনুরূপ । মোগল শাসকগণ পুত্র-কন্যাদের অবৈধ প্রণয় সম্পর্কে অবহিত হলে পুত্রকন্যাদের পরিবর্তে তাদের বাঞ্ছিত পাত্র-পাত্রীদের প্রাণসংহার করতেন । 'ধোপার পাট' ও 'শ্যাম রায়ের পালা'য় জমিদারদের ঐ ধরনের আচরণেরই প্রমাণ পাওয়া গেল । 'বীর নারায়ণের পালা'য় বীর নারায়ণের পিতার আচরণ ভিন্নতর । তিনি পুত্রের অবৈধ প্রণয়ের অভিযোগ অবহিত হয়ে পুত্রকে শাস্তিদানের প্রতিজ্ঞা করেন । এ ধরনের আচরণে বীর নারায়ণের পিতাকে মহৎ পুরুষ বলেই আপাতঃদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হবে । কিন্তু তার চরিত্রের নির্যাতনপ্রিয় মানসিকতার পরিচয় অন্যত্র স্পষ্ট হয়েছে । পলাতক পুত্রকে অনুসন্ধান করে খুঁজে বের করার জন্য জমিদার তার অনুগত বেতনভোগীদের ওপর যে-নির্দেশ জারী করেন তাতে বলেন যে কর্তব্যে অবহেলার শাস্তি হবে সপরিবারে প্রাণদন্ড । প্রজাগণের ওপর উৎপীড়নের এই ভিন্নতর রূপটি কেবল 'বীর নারায়ণের পালা'য় পরিদৃষ্ট হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

ঘুণাইয়া কই যদি এতে কর দান ।
জন বাচ্ছা সইতে তরায় যাইব গর্দ্দান ।।
মোর পুত্র বলিয়া যদি এতে কর দান ।
ভিটা খালি করবার রাজ্যি হইব লানবান ।। (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.
পৃ ৩০৯ - ১০)[17]

অত্যাচারী রাজার চরিত্র আমরা 'মইষাল বন্ধু' গাথায়ও প্রত্যক্ষ করি । চট্টগ্রামের এক কাঞ্চু রাজার কাহিনী বিধৃত হয়েছে ঐ গাথায় । উৎপীড়নপ্রিয়তার পাশাপাশি বহু নারীসম্ভোগও তার চরিত্রের অন্যতম উপাদান । গৃহে সাত শত বধূ থাকার পরও রাজা সুন্দরী যুবতীর অনুসন্ধান পেলে বাহুবলে তাকে বিবাহ করেন ।

চাটীগাঁইয়া কাঞ্চু রাজা শুন দিয়া মন ।
বড়ই লম্পট রাজা রাজ্যের দুষমণ ।।
সাতশত সুন্দরী নারী আছে তার ঘরে ।
সুন্দর পাইলে রাজা আরও বিয়া করে ।। (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ৭৬)

'মইষাল বন্ধু' গাথায় জমিদারের অত্যাচারের কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে । মহিষ কর্তৃক ক্ষেতের ধান নষ্ট হলে জমিদার উচ্চবিত্ত কৃষক বলরামকে পাইক পেয়াদার সাহায্যে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করে । বলরামের ভৃত্য জামিন হলে বলরামের মুক্তি ঘটে, কিন্তু তার মহিষগুলোর মুক্তির জন্য পাঁচশ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয় । 'ভেলুয়া' গাথায় আর-এক অত্যাচারী রাজার পরিচয় বিধৃত হয়েছে । রংপুরের আবু রাজা এত বেশি উৎপীড়ক যে তার ভয়ে 'বাঘে মহিষে এক ঘাটে জল পান করে' । সীমাহীন ধনদৌলতের অধিকারী এই রাজাও বহুনারীসম্ভোগের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন । গৃহে তার পাঁচশত বধূ আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সুন্দরী নারীর অনুসন্ধান পেলে তাকে অপহরণ করতে দ্বিধা করেন না ।

দুরন্ত দুষ্টমন্যা রাজা হগলাতে ডরায় ।
তার ডরে বাঘে ভইসে এক ঘুয়ায় জল খায় ।।
পঞ্চশত সুন্দরী নারী আছে তার ঘরে ।
পরের ঘরের সুন্দরী নারী তেও চুরি করে ।। (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ১৬৭

রূপলালসা ও নিগ্রহপ্রিয়তার অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য হিসেবে শাসক চরিত্রে যুদ্ধপরায়ণতার উপাদানও ক্রিয়াশীল ছিল । পররাজ্য গ্রাস, আত্মরক্ষা, আত্মসম্মানরক্ষা, প্রতিশোধ কিংবা প্রতিহিংসা চরিতার্থকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে যুদ্ধ সংঘটিত হতে দেখা যায় । 'ভারাইয়া রাজার কাহিনী','ফিরোজ খান দেওয়ান','ঈসা খাঁ মসনদালী','রাজা রঘুর পালা', 'ভেলুয়া' প্রভৃতি গাথায় যুদ্ধের বিবরণ আছে । 'ভারাইয়া রাজার কাহিনী'তে ভূমির অধিকার নিয়ে উপজাতীয় কোচরাজা ভারাইয়ার সঙ্গে প্রতিবেশী ক্ষত্রিয় রাজা বীরসিংহের একাধিকবার যুদ্ধ সংঘটিত হয় । যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে ভারাইয়া রাজা জয়ী হলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে তার পরাজয় ঘটে । এই যুদ্ধে উভয় রাজার যুদ্ধপ্রিয়-চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছে । ভূমি দখল ছাড়াও যুদ্ধজয়ের মধ্যে দিয়ে ভারাইয়া রাজার মধ্যে ভিন্নতর আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় । ক্ষত্রিয় রাজার পুত্রের নিকট কন্যা সম্প্রদান করে ভারাইয়া রাজা তার কৌলিন্য বৃদ্ধির প্রয়াস পেয়েছেন । যুদ্ধে ঘোড়া ব্যবহার ছাড়া বর্শা , বল্লম, তূণ, তীর, ধনুক, লোহার, মুগুর প্রভৃতি অনাধুনিক অস্ত্র ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায় ।

ঝুলুঙ্গা লইয়া নাচে, ভালা, বড় বড় বীর ।।
ঢেডা শেল আর লম্বরে, শলকী চোখা-মাথা ।
হাতে শেল ধনুক কলা সাথে শেল ঝুগা ।।(পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ১৫৯)

যুদ্ধের বর্ণনা কোনো কোনো অংশে যুদ্ধের ভয়াবহতাকে পরিস্ফুট করে ।

সায়রের বুকে যেমুন তোফান ছুটিল ।।
গরও বুকে তীরের ঘা, লৌ উঠে মুখে ।
ধনুক তীর বাজে গিয়া গালে মস্ত মুখে ।। (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ১৬০)

'রাজা রঘুর গানা'য় বালক রাজা রঘু ঈসা খাঁ কর্তৃক অপহৃত হলে অপমানবোধতাড়িত উপজাতীয় জনগণ তাকে উদ্ধারকল্পে যুদ্ধযাত্রা করে । তবে অপরপক্ষের সঙ্গে মুখোমুখি না হওয়ায় যুদ্ধ সংঘটিত হয় না । এই গাথায় যুদ্ধযাত্রার বর্ণনাটি যুদ্ধকেই স্মরণ করিয়ে দেয় । বর্ণনাটি নিম্নরূপঃ চারিদিক থেকে সমগ্র রাজ্য জুড়ে গারো উপজাতীয় জনগণ রাজ-উদ্ধার মানসে ধেয়ে এসেছে রাজধানী সুসং অভিমুখে । সেখান থেকে তারা ঈসা খাঁর রাজধানী জঙ্গলবাড়ি শহর অভিমুখে যাত্রা করছে । বর্শা, বল্লম, রামদা প্রভৃতি নিয়ে লাটাখ সহস্রাধিক গারো নেতা জঙ্গলবাড়ি শহর চূর্ণবিচূর্ণ করার মানসে দৃপ্ত পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে :

সার সার কত্যা চলে
জঙ্গলবাড়ীর স'রে ।।
... ...
তারার দাপটে ভূমি
তরাতরি কাঁপে ।। (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৮৭)

'ফিরোজ খান দেওয়ান' গাথায় মুসলমান দেওয়ান উমর খাঁর কন্যা সখীনাকে দেওয়ানের অসম্মতি সত্ত্বেও দেওয়ান ফিরোজ খাঁ অপহরণ ও বিয়ে করলে অপমানিত দেওয়ান উমর খাঁ দিল্লির বাদশাহ্-র শরণাপন্ন হন । পরে বাদশাহ্-র সেনাবাহিনীর সাহায্যে উমর খাঁ ফিরোজ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন । যুদ্ধে ফিরোজ খাঁর সৈন্যরা যখন পরাজিত হতে চলেছে তখন সখীনা দিল্লির বাদশাহ্ ও পিতার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে জয়ী হয় ।

আড়াই দিন হইল রণ কেউ না জিতে হারে ।
আগুন লাগাইল বিবি কেল্লাতাজপুর সরে ।।
বড় বড় ঘর দরজা পুইড়া হইল ছাই ।
রণে হারে বাদশার ফৌজ মরনের সীমা নাই ।।(পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ৪৭৪)

'ঈসা খাঁ মসনদালী' গাথায় ঈসা খাঁর বিরুদ্ধে দিল্লির বাদশাহ্-র সেনাপতি মানসিংহের যুদ্ধ পরিচালনার বর্ণনা আছে । ঈসা খাঁ-মানসিংহের যুদ্ধ ইতিহাসবিখ্যাত । কর প্রদানে ঈসা খাঁর অস্বীকৃতি এবং দিল্লির বাদশাহ্-র বশ্যতা স্বীকারে ঈসা খাঁর অসম্মতি — এই যুদ্ধের কারণ । কর আদায় এবং

Dhaka University Institutional Repository

বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করার জন্য মানসিংহকে ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রেরণ করা হয়। যুদ্ধে ঈশা খাঁর সাহসিকতা, বীরত্ব, কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা, দেশপ্রিয়তা প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া যুদ্ধের বর্ণনা আছে 'জেবুয়া' গাথায়। রূপলালসাই এই যুদ্ধের কারণ। নারী অপহরণ-নিমিত্তে এই যুদ্ধ আয়োজিত হয়। এই গাথায় যুদ্ধ সংঘটিত হয় স্থলভাগের পরিবর্তে জলভাগে।

রূপলালসা, লাঞ্ছনাপ্রিয়তা, যুদ্ধপরায়ণতা, পররাজ্যগ্রাস, আভিজাত্যলাভের প্রয়াস প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য যেমন শাসক-চরিত্রের স্বভাবধর্ম তেমনি প্রজাবৎসলতা, উন্নত চরিত্রগুণ, মানবীয় ঔদার্য, সংবেদনশীলতা, আন্তরিক প্রণয়াবেগ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যও শাসক-চরিত্রে দুর্লক্ষ্য নয়। 'ভারতীর্থের গান' গাথায় প্রজাবৎসলতার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হয়। মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করে রাজা ভগদত্ত যখন প্রবাস গমনে উদ্যত, তখন কনিষ্ঠ ভ্রাতার হাতে রাজকার্যভার অর্পণ করে তিনি প্রজাগণের সুখদুঃখের অংশীদার হওয়ার পরামর্শ দেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ পালন ও প্রজার প্রতি কর্তব্য পালনে কনিষ্ঠ ভ্রাতার উন্নত চরিত্র-গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। কোনো কারণে প্রজাদের ডেকে আনতে হলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা রামচন্দ্র পেয়াদাগণের প্রতি নির্দেশ দিতেন যে, তাদের হাঁটিয়ে কষ্ট না দিয়ে যেন হাতীর পিঠে চড়িয়ে আনা হয় এবং তাদের সঙ্গে যেন কোনোরূপ অসদাচরণ না করা হয়।

প্রেজাগোরে তলপ দিলে প্যায়দাগোরে ডাইকা কয়।
হাতির পিস্টে আইনবা প্রেজা হয়না যানি কস্ট তার।
মিস্ট কথা আইনবা ডাইকা প্রেজা যে আমার।। (পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি.স.পৃ ৫২০)

প্রজাদের সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিপালন করা যে রাজার দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত তা রাজা ভগদত্ত ও রাম-চন্দ্রের আচরণে স্পষ্ট হয়েছে।

'কাজলরেখা'র সূচ রাজার চরিত্রে উন্নত চরিত্রগুণের অভিপ্রকাশ ঘটেছে। দৈবের নির্বন্ধে সূচবিদ্ধ ও সূচমুক্ত রাজা তার দাসী ও রাণীর মধ্যে যে কুটিল ষড়যন্ত্র প্রত্যক্ষ করেন, তা উন্মোচনে তাঁর সহনশীলতা ও উন্নত চরিত্রগুণেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কাজলরেখা রাণী হয়েও দাসীর কূটবুদ্ধির কারণে দাসীবৃত্তিতে বাধ্য হয়। সূচরাজার মনে প্রথমে সন্দেহ জাগে, তিনি মন্ত্রীর দ্বারা পরীক্ষা করেন। পরে নিজে আলপনা আঁকিয়ে এবং অতিথিদের জন্য রান্নার আয়োজন করে স্থির হন যে কাজলরেখাই মূলত রাণী। কিন্তু তারপরও তিনি বিচারে প্রবৃত্ত হননি যতদিন প্রমাণ সহযোগে এই কূটচক্রের রহস্য উন্মোচিত না হয়েছে।

মানবীয় ঔদার্যের পরিচয় আমরা 'মলুয়ার বারমাসী' গাথায়ও প্রত্যক্ষ করি। ভূমা রাজার পুত্র বসন্ত ডাকাতদের কবল থেকে যুবতী মলুয়াকে উদ্ধার করে তার পিতা-মাতার নিকট তাকে স্বার্থহীনভাবে পৌঁছে দেয়। মলুয়ার প্রতি তার অনুরাগ-আসক্তি প্রবল, পিতা-মাতার নিকট অর্পণ না করে সহজেই সে তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে সক্ষম ছিল, কিন্তু তা সে করেনি। এখানেই তার ঔদার্যের পরিচয়। হৃদয়ের রক্তক্ষরণে সে আত্মসমাহিত হয়েছে, কিন্তু ক্ষমতার অপব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়নি। পুত্রের প্রণয়বাসিত হৃদয়ের কাতরতা অত্যন্ত সংবেদনশীল মন নিয়েই পিতা ভূমা রাজা অনুধাবন করেছেন। বণিক নিতি-মাধবের নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়ে রাজা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। পরে মলুয়ার সুউদ্যোগে ভূমা রাজার গৃহে আগমন ঘটলে রাজা বিবাহ আয়োজনে হয়েছেন তৎপর।

Dhaka University Institutional Repository

সংবেদনশীলতা, পরার্থপরতার পরিচয় 'দেওয়ানা মদিনা', 'আঁধা বন্ধু', 'বীরনারায়ণের পালা' প্রভৃতি গাথায় লক্ষণীয় । 'দেওয়ানা মদিনা' গাথায় বানিয়াচঙ্গের দেওয়ান সোনাফর স্ত্রীর মৃত্যুকালীন অনুরোধকে শিরোধার্য করে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন । প্রথম স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ, অনুরোধ প্রতিপালনে একনিষ্ঠতার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে । দেওয়ান সোনাফরের এই সংবেদনশীলতা পুত্র দুলাল চরিত্রে সঞ্চারিত হতে দেখা যায় । মদিনার প্রতি আন্তরিক প্রণয়াবেগের ফলে দুলাল মদিনার সমাধিপৃষ্ঠেই জীবনের পরবর্তী আবাসস্থল নির্মাণ করে এবং দেওয়ানী-জীবনে প্রত্যাবর্তন থেকে বিরত থাকে ।

বান্ধিল ছেপরা এক কবরের উপরে ।।
এইরূপে থাকে মিঞা দাওনা লইয়া ।
ফকীর সাজিল দুলাল দেওয়ানগিরি থুইয়া ।। (মৈ. গী. পৃ ৩৬৭)

'আঁধা বন্ধু' গাথায় সহায়-সম্বলহীন প্রবাসী এক অন্ধ বংশীবাদকের প্রতি রাজার প্রবল সহানুভূতির পরিচয় বিধৃত হয়েছে । রাজা পিতৃমাতৃহীন বাস্তুহারা অন্ধের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে স্বীয় গৃহে তার আবাসনের ব্যবস্থা করেন এবং রাজকন্যার শিক্ষকতার কাজে তাকে নিযুক্ত করেন । কিছুদিন পরে বংশীবাদক বিদায়প্রার্থী হলে রাজা তাকে স্থায়িভাবে বসবাসের প্রস্তাব দিয়ে বলেন, সুন্দর রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা করা হবে, নব দম্পতির বিনোদনের জন্য প্রমোদগৃহ নির্মাণ করা হবে, রাজত্ব করার জন্য রাজ্য দেওয়া হবে, সঙ্গে থাকবে শতজন দাসী । কেবলমাত্র অন্ধের জন্য চক্ষুদান সম্ভব হবে না, কিন্তু তাছাড়া সকল সুখেরই ব্যবস্থা করা হবে ।

সুন্দর রাজার কন্যা বিয়া করাইব ।
জলটুঙ্গী ঘর এক বানাইয়া দিব ।।
শতেক দাসী দিব তোমার সঙ্গতি করিয়া ।
সুখেতে রাজত্বি কর এইখানে থাকিয়া ।। (পূ. গী. চ. খ. দ্বি. স. পৃ ১৯৮)

'বীর নারায়ণের পালা'য় পরহিতৈষণার চমৎকার উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে । জমিদারপুত্র বীরনারায়ণ নির্জন নদীতীরে সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন প্রত্যক্ষ করল বণিক কর্তৃক এক পল্লীবালিকা অপহৃত হচ্ছে, তখন অপহৃতা কন্যার আর্তচিৎকার তার হৃদয়ে সহানুভূতি উদ্রেক করল । জীবনহানির আশংকা উপলব্ধি করেও সে অপহৃতা কন্যা উদ্ধারে সঙ্কল্পবদ্ধ হয় । পরহিতের এমন উদাহরণ বিরল । প্রজাহিতৈষণাবোধও বীরনারায়ণের মধ্যে প্রবল ঃ

সেদরতি করিয়া সাধুরে
আরে কন্যা যায় লইয়া ।
কিরথায় থামরার তবেরে
আর জমিদারী লইয়া ।। (পূ. গী. চ. খ. দ্বি. স. পৃ ২১৮)

শাসক-চরিত্রে আন্তরিক প্রণয়স্রোতের উদাহরণ 'মহুয়া', 'ফিরোজ খান দেওয়ান', 'কমলা', 'মুকুট রায়', 'রতন ঠাকুরের পালা', 'দেওয়ান ভাবনা' ও 'শ্যাম রায়ের পালা'য় সৃষ্টি হয়েছে । 'মহুয়া'

Dhaka University Institutional Repository

গাথায় জমিদার-পুত্র নদের চাঁদ সাধারণ বেদে-কন্যা মহুয়ার প্রতি আসক্তিবশত গৃহত্যাগ করে পথবাসী ও অবশেষে বনবাসী হয়। প্রাণনাশের আশংকা সত্ত্বেও নদের চাঁদ প্রণয়াকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দেয়নি। সাধারণ বেদে-কন্যাকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে লাভ করার আন্তরিক বাসনা চরিতার্থ করার পরিণতি-স্বরূপ তাকে শেষ পর্যন্ত জীবনবিসর্জন দিতে হয়েছে। নদের চাঁদের আত্মত্যাগ তাঁর প্রণয়াবেগকে মহিমাদীপ্ত করেছে।

'কমলা' গাথায় জমিদার-পুত্র প্রদীপকুমারের অনুরাগেও আন্তরিকতা অপরিসীম। কমলার প্রতি তার প্রণয়বাসনা চরিতার্থ করার জন্য প্রদীপকুমার যে একনিষ্ঠতা, সংযম ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে, তা অতুলনীয়। মইষাল বন্ধুর কুটীর থেকে কমলাকে উদ্ধার করার ঘটনা থেকে উভয়ের পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার কাল পর্যন্ত একটি দীর্ঘ সময় জমিদারপুত্রকে অপরিমেয় সংযত আচরণ ও একাগ্রতার সাধনা করতে হয়েছে।

'দেওয়ান ভাবনা'য় জমিদারপুত্র মাধব সোনাইয়ের প্রতি প্রবল প্রণয়াবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে দেওয়ানের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার সাহসিকতা প্রদর্শন করে। দেওয়ানের লাঠিয়াল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে সে সোনাইকে উদ্ধার করে এবং স্ত্রীরূপে বরণ করে। পরবর্তীকালে দেওয়ানের কারাদণ্ড গ্রহণেও সে নিঃশঙ্ক মনের পরিচয় দেয়। প্রণয়বাসনা চরিতার্থ করার জন্য মাধব চরিত্র কেবল আত্মত্যাগের মহিমাদীপ্তই হয়নি, বীর্যবত্তার গৌরবও অর্জন করেছে।

'ফিরোজ খান দেওয়ান' গাথায় ফিরোজ খান প্রজাহিতৈষণাকল্পে জীবন উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু উমর খাঁর কন্যা সখীনার প্রতিকৃতি দর্শনের পর তাঁর মধ্যে প্রণয়ানুরাগ উদ্দীপ্ত হয়। রাজ্য ত্যাগ করে তিনি বনবাসী হন, সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করেন, সখীনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর তার নিকট প্রণয়নিবেদন করেন, অনুকূল সাড়া পেয়ে যুদ্ধ করে সখীনাকে উদ্ধার করেন। আন্তরিক প্রণয়াবেগে উদ্দীপনার ক্ষেত্রে দেওয়ান ফিরোজ খাঁর চরিত্রটি উজ্জ্বল।

'শ্যাম রায়ের পালা'য় জমিদার-পুত্র শ্যাম রায় সাধারণ ডোম-বধূর রূপমুগ্ধ হয়ে তার নিকট প্রণয়নিবেদন করেন। সমাজবিগর্হিত, পারিবারিক জীবনে গ্রহণঅযোগ্য এই প্রণয়বাসনা চরিতার্থ করার জন্য শ্যাম রায় ডোম-বধূকে নিয়ে রাজ্যত্যাগ করে এবং চরম কষ্টকর জীবিকা নির্বাহের উপায় অবলম্বনে বাধ্য হয়। পাত্র রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অবশেষে প্রাণবিসর্জন করতে হয় শ্যাম রায়কে। সামান্য ডোম-বধূর প্রতি প্রণয়ানুরাগে শ্যাম রায়ের পরম আত্মত্যাগ তার প্রণয়মহিমাকে উজ্জ্বল করেছে।

'মুকুট রায়' গাথায় বাঞ্ছিতা পুষ্পচারিনীকে উদ্ধারের জন্য বহু দেশ ভ্রমণ করেছে মুকুট রায়। অবশেষে ঘনঅরণ্যমধ্যে তার সাক্ষাৎ লাভ ঘটেছে। প্রণয়িনীকে উদ্ধারের জন্য জীবনহানির আশংকাকে তুচ্ছজ্ঞান করেছে মুকুট রায়। রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের পর সুখী দাম্পত্য জীবনে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে তার অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু। জীবনলাভের পর পুনরায় প্রণয়িনীর জন্য কাতর হয়েছে মুকুট রায়। মুকুটরায়ের একনিষ্ঠতা তুলনাহীন। মুকুট রায়ের পিতা বহু রাজকন্যার প্রতিকৃতি সংগ্রহ করে মুকুট রায়কে তার মধ্য থেকে স্ত্রী নির্বাচনের প্রস্তাব রেখেছেন, কিন্তু মুকুট রায় তার পুষ্পচারিনীর জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে বহু দেশ ভ্রমণের ত্যাগ স্বীকার করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

'রতন ঠাকুরের পালা'য় আমরা রতন ঠাকুরের মধ্যে একনিষ্ঠ আন্তরিক প্রণয়াবেগের পরিচয় পাই। জমিদার-পুত্র রতন ঠাকুর সামান্য মালিকন্যার প্রতি আসক্ত এবং তাকে নিয়ে দেশান্তরী হয়। প্রণয়িনীর জন্য কষ্টকর জীবন গ্রহণ করে। পিতার কুটচক্রের আবর্তে রতন ঠাকুর একদা বিভ্রান্ত হলেও তার প্রণয়াকাঙ্ক্ষার আন্তরিকতা সাময়িক ভ্রান্তিমোচনের মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয়। মালি-কন্যার প্রতি অনুরাগবশত সন্ন্যাসজীবনে ব্রতী হয় রতন ঠাকুর।

শাসক-শক্তির গৃহাভ্যন্তরের আর-একটি বৈশিষ্ট্য ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে পরিদৃষ্ট হয়। বিমাতার ষড়যন্ত্রের বিষয়টি কেবলমাত্র শাসক-শক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, না, সমগ্র সমাজের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিদ্যমান ছিল — তা গীতিকাসমূহ বিশ্লেষণ করে জানা যায় না। গীতিকায় সমাজের অন্য স্তরের মানুষের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না। 'দেওয়ানা মদিনা' ও 'হীরালনী' গাথায় বিমাতার কুটচক্র এবং তার নির্মম চিত্র লক্ষিত হয়েছে। দেওয়ান সোনাফরের প্রথম স্ত্রী মৃত্যুকালে বিমাতার বিমাতাসুলভ আচরণ সম্পর্কে দেওয়ানকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু অবস্থাচক্রে সোনাফর দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে তার কুটিল আচরণে বিভ্রান্ত হয়ে প্রথম স্ত্রীর সতর্কবাণী বিস্মৃত হন। পরিণতি হয় মারাত্মক। বিমাতার ষড়যন্ত্রে আলাল-দুলাল দুই পুত্রকে হারান তিনি।

> সতীনের পুত্র মোর অইল গলার কাঁটা।
> খাওন না সুজে মোর অইল বিষুম লোটা।।
> যতদিন না পারি এই কাঁটা দূর করিতে।
> ততদিন সুখ নাই মোর নজিবেতে।। (মৈ.গী.পৃ ৩৫৯-৬০)

দেওয়ানের দ্বিতীয় স্ত্রী এজন্য অভিনয় করে দেওয়ানের মন থেকে পরিচিতজনদের মন থেকে সন্দেহ দূর করে। অতিশয় ভাল আচরণের মাধ্যমে দুই সৎপুত্রের মনেও সহানুভূতি সৃষ্টি করে। অতঃপর জল্লাদের মাধ্যমে তাদের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হয়।

'হীরালনী' গাথায় দুই রাজপরিবারে বিমাতার এরূপ কুটিল আচরণের পরিচয় বিধৃত হয়েছে। রাজা চন্দ্রধর তার দ্বিতীয় স্ত্রীর কুটিলতার শিকার হয়ে প্রথম স্ত্রীকে বনবাস দেয় এবং প্রথম স্ত্রীর কন্যা হেমমতীর সঙ্গে দ্বিতীয় স্ত্রীর পুত্রের অন্যায় বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে উদ্যোগী হয়। অন্যদিকে দক্ষপুরের রাজপরিবারে বিমাতা কর্তৃক সৎপুত্রকে মন্ত্রের বলে হরিণে রূপান্তরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

বনিকশ্রেণী

দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে বণিক শ্রেণী। প্রতিপত্তি বিবেচনায় নয়, তবে সচ্ছলতার মাপকাঠিতে এঁরাও সমাজের উপরিতলেরই অধিবাসী। তবে প্রথম পর্যায়ভুক্ত রাজা-জমিদার-দেওয়ানের সঙ্গে এদের সম্পর্ক সর্বদা দ্বন্দ্বাত্মক। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দুরন্ত সম্পদ বৃদ্ধির মোহ, গতিময়তা ও কর্মময়তা এঁদের চরিত্রের সাধারণ উপাদান। ধূর্ততা, রূপলালসা এবং তা চরিতার্থতাকল্পে সুস্থ গণতন্ত্রসম্মত প্রণয়নিবেদনের পরিবর্তে অপহরণ কিংবা অন্যপ্রকার ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ, নিশ্চিত্রময় জুয়াপ্রেমে সর্বস্বান্ত, সংকীর্ণ অর্থলোভ,

Dhaka University Institutional Repository

আভিজাত্য-গৌরব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি সচ্চরিত্র, কৃতজ্ঞতাপরায়ণ, সংবেদনশীল, প্রণয়াবেগে একনিষ্ঠ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যও এঁদের চরিত্রে দুর্লভ নয়।

'মহুয়া', 'মইষাল বন্ধু' ও 'বীরনারায়ণের পালা' গাথাত্রয়ে রূপলালসামত্ত বণিকের ধূর্ততা, ষড়যন্ত্র ও অপহরণের পরিচয় বিধৃত হয়েছে। 'মহুয়া' গাথায় মহুয়া ও নদের চাঁদ হুমরা বেদের কবল থেকে পলায়নরত অবস্থায় দুর্গম নদী পারাপারের জন্য যখন জনৈক বণিকের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছে, তখন বণিক সেই সুযোগে মহুয়ার দেহসৌন্দর্যে বিভোর হয়ে তাকে করায়ত্ত করার জন্য নদের চাঁদকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র কার্যকর করেছে ঃ

কন্যারে পাইতে সাধু চিন্তে মনে মন ।।
দেখিয়া কন্যার রূপ সাধু পাগল হইল ।
মাঝি মাল্লায় ডাক দিয়া সাধু সল্লা যে করিল ।।
উজান পাকে সাধুর ডিঙ্গা উজাইয়া যায় ।
জলে ভাসে নদ্যার ঠাকুর ঘটলো একি দায় ।।
বানের মুখে কালা ঢেউ পাক দিয়া করে তল ।
ঢেউয়ের পাকে নদ্যার ঠাকুর পইড়া হইল তল ।। (মৈ.গী.পৃ ২৭)

'মইষাল বন্ধু' গাথায় মধুয়া নামক বণিকের ষড়যন্ত্র আরও মারাত্মক পর্যায়ের। বণিক মধুয়া তার বণিক বন্ধু ডিঙ্গাধরের সুন্দরী স্ত্রীকে করায়ত্ত করার অভিপ্রায়েই কেবল তার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে; ডিঙ্গাধরের মনে বিশ্বাস জাগ্রত করার প্রয়াস পায়। বন্ধুত্বের কল্যাণে মধুয়া ডিঙ্গাধরকে বাণিজ্যের কথা বলে বিভ্রান্ত করতে এবং তার সুন্দরী স্ত্রীকে অপহরণ করতে সফল হয়। প্রথমে নদীতে স্নানরতা সাধুবীকে দেখে মধুয়ার মনে আসক্তি জন্মে ঃ

এরে দেইখ্যা মধুয়া তবে হইল পাগল ।
ভাটি গাঙ্গে যাইক্যা বেটা করিল নজর ।। (পূ.গী.দ্বি.খ. দ্বি.স.পৃ ৫৩)

অতঃপর সে তাকে অপহরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করল। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই ডিঙ্গাধরের সঙ্গে মধুয়া বন্ধুত্ব স্থাপনে উদ্যোগী হয় ঃ

বইয়া আছে ডিঙ্গাধর কাচটঙ্গী ঘরে ।
অতিত হইল মধুয়া গিয়া তার পুরে ।।
ছলেতে মিতালী পাতি রজনী গোঙায় ।
বাণিজ্যি ব্যাপারের কথা বন্ধুরে শোনায় ।। (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ৫৪)

বন্ধুত্বের মাধ্যমে ডিঙ্গাধরের নিকট পরম বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠল মধুয়া। গোপন পরিকল্পনা অনুযায়ী সে ডিঙ্গাধরকে অপরিচিত অঞ্চলে বিপুল লাভজনক ব্যবসার লোভ দেখাল। ডিঙ্গাধর মধুয়ার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে উত্তর অঞ্চলে বাণিজ্য-যাত্রার আয়োজন করল। বণিক-চরিত্রে অধিকতর মুনাফা লাভের মোহ যে সকল যুগে কার্যকর, তা প্রমাণিত হয় এই ঘটনায়।

আরঙ্গের দেশ আছে উত্তর পাটনে ।
বাণিজ্যি-কারণে বন্ধু যাই সেইখানে ।।
কিবা সে দেশের রীতি শুন দিয়া মন ।
আমনে বদল করে সোনা মণে মণ ।। (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ৫৪-৫৫)

Dhaka University Institutional Repository

একদা বাণিজ্য-যাত্রা করে মহুয়া ডিঙ্গাধরকে অকূল সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে তার স্ত্রীকে অপহরণের জন্য প্রত্যাবর্তন করল । ডিঙ্গাধরের বাড়ির ঘাটে যখন মহুয়ার বাণিজ্য-তরী নোঙর করল তখন সাধুতী মনে করল তার স্বামী বাণিজ্য-শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছে। নদীর ঘাটে সাধুতী গেল স্বামীকে বরণ করার জন্য, মহুয়া সেই সুযোগে অপহরণ করল সাধুতীকে :

তবেত দুষমণ মহুয়া কোন কাম করে ।
চিলা যেমত থাগা দিয়া কাটুনীর মাছ ধরে ।।
হাতেতে তুলিয়া ধরে ডিঙ্গার উপরে ।
ইঙ্গিত পাইয়া মাঝি ডিঙ্গা দিল ছেড়ে ।। (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ৫৭)

'বীর নারায়ণের পালা'য় বণিক কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নারী অপহরণের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে । গ্রামের গৃহস্থ-কন্যা জল নিতে নদীর ঘাটে এসেছে । নির্জন দেখে বণিক তাকে অপহরণ করে ঃ

ঘাটেতে সুন্দরী কন্যারে আরে সাধু
দেখে আড় নয়ানে ।
কন্যার লাগিয়া সাধু
আরে সাধু উচাটন মনে ।।
চৌদিকে চাইয়া সাধুরে
আরে সাধু না দেখে লোকজন ।
... ...
পাছমুড় দিয়া সাধুরে
আরে সাধু ধরিল কন্যায় ।। (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ২১৭)

প্রণয়যাচঞা নেই, প্রণয়বাসনা নেই, সুন্দরী কন্যার সাক্ষাৎ পেয়েই নির্জন দেখে তাকে অপহরণ করার মধ্যে বণিক-চরিত্রের অমানবিক ব্যবসামনস্কতার বৈশিষ্ট্যটি উন্মোচিত হয়েছে । মুনাফা যেখানে আছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ স্বার্থের বিষয় যেখানে জড়িত,সেখানে বণিক শ্রেণী করতে পারে না এমন কোনো অমানবীয় আচরণ নেই । বণিক শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাদের এই স্বভাব-বৈশিষ্ট্যসমূহ; অর্থাৎ ধূর্ততা, ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা, অপহরণ, লুন্ঠন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আভিজাত্য-প্রয়াস । স্বাভাব্য যে উদ্ভবকালে এই শ্রেণী শাসক সামন্ত সম্প্রদায়ের অবহেলা, বঞ্চনা ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে, সে-চিত্র ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহেও অঙ্কিত হয়েছে । অথচ বাণিজ্যের মাধ্যমে তাদের হাতে তখন নগদ অর্থ ও সম্পদের বাহুল্য সমাবেশ অতি সহজেই লক্ষণীয়, সুতরাং তারা কেন বঞ্চনাকে নীরবে সহ্য করবে; কিন্তু তাদের হাতে তখন প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই । সম্পদ আছে ক্ষমতা নেই, অতএব ক্ষমতা দখলের জন্য প্রয়োজন বল প্রয়োগের, প্রয়োজন শঠতা, কপটতা ও হীন ষড়যন্ত্র পার্যন্ত করার । বঞ্চনা থেকে যে অপকর্ষবোধ, তা থেকেই বণিক-চরিত্রে সৃষ্টি হয়েছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আভিজাত্য অর্জনের প্রয়াসমূলক মনোভঙ্গি ।

আমরা এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আভিজাত্যের গৌরব লক্ষ্য করি 'মহুয়া', 'মলুয়ার বারোমাসী' এ

Dhaka University Institutional Repository

'মলুয়ার বারমাসী' গাথায় । 'জেলুয়া'য় কাঞ্চননগরের মানিক সওদাগর স্বীয় কন্যা জেলুয়াকে সুরাই সাধুর পুত্রের নিকট সমর্পণ করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছেন । এক্ষেত্রে তার কৌলিন্যের গৌরববোধই ক্রিয়াশীল ঃ

চান্দ সদাগরের বংশ জাতিতে কুলীন ।
বংশের গৌরবে সাধু অন্যে ভাবে হীন ।। (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ১৪৪)

সুপাত্রে কন্যা সমর্পণের জন্য মানিক সওদাগর তার পাঁচ পুত্রকে পাত্র-অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেছিল । 'মলয়ার বারমাসী'তে মলয়ার জন্য সুপাত্র সংগ্রহের জন্য বণিক পিতামাথব নিজেই ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন । কিন্তু সেই অবসরে ডাকাতের দ্বারা কন্যা অপহৃত হয় । থলভূমের রাজপুত্র অপহৃত কন্যাকে উদ্ধার করেছিল । কিন্তু তাই বলে বণিকের মন থেকে আভিজাত্যের গৌরব দূর হয়নি । তিনি থলভূমের রাজপুত্রের নিকট কন্যা সমর্পণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন ঃ

তবে সাধু কহে রাজা আমার কথা ধর ।
এহি কন্যা না করিব তোমার পুত্রের ঘর ।। (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৪১৩)

'বগুলার বারমাসী' গাথায় বগুলার বণিক-পিতার মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিল । তিনি রাজপুত্রের নিকট কন্যা সমর্পণ করে আভিজাত্যের গৌরব বৃদ্ধির অভিলাষ পোষণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কন্যা এই অভিলাষ চরিতার্থতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল । বগুলা তার প্রণয়ীকে বলছে ঃ

বাপে বিয়া দিতরে চায় দুস্মন কুমারে ।
রাজার ঘরে যাইতে বন্ধু আমার মন নাই সে সরে ।। (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ২১২)

শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধিরা যে বণিক শ্রেণীর ওপর নির্যাতন পরিচালনা করেছে তার চিত্র দুইটি গাথায় সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়েছে । 'বগুলার বারমাসী' গাথায় বগুলাকে স্ত্রী হিসেবে লাভ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল রাজপুত্র । কিন্তু রাজপুত্রের দুঃস্বভাবের কারনে)বগুলার মনে ছিল বিতৃষ্ণা । বগুলা রাজপুত্রের পরিবর্তে পতি হিসেবে বরণ করেছিল এক বণিক-পুত্রকে । ফলে এই বণিক-পুত্র রাজপুত্রের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিল । রাজপুত্র ষড়যন্ত্র করে বণিকপুত্রকে বাণিজ্য-গমণে বাধ্য করেছিল এবং তার প্রত্যাবর্তনে সুপরিকল্পিতভাবে বিলম্ব ঘটাচ্ছিল । উদ্দেশ্য ছিল ঃ এই অবসরে বগুলাকে স্ত্রী হিসেবে লাভ । কিন্তু কোনোভাবে বগুলার চিত্তজয়ে সক্ষম না হয়ে রাজপুত্র বণিকপুত্রের মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ রটনা করেছিল ঃ

কার্তিক মাসেতে কুমার চিত্ত উচাটন ।
বৈদেশে সাধুর পুত্রের হইয়াছে মরণ ।।
চৌদল পাঠাইও কুমার নিশি দুপহরে ।
কালুকা যাইব কুমার তোমার মন্দিরে ।। (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স. পৃ ২২৮)

'সনুমালা' গাথায় রাজা ও রাজপুত্র উভয়েই বণিক ও বণিক-পুত্রের ওপর নিপীড়ন করছে । বণিকের বাণিজ্য-যাত্রার সময়ে দেশের "রাজা কৈয়া দিছে — এই এই চিজ-বস্তু আমি চাই, না অইলে

Dhaka University Institutional Repository

সদাগরের গর্দ্দান যাইব ।" জীবন রক্ষার জন্য বণিক রাজার পাঙ্খিত দ্রব্য অনুসন্ধানের জন্য সাত রাজ্য ভ্রমণ করে সাত ডিঙ্গা ধন সংগ্রহ করেছে । পথে বণিক কুড়িয়ে পেয়েছে মনুমালাকে । এই মনুমালার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বণিক-পুত্রের, কিন্তু মনুমালার দেহসৌন্দর্য অবলোকন করে তাকে পত্নী হিসেবে গ্রহণের জন্য অভিলাষী হয়েছে রাজপুত্রের মন । সেই অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য ষড়যন্ত্র এঁটেছে রাজপুত্র । সাপের মাথার মণি লাভের বায়না ধরেছে সে পিতা-মাতার নিকট । কেননা সে জানে এই মণি সংগ্রহের দায়িত্ব বর্তাবে বণিক বা বণিক-পুত্রের ওপর এবং এই দুর্লভ বস্তু সংগ্রহে ব্যর্থ হবে তারা, রাজার আদেশ পালনে ব্যর্থ হলে মস্তক ছিন্ন হবে তাদের এবং তাহলেই প্রার্থিত কন্যাকে লাভ করা সম্ভব হবে । রাজা পুত্রের মনবাঞ্ছা পূরণকল্পে বণিকের ওপর দায়িত্ব দিলেন মণি সংগ্রহের । মণি সংগ্রহে ব্যর্থ হলে বণিক-পুত্রকে সর্প দংশনে হত্যা করা হল ঃ

> কালত গরল বিষরে অঙ্গা পাইল ।
> কাল বিষের জ্বালায় সাধু-পুত্র পরাণ ত্যজিল ।। (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ২৮৮)

সংকীর্ণ অর্থলোভের বৈশিষ্ট্য আমরা প্রত্যক্ষ করি 'দেওয়ানা মদিনা' গাথায় এক ব্যবসায়ী চরিত্রে । সৎমার ষড়যন্ত্রের শিকার আলাল-দুলালকে জল্লাদকে তাদের প্রবল ক্রন্দনের জন্য হত্যা করতে না পেরে এক ব্যবসায়ীর নৌকায় তুলে দিয়েছিল । জল্লাদের কাছ থেকে বিনা অর্থে লাভ করলেও ব্যবসায়ী আলাল-দুলালকে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করেছিল গৃহস্থ হীরাধর বেপারীর নিকট ঃ

> হীরাধরের বাড়ীৎ সাধু ধান না কিনিয়া ।
> আলাল দুলালে কিস্মত দিল দাম ধরিয়া ।। (মৈ.গী.পৃ ৩৬৯)

তবে বণিক-চরিত্রের মধ্যে সততা, আন্তরিকতা, সংবেদনশীলতাও দুর্লক্ষ্য নয় । বিশেষত কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিংবা সদ্য কৃষক জীবন থেকে বণিক জীবনে রূপান্তর সাধিত হয়েছে যেসব চরিত্রের তাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতাপরায়ণ, আন্তরিক প্রণয়াবেগের বৈশিষ্ট্য সহজেই পরিলক্ষিত হয় । 'নইযার মনু' গাথায় কৃষক-পুত্র ডিঙ্গাধরের জীবন কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । ভাগ্য বিড়ম্বনায় বণিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে প্রচুর অর্থের উত্তরাধিকারী হয় সে । কিন্তু সেজন্য সাধুতীর প্রতি পূর্বানুরাগকে ডিঙ্গাধর বিস্মৃত হয়নি । যদিও সাধুতী-পরিবারের আর্থিক দুর্দশা তখন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল । এ ধরনের পরিস্থিতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ব-প্রণয়ের প্রতি অস্বীকৃতিই শ্রেণীবিভক্ত বণিক সমাজের স্বভাবধর্ম । কিন্তু ডিঙ্গাধরের চরিত্রে কৃষিজীবনসংলগ্নতাই হয়ত পূর্ব-আসক্তির প্রতি তাকে আন্তরিক থাকতে সহায়তা করেছে ।

> উত্তর্যা বাতাস লাগ্যা পুবাল্যা যে মরে ।
> সাত ডিঙ্গা ধন তার পাইল ডিঙ্গাধরে ।।
> দেশে চলে ডিঙ্গাধর সুর্মাই নদী বাইয়া ।
> বার দিনে হাজির হইল নিজের দেশে যাইয়া ।।
> চৌখন্ডী করিয়া তবে শিঙ্গাখালীর পারে ।
> বড় বড় ঘর বান্ধে দক্ষিণ দুয়ারে ।।
> তবে ডিঙ্গাধর সাধু গোন গাম করিল ।
> সাধুতী কন্যার কথা মনেতে পড়িল ।। (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ৪৭)

Dhaka University Institutional Repository

সাধুতীকে স্মরণ করে প্রথমে তাদের আর্থিক পরিস্থিতি জেনে এবং ডিঙ্গাধরের প্রতি সাধুতীর অনুরাগ অক্ষুন্ন আছে কিনা তা পরীক্ষা করে ডিঙ্গাধরে বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করেছে । কৃতজ্ঞতাবশত মহাজনী ঋণের দায় থেকেও উদ্ধার করেছে সমগ্র পরিবারকে । সাধুতীর পিতার নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিল ডিঙ্গাধরের পিতা । সে ঋণ শোধ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি ।

'আয়নাবিবি' গাথায় মামুদ উজ্যোলের চরিত্রটিও আন্তরিক প্রণয়াবেগে ডিঙ্গাধরের সমধর্মী । মামুদ উজ্যালের জীবনও কৃষি-জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে ঘনিষ্ঠ । বাণিজ্য-যাত্রার পথে দরিদ্র-ভূমিহীন-কন্যা আয়নাবিবির সঙ্গে চার চক্ষুর দর্শন ঘটেছিল মামুদ উজ্যালের । ব্যবসায়ে বিপুল সম্পদ লাভের পরও মামুদ উজ্যাল বিস্মৃত হয়নি দরিদ্র-কন্যাকে । প্রত্যাবর্তনের পথে তার অনুসন্ধানে এসে না পেয়ে সম্পত্তি-মোহ বিসর্জন দিয়ে মামুদ উজ্যাল সংসার-বিরাগী হয়ে সন্ন্যাসী সেজেছিল । আয়না বিবির জন্য মামুদ উজ্যালের সম্পদ-মোহ পরিত্যাগ এবং ভিক্ষাবৃত্তির জীবন অবলম্বনের মধ্যে স্বীয় অনুরাগের প্রতি প্রবল আন্তরিকতারই প্রমাণ বিদ্যমান ।

চরেতে উঠিল উজ্যাল আয়নারে দেখিতে ।
শূন্য ভিটা পইড়া আছে না পায় দেখিতে ।।

... ...

আমার মায়ে কইওরে ভাগীধার বাড়ীতে গিয়া ।
তোমার পুত্র উজ্যাল গেছে ফকির হইয়া ।।

... ...

বেহুরা হইয়া সাধু ঘুরিয়া বেড়ায় ।
ভিক্ষা মাগিতে সাধু উজ্যাল বাড়ী বাড়ী যায় ।। (পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি.স.পৃ ২০০-০১)

আন্তরিকতার পরিচয় 'ধোপার পাট', 'মইষাল বন্ধু', 'তেলুয়া' গাথায়ও বিশেষভাবে লক্ষণীয় । তামসা গাজী দয়াপরবশ হয়ে নদী-তীর থেকে ধোপা-কন্যা কাঞ্চনমালাকে, সুবাল্যা বেপারী নদীতে নিমজ্জমান ডিঙ্গাধরকে এবং ব্রাহ্মণ সাধু নির্জন চর থেকে তেলুয়া ও তার সখীকে উদ্ধার করেছিল । এসব উদ্ধারকাজে বণিকদের মানবীয় ঔদার্যেরই পরিচয় বিধৃত হয়েছে । আর বণিকরা যে শুধু অপহরণই করেনা, বিপদ থেকে উদ্ধারও করে তারও প্রমাণ পাওয়া যায় এসব গাথায় ।

সামন্ত সমাজের উদর থেকেই বণিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে । প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মহাজনী ঋণের নির্মম শোষণ, শাসক-শক্তির অন্যায় উৎপীড়ন প্রভৃতির ফলে কৃষি-জীবন থেকে উন্মূলিত ভাগ্যান্বেষীরাই যে বণিক জীবন অবলম্বন করেছে এবং উদ্ভবকালে শাসক-শক্তির বঞ্চনা ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে, সেই ঐতিহাসিক সত্যই ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে বিধৃত বণিক জীবনচিত্রের মধ্যে সুপরিস্ফুট । ডিঙ্গাধর, মামুদ উজ্যাল উন্মূলিত, ভাগ্যান্বেষীরাই দলভুক্ত । প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মহাজনী ঋণের করাল গ্রাসে কৃষক জীবন থেকে উন্মূলিত হয়েছে ডিঙ্গাধর । চাষাবাদ করে জীবন নির্বাহ কঠিন, তাই চাষাবাদের অবসরে প্রতিবছর ভাগ্যান্বেষণে বাণিজ্য-গমনে ব্রতী হয়েছে মামুদ উজ্যাল । এভাবেই হয়ত বণিক-জীবনে অভ্যস্ত হয়ে কৃষি-জীবন থেকে ক্রম-বিচ্ছিন্ন হয়ে পুরোপুরি বণিক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছে মামুদ উজ্যালগণ ।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষকসমাজ

তৃতীয় পর্যায়ে কৃষক সমাজের অস্তিত্ব বিদ্যমান । সম্পদশালী, উচ্চবিত্ত কৃষক জীবনের পাশাপাশি সাধারণ পরিশ্রমজীবী কৃষক চরিত্রের চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে এসব গীতিকায় । গতিহীন, স্থবিরতা-আচ্ছন্ন, ক্রম-ক্ষয়িষ্ণু কৃষক জীবনে সরলতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থময়তা, আবেগ-উচ্ছ্বাসহীনতা যেন পরস্পর সম্পৃক্ত হয়ে মিশে আছে । প্রণয়াবেগে এঁরা তুলনামূলক নিম্নতালে সক্রিয় ও প্রতিবাদী, কিন্তু আনুরক্তিতা ও একনিষ্ঠতায় উচ্চকিত ।

'মলুয়া' গাথাটিতে সম্পন্ন উচ্চবিত্ত ও দরিদ্র উভয় ধরনের কৃষক জীবনেরই পরিচয় বিধৃত হয়েছে । এরা একই স্তরভুক্ত, কিন্তু আর্থিক অবস্থানের দিক থেকে মেরু-দুস্তর ব্যবধানের কারণে মলুয়ার পিতা উচ্চবিত্ত কৃষক হীরাধর দাস ভূমিহীন কৃষক চান্দ বিনোদের নিকট কন্যা সমর্পণে দ্বিধাগ্রস্ত। উচ্চবিত্ত কৃষক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসেবে মলুয়ার পিতার মনে বংশগৌরব বিবেচনাও ক্রিয়াশীল । কিন্তু কন্যার ভবিষ্যৎ জীবনের কল্যাণ-চিন্তায় আর্থিক সচ্ছলতার বিষয়টিই তাঁর কাছে প্রধান বিচার্য হয়ে উঠেছে । রূপেগুণে বর অপছন্দ নয়, বংশেও সে কুলীন ঃ

বরত পছন্দ হয় কার্তিক কুমার ।
বংশেতে কুলিন সেই যত হালুয়ার ।। (মৈ.গী.পৃ ৬৪)

কিন্তু তার সম্পত্তি যে নেই মোটেই । রূপ-গুণ-কৌলীন্য দিয়ে যে কন্যার ক্ষুধা কিংবা অন্যান্য আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়ার নয়, — সেরকম বণিকসুলভ মানসিকতা হীরাধর দাসের বক্তব্যে স্পষ্ট । তিনি অত্যন্ত বৈষয়িক দিক থেকেই ভাবছেন বরের যদি এতটুকু জমিও না থাকে তাহলে তার কন্যার জীবন সুখী হবে কিভাবে ?

এক কাঠা ভুই নাই খলা পাতিবারে ।
কেমন কইরা বিয়া দিতাম কন্যা এই ঘরে ।।
একখানি ভাঙা ঘর চালে নাই ছানি ।
কেমনে খাইব কন্যা উচ্ছিলার পানি ।। (মৈ.গী. পৃ ৬৪)

সন্তানবাৎসল্যহেতু এমন সংকীর্ণ স্বার্থ -চিন্তা প্রায়-সকল পিতা-মাতারই যেন স্বভাববৈশিষ্ট্য । এর আরও সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে যখন মলুয়ার পিতা কর্তৃক প্রস্তাব-প্রত্যাখ্যাত অপমানাহত চান্দ বিনোদ শিকার করে দেওয়ানের আশীর্বাদে স্বীয় আর্থিক জীবনের পরিবর্তন সাধন করে, তখন দেখা যায়, উপযাচক হয়ে মলুয়ার পিতাই চান্দ বিনোদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে উদ্যোগী হন । এক্ষেত্রে দরিদ্র কৃষক চান্দ বিনোদ স্বীয় পরিবর্তিত জীবনে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারত । কিন্তু দরিদ্র কৃষক জীবনের সারল্য, প্রণয়াকাঙ্ক্ষার প্রতি আনুরক্তিতা চান্দ বিনোদ-চরিত্রের মৌলবৈশিষ্ট্য । সে তার প্রণয়তৃষ্ণা চরিতার্থ করার জন্য তীব্রতর আবেগে সক্রিয় নয়, কিন্তু একনিষ্ঠ, সংযত ও আনুরক্ত ।

কুড়া শীগার কইরা বিনোদ পাইল জমীন বাড়ী ।
ইনাম বকশিস্ পাইল কত কইতে নাহি পারি ।।
....

Dhaka University Institutional Repository

এরে পুন্যা হীরাধর কোন কাম করিল ।
কন্যার বিয়ার লাগ্যা ভাটুয়া পাঠাইল ।। (মৈ.গী.পৃ ৬৬)

হীরাধর দাসের এরূপ আচরণে কৃষক চরিত্রের অন্তর্গত হীন-স্বার্থপর বৈশিষ্ট্যটি চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হয়েছে ।

কৃষক জীবনে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, শাসক শ্রেণীর অন্যায় নির্যাতন, মহাজনী শ্রেণের কালগ্রাস প্রভৃতির আক্রমণ যেন অনিবার্য অদৃষ্টলিপির মতো । অদৃষ্টলিপির বিধানকে পশ্চাদপদ মানসিকতায় যেমন প্রতিবাদহীনভাবে আলিঙ্গন করার প্রচলন রয়েছে এক্ষেত্রেও কৃষক জীবন ঐসব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী না হয়ে আলিঙ্গন করে ক্রমক্ষয়িষ্ণু হচ্ছে । এর কোনো একটির নির্মম আঘাতেই কৃষক জীবন সহজে উন্মূলিত হয়ে সাধারণ পরিশ্রমজীবী জীবনে পরিণত হয় ।

'মলুয়া' গাথায় চান্দ বিনোদের জীবনকে প্রথম উন্মূলিত করে প্রাকৃতিক বিপর্যয় । চান্দ বিনোদ তার নিজের জমি আবাদ করে ধান রোপন করেছিল, পরে ধান পাকার সময় হলে মাঠে গিয়ে দেখে আশ্বিন মাসের প্লাবনে জমির ধান-সকল বিনষ্ট হয়েছে । শস্যহীন জীবনে সারা বছর সংসার কিভাবে নির্বাহ হবে সেই চিন্তায় মাতা-পুত্র কাঁদছে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে আসন্ন দুর্ভিক্ষের আশংকায় আরও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে ঃ

"আইশ্না পানিতে ধাও সব পসিয়া গেছে ।। "
মায়ে কান্দে পুত্র কান্দে শিরে দিয়ে হাত ।
সারা বছরের লাগ্যা গেছে ঘরের ভাত ।।
টাকায় দেড় আড়া ধান পইড়াছে আকাল । (মৈ.গী.পৃ ৪৮)

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শস্যহানির সঙ্গে আকালের সম্পর্ক অত্যন্ত ওৎপ্রোতভাবে জড়িত । এই বিপর্যয় যেহেতু কৃষক জীবনকেই সবচেয়ে বেশি আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, সেহেতু দুর্ভিক্ষের সঙ্গে কৃষক জীবনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় । কৃষি-নির্ভর পশ্চাদপদ মধ্যযুগীয় সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকেই শুধু নয়, বর্তমান বাংলাদেশের গ্রাম-জীবনের পটভূমিতেও, বলা যায়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, শস্যহানি, মন্বন্তর প্রভৃতির নির্মম আঘাতে জর্জরিত দরিদ্র কৃষক জীবন বৈষম্যমূলক সমাজের অনিবার্য গতিপ্রবাহে ক্রমশ ভূমিহারা দিন-মজুর জীবনে রূপান্তরিত হয় । চান্দ বিনোদের জীবনে, 'মইষাল বন্ধু' গাথায় সুজন, ডিঙ্গাধর ও বলরামের জীবনে রূপান্তরের এই চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে । প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শস্যহানির পর চান্দ বিনোদ ক্রমশ তার হালের গরু, জমি বিক্রি করে নিঃস্ব হয়ে পড়ল ।

আছিল হালের গরু বেচিয়া খাইল ।
পাঁচ গোটা ক্ষেত বিনোদ মাজনে দিল ।।
খেত খোঁলা নাই তার, নাই হালের গরু । (মৈ.গী.পৃ ৪৮ - ৪৯)

Dhaka University Institutional Repository

এমন নিঃস্ব অবস্থায় কায়িক শ্রমই তার একমাত্র সম্পদ । কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভর করেই তাকে জীবিকা নির্বাহের উপায় অবলম্বন করতে হবে । এমন অবস্থায় পেশা পরিবর্তনের বিকল্প নেই তার সামনে । শিকার করে জীবিকা নির্বাহে প্রয়াসী হয় চান্দ বিনোদ । যন্ত্র সভ্যতা যদি স্পর্শ করত ঐ সমাজকে, তাহলে চান্দ বিনোদ হয়ত শিল্প-শ্রমিকে রূপান্তরিত হত । কিন্তু তার অবর্তমানে গ্রামীণ জীবনের পশ্চাদপদ উৎপাদন ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই চান্দ বিনোদকে ভিন্ন পেশার কথা চিন্তা করতে হয়েছে ।

ঘরে নাই ক্ষুধার অন্ন কি রান্ধিব মায় ।
উপাস থাকিয়া পুত্র শীগারেতে যায় ।। (মৈ.গী.পৃ ৪৯)

প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে অতিক্রম করে শিকার করে চান্দ বিনোদের স্বীয় ভাগ্য বিড়ম্বনার অবসান ঘটানোর পর শাসক-শক্তির অন্যায় নিপীড়নের শিকার হল সে । শাসক সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারমূলক অন্যায় নিগ্রহে একটি সচ্ছল কৃষক জীবনও কী সীমাহীন অর্থকষ্ট ও দারিদ্র্যের শিকার হয় তার চিত্র চান্দ বিনোদের জীবনকে কেন্দ্র করেই অঙ্কিত করেছে । শিকার করে চান্দ বিনোদ দেওয়ানের আশীর্বাদে প্রচুর আবাদী জমি ও নগদ অর্থের অধিকারী হয়েছিল । সচ্ছল কৃষক জীবনে মলুয়াকে স্ত্রী হিসেবে লাভ করে সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করছিল সে । এর মধ্যে মলুয়ার প্রতি বিচারক কাজীর লোলুপ দৃষ্টির কারণে তার নীতিহীন বিচারে পুনরায় নিঃস্ব হল চান্দ বিনোদ । কাজী পরওয়ানা জারী করে প্রথমে তার স্থাবর সম্পত্তি কেড়ে নিলে চান্দ বিনোদ জীবিকা নির্বাহের জন্য সকল অস্থাবর সম্পত্তি অর্থাৎ ঘরের ধান, হালের বলদ, দুধের গাভী, আটচালা ঘর প্রভৃতি একে একে বিক্রয় করে সর্বস্বহারা হল ঃ

ঘরের ধান ফুরাইয়া দুঃখেতে পড়িল ।
হালের বলদ বেচ্যা কিন্যা বিনোদ খাইল ।।
দুধের গাই বেচ্যা খাইল ভাবিয়া চিন্তিয়া ।
... ...
রঙ্গিলা আটচালা ঘর তাও বেচ্যা খাইল ।। (মৈ.গী. পৃ ৭৭)

বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে সংসার নির্বাহ করা কৃষক জীবনের একটি আনুরবৈশিষ্ট্য । কেননা কৃষক দিনমজুর নয়, কৃষক হিসেবে তার মধ্যে আছে এক ধরনের আত্মাভিমান । নিজের জমিতে শ্রমদানে সে নিস্কুন্ঠ হলেও পরের জমিতে শ্রম দিয়ে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে তার মধ্যে রয়েছে এক ঐতিহ্যিক সংস্কার । সেকারণে যতক্ষণ সে দিনমজুরী না করে সম্পদ বিক্রয়ের মাধ্যমে আর্থিক অনটন দূর করতে সক্ষম হয়, ততক্ষণ সে মজুর হিসেবে পরিচিত হতে চায় না । এক্ষেত্রেও চান্দ বিনোদ সবকিছু বিক্রয় করার পর শিকার-উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করল । অতঃপর সংসার পরিচালনার দায়িত্ব পড়ল কৃষক-বধূ মলুয়ার ওপর । তারও একই জীবনবৈশিষ্ট্য । যতদিন পারল নিজের অলঙ্কার বিক্রয় করে ও বন্ধক দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করল । আষাঢ় মাস থেকে কার্তিক মাসের মধ্যে একে একে নাকের নথ, গলার মোতির মালা, পায়ের খাড়ু, হাতের বাজু, পাটের শাড়ী, কানের ফুল বিক্রি করে উপোস থাকা শুরু করল ।
বাকী রইল কেবল হাতের কঙ্কণ ।

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গের যত সোনাদানা সকল বান্ধা দিয়া ।।
শতানি অঙ্গের বাস হাতের কঙ্কণ বাকী ।
... ...
ছেঁড়া কাপড়ে মলুয়ার অঙ্গ নাহি ঢাকে ।
একদিন গেল মলুয়ার দুরন্ত উপাসে ।। (মৈ.গী.পৃ ৭৯)

হাতের কঙ্কণ বাকী থাকলেও তা সে বিক্রি করতে পারে না । কেননা ঐতিহ্যিক সংস্কারবশত বিশ্বাস, হাতের কঙ্কণ নারীর সাধব্যের প্রতীক । শত দারিদ্র-অনাহারী জীবনেও সেই কঙ্কণ ত্যাগ করা তার জন্য অসম্ভব । ঘরে কোনো খাদ্য সামগ্রী নেই, দারুণ উপোসে দিন যাচ্ছে মলুয়ার, কিন্তু মহাজনের ঋণের সুদ ক্রমবর্ধমান । নির্মমভাবে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

ঘরে নাই লক্ষ্মীর দানা এক মুইঠ খুদ ।
দিনরাইত বাড়তে আছে মহাজনের সুদ ।। (মৈ.গী.পৃ ৭৯)

ছিন্ন বস্ত্রে, অনাহারী জীবনে, মহাজনের নিকট থেকে গৃহীত ঋণের সুদ যখন ক্রমবর্ধমান তখন কৃষক-বধুর পক্ষেও দিনমজুরীর বিকল্প নেই । মলুয়া তাই,

সুতা কাটে ধান ভানে শাশুড়ীরে লইয়া ।
এই মতে দিন কাটে দুঃখু যে পাইয়া ।। (মৈ.গী.পৃ ৮৩)

মহাজনী ঋণ কৃষক জীবনকে বিপর্যস্ত করার আর এক উপাদান । মহাজনী ঋণের গ্রাসে দু'দুটি সম্পন্ন কৃষক-জীবন বিপন্ন হওয়ার কাহিনী বিধৃত হয়েছে 'মইষাল বন্ধু' গাথায় । উচ্চবিত্ত কৃষক সুজন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মহাজনী ঋণের শোষণে নিঃশেষিত হল । প্রথমে অগ্নিদগ্ধ হল তার বাড়ি, রোগে মরল হালের মহিষ ও দুগ্ধবতী গাভী, পরে আশ্বিন মাসের প্লাবনে হল শস্যহানি ।

আগুন লাগিয়া পুড়ে তিন খন্ড বাড়ী ।।
... ...
বাতানে মইষ মরল পালে মরল গাই ।
... ...
আইশনা পানিতে তার খাইল বাকের ধান । (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ৩২)

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়ের আঘাতে জর্জরিত সুজন কৃষকের জীবন যখন প্রায়-উন্মূলিত, তখন মহাজনের ঋণের শরণাপন্ন হওয়ার বিকল্প রইলনা তার সামনে । ধনী কৃষক ও মহাজন বলরামের নিকট থেকে এক শ টাকা ঋণ নিয়ে সে তার কৃষক জীবন অব্যাহত রাখল । কিন্তু তার মৃত্যুর পরে পুত্র ডিঙ্গাধর যখন আর্থিক সংকট উত্তরণে প্রয়াসী, তখন মহাজনী ঋণ পরিশোধের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ডিঙ্গাধরকে কৃষক-জীবন থেকে সম্পূর্ণ উন্মূলিত হয়ে বলরামের বাড়ির সাধারণ মইষালে রূপান্তরিত হতে হল । এক শ টাকা ঋণের জন্য ডিঙ্গাধরকে ছয় বছর মইষালের কাজ করতে হল বলরামের বাড়িতে । কত বছরের পরিশ্রমের বিনিময়ে ঋণ পরিশোধ হবে, তাও নির্ধারণ করে দিল মহাজনই ।

আজি হইতে করবা তুমি মইষের রাখালী ।
ছয় বচ্ছর খাট্যা দিলে তবে হইব খালি ।। (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ৩৬)

কৃষক-মহাজন বলরামের জীবনও নিঃস্ব হয় মহাজনী ঋণের করালগ্রাসে । বলরামের মহিষে জমিদারের

Dhaka University Institutional Repository

নিকট মহিষগুলো আটকে পড়ে । মহিষের মুক্তির জন্য পাঁচশ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয় বলরামকে । এই টাকা সে মহাজন আষাঢ়িয়া মন্ডলের নিকট থেকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে । বলরাম ঋণ-পরিশোধ না করেই মারা যান । বলরামের স্ত্রী পালিত মহিষ বন্ধক রেখে অর্ধেক ঋণ পরিশোধ করলেও বাকী অর্ধেক পরিশোধের ক্ষমতা তার ছিলনা । মহাজন ছয়মাসের মধ্যে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছিল, অন্যথায় ঘরবাড়ি সব কেড়ে নেওয়া হবে এবং মহাজনের পুত্রের নিকট বলরামের কন্যার বিয়ে দিতে হবে ।

ছয়মাসের মধ্যে ধার দিতে নাহি পারি ।
আষাঢ়্যা লইয়া যাইব ঘরবন্দি বাড়ি ।।
ছেড়ারে করাইব বিয়া সাধুতী কন্যায় ।
কন্যা পণ দিতে হইব এই ঋণের দায় ।। (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ৪৯-৫০)

মহাজনী ঋণের দায়ে কৃষক জীবন নিঃস্ব হওয়ার বৈশিষ্ট্য মধ্যযুগের পটভূমিতেও বর্তমান ছিল এমন প্রমাণ এই গাথায় স্পষ্ট ।

পশ্চাদপদ কৃষক জীবনের আর একটি বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে 'দেওয়ানা মদিনা' গাথায় । সামন্ত-তান্ত্রিক কৃষক জীবনের বিন্যাসে সমগ্র পরিবারের শ্রম জড়িত । কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কেবলমাত্র কৃষকের শ্রমই নয়, কৃষক-বধূসহ পুত্র-কন্যা অর্থাৎ সমগ্র পরিবার এই প্রক্রিয়ার অংশীদার । কোনো-না-কোনোভাবে কোনো-না-কোনো সময় প্রত্যেকেরই শ্রম এই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হচ্ছে । 'দেওয়ানা মদিনা' গাথায় দুলালের পাশাপাশি মদিনারও কৃষিকাজে অংশগ্রহণের চিত্র পরিলক্ষিত হয় । অগ্রহায়ণ মাসে দুলাল জমি থেকে ধান কেটে আনার পর সেই ধানকে চাউলে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়ায় মদিনার শ্রম যুক্ত হচ্ছে । কেবলমাত্র বাড়িতে নয়, মদিনা দুলালের সঙ্গে মাঠেও যাচ্ছে । মাঘ মাসের দারুণ শীতের সময় কুয়াশা-অন্ধকার প্রত্যুষে যখন মাঠে পানি দিতে যায় দুলাল, তখন আগুন নিয়ে তার পাশে থাকে মদিনা । পৌষ মাসে যখন সাইলের ধানে মাঠ ভরে যায়, তখন জমির আগাছা, আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজে সহায়তা করে মদিনা, হুকায় তামাক ভরে দুলালের জন্য এগিয়ে দেয় । বীজ বপনের সময় কাজের তাড়ায় যখন দুলাল বাড়ি ফিরতে পারে না তখন মাঠে ভাত নিয়ে যায় মদিনা ।

লক্ষ্মী না আগন মাসে বাওয়ার দাওয়া সারি ।
খসম মোর আনে ধান আমি ধান নাড়ি ।।
...   .
পোষ না মাসেতে যখন ছাবে সাইল ক্ষেত ।
আমি না অভাগী পর দেই যত চোত খেত ।। (মৈ.গী.পৃ ৩৭৯ - ৮০)

গ্রামীন সমাজে সাধারণ কৃষক জীবনে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর কৃষিকাজে সমানুরাল অংশগ্রহণের চিত্র এখনও দুর্লক্ষ্য নয় ।

Dhaka University Institutional Repository

বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়

সমাজের নিচুতলার কিংবা প্রান্তিক স্তরের বিভিন্ন পেশার ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ চতুর্থ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে : গোঁড়া, অর্থলোভী ও পন্ডিত ব্রাহ্মণ (মলুয়া, কঙ্ক ও লীলা, দেওয়ান ভাবনা), সন্ন্যাসী (মহুয়া, দস্যু কেনারামের পালা), পীর (কঙ্ক ও লীলা), রাখাল (কমলা, কঙ্ক ও লীলা, মইষাল বন্ধু), বংশীবাদক (কঙ্ক ও লীলা, মইষাল বন্ধু, আধা বন্ধু) মৎস্যজীবী (রূপবতী, জীরালনী), ঘটক (মলুয়া, চন্দ্রাবতী, দেওয়ান ভাবনা, ভেলুয়া), গণক (মলুয়া, রূপবতী), আদিবাসী জনগোষ্ঠী (শীলা দেবী, ভারাইয়া রাজার কাহিনী), মালাকর (রতন ঠাকুরের পালা), ভূমিহীন বেকার (আয়নাবিবি), ভিক্ষুক (কঙ্ক ও লীলা, সর্প-ওঝা (মলুয়া, মাঝুরের মা, পীর বাতাসী), বেদে (মহুয়া, আয়না বিবি), কুটনী (মলুয়া, কমলা) কুসীদজীবী (মইষাল বন্ধু), ডাকাত (মহুয়া, দস্যু কেনারামের পালা, মলুয়ার বারমাসী), জল্লাদ (দেওয়ানা মদিনা), বারবণিতা (রতন ঠাকুরের পালা), ধোপা (ধোপার পাট), চন্ডাল (কঙ্ক ও লীলা), ডোম (শ্যাম রায়ের পালা) প্রভৃতি নানা গোত্রের মানুষ। সচ্ছলতা বিবেচনায় সকলে যে নিচুতলার, তা নয়। ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, পীর, কুসীদজীবী, ডাকাত, জল্লাদ — এরা অসচ্ছল নয়। কিংবা প্রতিপত্তি বিবেচনায়ও ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, পীরগণ অবহেলার পাত্র নন। বরং সমাজে এঁদের প্রভাব অপরিমেয়। তবু সমাজের নিয়ন্ত্রণমূলক কেন্দ্রীয় অবস্থানে এঁরা কেউ প্রতিষ্ঠিত নন।

সমাজের প্রান্তস্থিত এসব মানুষ স্ব স্ব পেশার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে হয়ে উঠেছেন তাৎপর্যময়। নিচুতলার মানুষের মধ্যে দারিদ্র্য যেমন প্রবল তেমনি তাদের মধ্যে অবহেলা-বঞ্চনাজাত হীনতা, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতাও দুর্লক্ষ্য নয়। আবার এরই পাশাপাশি হিংস্রতা-ক্রূরতা, সরল-আন্তরিকতা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, সংবেদনশীলতা, ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে একনিষ্ঠতা, সাহসিকতা, সর্বস্ব নিবেদনের মাধ্যমে প্রণয়ের সার্থকতা অনুসন্ধান, অর্থগৃধ্নুতা, জিঘাংসাবৃত্তি, ধর্মীয় কঠোর অনুশাসনপ্রিয়তা, স্বাধীন প্রণয়বাসনা, জীবিকা নির্বাহের কঠোর সংগ্রাম, কূটচক্রের মাধ্যমে অকারণ শত্রুতাসাধন, সন্ন্যাসজীবনের ঔদাসীন্য ও ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রভৃতি পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে আছে।

ব্রাহ্মণ

পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলে নব ব্রাহ্মণ্যবাদের কঠোর অনুশাসন সেন-শাসক শ্রেণীর শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রসারিত না-হলেও ঐ অঞ্চলে যে ব্রাহ্মণদের আদৌ অনুপ্রবেশ ঘটেনি, তা কিন্তু নয়। দুইটি গাথায় আমরা ব্রাহ্মণদের অনুশাসন প্রয়োগের বা তার নৃশংসতার চিত্ররূপ প্রত্যক্ষ করি। ব্রাহ্মণ শ্রেণীর লোকদের উপস্থিতি অধিকাংশ গাথায় পরিলক্ষিত হলেও দুইটি গাথায় বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুতে অবস্থানকারী দুই পুরোহিত-ব্রাহ্মণ চরিত্রের উপস্থাপন তাৎপর্যপূর্ণ। 'মলুয়া' গাথায় ব্রাহ্মণ-গোত্রীয় ব্যক্তিবর্গের জীবনবিচ্ছিন্ন শাস্ত্রানুশাসনপ্রিয়তার পরিচয় বিধৃত হয়েছে। মুসলমান দেওয়ান মলুয়াকে অপহরণ করলে কৌশলে পরিত্রাণ লাভ পর্যন্ত তিন মাস তাকে দেওয়ানের তত্ত্বাবধানে থাকতে হয়। সমাজের বিচারে এতে তার জাত নষ্ট হয়েছে। গ্রাম-জীবনের ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্নতা এবং পশ্চাদপদ

Dhaka University Institutional Repository

সংকীর্ণ মনোভঙ্গির পরিচয় বিধৃত হয়েছে এখানে :

কেহ বলে মলুয়া যে হইত অসতী ।
মুসলমানের অন্ন খাইয়া গেল তার জাতি ॥ (মৈ.গী.পৃ ৯১)

প্রতিবেশী ও সমাজস্থ মানুষের এই বক্তব্যকে চান্দ বিনোদের ব্রাহ্মণ আত্মীয়গণ ধর্মীয় আচ্ছাদন পরিয়ে আরও সুদৃঢ় করে তোলেন এবং তাকে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে বিধৃত হন । ব্রাহ্মণ্য বিধান অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত : স্ত্রী ত্যাগ ।

বিনদের মামা সে যে জাতিতে কুলীন ।
হালুয়া দাসের গুষ্ঠীর মধ্যে সেইত প্রবীন ॥
"ভাইগ্না বউয়ের হাতের ভাত খাইতে নাহি পারি ।
জাতিতে উঠুক বিনোদ পরাচিত্তি করি ।।"
সম্বন্ধে বিনোদের পিসা কুলের বড় জাক ।
সে কয় "আমার কথা না শুনিলে পাপ ॥
তিন মাস রইল কন্যা দেওয়ান সাহেব ঘরে ।
কি দিয়া রাইখ্যাছে পরান কে কহিতে পারে ॥"
ভাবিয়া চিন্তিয়া বিনোদ শেষ কাম করিল ।
ব্রাহ্মণের পাতি দিয়ে পরাচিত্তি করিল ॥
পরাচিত্তি করিয়া বিনোদ ত্যজে ঘরের নারী । (মৈ.গী.পৃ ৯১ - ৯২)

ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন ছাড়াও এই অংশে পশ্চাদপদ গ্রামসমাজে সামাজিক বিচারের নৃশংস অমানবিক রূপটি পরিস্ফুটিত হয়েছে । গ্রামের অচলায়তন এই সমাজ শোষণ ও শাসনের শৃঙ্খল থেকে সাধারণ নাগরিকদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে সর্বকালে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় থাকলেও তাদের জন্য ধর্মীয় বিধান দিতে অতিশয় সক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছে । এই সমাজ দেওয়ান-কাজীর অত্যাচার থেকে মলুয়াকে উদ্ধার করার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকাই পালন করেনি, কিন্তু মুসলমান দেওয়ানের ঘরে অবস্থানের ফলে মলুয়া জাতি হারিয়েছে এই দন্ড দিতে তার পারঙ্গমতা অতুলনীয় । ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধীন স্থবির, অচঞ্চল, গতিহীন, বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ জীবনের চমৎকার বৈশিষ্ট্যই ব্রাহ্মণ্য-বিচারের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে । মলুয়া স্বামী-পরিত্যক্তা হয়েও সর্প-দংশনে মৃত-ঘোষিত স্বামীকে স্বীয় দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাধনাবলে জীবিত করে তোলার পর সমাজ যখন তাকে স্ত্রীর মর্যাদায় গৃহ-প্রবেশের পক্ষে রায় দিচ্ছে, তখনও ব্রাহ্মণের শাস্ত্রগত প্রাণ দয়াহীন :

বিনোদের মামা বলে হালুয়ার সরদার ।
"যে ঘরে তুলিয়া লইবে জাতি যাইবে তার ॥"
বিনোদের পিসা কয় ভাবিয়া চিন্তিয়া ।
"ঘরেতে না লইব কন্যা জাতিধর্ম্ম ছাড়িয়া ॥" (মৈ.গী.পৃ ৯৩)

'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় কঙ্ক শিশু বয়সে পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় চিরদিন চন্ডালগৃহে লালিত-পালিত হওয়ায়, কিন্তু পরবর্তীকালে পান্ডিত্য ও সৃজনশীলতা দ্বারা প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও, ব্রাহ্মণগণ তাকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে স্বীকৃতি প্রকাশ করে ।

এতেক শুনিয়া যদু আর যত গোড়াহিন্দু

Dhaka University Institutional Repository

কয় সবে মাথা নোয়াইয়া ।
আমরা সম্মত নহি, আরও শুন সবে কহি
রহ কঙ্কে মোদেরে ছাড়িয়া ॥
জন্মিয়া চন্ডালের অন্ন খায় যেই জন ।
যে তারে সমাজে তুলে নহে সে ব্রাহ্মণ ॥ (মৈ. গী. পৃ ২০৯)

ব্রাহ্মণরা কেবল আপত্তি প্রকাশ করেই নিবৃত্ত হয়নি । তারা নানা প্রকার হীন ষড়যন্ত্রের উপায়ও অবলম্বন করে । তারা কঙ্কের মুসলমান পীরের সংস্পর্শে হিন্দু ধর্মচ্যুতির কথা প্রচার করে এবং কঙ্ক ও লীলার অবৈধ প্রণয় সম্পর্কেও মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করে । কলঙ্ক রটনার মধ্যে ব্রাহ্মণ-চরিত্রের সবচেয়ে কুৎসিত প্রবৃত্তি উন্মোচিত হয়েছে ; রচয়িতাও এ-বিষয়ে আত্মনির্লিপ্তির পরিচয় দিতে সক্ষম হননি ঃ

আর এক কথা রটে না যায় কথন ।
'কঙ্কেরে সঁপেছে লীলা জীবন-যৌবন ॥'
সন্ধ্যা-মন্ত্র নাহি জানে বেদাচারহীন ।
দুরন্ত দুর্জন যারা সমাজেতে ঘৃণ ॥
মদ্য-মাংস খায় সদা পাষন্ড-আচার ।
জন্মিয়া ব্রাহ্মণ-কুলে যত কুলাঙ্গার ॥ (মৈ. গী. পৃ ২৮০)

ব্রাহ্মণ-চরিত্র সম্পর্কে এমন সত্যবাণী ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে আর কোথাও এত সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়নি । অথচ 'কঙ্ক ও লীলা' গাথায়ই আমরা এমন এক উদারমনস্ক পন্ডিত-ব্রাহ্মণ গর্গ-চরিত্রের পরিচয় প্রত্যক্ষ করি যিনি চন্ডাল-পুত্রকেও নামাবলী দিয়ে পেঁচিয়ে নিজ বাড়িতে স্থান দিতে এতটুকু দ্বিধান্বিত হননি ।

গর্গ নামে ছিল এক পন্ডিত ব্রাহ্মণ ।
শিষ্যালয় হইতে বাড়ী করেন গমন ॥
পরম পন্ডিত তিনি ধর্মে বড় জ্ঞানী ।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপন্ডিত লোকে কয় শুনি ॥
দেখিয়া শ্মশানে শিশু যায় গড়াগড়ি ।
হাত ধরি উঠাইলা গিয়া তাড়াতাড়ি ॥
নামাবলী দিয়া শিশুর বয়ান মুছায় ।
সঙ্গেতে লইয়া কঙ্কে নিজ ঘরে যায় ॥ (মৈ. গী. পৃ ২৬৮)

সর্বশাস্ত্রে সুপন্ডিত এই ব্রাহ্মণগৃহে থেকে কঙ্ক কবি হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠলে গর্গ তাকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন । কিন্তু ক্ষুদ্রমনস্ক ব্রাহ্মণকুলের হীন আচরণে গর্গের উদ্যোগ শুধু অসফলই হয়না, উল্টো এর ফলে তার পরিবারে করুণ পরিণতি সংঘটিত হয় । কিন্তু ব্রাহ্মণ-পন্ডিত গর্গ সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানবীয় অভীপ্সায় নিজেকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত করে তোলেন ।

এই ব্রাহ্মণের মানবীয় ঔদার্যের বিপরীতে আমরা 'দেওয়ান ভাবনা' গাথায় এমন এক পুরোহিত-ব্রাহ্মণকে প্রত্যক্ষ করি যিনি ক্ষুদ্রতায়-নীচতায় অন্য সকলকে অতিক্রম করে গেছেন । সামান্য অর্থের লোভে তিনি নিজের আশ্রয়ে লালিতা পিতৃহীন আপন ভগ্নী-কন্যাকে মুসলমান দেওয়ানের নিকট বিবাহ দিতেও এতটুকু দ্বিধান্বিত নন ।

Dhaka University Institutional Repository

"শুন শুন ভাটুক ঠাকুর কই যে তোমারে ।
এক যে সুন্দরী কন্যা আছে তোমার ঘরে ॥
জল বাইহেতে দেওয়ান ভাবনা দেখ্যাছে তাহারে ।
সেইদিন হইতে দেওয়ান ভাবনা পাগলা হইয়া ঘুরে ॥
তার কাছে তোমার কন্যা যদি দেওগো সাদী ।
ঘরের যত নিকার বিবি সকল হইবে বাঁদী ॥
বাড়ীর আগে দিয়া দিব চৌকোণ পুষ্করনী ।
পানেতে বান্ধিয়া দিব ঘাটের সিঁড়িখানি ॥
বাজিনু পুরা জমি দিব লেখ্যা লাখেরাজ ।
দেওয়ানের কথায় তুমি কর এই কাজ ॥"

এহেত ভাটুক ঠাকুর যজমান্যা বামুন ।
সেইত আবার পাইল জমির লোভন ॥
সম্মতি জানাইল ভাটুক দুর্গতো বাদরায় ।
জাতি যাইরা দিয়া দিব মনেতে বুঝায় ॥ (মৈ. গী. পৃ ১৮২)

ভাটুক ঠাকুরের এই অর্থলোভ, সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ও অতিশয় ক্ষুদ্র মনের পরিচয় ময়মনসিংহের গীতিকা-সমূহে তুলনাহীন । ভাটুক ঠাকুর তার হীন আচরণের দ্বারা দরিদ্র ব্রাহ্মণের শাস্ত্র সংকীর্ণচিত্ততার প্রতিনিধি হয়ে উঠেছেন ।

সন্ন্যাসী

'মহুয়া' ও 'দস্যু কেনারামের পালা'য় আমরা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী দুই সন্ন্যাসীচরিত্রের চিত্রাঙ্কন লক্ষ্য করি । একজন, বিপদগ্রস্তা যুবতীর প্রতি লালসাবশত তাকে বিপদ থেকে উদ্ধারের বিনিময়ে করায়ত্ত করতে উদ্যত । অন্যজন, ধর্মকাহিনী শুনিয়ে নির্দয় দস্যুর মনোজগতের পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে তাকে দস্যুবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত করতে প্রয়াসী । 'মহুয়া' গাথায় অঙ্কিত সন্ন্যাসী চরিত্রের হীন প্রবৃত্তির পাশাপাশি 'দস্যু কেনারামের পালা'র সন্ন্যাসী দ্বিজ বংশীদাসের সাহসিকতা, ওজস্বিতা, প্রবল আত্মবিশ্বাস ও গভীরতর ধর্মবিশ্বাস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রান্তের পরস্পর-বিরোধী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ায় উভয় চরিত্রই সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ।

'মহুয়া' গাথায় গভীর অরণ্যমধ্যে সন্ন্যাসী কর্তৃক বিষদিগ্ধ হওয়ার ফলে মৃত্যুপথযাত্রী নদের চাঁদকে চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলার পর মহুয়ার নিকট প্রণয়নিবেদন করছে :

মুনি বলে, "কন্যা তুমি আমার কথা শুন দিয়া মন ।
পায়ে ধরি মাগি কন্যা তোমার যৈবন ॥
তোমার রূপেতে আমো কন্যা যোগীর ভাঙ্গে যুগ ।
এমন ফুলের মধু আও মোরে ভোগ ॥" (মৈ. গী. পৃ ৩৩)

সন্ন্যাসীর ভয়ঙ্কর শারীরিক রূপটিও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ : 'শিরে বান্ধা জটা

Dhaka University Institutional Repository

চুল লম্বা মুছ দাড়ি ।' বা 'ঝিঙ্গালা শিঙালা জটা জটা মুখে দাড়ি ।'

'দস্যু কেনারামের পালা'য় দস্যু কেনার প্রশান্ত ছুরিকার নিচে দ্বিজ বংশীদাসের নির্ভয় অটল মূর্তি সন্ন্যাসী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত করে :

হাসিতে হাসিতে কেনা এতেক বলিয়া ।
খাণ্ডা তুলিয়া লইল 'জয় কালী' বলিয়া ।।

ঠাকুর বলেন 'দস্যু নরহত্যা পাপ ।
নরকে যাইবা তুমি না পাইবা মাপ ।।
... ...
হাসিয়া হাসিয়া তবে কহে দস্যুপতি ।
"সাত পাকে ঘুরাইতে নাশ জলাগতি ।।
... ...
পাপপুণ্য নাহি জানি মানুষ মারিব ।
তোমার কাছেতে ঠাকুর ধর্ম্ম না শিখিব ।।"

ঠাকুর কহেন "দস্যু কিবা তোমার নাম ।"
দস্যু কহে " চিনিলে না আমি কেনারাম ।।।"
যার নাম শুনি লোকে কাঁপে থরথরি ।
শিউরি বৃক্ষের পাতা পড়ে ঝরঝরি ।।
শুনিয়া কেনার নাম কাঁদে শিষ্যগণ ।
অটল অচল পিতা হাসিমুখে কন ।। (মৈ.গী. পৃ ২০০ - ০১)

নৃশংস, খ্যাতনামা খুনী দস্যুর নাম শ্রবণে শিষ্যমণ্ডলী শঙ্কিত ও বিচলিত হলেও গুরু দ্বিজ বংশীদাস অচঞ্চল । তাঁর এই নিরাতঙ্কের পেছনে সন্ন্যাস জীবনের মোহমুক্ত জীবনধারার অভ্যস্ততা, প্রবল ধর্মবিশ্বাসহেতু মৃত্যুভয়হীনতা এবং অপার্থিব জীবন সম্পর্কে গভীর আত্মবিশ্বাসের পরিচয়ই অভিব্যক্ত হয়েছে ।

পীর

ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারে পীরদের ভূমিকাই ছিল প্রধান । সুফীবাদের অনুসারী এসব পীরেরা ধর্মচিন্তায়ও অনেক উদারতার পরিচয় দিয়েছেন । পীরদের আন্তরিকতা, দূরদর্শিতা, পরমত-সহিষ্ণুতা, অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের কুশলতা ধর্ম প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । 'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় জনৈক পীরের আগমন ঘটেছে — যিনি ব্রাহ্মণ-পুত্র কঙ্কের বাঁশীর সুর ও কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে স্বীয় উদার্যপূর্ণ আচরণ দ্বারা তাকে মুগ্ধ করে শিষ্যত্বে বরণ করে নিয়েছেন । ধর্ম-প্রচার ও প্রসারের জন্য একজন প্রকৃত পীরের ব্যক্তি-জীবনে যেসব গুণাবলী থাকা প্রয়োজন, তার সবই তাঁর মধ্যে বর্তমান । দরো বাড়িতে নয়, সকলের যাতায়াতযোগ্য স্থানে এসে পীর তাঁর আবাস

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপন করে অলৌকিক ক্ষমতা ও মানবীয় ঔদার্যের পরিচয় দানের মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা-সহানুভূতি অর্জন করেছেন।

নাসিজাকি পীর তার বড় হেকমত।
ধুলা দিয়া ভাল করে আইসে রোগী যত॥
অন্তুরের কথা নাহি দেয় বলিবারে।
আপুনি কহিয়া যায় অতি সুবিস্তারে॥
... ...

অবাক হইল সবে দেখি কেরামত।
দর্শন-মানসে লোক আইসে শত শত॥
যে যাহা মানত করে সিদ্ধি হয় তার।
হেকমত জাহির হইল দেশের মাঝার॥
চাউল-কলা কত সিন্নি আইসে নিতি নিতি।
মোরগ ছাগল কইতর নাহি তার ইতি॥
সিন্নির কণিকামাত্র পীর নাহি খায়।
গরীব দুঃখীরে সব বাটিয়া বিলায়॥ (মৈ. গী. পৃ ২৭৪ - ৭৫)

সাধারণ গরিব মানুষের প্রতি পীরদের বিশেষ সহানুভূতির দৃষ্টি ছিল বলেই ধর্মপ্রচার সহজতর হয়েছে কঙ্কের বাঁশির সুর শুনে মুগ্ধ পীর তাকে ডেকে এনে তার মুখ থেকে 'মলুয়ার বারমাসী' গান শুনেছেন। মুসলমান পীর হয়ে হিন্দু-কাহিনী শুনে মুগ্ধ হওয়ার মধ্যে অন্য ধর্মের প্রতি উদার ও সহনশীল মনের পরিচয়ই সুস্পষ্ট :

পীরের নিকটে বসি, মলুয়ার বারমাসী
যবে কঙ্ক মধুরে গাহিলা।
আহা কিবা মনোহর, শুনু মনে মনোহর,
শুনি পীর মোহিত হইলা॥ (মৈ. গী. পৃ ২৭৬)

পীর কঙ্কের কবিত্বশক্তির সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাকে শিষ্যত্বে দীক্ষা গ্রহণের জন্য তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। এবং শিষ্যত্ব বরণের পর সত্য পীরের পাঁচালী রচনার আদেশ দিলেন :

দেখিয়া শুনিয়া পীর, কঙ্কেরে করিলা স্থির
উপযুক্ত ভক্ত এহি জন।
সত্যপীরের পাঁচালী কঙ্কেরে লিখিতে বলি
একদিন হৈল অদর্শন॥ (মৈ. গী. পৃ ২৭৭)

কঙ্ক পীরের আদেশে যে পাঁচালী রচনা করেন, তা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক সমাদৃত হল :

হিন্দু আর মোছলমানে সত্যপীরে ভক্তে মানে,
পাঁচালীর হৈল সমাদর॥ (মৈ. গী. পৃ ২৭৮)

হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের পূজ্য ছিল সত্য পীর, সত্য নারায়ণ। সত্য পীর বা সত্য নারায়ণের কথা আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্-র শাসনামলে (১৪৯৩ - ১৫১৯) শোনা যায়। সে সময়ে বাংলাদেশে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের বিশেষ প্রবাহ শুরু হয়েছে। সত্য পীর বা সত্য নারায়ণ এরই আইডিয়া এবং হিন্দু-মুসলিম দুই জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ফসল।

Dhaka University Institutional Repository

রাখাল ও বংশীবাদক

রাখালী-জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে কয়েকটি গাথায় । 'কমলা', 'কঙ্ক ও লীলা' এবং 'মহিষাল বন্ধু' গাথার বিধৃত রাখালী-জীবনে আন্তরিকতা, সংবেদনশীলতা, প্রণয়াবেগ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় । রাখালী-জীবনের সঙ্গে বাঁশীর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেবল 'কমলা' গাথায় চিত্রিত 'মহিষাল বন্ধু'র চরিত্রটি সংবেদনশীলতা, সহজ-সরল-সারল্যপূর্ণতায় উজ্জ্বল :

অপরূপ রূপ দেখি মহিষাল ভাবিল ।
লক্ষ্মী বুঝি ছলিবারে আমারে আইল ॥ (মৈ. গী. পৃ ১৪৬)

নিরুদ্দেশযাত্রী কমলাকে পেয়ে মহিষালের এমন চিন্তার মধ্যে গ্রাম-জীবনের অনভিজ্ঞ, ধর্মপ্রাণ একটি নিষ্পাপ মানুষের চিত্রই পরিস্ফুট হয়েছে । মহিষাল চরিত্রের মহত্ত্বের দিক আরও উজ্জ্বল হয়েছে যখন বিপুল সম্পদ ও অর্থের বিনিময়ে জমিদার-পুত্র কমলাকে হস্তগত করতে চাইছে। কিন্তু মহিষাল অর্থলোভের নিকট নতি স্বীকার করছেনা । মহিষালের দারিদ্র্য-পীড়িত জীবন অর্থলোভ ও স্বার্থপরতা-মুক্ত :

কান্দিয়া মহিষাল কয় "মোর ধনে কাজ নাই ।
মায়েরে ছাড়িলে আর মোর বাঁচা নাই ॥ (মৈ. গী. পৃ ১৪৯)

এখানেই মহিষাল-চরিত্রের মানবীয় ঔদার্য ফুটে উঠেছে । 'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় কঙ্কের রাখালী জীবন সৃজনশীল প্রেরণায় উজ্জীবিত । নির্জন প্রান্তরের উদাস নিসর্গ, বাঁশীর অন্তর্লীন সুর প্রভৃতি সৃজনশীলতার অনুকূল উপাদান :

সেইদিন হইতে কঙ্ক উঠিয়া প্রভাতে ।
লইয়া গর্গের ধেনু চরায় মাঠেতে ॥
সন্ধ্যাকালে গাভী লইয়া ফিরে কঙ্ক ঘরে । (মৈ. গী. পৃ ২৬৯)

কঙ্কের বাঁশী শুনে নদী বহে উজান বাঁকে
সঙ্গীতে বনের পশু সেও বশ থাকে ॥ (মৈ. গী. পৃ ২৭৩)

'মহিষাল বন্ধু' গাথায় ডিঙাধরের রাখালী-জীবনেও বাঁশীর সুরের প্রণোদনা রয়েছে । নির্জন নদীতীরে বাঁশীর সুর তার মনকে যেভাবে সংবেদনশীল করে তুলেছিল, তাতেই তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে বলরাম-কন্যা সাধুতীর প্রতি আন্তরিক প্রণয়নিবেদন ।

রাখাল নয়, কেবলমাত্র বংশীবাদক — এমন একটি দুর্লভ চরিত্রের পরিচয় বিধৃত হয়েছে 'আঁধা বন্ধু' গাথায় । অন্ধ বংশীবাদকের চরিত্রটি আন্তরিকতায়, মানবিকতায়, আত্মত্যাগী মানসিকতায়, রহস্যময়তায়, অস্বাভাবিকতায় বিশ্বসাহিত্যের অংশ হয়ে উঠেছে । অন্ধ বংশীবাদক বংশপরিচয়হীন, কোনো পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, বাঁশী বাজানোই যেন তার পেশা, বাঁশীই যেন তার প্রাণ, বাঁশী বাজাতেই তার সকল আনন্দ । উদাসীন, সংসারবিমুখ, সুরের দ্যোতনায় উচ্ছ্বসিত এই চরিত্রটির সবচেয়ে বড়গুণ তার মানবিকতা । এক রাজকন্যা তার বাঁশীর সুরে মুগ্ধ, তার প্রতি অনুরক্ত । কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

অন্ধ বংশীবাদক জানে এই অনুরাগের কোনো সফল পরিসমাপ্তি অসম্ভব । তাই সে রাজালয় পরিত্যাগ করে । কিন্তু রাজকন্যার অনুরাগ এতই প্রবল যে বিয়ের পরেও সে বংশীবাদককে বিস্মৃত হয়নি, বাঁশির সুর শুনে গৃহ পরিত্যাগ করে রাজকন্যা বংশীবাদকের অনুগামী হয়েছে । কিন্তু বংশীবাদকের মানবিকতা এমনই চূড়াস্পর্শী যে রাজকন্যাকে তার আকর্ষণ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য প্রথমে তার প্রাণাধিক প্রিয় বাঁশীটি এবং পরে নিজেকেও নদীজলে বিসর্জন দেয় ।

শুন শুন কন্যা তোমারে কহিযে তোমারে ।
বিসর্জন দিলাম বাঁশী তুমি যাও ঘরে ॥
আর না বাজিবে বাঁশী আসে গো দংশিয়া ।
ঐ দেখ যায় বাঁশী দেউয়েত ভাসিয়া ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ২০৬)

সঙ্গীতপ্রিয়তা শাশ্বত মানবধর্মের পরিচয় । সুরের আবিষ্টতা মানুষের মনুষ্য-ধর্মকে যে গভীরভাবে উজ্জীবিত ও স্পন্দনশীল করে, অন্ধ বংশীবাদক চরিত্রটি তার প্রমাণ ।

মৎস্যজীবী

মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দুইটি গাথায় লক্ষণীয় । কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র জীবনেও স্বার্থহীন ঔদার্য ও মানবীয় অভীপ্সায় উভয় পরিবার উজ্জ্বলতায় ভাস্বর রেখেছে । 'রূপবতী' গাথায় রাজকন্যা রূপবতী তার বিপর্যস্ত বনবাসী জীবনে এক মৎস্যজীবী পরিবারের আশ্রিতা হয় । রূপবতীর রাজ পরিবারে প্রতিষ্ঠা, স্বীয় পতির প্রাণরক্ষা মন্ডুক প্রভৃতি ক্ষেত্রে মৎস্যজীবী পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত সক্রিয়, সাহসিকতাপূর্ণ ও মানবীয় ।

জাওয়ালীয়া জাওয়ালিয়া তারা দুইটি ভাই ।
জাল বাইয়া খায় যারে অন্য কার্য্য নাই ॥
কোমরে বান্ধিয়া খোলা হাতে লইয়া জাল ।
নদীর কিনারে ঘুরে সকাল বিকাল ॥
ঘুরিতে ঘুরিতে তারা এইখানে আইল ।
রূপবতী কন্যার সঙ্গে বনে দেখা হইল ॥ (মৈ.গী.পৃ ২৩৩)

রূপবতীকে বনাভ্যন্তরে পেয়ে দুই ভাই বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পরমাদরে লালন-পালন করে এবং পরবর্তী সময়ে পতি বিরহে কাতর রূপবতীর প্রতি সন্তানবৎ স্নেহবশে তাকে নিয়ে রাজদরবারে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করে :

প্রভাতে উঠিয়া পুনাই কোন কাম করে ।
নৌকা সাজাইতে তবে কয় জাওয়ালারে ॥
জাওয়াইয়া আনিল পানসী ঘাটেতে লাগায় ।
কন্যারে লইয়া পুনাই রাজার দেশে যায় ॥ (মৈ.গী.পৃ ২৫৮)

রাজদরবারে স্নেহ-বধূ পুনাইয়ের ভূমিকা অত্যন্ত বীরত্বব্যঞ্জক ও গৌরবদীপ্ত ।

পালিতা কন্যার প্রতি অসীম স্নেহ-ভালোবাসা 'হীরামনী' গাথায়ও একটি মৎস্যজীবী পরিবারকে দীপ্তিমান করেছে । এই গাথায় মৎস্যজীবী পরিবারটি অধিকতর মহত্ত্বের পরিচয় ব্যক্ত করেছে দরিদ্র

Dhaka University Institutional Repository

হয়েও অর্থলোভের নিকট নতি স্বীকার না করে । নদীজলে নিমজ্জিত হীরামনীর প্রায়-মৃতদেহ জেলের জালে ধরা পড়লে তাকে বাড়িতে নিয়ে জেলে লালন-পালন করে । পরে বিপুল অর্থের বিনিময়ে তাকে কোনো সওদাগর ক্রয় করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে দরিদ্র জেলে পরিবারের অস্বীকৃতির মধ্যেই তাদের মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটে ।

জেল্যানী কয় শুন শুন ধার্মিক সুজন ।
বিধাতা দিয়াছে দুঃখ ছাড়াইব কেমুন ।।
দুঃখের সহিত দিছে এহি মোর সুখ ।
ঘুম ভনে উঠিয়া দেখি আমার মায়ের মুখ ।।
এই সুখ ধনে বেচি দুঃখ হবে সারা ।
খসিবে হাতের শঙ্খ পতি যাবে মারা ।।
মুওশ লইয়া ঘরে যাহ সাধু মহাজন ।
কন্যারে বগলি দিয়া না লইব ধন ।। (পু.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৪৩৬-৩৭)

ধোপা

রজক-চরিত্রের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'ধোপার পাট' গাথায় । দুইটি ধোপা চরিত্রের পরিচয় বিধৃত হয়েছে এই গাথায় । উভয়েই জমিদার বাড়ির কাপড় পরিস্কার করে জীবিকা নির্বাহ করে, উভয় পরিবারের দারিদ্র্যের পরিচয় পরিলক্ষিত হয় । জমিদার বাড়ির কাজ করেও জীবিকার যন্ত্রণা থেকে শ্রমজীবী মানুষেরা যে মুক্ত হতে পারত না, তার প্রমাণ এতে স্পষ্ট । উপরন্তু কাজে কোনোপ্রকার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ঘটলেও তার দন্ড ছিল নির্মম । এক ধোপাকে জমিদার তলব করেছে অন্য কারণে, কিন্তু ধোপার মনে দুশ্চিন্তা হল বৃষ্টির কারণে কাপড় শুকাতে না পারায় যথাসময়ে কাপড় সরবরাহ করতে বিলম্ব হওয়ার জন্যই হয়ত এই তলব, তাই সে কিছু জিজ্ঞাসার পূর্বেই কৈফিয়ৎ দিচ্ছে :

দুইদিন গেছে বিষ্টি বাদল মেঘে আর তুফানে ।
কাপড় না বাতায় এই দারুন দুর্দিনে ।।
তে কারণে মহারাজা আমার অবগতি ।
বচ্ছর না ঘুরাইতে আইল দুর্গতি ।। (পু.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ১১)

এই কৈফিয়ৎ দানের মধ্যে শাস্তিভোগের আশংকার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে । তাছাড়া জমিদারের লোক পাঠানোর খবর পেয়ে কম্পিত শরীরে দ্রুত আগমনের ঘটনায়ও এর প্রমাণ স্পষ্টঃ 'কাঁপতে কাঁপতে আইল গোধা ভগমানের বাড়ী ।'

ঘটক

বিবাহ সংঘটনে ঘটকের ভূমিকা মধ্যযুগীয় সমাজেও বিদ্যমান ছিল । পুত্র বা কন্যা বিবাহযোগ্য হলে বাড়িতে ঘটকের আগমন ছিল সাধারণ জীবনাচারের অঙ্গ । উদাহরণস্বরূপ,
'মহুয়া' গাথায় মহুয়া বিবাহযোগ্যা হলে "মাস মাসে ঘটক আইল হীরাধরের বাড়ী ।" 'চন্দ্রাবতী' গাথায় : "এগদিন ত না ঘটক আইল ভট্টাচার্য্যের বাড়ী, ।" 'দেওয়ান ভাবনা'য় : "একই না ঘটক

Dhaka University Institutional Repository

ফিরয়া গেলগো পন্দে না হয় ।" বা, " এই ঘটক ফিরয়া গেলরে পার ঘটক পাইল ।" বা, " এতি মতে পাইল ঘটক পরতি মাসে মাসে " ॥

গণক

গণকের উপস্থিতি আমাদের সমাজে এখনও বিদ্যমান । পশ্চাদপদতার কারণে তৎকালীন সমাজে মানুষের অনভিজ্ঞতার অসহায়ত্ব দূর করার উপায়স্বরূপ গণকের প্রভাব ছিল মারাত্মক । রূপবতী গাথায় গণকের উপস্থিতি লক্ষণীয় । রাজা রামচন্দ্র রাজ্যে অনুপস্থিত, রাজকন্যা রূপবতীর বিবাহ-বয়স উপস্থিত, এমন সময়ে রাণীর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অসহায় জীবনে কন্যার ভাগ্য গণনার জন্য বাড়িতে বহু গণকের আগমন ঘটছে । সকলেই বলছে দুশ্চিন্তার কারণ নেই, অতিশীঘ্র বিয়ে হবে এবং রাজরাণী হবে এই কন্যা । গণকদের এ-এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য যে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য তারা সবসময় কল্যাণময় ভবিষ্যতের কথাই বলবে এবং সে ধরনের ভবিষ্যতের পথে সামান্য অন্তরায়ের কথা উল্লেখ করে সেজন্য সামান্য ব্যয়ের কথা বলবে — এটাও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যেই । 'রূপবতী' গাথায় পাঁচজন গণকের আগমন ও তাদের উচ্চারণে উপর্যুক্ত সত্যই প্রতিফলিত হয়েছে :

এক গণক আইল তবে খুঙীপুথি লইয়া ।
এই গণক আইয়া কয় গণিয়া চাহিয়া ॥
... ...

রাজার ঘরে অইব বিয়া রাজার পাটরাণী ।
সুখেতে কাটাইব কাল কহিলাম আমি ॥ (মৈ. গী. পৃ ২৩২)

আর গণক বলে " কন্যার চলন-চালন বেশ ।
... ...

এই কন্যার বড় ভাগ্য পাবে রাজার পাট ॥
চরণ ধোয়াইবা কন্যার শতেক কিঙ্করে ।
দক্ষিণ দেশে হইব বিয়া পরী নদাপারে ॥ " (মৈ. গী. পৃ ২৪২)

আর গণক বলে " কন্যা সর্বাঙ্গসুলক্ষণ ।
... ...

পায়ের দুইখানি শোভে যেমন কিঙ্কিণী
এই লক্ষণ থাকলে কন্যা হয় রাজরাণী ॥ (মৈ. গী. পৃ ২৩৩)

আর গণক আইসা তবে হস্ত দেইখা কয় ।
" রাতিতে হইবে বিয়া নাহি কোন ভয় ॥
... ...

রাজার ঘরে হইব বিয়া তার নাহি খা ।
একে একে হইব কন্যা সাত পুতের মা ॥ (মৈ. গী. পৃ ২৪৩)

Dhaka University Institutional Repository

আর গণক বলে "কন্যার দেখ চক্রের মণি ।
ভাগ্যবতী হবে কন্যা হবে রাজরাণী ॥
খিল্লিতে পাড়িয়ে দেখে গোষ্ঠী হবে রাজা ।
গর দোষ আছে কন্যার কাট এই বেলা ॥
উত্তম বসন জোর আর নারী মেলা ।
ঘৃত দুগ্ধ তণ্ডুল আন সাজাইয়া ডালা ॥ (মৈ.গী.পৃ ২০৩)

গণকদের কথা বলার মধ্যে কৌতুকটিই লক্ষ্য করার মতো । বিশ্বাসযোগ্য হয় এমন কথাই তারা উচ্চারণ করে এবং কৌশলেই তারা তাদের পাওয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে ।

গণকের উপস্থিতি 'মহুয়া ' গাথায়ও লক্ষণীয় । মহুয়ার পিতা কন্যার বিবাহ আয়োজনের পূর্বে গণক ডাকিয়ে তার কল্যান-অকল্যান জেনে নিচ্ছে । এবং বিয়ের লগ্ন স্থির করছে ঃ

গণক ডাকাইয়া বাপে দেখে পাঁজি পুঁথি ॥
পাঁজিপুঁথি দেখ্যা গণক বিয়ার লগ্ন কয়ে । (মৈ.গী.পৃ ৬৭)

আদিবাসী জনগণ

দুইটি গাথায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে । 'মুন্ডা' ও 'গারো' শ্রেণীর উপজাতীয় জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ ঘটেছে 'শীলাদেবী' ও 'রাজা রঘুর পালা'য় । 'মুন্ডা'দের সক্রিয়তাকে গৌরবমন্ডিত করে উপস্থাপন করা না হলেও 'গারো'দের অভিযান সম্পূর্ণভাবেই মহৎ-উদ্দেশ্যমন্ডিত । মধ্যযুগে পাহাড়ের ঘন অরণ্যমধ্যে বসবাসরত আদিবাসী জনগণ যে কখনও কখনও সমতলভূমির জনজীবনে বিঘ্ন সৃষ্টি করত তার ঐতিহাসিক প্রমাণ এসব গাথায় সুস্পষ্ট । আদিবাসী জনগণ যতই অশিক্ষিত, বর্বর হোক তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি যে-বিবেচনাযোগ্য তার প্রমাণও উল্লিখিত ঘটনাদ্বয়ে স্পষ্ট ।

'শীলাদেবী' গাথায় সমতলভূমির ব্রাহ্মণ রাজার বিরুদ্ধে মুন্ডা-দলের সম্মিলিত আক্রমণ-প্রয়াসে তাদের অন্যায় আচরণের প্রমাণ থাকলেও এই যৌথ-প্রয়াসের মধ্যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনবৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে ঃ

বনেতে থাকিয়া মুন্ডা যোগ্ কাম করিল ।
জঙ্গলীর দল লইয়া রঘুই আসিল ॥
"শুন শুন জঙ্গলীর আদি কহি যে তোমারে ।
আইস রাজে যাইয়া তোরা বামুন রাজার ঘরে ॥
ধন দৌলতের রাজার নাই সীমা পরিসীমা ।
একদিন মারিলে পাইব বছরের দানা ॥"
একেত জঙ্গলীর জাতি তায় তারা ক্ষুধায় কাতর ।
ধনের কথা শুইন্যা সবে হইল পাগল ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৫৬)

ব্রাহ্মণ-রাজার বাড়িতে রাত্রির অন্ধকারে অকস্মাৎ আক্রমণ করে মুন্ডার দল সহজেই জয়ী হয় । এই

Dhaka University Institutional Repository

হামলার পেছনে রাজা কর্তৃক যুবার একটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের অপমানবোধ কার্যকর ছিল । তবে যুবাদের প্রস্তাবটি ন্যায়সঙ্গত কিনা তা প্রশ্নসাপেক্ষ । ব্রাহ্মণ-রাজার বাড়িতে পাঁচ বছর পরিশ্রম করে যুবা পারিশ্রমিকের পরিবর্তে রাজকন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে রাজা তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং যুবাকে কারারুদ্ধ করেন । এরই প্রতিশোধে যুবা হামলা-অভিযান পরিচালনা করে ।

এই গাথায় যুবাদের যৌথ-অভিযানের ন্যায়-অন্যায়ের বিষয়টি প্রশ্নসাপেক্ষ হলেও 'রাজা রঘুর পালা'য় গারো উপজাতীয় জনগণের যুথবদ্ধ প্রয়াস অত্যন্ত মহত্ত্বমণ্ডিত । বিবরণানুসারে একজন ধার্মিক রাজার মৃত্যুর পর দুগ্ধপোষ্য শিশু রাজপুত্র রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয় । পার্শ্ববর্তী রাজা ঈশা খাঁ এসে শিশু রাজপুত্রকে হরণ করে । রাজা শিশু হোক কিন্তু সাধারণ প্রজাদিগের নিকট তিনি রাজা, তাই রাজা-অপহরণে তাদের মধ্যে বেদনা ও অপমানবোধ সঞ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক । এই গাথায় অপহৃত রাজপুত্রকে উদ্ধারকল্পে গারো উপজাতীয় জনগণ যে সাহসিকতা ও ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছে, তা অপূর্ব । মধ্য-যুগে রাজার সঙ্গে প্রজাদের যে কেবল বিচ্ছিন্নতা বা বৈরিতাই ছিল না, অপূর্ব ভালোবাসা ও পারস্পরিক কল্যাণের বন্ধনও ছিল, তা এখানে স্পষ্ট :

খবর লাগ্যা গেছে সুসঙ্গ মুলুক জুড়িয়া ।
পাহাড়ীর যত গারো আইল নামিয়া ॥
মুলুক ভাঙিয়া লোক পাগল হইয়া গিয়া ।
কেমুন হিম্মতি দেখায় রাজারে দিতে আইতে ॥ (পূ. গী. চ. খ. দ্বি. স. পৃ ৮৬)

রাজাপহরণের অপমানবোধের যন্ত্রণা লাঘবের জন্য তারা ঈশা খাঁর জঙ্গলবাড়ী আক্রমণ করে এবং শিশু রাজাকে উদ্ধার করে ।

মার মার করয়া চলে
জঙ্গলবাড়ীর পারে ॥
বাঁশ লইয়া যায় যায়
চলে গারো যারে । (পূ. গী. চ. খ. দ্বি. স. পৃ ৮৭)

উপজাতীয় জনগণের এই যুথবদ্ধ প্রয়াস, সাহসিকতা, রাজার প্রতিশোধগ্রহণে দৃঢ় মানসিকতার পরিচয় বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ । 'লীলাদেবী' পালায় উপজাতীয় জনগণের সম্মিলিত প্রয়াসে শক্তির প্রকাশ সুস্পষ্ট হলেও কল্যাণমুখী নয় । সম্মিলিত প্রয়াস যে সর্বশক্তিমান ও যেকোনো অপশক্তিকে পরাজিত করতে সক্ষম 'রাজা রঘুর পালা'য় তার প্রমাণ সুস্পষ্ট ।

প্রসঙ্গত সম্মিলিত প্রয়াসের অন্য একটি উদাহরণ উল্লেখযোগ্য । 'বীর নারায়ণের পালা'য় তা পরিলক্ষিত হয় । জমিদার-পুত্র বীর নারায়ণ জনৈক প্রজা কন্যাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেলে ঐ কন্যাকে নিয়ে দেশত্যাগী হতে বাধ্য হয় । সাধারণ প্রজারা বীর নারায়ণ চরিত্রের মহত্ত্বের বিষয়টি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় এবং তারা এই আচরণকে জমিদারের অত্যাচার হিসেবে বিবেচনা করে । প্রজাগণ সম্মিলিতভাবে এই বিবাদীদের বিরুদ্ধে জমিদারের নিকট বিচার দাবি করে । জমিদার সম্মিলিত দাবিকেই বড় হিসেবে গ্রহণ করে পুত্রকে দণ্ড দেয় । জমি-দারের নিকট প্রজাগণের সম্মিলিত অভিযোগ উত্থাপনের এবং জমিদার কর্তৃক স্বীয় পুত্রকে সাজা প্রদানের ঘটনাটি মধ্যযুগের মানদণ্ডে বিরল ।

Dhaka University Institutional Repository

সল্লা যুক্তি করিয়া তাহারে মারে কুপিত হইয়া ।
কুইদ করিবারে চায় বাপের কাছে গিয়া ॥
কুপুত্রার কান্ড যত্তে মারে তারা বাপেরে জানায় ।
"এমুন পুত্র আর কেউ হইলে গাঙেতে ভাসায় ॥
... ...

কুপুত্রের কথা যত বাপে শুনিল ।
রাগেতে শিরশির অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল ॥
আগুন হইয়া বাপে কটুয়াছে ফুলে ।
বীর নারায়ণ পুত্রে লইয়া আন সভার আগে ॥
সাচা যদি হয় কথা দন্ড দিবাম ।
পুত্র বলিয়া নাইসে ঘুরা কাইট্যা লইবাম ॥
কুপুত্র থাকনের থাইক্যা না থাকন ভালা ।
এমুন পুত্র কেমুন থায়রে কুলের জ্বালা" ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৩০৮)

মধ্যযুগেও যে সাধারণ প্রজাগণের সম্মিলিত অভিযোগকে শাসক জমিদার বিবেচনায় নিতেন এবং সে-অনুযায়ী ন্যায় বিচার করতেন এই গাথায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় ।

মালাকর

বাজারে পুষ্পমাল্য বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহের ঘটনা বিধৃত হয়েছে 'রতন ঠাকুরের পালা'য় । বৃদ্ধ মালাকরের জীবিকার একমাত্র উপায় মাল্য রচনা ও তা বিক্রয় । বৃদ্ধ মালাকরের কন্যা কাছে ঃ

শুন শুন বিরধ বাপ শুন কহিরে তোমারে ।
এই মালা লইয়া যাও রে তুমি তিরপুরার হাটে ॥
তিরপুরার হাটখানি বইসে বিহান বেলা ।
সেই না হাটে বিকাইয়া আইস চিকণ ফুলের মালা ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৩২৩

দরিদ্র জীবন

বৃদ্ধ মাঝির দরিদ্র সংসারের চেয়েও আরও দরিদ্র সংসারের চিত্র 'মাহুয়া বিবি' গাথায় অঙ্কিত হয়েছে । সেখানে মাহুয়া বিবির বৃদ্ধ পিতা ভূমিহীন, মায়ের-উৎসহীন; কাঠিকাঠা বাড়িয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে জীবন অতিবাহিত করছে । অর্ধাহারী জীবনে প্রম-অক্ষম পিতা যুবতী কন্যার বিয়ের ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ঃ

দুনিয়া ভেতরে আমরার মতো ভাগ্য আর কেউ নাই ।
গ্রামেতে বসতি রে এক দানার ঠাঁই ॥
জোত জমা কিছু, নিরে নাহিক লাগিয়া ।
আমাই লইরা খাওয়ায় এমন নাই রে পার্শিয়া ॥
দিনের দিন মানে একবার ভাত খাই ।

Dhaka University Institutional Repository

তবুও দিনের নাগাল দৌড়াইয়া না পাই ॥
এক কন্যা আছেরে আমার জন্মের সোনার নড়ি ।
কহিতে কন্যার কথা বহে চক্ষের পানি ॥
বিয়ার [illegible] সোনে বিয়া দিয়া ।
এর দুঃখে যাইব আমার কয়বর কাটিয়া ॥ (পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি.স.পৃ ১১৭)

এমন দারিদ্র্য জীবনের রূপ গীতিকায় অন্যত্র চিত্রিত হয়নি । তবে হিন্দু ব্রাহ্মণের দরিদ্র জীবনের কাহিনী 'কঙ্ক ও লীলা'য় বিধৃত হয়েছে । এখানে কন্যার বিয়ের দুশ্চিন্তা যেমন নেই, তেমনি 'কঙ্ক ও লীলা'য় আমরা দরিদ্র ভিক্ষাবৃত্তির জীবনে সন্তান পালনের কঠিন সংগ্রাম রূপ প্রত্যক্ষ করি ঃ

বিপ্রপুরে ছিল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।
ভিক্ষাবৃত্তি করি করে জীবন পালন ॥
. . .   .
সারাদিন ভিক্ষা মাগি দুয়ারে দুয়ারে ।
সন্ধ্যাকালে ফিরে বিপ্র আপনার ঘরে ॥
এই মতে নিতি যায় অন্ন উপার্জন ।
কষ্টে সেনাতে করে জীবনধারণ ॥
সংসারেতে ভার্য্যা ভিন্ন কেহ নাহি ছিল ।
কিছুদিন পরে এক পুত্র জন্মিল ॥
কেমনে পালিবে পুত্রে না দেখে উপায় ।
কেউ নাহি চায় পুত্র কেউ নাহি পায় ॥ (মৈ.গী.পৃ ২৬১)

দারিদ্র্য জীবনে সন্তান বাঁচিয়ে রাখাই যেখানে কষ্টকর, সেখানে পুত্রের জন্মে মন আহ্লাদিত হয় না । সচ্ছল জীবনে পিতা-মাতা পুত্রের আকাঙ্ক্ষা করেও পায় না, কিন্তু অসচ্ছল জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই পুত্রের আগমন ঘটে, এবং সে থাকে অবহেলিত । দরিদ্র জীবনের দীর্ঘনিঃশ্বাস ও নিষ্ঠুর বাস্তবতাই ব্যক্ত হয়েছে শেষ পংক্তিটিতে ঃ "কেউ নাহি চায় পুত্র কেউ নাহি পায় ॥"

সর্প-ওঝা

বনজঙ্গলঘেরা পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলে সাপের প্রাদুর্ভাব এবং সর্প-ওঝার অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়টি আমরা তিনটি গাথা থেকে অবহিত হই । 'মহুয়া', 'মান্জুর মা' ও 'পীর বাতাসী' গাথায় সর্প-দংশন, মৃত্যু এবং সর্প-দংশনে মৃত-প্রায় লোককে ওঝার অলৌকিক তন্ত্র-গুণে জীবিত করার ঘটনা বিধৃত হয়েছে ।

'মহুয়া' গাথায় শিকার-সন্ধানী চাঁদ বিনোদ ঘন অরণ্যমধ্যে বিষাক্ত সর্প কর্তৃক দংশিত হয়ে মৃত্যুমুখী হলে মহুয়া তাকে ওঝার নিকট নিয়ে যায় ।

গোবায় ছিল কালসাপ যেন কাম করিল ।
কানি আঙ্গুলের মাঝে যেন সে মারিল ॥

Dhaka University Institutional Repository

কালকূট বিষ হায়রে উজান ধাইল ।
মস্তকে উঠিল বিষ ঢলিয়া পড়িল ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৪)

অথচ ওঝা তার অলৌকিক মন্ত্রগুণে মৃত হিসেবে ঘোষিত চান্দ বিনোদকে জীবিত করে তুলল :

নাক মুখ দেইখ্যা ওঝা মাথায় থাবা দিল ।
বুকেতে আনিয়া বিষ কোমরে নামাইল ॥
কোমরে আনিয়া বিষ হাটুতে নামাইল ।
হাটুতে আনিয়া বিষ পায়ে নামাইল ॥
পাতালেতে কালনাগ চুমকে লইল ।
যখনে নাগিনী বিষ চুমকে লইল ॥
বিষজ্বালা গেল বিনোদ আখি মেইল্যা চাইল । (মৈ.গী.পৃ ১৫ - ১৬)

'মলুয়া গাথায় সর্পদংশন ও সর্প-ওঝার ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য । কিন্তু 'মান্জুর মা' কিংবা 'পীর বাতাসী' গাথায় সর্প-ওঝার ভূমিকাই প্রধান । 'মান্জুর মা' গাথায় সর্প-ওঝার কিংবদন্তীসম অলৌকিক ক্ষমতার কাহিনী বিধৃত হয়েছে । গাথার নায়ক মনির সর্প-ওঝা । তার জীবনের সর্পওঝা হিসেবে সাধনা, সফলতা, কিংবদন্তীর নায়ক হয়ে-ওঠা, কিন্তু শেষ জীবনে একটি ঘটনায় ব্যর্থতা এবং সেই ব্যর্থতার ছোট ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে তার জীবনের করুণ পরিণতি সংঘটিত হওয়ার কাহিনীই 'মান্জুর মা' গাথার মূল প্রতিপাদ্য । 'মান্জুর মা' গাথায় মনির ওঝার অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয়েছে :

কানির - বাড়ীর মণির ওঝা রে
ওঝা আরে কিনা মন্ত্র জানে ।
কালনাগে ডংশিলে বিষরে
ঝাড়্যা ভালা উদ্যানালে আনে ॥
গাড়রী মন্ত্র জানে রে
আরে ভালা কিবা মন্ত্রের ধারা ।
... ...
মরা মানুষ উঠ্যা খাড়য়রে
আরে ওঝা না নেয় পয়সা ॥
... ...
আসমান জমীনের মধ্যে
আরে ভালা চাইর কোণা পিরথিবী ।
এমন কাইরতের ওঝারে
আরে ভালা আর নাই সে দেখি ॥ (পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি.স.পৃ১১-১২)

'পীর বাতাসী' গাথায় সর্প-দংশন ও সর্প-ওঝার কাহিনী বিস্তৃত অংশ জুড়ে বিদ্যমান । সর্প-দংশনে এই গাথার নায়ক বিনাথ ও তার পিতার মৃত্যু হয়েছে । এই গাথায় সুমাই ওঝার অপরিমেয় মন্ত্র-শক্তির পরিচয় বিধৃত হয়েছে :

Dhaka University Institutional Repository

নানা মন্ত্র জানে বেটা জ্ঞানে বিহস্পতি ।
ঔষধ মন্ত্রের জোরে বনেত বসতি ॥
মন্ত্র পড়্যা পক্ক না কড়ি আছে তা খানে।
জঙ্গালার যত সপ্প সকল ধইরা আনে ॥
কেউটা রোখা বর্মজাল নোওয়ায় দেইখ্যা মাথা ।
বনের বিরক ওঝার দেখ মাথায় ধরে ছাতা ॥
... .
কড়ি চালনা দিয়া দেখ সপ্প ধইরা আনে ।
ছয় মাসের মরা জিয়ায় ঔষধের গুণে ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৩৪৫ – ৪৬)

উল্লিখিত অন্য দুই ওঝার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি এমন একটি বৈশিষ্ট্য সুমাই ওঝা চরিত্রে চমৎকারভাবে অঙ্কন করা হয়েছে । অতিশয় বাৎসল্য-অনুরাগে উদ্দীপিত হয়ে সুমাই ওঝা বিনাথকে মন্ত্র শিক্ষা দেয়, কিন্তু শিক্ষা পেয়ে বিনাথ তার নিপুণ প্রয়োগে এমনই দক্ষ হয়ে ওঠে যে জনপ্রিয়তায় শিক্ষাদাতাকেও অতিক্রম করে যায় । বিনাথের অধিক লোকপ্রিয়তাই সুমাই ওঝার মনে ঈর্ষার সৃষ্টি করে । সে-ঈর্ষা এমনই সীমাহীন যে সুমাই ওঝা বিনাথের প্রাণহরণে হয় উদ্যত । বিনাথ পালিয়ে প্রথমবারে জীবন রক্ষায় সক্ষম হলেও সুমাই ওঝা কৌশলে, হীন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রথমে তার মন্ত্রমহিমা হরণ করে এবং পরে হত্যা করে । এক্ষেত্রে সাপের প্রতিহিংসাপরায়ণ বৈশিষ্ট্যটি সর্প-ওঝার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয় ।

শিক্ষা নাই সে দিয়া সুমাইর হিংসা হইল মনে ।
শিষ্যি না হইয়া বিনাথ নিজগুরু জিনে ॥
দেশেতে হইল খেতি বিনাথের গুণ ।
এরে দেখ্যা সুমাই ওঝা হিংসিত আগুন ॥
বিনাথে মারিতে ওঝা যুক্তি করে মনে । (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৩৫১)

'সনুমালা' গাথায় সর্পদংশন ও সাপের প্রসঙ্গ এসেছে ভিন্ন প্রেক্ষিতে । বণিকের সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি রূপলালসাবশত রাজপুত্র মনে ষড়যন্ত্র আটে । রাজপুত্র 'সাপের মাথার মণি' লাভের বায়না ধরলে রাজা বণিককে তা সংগ্রহের দায়িত্ব দেন । বণিক তা সংগ্রহে ব্যর্থ হলে রাজা তার সর্পদংশনে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেন :

কালত গরল বিষরে অঙ্গা ছাইল ।
কাল বিষের জ্বালায় সাধু-পুত্র পরাণ ত্যজিল ॥
সোনার বরণ অঙ্গা, বিষে হইল ছালী ।
সাধু সদাগর কাঁদে পুত্র পুত্র বলি ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ২৮৮)

বেদে-দল

'মহুয়া' ও 'আয়না বিবি' গাথায় বেদে দলের পরিচয় বিধৃত হয়েছে । তবে দুই গাথায় বিধৃত দুই বেদে দলের জীবনাচরণ মৌলিকভাবে ভিন্ন । 'মহুয়া' গাথায় হুমরা বেদের দল প্রথমে ডাকাতি-কাজে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োজিত ছিল । পরে বেদে হিসেবে তাদের যে-পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে, তা মূলত সার্কাস-দলের জীবনাচরণের অনুরূপ । অন্যদিকে আমরা বর্তমান বেদে হিসেবে যাদের সঙ্গে পরিচিত তাদের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'আয়না বিবি' গাথায় । এই দলের মেয়ে-বধূরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে চিকিৎসা করছে এবং তারা জলবাসী, নৌকার ওপরেই তাদের সংসারবাস ।

'মহুয়া' গাথায় বেদে-দলের যে-চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে :

তোতা লইল ময়না লইল আরো লইল টিয়া ।
সোনামুখী দইয়ুল লইল পিঞ্জিরায় ভরিয়া ॥
ঘোড়া লইল গাধা লইল কত কইব আর ।
সঙ্গেতে করিয়া লইল রাও চন্ডালের হার ॥
শিকারী কুকুর লইল শিয়াল হেজা ধরে ।
মনের সুখেতে চলে বৈদেশ নগরে ।।। (মৈ.গী.পৃ ৭)

সার্কাস দলের মতো এরা বিভিন্ন স্থানে ডেরা বেঁধে খেলা দেখায়, চিকিৎসা করে না কিংবা নৌকায়ও তাদের বাস নয় ।

'আয়না বিবি' গাথায় যে কুরুন্দিয়া নামক বেদের দল পাওয়া যায়, তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির । এই দলের পুরুষেরা রান্নাসহ গৃহস্থালীতে ব্যাপৃত থাকে, অন্যদিকে মহিলারা নানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়ে অর্থ উপার্জন করে ।

হায় কুরুন্দিয়া এক না জাতি ভালা কহি সভার আগে ।
নায় থাকে নায় বাসা ফিরে বিদেশে ॥
পুরুষেরা রান্ধে বাড়ে সুখে বস্যা খায় ।
ঘরের নারী তারা গাওয়ালে বেড়ায় রে ॥
সজমসল্লা বিকাইয়া তারা ভালা ফিরে দেশ ও বিদেশে ।
বারমাসে তের পাতি জল হাওরে ভাসে ॥
বাণিজ্যি বেসাতী যত আর দেখ মাইয়্যা লোকে করে ।
ঢেকুরা পুরুষের দলা কেবল বায় সে নাও ॥ (পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি.স.পৃ ২০৯)

কুটনী

'মলুয়া' ও 'কমলা' গাথায় দুইজন কুটনী বৃদ্ধার চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে । তুলনামূলকভাবে কমলা গাথায় অঙ্কিত কুটনীর ভূমিকায় বৃদ্ধা গোয়ালিনী চরিত্রটি দক্ষতা, পারদর্শিতা ও অভিজ্ঞতায় অপূর্ব । এই চরিত্র অঙ্কনে লেখকের শৈল্পিক উঁচু মানের পরিচয়ও পাওয়া যায় ।

'মলুয়া' গাথায় নেতাই কুটনীর চরিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে :

বয়সেতে বেশ্যামতি কত পতি ধরে ।
বয়স হারাইয়া অখন বসিয়াছে ঘরে ॥

Dhaka University Institutional Repository

বয়স হারাইয়া তবু স্বভাব না যায় ।
কুমন্ত্রণা দিয়া কত কামিনী মজায় ॥
চুল পাকিয়াছে তার পড়িয়াছে দাত ।
এতেক করিয়া অন্ন জুটায় পেটের ভাত ॥ (মৈ.গী.পৃ ৭২)

বৃদ্ধবয়সেও তাদের যৌবনবয়সের স্বভাব অক্ষত থাকার একটি বড় কারণ যে এরা আর্থিক দিক থেকে দরিদ্র । যৌবনেও হয়ত এই দারিদ্র্যই তাদের এ-ধরনের অন্যায়-কর্মে ব্রতী করেছে ।

কমলা গাথায় চিকন গোয়ালিনীর চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে তার দুধ বিক্রির কাজে দুর্নীতির মাধ্যমে :

গেরামে আছয়ে এক চিকন গোয়ালিনী ।
যৌবনে আছিল যেমন সবরি-কলা-চিনি ॥
বড় রসিক আছিল এই চিকন গোয়ালিনী ।
এক সের দৈয়েতে দিত তিন সের পানি ॥
সদাই আনন্দ মন করে হাসিখুশী ।
দই-দুধ হইতে সে যে কথা বেচে বেশী ॥

যখন আছিল তার নবীন বয়স ।
নাগর ধরিয়া কত করত রঙ্গরস ॥
... ...
চলিতে ঢলিয়া পড়ে রসে থলথল ।
শুখাইয়া গেছে তার যৌবন-কমল ॥
তবু মনে ভাবে যে সে চিকন গোয়ালিনী ।
বৃদ্ধ বয়সে যেমন ভাবের ভামিনী ॥
সংসারেতে আছে যত লুচ্চা লোকন্দরা ।
গোয়ালিনীর বাড়িত গিয়া করে ঘুরাফেরা ॥ (মৈ.গী.পৃ ১২৩-২৪)

শেষ দুই পংক্তিতে গোয়ালিনীর কুটনী চরিত্র আরও জীবন্তভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে । এরপরে চিকন গোয়ালিনীর অলৌকিক শক্তিমত্তা সম্পর্কে আরও অনেক ভয়াবহ তথ্য পরিবেশিত হয়েছে এবং ঐসব তথ্যের মাধ্যমে এই চরিত্রটিকে গ্রামীণ পটভূমিতে বস্তুনিষ্ঠ করে তোলা হয়েছে :

লক্ষে শুনি গোয়ালিনী পান-পড়া জানে ।
ঘরতনে কুলের বধু বাইরে টাইনা আনে ॥
তেলপড়া দেয় যদি চিকন গোয়ালিনী ।
সুয়ামী এড়িয়া যায় ঘরের কামিনী ॥
আর একটা ঔষধ শুনি আছে তার কাছে ।
গিরধনির কানে আর কাল-পনা মাছে ॥
কিছু কিছু পেচার মাংস কাটিয়া কুটিয়া ।
তিল পরিমাণ বড়ী করে রৌদ্রে শুকাইয়া ॥
এক এক বড়ীর দাম পাচ খুরি কড়ি ।

Dhaka University Institutional Repository

এরে খাইলে পাগল হয় পাড়ার যত নারী ॥
বাসী জলে বড়ী খায় উঠিয়া বিয়ানে ।
সতী নারী পতি ছাড়ে ঔষধের গুণে ॥ (মৈ.গী.পৃ ১২৪)

চিকন গোয়ালিনী চরিত্রের এসব অসম্ভব শক্তি সম্পর্কে তার পরবর্তী কার্যকলাপ লক্ষ্য করে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয় ।

কুসীদজীবী

কুসীদজীবী চরিত্রের একটি নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'মইষাল বন্ধু' গাথায় । আষাঢ়িয়া মন্ডল নামে এক কুসীদজীবী মহাজন, যিনি কেবল অর্থই চেনেন । বিড়ালে যাতে ভাত নষ্ট করতে না পারে সেজন্য তিনি বিড়াল বেঁধে রেখে আহার গ্রহণ করেন । অর্থ ব্যয় হবে এই শঙ্কায় তিনি স্ত্রীকে নিরাবরণ রাখেন । শুধু স্ত্রীকেই নয়, নিজেও তিনি নেংটি পরিধান করেন । কেবলমাত্র সুদ এবং সুদের মাধ্যমে অর্থ বৃদ্ধিই তার সার্বক্ষণিক চিন্তা । পুত্রদের নিকট এই মহাজন কঞ্জুস স্বভাবের জন্য ঠাট্টার পাত্রে পরিণত হয়েছেন :

বিলাই বান্ধ্যা ভাত খায় আষাঢ্যা মন্ডল ।
মাউগের পিন্ধনে নাই কাপড় জইয়ে মারে চড়চাপড় ॥
পুতে ডাকে লাউডের পাগল ।
লেংঠী পিন্ধ্যা থাকে শালা পাটি নাই ঘরে ॥
দিন রাইত শুইয়া বইয়া সুদের চিন্তা করে ॥ (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ৪৫)

এমন মহাজনের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে অনেকে নিঃশেষিত হয়েছেন । মহাজনী সুদের কালগ্রাসে দুইজন ধনী কৃষকের নিঃশেষিত হওয়ার কাহিনী বিধৃত হয়েছে 'মইষাল বন্ধু' গাথায় । আষাঢ়িয়া মন্ডল ছাড়াও এই গাথায় অন্য যে মহাজন-ধনিকের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তার নাম বলরাম । আষাঢ়িয়া মন্ডলের মত কেবল সে মহাজনী ব্যবসা করেই জীবিকা নির্বাহ করেনা, বলরাম একজন ধনী কৃষকও ।

শিভাপুরের বলরাম ধনী মহাজন ।
ধনের লাগিয়া তার নাই অনাটন ॥
ধারে সুদে কত লোক টাকা লইয়া যায় ।
সেই সুদে বলরাম সংসার চালায় ॥। (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ৩২)

ডাকাত

'মহুয়া' ও 'মলয়ার বারমাসী' গাথায় ডাকাত কর্তৃক শিশুকন্যা অপহরণের ঘটনা বিধৃত হয়েছে । তাছাড়া 'মলয়ার বারমাসী' ও 'দস্যু কেনারামের পালা'য় ডাকাত কর্তৃক সম্পদ লুন্ঠনের বিবরণ পাওয়া যায় । শেষোক্ত গাথায় দস্যু কর্তৃক মানুষ হত্যার তথ্যও বিবৃত হয়েছে । লোকালয় থেকে দূরে নির্জন অরণ্যমধ্যে ছিল সংসারচ্যুত ডাকাতদের বসবাস । সেখানে তারা অপহৃত কন্যাদের পরম আদরেই লালন-পালন করত । 'মহুয়া' গাথায় হুমরা বেদে ছয়মাসের শিশুকন্যা মহুয়াকে অপহরণ করে :

Dhaka University Institutional Repository

ছয়মাসের শিশু কইন্যা পরমা সুন্দরী ।
রাত্রি নিশাকালে হুমরা তারে করল চুরী ॥ (মৈ.গী.পৃ ৫)

হুমরার বসবাসের এলাকা নির্জন ঘন অরণ্যমধ্যে :

বনেতে করিত বাস হুমরা বইদ্যা নাম ।
তাহার কথা শুন কইরে হিন্দু মুসলমান ॥
ডাকাতি করিত বেটা ডাকাইতের সর্দ্দার । (মৈ.গী.পৃ ৪)

অপহৃত শিশুকন্যাকে হুমরা পরম যত্নে লালন করেছে :

ছয়মাসের শিশুকন্যা বচ্ছরের হৈল ।
পিঞ্জরে রাখিয়া পঞ্জী পালিতে লাগিল ॥
এক দুই তিন করি শুল বছর যায় ।
খেলা কছরত তারে যতনে শিখায় ॥ (মৈ.গী.পৃ ৫)

'মলুয়ার বারমাসী' গাথায় হারুয়া ডাকাত সওদাগর নিতিমাধবের বাড়ি ডাকাতি করার সময় সম্পদ লুন্ঠনের সাথে তার নয় বছরের শিশুকন্যাকেও অপহরণ করে :

এরে দেখ্যা পাগল হারুয়া কোন্ কাম করিল ।
ঘুমনু কন্যারে তবে বুকে তুল্যা লইল ॥
মায়ের কান্দনে কন্যা চক্ষু মেল্যা চায় ।
মায়ের বুকের ধন চুরে লইয়া যায় ॥ (পু.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৪০৯)

হারুয়া ডাকাতের বসবাসের এলাকাও লোকালয়ের বাইরে, জনহীন অরণ্যমধ্যে :

পাইলা বনের মাঝেরে দারাক সারি সারি ।
সেই বনে বসতি করে হারুয়া নাইক ঘর বাড়ী ॥
কুটিয়া বানাইয়া হারুয়া মাটির না তলে ।
সেইখানে আছে হারুয়া লইয়া দলে বলে ॥ (পু.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৪০৯)

হারুয়া ডাকাতও মলুয়াকে পরম আদরে লালন করে:

যে দেশের যত দ্রব্য দেখ চুরি কইরা পায় ।
ভাল ভাল বনের ফল কন্যারে বিলায় ॥ (পু.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৪০৯)

ডাকাতের উপদ্রবের যে-কাহিনী 'দস্যু কেনারামের পালা'য় বিবৃত হয়েছে, তা থেকে অনুমান করা যায় যে তৎকালীন সমাজে সম্পদশালী লোকদের জীবনই শুধু নয়,সাধারণ মানুষের জীবনও নিরুপদ্রব ছিল না । লোকালয়ের বাইরে বিস্তৃত ভূভাগ জঙ্গলাকীর্ণ ও দুর্গম থাকায় অনায়াসেই তা ডাকাতদের স্থায়ী নিরাপত্তার আবাসভূমি হয়ে উঠেছিল । ডাকাতদের বিরুদ্ধে কোনো প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগও গাথায় পরিলক্ষিত হয় না । ফলে ডাকাতদের দ্বারা সম্পদ অপহরণ, শিশু অপহরণ, নরহত্যা অদৃস্টলিপির অনিবার্য উপাদানের মতো সাধারণ নাগরিকদের জীবনাচারের অঙ্গীভূত হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয় :

হালুয়ার সাত পুত্র গো ডাকাইতের সর্দ্দার ।
ডাকাতি করিয়া কৈল দৌলত বিস্তর ॥
গারুয়া পাহাড় হৈতে দক্ষিণ সাগর ।
ঘরবাড়ী নাহি কেবল নল খাগড়ার গড় ॥

Dhaka University Institutional Repository

বনেতে লুকাইয়া যত ডাকাতিয়াগণ ।
পথিক ধরিয়া মারে ধনের কারণ ॥
টাকা পয়সা রাখে লোকে মাটিতে পুতিয়া ।
ডাকাতে কাড়িয়া লয় গামছা মড়া দিয়া ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৯৬)

জল্লাদ

'দেওয়ানা মদিনা' গাথায় এক জল্লাদ চরিত্র পরিলক্ষিত হয় । ভয়াবহ, নৃশংস, নির্দয় রূপই জল্লাদ চরিত্রটিকে বস্তুনিষ্ঠ করে তুলেছে । দেওয়ান-বধূর সতীন-পুত্র হত্যার ষড়যন্ত্রে সহযোগী হিসেবে জল্লাদ তার মানবীয় সহানুভূতিহীন নিষ্ঠুরতম চারিত্রিক রূপের প্রকাশ ঘটিয়েছে । সম্পদের বিনিময়ে যে-কোনো প্রকার অনাচার সংঘটনে তার চিত্ত যে-দ্বিধাহীন, শোষকশক্তির মতোই সে তা উচ্চারণ করে :

বিশ পুড়া জমি দিলে আনবাইন মনে মনে ।
না পারি মুই এমন কাম নাই তিরভুবনে ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩৬৬)

মৃত্যুদন্ড বাস্তবে কার্যকর করার সময় জল্লাদ চরিত্রটির নির্মম রূপ আরও চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হয়েছে :

পরেত জল্লাদ কয় কুমার দুইয়ের আগে ।
"ইয়াদ কর আল্লার নাম মরণকালের আগে ॥
তোমরার যম আমি দুয়ারেতে খাড়া ।
আমার হাতেতে দুইজন যাইবা যে মারা ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩৬৭)

বারবনিতা

'রতন ঠাকুরের পালা'য় আমরা এক বারবনিতাকে প্রত্যক্ষ করি । এর ফলে তৎকালীন সমাজে বারবনিতার অস্তিত্ব বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় । পুত্রকে অন্য নারীর আসক্তি থেকে মুক্ত করার জন্য রতন ঠাকুরের পিতা রাজা হয়েও রঙিলা নামে এক বারবনিতাকে নিয়োগ করে । সমাজে বারবনিতারা যে অস্পৃশ্যা ছিল না এবং তাদের বশীকরণ ক্ষমতা যে সমাজে কিংবদন্তীরূপে প্রচারিত ছিল, তা রঙিলার নিয়োগ এবং তার লক্ষ্যসাধনের সফলতায়ই প্রমাণ হয় ।

শুন শুন রঙিলা বেশ্যা বলি যে তোমারে ।
আমার পুত্র পাগল হইয়া গিয়াছে বৈদেশে ॥
অর্দ্ধেক রাজত্বি দিবাম আর সে দিবাম তার ।
সোনাতে বান্ধিয়া দিবাম তোমার গলার হার ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৩৩৩)

বারবনিতার বশীকরণ-শক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

দুরণে সুহৃদ্ করে পান পড়া দিয়া ।
সতী নারীর পতি সে যে নেয়ত ভুলাইয়া ॥
এক ফোটা জল পইরা গায়ে ছিটা দিলে ।
পাগলিনী হইয়া সতী আপন পতি ভুলে ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ.৩৩৩)

Dhaka University Institutional Repository

চন্ডাল ও ডোম

চন্ডাল ও ডোম চরিত্রের চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে ময়মনসিংহের গীতিকায় । 'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় ব্রাহ্মণ-পুত্র কঙ্ক পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় প্রথমে এক নিঃসন্তান চন্ডাল গৃহে লালিত-পালিত হয় ।

মুরারি নামেতে এক চন্ডাল সুজন ।
শিশুরে দেখিয়া তার দুঃখী হৈল মন ॥
কোলেতে লইয়া শিশু নিজ ঘরে আনে ।
চন্ডালিনী পালে তারে পরম যতনে ॥ (মৈ.গী.পৃ ২৬৭)

'শ্যাম রায়ের পালা'য় এক ডোম পরিবারের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে । ডোম-বধূর প্রতি ব্রাহ্মণ জমিদার-পুত্র শ্যাম রায় অনুরক্ত হয় । ডোম-বধূ অনেক চেষ্টা করেও তাকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয় না । একদিন ডোম বাঁশ কাটার জন্য অন্যত্র গেলে রাত্রে ডোম-বধূ শ্যাম রায়ের সঙ্গে অভিসারে মিলিত হয় । ডোম-বধূর পক্ষেই এমন আচরণ সম্ভব হয়েছে :

কাইলসে যাইব আমার ডোম বাঁশ কাটিবারে ॥
আজিকার রাত্তিরে বন্ধু চিন্তে ক্ষেমা দিও ।
কালুকা নিশিতে বন্ধু আমার বাড়ী যাইও ॥
ভাঙা ঘরে যৈবন লইয়া থাকিমু একেলা ।
শাশুরীর আপরকে রাখমু পাছের দোয়ার খোলা ॥ (পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি.স.পৃ ২৮১)

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণে গীতিকাসমূহে বিধৃত সমাজের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয় । কয়েকটি গাথায় ব্রাহ্মণ সমাজভুক্ত লোকসাধারণের অস্তিত্ব পাওয়া গেলেও কেবলমাত্র দুটি গাথায় ব্রাহ্মণদের কঠোর অনুশাসনধর্ম, জনজীবনবিচ্ছিন্ন শাস্ত্রনির্ভর সংকীর্ণতার পরিচয় বিধৃত হয়েছে । সমাজে ক্ষত্রিয় শ্রেণীর লোকের অস্তিত্বের কোনো উল্লেখ নেই । সমাজে শাসক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নবাব-দেওয়ান-কাজী-রাজা-বা-জমিদারের সঙ্গে সাধারণ প্রজা বা কৃষকের দ্বন্দ্বের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হলেও বনিকের সঙ্গে দ্বন্দ্বের মাত্রা কম । অধিকাংশ গাথায় বণিক শ্রেণীর লোকদের সরব অস্তিত্ব বিধৃত হলেও কৃষক সমাজের ক্রমক্ষয়িষ্ণু চিত্র অঙ্কিত হয়েছে মাত্র চারটি গাথায় । একটিমাত্র গাথায় মহাজনী ঋণের জালে সর্বস্বহারা কৃষককুলের চিত্র বিধৃত হয়েছে । সমাজে বেদে, সন্ন্যাসী, ঘটক, গণক, দস্যু, জেলে, পীর, জল্লাদ, ধোপা, সর্প-ওঝা, ডোম, মালাকর, গণিকা প্রভৃতি নানা বৃত্তিজীবী মানুষের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকলেও কারিগর, কারুশিল্পী, তন্তুবায়, কর্মকার প্রভৃতি বৃত্তিধারী জনগণের চিত্র কোনো গাথায় অঙ্কিত হয়নি । একটিমাত্র গাথায় নৌকা মেরামতের জন্য মিস্ত্রি নিয়োগের তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে । সমাজে বণিকের ক্রমবর্ধিষ্ণু অবাধ উপস্থিতির পাশাপাশি শাসক সামন্তশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের অন্যায় পীড়ন ও রিরংসাবৃত্তির প্রবলতাও লক্ষণীয় । রাজা বা জমিদারগণ সকলে হিন্দু ধর্মের অনুসারী, অন্যদিকে নবাব-দেওয়ান- কাজী সকলেই ইসলাম ধর্মভুক্ত ।

গীতিকাসমূহ ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে প্রাপ্ত এসকল সামাজিক তথ্য থেকে সুস্পষ্ট যে গীতিকাসমূহ স্বল্পসময়ের ব্যবধানে নয়, বরং সুদীর্ঘকালের ব্যাপ্তিতে রচিত হয়েছে । এর অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই মুসলমান

Dhaka University Institutional Repository

শাসনযুগকে (খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ থেকে অস্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ) স্মরণ করিয়ে দেয় । সমাজে বঙ্গালী কৌলিন্যপ্রথা অনুযায়ী জাত-পাত বৈষম্য তেমনভাবে পরিদৃস্ট না হওয়ায় সুস্পস্ট যে গীতিকা-সমূহ উদ্ভবের অনুকুলটি পূর্ণতরভাবে নব্য ব্রাহ্মণ্য শাসন (খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতক) থেকে মুক্ত ছিল । ব্রাহ্মণদের উপস্হিতি সমাজে বিচ্ছিন্নভাবে পরিলক্ষিত হলেও তা ব্রাহ্মণ্য শাসনের ইঙ্গিত বহন করে না । কৃষক সমাজের সুল্প উপস্হিতি ও বণিক সমাজের অবাধ বিকাশমুখিতা পাল-যুগ-পূর্ব-সময়কেই (খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকের পূর্ব যুগ) নির্দেশ করে । মুসলমান নবাব-দেওয়ান-কাজীর বিরংসাবৃত্তি মুসলিম শাসনযুগেরই সুস্পস্ট ইঙ্গিতবাহী । মহাজনের উপস্হিতি মোগল আমলকেই স্মরণ করিয়ে দেয় । সর্বোপরি গীতিকাসমূহে বিধৃত সমাজ শাসকের পীড়ন, বণিকের লুন্ঠন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহাজনী ঋণে নিঃস্ব কৃষক এবং চির লাঞ্ছিত-অবহেলিত সাধারণ প্রজার চিত্র উপস্হাপিত করলেও তা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার নিস্তরঙ্গ,স্পন্দনহীন, বৈচিত্র্যবর্জিত, বিদ্রোহমুক্ত জীবনবৈশিস্ট্যকেই মূলত যথার্থভাবে প্রকাশ করে ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জীবনোপকরণ ও জীবনাচরণ

কোনো ব্যক্তি বা সমষ্টির জীবনোপকরণ ও জীবনাচরণের নানা উপাদান তাঁর বা তাঁদের শ্রেণী ও সামাজিক অবস্থানগত, অভিরুচিগত ও মানসগত বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিফলন ঘটায়। কোনো শ্রেণী-প্রতিনিধির প্রাত্যহিক জীবনাচার, অভ্যাস, দৈন্য ও বৈভব, অন্যের আনন্দ ও যন্ত্রণার প্রতি অভিব্যক্ত প্রতিক্রিয়া ও সহানুভূতির অভিপ্রকাশ প্রভৃতি ঐ সামাজিক শ্রেণীর সামগ্রিক পরিচয়কেই মূর্ত করে তোলে। কোনো একক মানুষ বা বিশেষ সামাজিক-প্রতিনিধির জীবনবৈশিষ্ট্য যেমন তাঁদের অভিরুচি ও জীবনাচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে বা এ-সবকিছুর মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়, তেমনি এসব বৈচিত্রের অভ্যন্তরেই সুপ্ত থাকে ব্যক্তি বা সমাজের প্রকৃত মানসভঙ্গি। ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে বিধৃত নানা শ্রেণী ও বৃত্তিজীবী লোকসকলের দৈনন্দিন জীবনের আচার-আচরণ-অভ্যাস, তাদের সমৃদ্ধি ও দারিদ্র্যের আনন্দ-যন্ত্রণা, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক সংস্কার প্রভৃতি কোন সমাজবৈশিষ্ট্যকে মূর্ত করে, নির্দিষ্ট কোনো কাল ও সমাজবাস্তবতার পটভূমিতে তা কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ — সেটাই আমাদের এ-পর্যায়ের বিবেচ্য বিষয়।

শাসক-শক্তি

সমাজের অন্যান্য অংশ কিংবা স্তরের তুলনায় শাসক-শক্তির সম্পদ, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য সর্বাধিক। কেননা প্রতিপত্তি ও সম্পত্তির হরিহর-সম্পর্ক বৈষম্যমূলক সমাজপদ্ধতিরই আনুবৈশিষ্ট্য। সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি — এই শব্দ দুটি প্রায়োগিক ক্ষেত্রে পরস্পরের পরিপূরক। এমনই অঙ্গাঙ্গি-সম্পর্ক উভয়ের যে একটির সমৃদ্ধি ঘটলে অপরটিরও আগমন ঘটে অনিবার্যভাবে। ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে শাসক-শক্তি জমিদার-রাজা-কাজী-দেওয়ান প্রমুখর প্রতিপত্তির পাশাপাশি সম্পত্তির সমৃদ্ধিও লক্ষণীয়।

'মলুয়া' গাথায় কাজী মলুয়াকে করায়ত্ত করার জন্য যে সম্পদমোহের প্রস্তাব দেয়, তাতেই তার ঐশ্বর্যময় জীবনের পরিচয় সুস্পষ্ট। কাজী মলুয়ার সমগ্র শরীর সোনা দ্বারা আচ্ছাদিত করার প্রস্তাব দিয়ে বলছেন, তার জন্য সোনার পালঙ্ক নির্মাণ করা হবে, অতি মূল্যবান মোহর দ্বারা তার গলার মালা তৈরি করা হবে, কাঁখের কলস স্বর্ণাচ্ছাদিত করা হবে এবং নাকে ব্যবহৃত অলঙ্কার হবে হীরক-নির্মিত।

সোনার পালঙ্ক দিবাম সাজুয়া বিছান।
গলায় গাথিয়া দিবাম মোহরের থান ॥
দিবাম কাঁকের কলসী সোনাতে বান্ধিয়া।
নাকের বেসর দিবাম তায় হীরায় গড়িয়া ॥ (মৈ. গী. পৃ ৭৪)

কাজীর তুলনায় দেওয়ানের ঐশ্বর্য অধিকতর। তিনি মলুয়ার প্রণয়যাচঞা করে বলছেন যে পৃথিবীর যত সুখ মলুয়াকে তা তিনি দেবেন, দিল্লি থেকে মলুয়ার জন্য অগ্নিপাটের শাড়ি এনে দেবেন। দিল্লির বাদশাহ্-র সঙ্গে দেওয়ানদের সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ যে তিনি তার প্রতিশ্রুতি হয়ত রক্ষা করতে সক্ষম। তবে এরূপ প্রতিশ্রুতিদানের মধ্যে দেওয়ানের বিলাসময় জীবনেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

অসংখ্য দাস-দাসী মলুয়ার সেবায় নিয়োজিত থাকবে, তার নাকে ব্যবহৃত অলঙ্কার গঠন করা হবে কাঁচা সোনা দ্বারা — এটি শাসক-শক্তির জন্য সাধারণ প্রতিদান । কিন্তু,

পিত্থিমীর সুখ আইন্যা দিবাম তোমারে ॥
দিল্লি হইতে আইন্যা দিবাম অগ্নিপাটের সাড়ি । (মৈ.গী.পৃ ৮৮)

— এই প্রতিশ্রুতির মধ্যে লুকিয়ে আছে দেওয়ানী জীবনের ঐশ্বর্যের গন্ধ । দেওয়ান চরিত্রের বিলাসী ও আভিজাত্যময় জীবনাচরণের পরিচয় নিম্নোক্ত পংক্তি দুটিতে আরও পরিস্ফুট হবে :

মুখেতে সুগন্ধী পান অতি ধীরে ধীরে ।
সুনালী রুমাল হাতে দেওয়ান পশিল অন্দরে ॥ (মৈ.গী.পৃ ৮৯)

শাসক-শক্তির ঐশ্বর্যময় জীবনের চিত্র তাদের বসতগৃহের প্রয়োজনাতিরিক্ত সমৃদ্ধির মধ্যেই লক্ষ্য করা যাবে । রাজা-দেওয়ান-জমিদার-তালুকদারদের জীবনাচরণ ও জীবনোপকরণের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতি-পত্তিশালী সমৃদ্ধ শ্রেণী-অবস্থানেরই স্বাক্ষরবাহী । সুন্দর সুন্দর বারবাংলা ঘর, ঘাটে-বাঁধা পানসী নৌকা, গ্রীষ্মকালে জলাশয়ের মাঝে নির্মিত জলটুঙ্গি-ঘর, চারিদিকে খোলা বারান্দাযুক্ত দ্বিতল প্রমোদগৃহ, পুষ্প-উদ্যান, সান-বাঁধা চৌকোনা পুকুর, শীতল পাটির বিছানা, আবের পাখা প্রভৃতি সমৃদ্ধির চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে ময়মনসিংহের গীতিকা সমূহে ।

'কমলা' গাথায় আমরা জমিদারের অধীনস্থ একজন তালুকদারের বসতবাটী ও সম্পদের যে-চিত্র প্রত্যক্ষ করি, তাতেই তাদের বিলাসিত জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় । তালুকদারের বাড়িতে চৌচালা-আটচালা মিলিয়ে মোট কুড়িটি গৃহ, তাতে উলুছনের ছাউনি, সুন্দরবনের সুন্দি বেতের বাঁধন সেই গৃহে, পাঁচ মহালে বিভক্ত তার সমগ্র বাড়িতে রয়েছে : কাছারিবাড়ি, পুজাবাড়ি, অন্দরমহল, রান্নাবাড়ি ও গোহালবাড়ি, অসংখ্য দাস-দাসী, আবাদী জমির পরিমাণ চল্লিশ 'কুড়া', বাড়িতে আছে দশটি হাতি ও ত্রিশটি ঘোড়া, সমগ্র মাঠ জুড়ে বিচরণ করে দুগ্ধবতী গাভী, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া — এদের সংখ্যা গননযোগ্য নয়, বাড়িতে রয়েছে : ধানের বিশাল বিশাল স্তুপ, গোলা-ভর্তি সরিষা, হাজার হাজার লোক তার বাড়িতে আসছে-যাচ্ছে-খাচ্ছে, অতিথি-সেবায় কোনো ত্রুটি হচ্ছে না, ফকির-বোষ্টমদের প্রচুর পরিমাণে চাউল দিয়ে বিদায় করা হয়, খাদ্য প্রস্তুত থাকলে ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাউকে যেতে দেওয়া হয় না, সাধারণভাবে নতুন বস্ত্রও দক্ষিণা দেওয়া হয়, ব্রাহ্মণ-অতিথি এলে তার জন্য দান-দক্ষিণা আরও উন্নত ধরনের, বার মাসের তের পার্বনে পূজা লেগেই আছে তার বাড়িতে ।

চৌচালা আটচালা তার ঘর যত খানি ।
সুন্দি বেতে বান্ধা আর উলুছনে ছানি ॥
পাচ খন্ড বাড়ী তার বিশ গোটা ঘর ।
হাজারে বিজারে খাটে দাঞার গাবর ॥ (মৈ.গী.পৃ ১২২)

'দেওয়ান ভাবনা' গাথায় দেওয়ানের বাড়িতে বার-বাংলার ঘর পরিদৃষ্ট হয় । যেমন : 'বইয়া আছে দেওয়ান ভাবনা বারবাংলার ঘরে ।' তাছাড়া এই গাথায় জমিদার-পুত্র মাধব তাদের

Dhaka University Institutional Repository

সমৃদ্ধির যে বিবরণ দেয় তাতেও জমিদার-গৃহের ঐশ্বর্য পরিস্ফুট হয় । মাধবের পিতার রয়েছে লাখ টাকা আয়ের জমিদারী, বাড়ির সম্মুখভাগে ফুলের বাগান, তাতে লাল-নীল নানা প্রকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, বাড়ির পশ্চাদ্ভাগে রয়েছে সানে-বান্ধা ঘাট বিশিষ্ট পুকুর, সেই পুকুরের মধ্যে গ্রীষ্মকালীন আমোদ-প্রমোদ-বিশ্রামের জন্য রয়েছে 'জলটুঙ্গীর ঘর', বাড়ির সামনে আছে সুদৃশ্য বৈঠকখানা ঘর অর্থাৎ 'কামটঙ্গীর বাসা', যেখানে বসে নায়ক মাধব তার প্রণয়িনীর সঙ্গে পাশা খেলার স্বপ্ন দেখছে । উচ্চবিত্ত পরিবারে পারিবারিক জীবনে পাশা খেলার যে প্রচলন ছিল এ-থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায় । জমিদার-পুত্র মাধবও তার প্রণয়িনীকে অগ্নিপাটের শাড়ি, গলায় হীরামতির হার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ।

বাপের আছে ধন-দৌলত কন্যাগো লাখের জমিদারী ।
তোমারে দিয়াম কন্যাগো অগ্নিপাটের শাড়ী ।।
বাড়ীর আগে ফুল-বাগিচা লাল আর নীলা ।
...   .
বাড়ীর পাছে বান্ধা ঘাট আছে পুষ্করিনী ।।
...   .
বাড়ীর মধ্যে আছে কন্যা জলটুঙ্গীর ঘর ।
...   .
বাড়ীর মধ্যে আছে কন্যা কামটঙ্গীর বাসা ।
রাইতের নিশি তথায় বসি খেলাইবাম পাশা ।। (মৈ.গী.পৃ ১৭৯-৮০)

'রূপবতী' পালায় রামপুর-রাজ রামচন্দ্রের ফুলেশ্বরী নদীর তীরে বারবাংলার ঘর, লক্ষ টাকার জমিদারীর বিবরণ পাওয়া যায় । বাড়িতে রয়েছে প্রচুর হাতি, ঘোড়া ও পাইক বরকন্দাজ । রাজা নবাবকে খাজনা দিতে যাচ্ছেন এবং সঙ্গে নিচ্ছেন খাজনা-অতিরিক্ত নানা প্রকার মূল্যবান উৎকোচ-সামগ্রী । এসব সামগ্রীর দুর্লভতা রাজার ঐশ্বর্যময় জীবনের প্রমাণ দেয় । উৎকোচ-সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে,অভ্র নামক মূল্যবান ধাতু দ্বারা নির্মিত চিরুনী, পাখা ও ডালা, দুর্লভ হস্তীদন্ত নির্মিত মাল্য প্রভৃতি । খাজনার পরিমাণ : দশ হাজার টাকা । তিনি যাচ্ছেন ষোল দাঁড়বিশিষ্ট পানসীতে চড়ে ।

আবের পাখা লইল রাজা আবের চিরুণি ।
আবেতে রঙ্গিয়া লইল খাড়ি আর বিউনি ।।
হাতীর দাঁতের পাটি লইল গজমতি মালা ।
...   .
খাজনা উগাইয়া তঙ্কা লইল দশ হাজার ।। (মৈ.গী.পৃ ২৪০)

শাসক-শক্তির বৈভবের চিত্র 'কাজলরেখা'য়ও অঙ্কিত হয়েছে । সূচ রাজার বন্ধু কাজলরেখার প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে লাভ করার জন্য যে সুখসম্পদের বিবরণ দিচ্ছে,তাতেই সমৃদ্ধির পরিচয় স্পষ্ট । কাঞ্চনপুরের রাজা সোনাধরের পিতা কোটিপতি, বাড়িতে তার অসংখ্য হাতি-ঘোড়া রয়েছে, গোচারণ-ভূমিতে চড়ে বেড়ায় নয় লক্ষ গাভী, সীমাহীন ধনদৌলতের অধিকারী এই রাজার পিতা স্বর্ণ দ্বারা পান্‌সী নির্মাণ করেছেন, বাড়িতে তাদেরও রয়েছে জলটুঙ্গী ঘর, খাট-পালঙ্ক ও চাঁদোয়া মশারী ।

হাতী ঘোড়া আছে যত লেখাজুখা নাই ।
বাথানেতে চড়ে তার নব লক্ষ গাই ।।

Dhaka University Institutional Repository

ধনদৌলতের তার নাহি কোন সীমা ।
ডিঙা বানাইছে বাপে দিয়া যত সোনা ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩৩৮)

'কমলারাণীর গান' শীর্ষক গাথায় আমরা লক্ষ্য করি রাজা রাণীর জন্য পুকুর পার্শ্বে একটি সুন্দর গৃহ নির্মাণ করছেন, যেখানে পিঁপড়ারও প্রবেশাধিকার নেই । গজারি কাঠ দ্বারা নির্মিত এই গৃহে রয়েছে উলুছনের ছাউনি, শীতল পাটির বেড়া ও শয্যা, হাতির দাতের পালঙ্ক, অভ্রের পাখা ও ঘৃতবাতি ।

গজারির পালা দিলেগো নাই সে উলুয়া ছনে ছানি ।
... ...
শীতল পাটির বেড়া দিয়া বান্ধিল বিছানী ॥
মক্ষি না যাইতে পারে ঘরের ভিতরে ।
পিপড়া সান্ধাইল কিছু প্রবেশত না পারে ॥ (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ২২৫)

'ফিরোজ খান দেওয়ান' গাথায় দেওয়ান ফিরোজ খান কর্তৃক জঙ্গল কেটে পুরী নির্মাণের বিবরণ পাওয়া যায় । চল্লিশ পুরা জমির জঙ্গল পরিস্কার করে দেওয়ান পুরী নির্মাণ করেছেন । বড় বড় দীঘি খনন করে সানে তার ঘাট বাঁধিয়েছেন, বার-বাংলার ঘর নির্মাণ করে সোনার কপাট লাগিয়েছেন, কপাটে সংযুক্ত করেছেন আয়না, বাড়িতে রয়েছে সারি সারি ফুলের বাগান, বাড়ির সামনে উড়িয়েছেন স্বর্ণপতাকা । এমনভাবে সমগ্র পুরী সাজিয়েছেন যে পরীস্থান বলে ভ্রম হয় ।

বার বাংলার ঘরে লাগায় সোনার কপাট ॥
ছোট বড় খেড়কী তার করে ঝিলিমিলি ।
আয়না লাগাইয়া করে সুন্দর খরলী ॥
ফুলের বাগান তথায় করে সারি সারি ।
পরীর মুলুক জিনি হইল জঙ্গলবাড়ীরে ॥
ফটিকের থাসা দিয়া করে যত ঘর ।
সোনা দিয়া বেড়িয়াছে জঙ্গলবাড়ীর সর ॥ (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ৪৩৭)

অপরিমেয় সম্পত্তি, সুন্দর সুন্দর গৃহ নির্মাণ, গৃহ সজ্জা, পুরী নির্মাণ, পুরী-সজ্জা প্রভৃতির মধ্যেই শাসক-শক্তির ঐশ্বর্য-চিত্র সীমাবদ্ধ নয়, তাদের আয়োজিত অনুষ্ঠানাদির আড়ম্বরতাযুক্ত বিলাসী জীবনের আভাস স্পষ্ট । 'কমলা' গাথায় আমরা একটি বিবাহ-অনুষ্ঠানে এর পরিচয় পাই । ময়মনসিংহের গীতিকায় অন্য একটি বিবাহ-অনুষ্ঠানের বিবরণ আছে 'মলুয়া' গাথায় । উচ্চবিত্ত কৃষক-গৃহের বিবাহ অনুষ্ঠানের সঙ্গে তুলনায় জমিদার-গৃহের এই বিবাহ-অনুষ্ঠানের আড়ম্বরতা বহুগুণ বেশি । জমিদার পুত্র-বিবাহের নিমন্ত্রণ জানিয়ে দেশ-বিদেশের আত্মীয়-পরিজনের নিকট সোনার কালিতে পত্র লিখেছেন । বিবাহ-উপলক্ষে বাড়িতে লোকে লোকারণ্য, ঢাক-ঢোল-সানাই বাজছে, নাচ-গানের আয়োজন চলছে, মাটির বৃহদাকারের পাত্র ভরে ময়রা মিস্টি তৈরি করছে, গোয়ালা দধি পেতেছে হাজার হাজার পাত্রে, দেশী-বিদেশী আত্মীয়-স্বজন-গুরু-পুরোহিত-পন্ডিত ব্যক্তির আগমনে জমজমাট পুরীখানি এত উজ্জ্বল করে

Dhaka University Institutional Repository

সজ্জিত করা হয়েছে যে চাঁদের আলোও এই দীপ্তির কাছে ম্লান হয়ে গেছে। বরকন্যার ক্ষৌরকর্মের জন্য নাপিত সংগ্রহ করা হয়েছে নবদ্বীপ থেকে,আর সেই নাপিত সোনার নরুন-ক্ষুর দ্বারা ক্ষৌরকর্ম সাধন করছে।

সোনার কলিতে পত্র সকলি লিখিল। (মৈ.গী. পৃ ১৬৬)

কিংবা, বাড়ী ভরিয়া গাছে লোক আথারে পাথারে ॥
চারি ভরিয়া ময়রা মিঠাই বানায়।
হাজারে বিজারে গোয়াল দই জমায় ॥ (পৃ ১৬৬)

কিংবা, নবদ্বীপ তনে নাপিত আইল কামাইতে।
সেই নাপিত কামায় সোনার নরুন-ক্ষুরেতে ॥ (পৃ ১৬৭)

বরকন্যার বিবাহসজ্জার মধ্যে ঐশ্বর্য-চিত্র বর্তমান। বরের মাথায় রত্নের মুকুট, গলায় ফুলের মালা, তাতে চন্দনের সুগন্ধি, শরীরে নানা ধরনের কাপড়ের সজ্জা। কন্যার সাজসজ্জা আরও আড়ম্বরপূর্ণ। চমৎকার করে খোপা বাঁধার পরে কমলাকে পরানো হলো 'আসমান-তারা' শাড়ী, কানে দুল, ঝুমকা, নাকে সোনার বেসর, বলাকা, গলায় হীরার মাল্য, পায়ে নুপুর,মল, হাতে সোনার বাজু, মাথয়ে স্বর্ণদানা।

কানেতে পড়াইল দুল চম্পক ঝুমুকা।
নাকেতে সোনার বেসর আর বলাকা ॥
গলাতে পড়াইল এক হীরার হাসুলি।
পায়েতে পড়াইল খারু গুজরী আর পাচুলী ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৬৮)

জমিদার-গৃহের বিয়ে,— তার আওয়াজও সেই আয়তনের। ঢাক-ঢোলতো বাজছেই, বন্দুকেরও আওয়াজ হচ্ছে— যাতে পৃথিবী কাঁপছে :

ঢাক-ঢোল বাজে কত গীতবাদ্যধ্বনি।
বন্দুকের আওয়াজ যেমন কাপয়ে ধরনী ॥
তুরমী ছাড়িল যেমন আগুনের গাছ খাড়া।
হাউই গানাস ছুটে আসমানের তারা ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৬৯)

বিবাহ-আয়োজনের এই আড়ম্বরতার ন্যায় রাজা-দেওয়ান-জমিদারগণের সৌখিন শিকারপ্রিয়তার মধ্যেও ঐশ্বর্যময় জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়।'মলুয়া', 'কমলা', 'দেওয়ানা মদিনা', 'মলয়ার বারমাসী' ও 'জীরালনী' গাথায় আমরা শিকারের চিত্র প্রত্যক্ষ করি। 'মলুয়া' গাথায় দেওয়ান মলুয়ার অনুরোধে ঘোড়া শিকারে প্রবৃত্ত হন। দেওয়ানের স্বেচ্ছায় শিকার গমনের চিত্র এখানে নেই। 'কমলা' গাথায় জমিদার-পুত্র প্রদীপকুমারের শিকার গমন উল্লেখযোগ্য। প্রদীপকুমার বনে ঘোড়া শিকারে গিয়ে মইষালের গৃহে কমলার সন্ধান পায়। সোনার পানসীতে চড়ে জমিদার পুত্র শিকারে গিয়েছিল।

চলিল সোনার পানসী ভরা নদী দিয়া।
সিলুয়ারী বাতাসে দেখ পাল উড়াইয়া ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৬১)

'দেওয়ানা মদিনা' গাথায় ধনুক নদীর তীরবর্তী ভূমির দেওয়ান সেকেন্দারের শিকারপ্রিয়তার বিবরণ বিবৃত হয়েছে। শিকারপ্রিয় এই দেওয়ান শিকার উদ্দেশে বনে বনে ভ্রমণের সময় আলালকে

Dhaka University Institutional Repository

কুড়িয়ে পেয়েছিল ।

সেকেন্দার দেওয়ানের বড় শিগারে আউশ ।
পংখী শিগার করবার যায় লইয়া বেউশ্ ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩৭০)

'মলয়ার বারমাসী ' গাথায় ভুমা রাজার পুত্র বন্ধু শিকার-উদ্দেশ্যে ঘন অরণ্যে প্রবেশ করেছিল । হিংস্র প্রাণীর বসবাস ছিল সেই অরণ্যে, সেজন্য শিকারে পাঠাতে তার পিতা-মাতার সম্মতি ছিল না । রাজপুত্র এই অসম্মতি উপেক্ষা করেই শিকারে গমন করেছিল । রাজপুত্রের সঙ্গে ছিল বহু লোকলস্কর । সারা বন ঘুরেও রাজকুমার কোনো শিকার পায়নি, পেয়েছিল মলয়াকে ।

তবেত রাজার পুত্র মানা না শুনিল ।
লোক লস্কর লইয়া কুমার শিকারে মেলা দিল ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৪১০)

কিংবা, বনেত আইলাম কন্যা করিতে শিকার ।
শিকার না পাই কন্যা ঘুরিয়া বিস্তর ॥ (পৃ ৪১৩)

'জীরালনী' গাথায় রাজা চক্রধরের হরিণ শিকারে গমনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে । কিন্তু বিশাল জঙ্গলে রাজা লোকলস্করসহ শিকার উদ্দেশ্যে অনেক ছোটাছুটি করে কোনো শিকার পাননি । শেষেষে স্বর্ণ বর্ণের একটি হরিণ তিনি জীবিত অবস্থায় ধরে রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন । প্রায় প্রতিটি শিকার-বর্ণনায়ই শিকারের পরিবর্তে হারানো মানুষ উদ্ধারের কাহিনী পাওয়া যায় । 'জীরালনী' গাথায় যে-হরিণটিকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করা হয়, সেটিও প্রকৃতপক্ষে পশু নয়, পশুর রূপে মানুষ । গাথাসমূহে শিকারের বিষয়টি এসেছে গল্প-গ্রন্থনের জটিলতা-বৃদ্ধি কিংবা জটিলতা-মুক্তির অভিপ্রায়ে ।

রাজা-জমিদারগণের যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হওয়ার কাহিনী একাধিক গাথায় বিবৃত হয়েছে । যুদ্ধে তীর, ধনুক, বল্লম, বর্শা, রামদা প্রভৃতি অনাধুনিক অস্ত্র ব্যবহারের তথ্য পাওয়া যায় । নিয়মিত সেনাবাহিনীর বাইরে সাধারণ প্রজাগণের যুদ্ধ-যাত্রার চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে কোনো কোনো গাথায় । এ বিষয়ে শাসক-শক্তির যুদ্ধ-পরায়ণ বৈশিষ্ট্য আলোচনাসূত্রে বিস্তৃত বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে ।

যাতায়াত ব্যবস্থার পশ্চাদপদতা তৎকালীন সমাজের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য । জলপথে গমনাগমনের জন্য নৌকা এবং স্থলপথে পালকী কিংবা ঘোড়া ও হাতি ব্যবহার যখন শাসক-শক্তির যাতায়াত-উপকরণ হিসেবে পরিলক্ষিত হয়, তখন সাধারণ প্রজাগণের যে পদযুগল ভরসা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না, তা সহজেই বোধগম্য । 'কমলা' গাথায় চাকলাদার কন্যা কমলা ও তার মায়ের পালকিতে চড়ে মাতুলালয়ে গমনের বিবরণ পাওয়া যায় ।

আন্দি সান্দি দুই ভাইয়ে খবর যে দিল ॥
তারা দুই ভাইয়ে করে সোয়ারীর কাম ।
মায়ে ঝিয়ে লইয়া তারা গেল মামার ধাম ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৪২)

'রূপবতী' গাথায় রাজা রাজচন্দ্র নবাবের মুর্শিদাবাদ শহরে গমনের জন্য নৌকা ব্যবহার

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। রাজার মুর্শিদাবাদ গমন উপলক্ষে কানা চইতা ও উভুতিয়া নামে দুই ভাই পানসী সাজানোর নির্দেশ পায়।

কানা চইতা উভুতিয়া তারা দুইটী ভাই।
পানসী সাজাইতে তারা পাইল ফরমাই॥
ষোল দাঁড় জুইত করে আরও তুলে পাল। (মৈ.গী.পৃ ২৩৯)

এই কানা চইতাকে দিয়েই রাজচন্দ্রের স্ত্রী রাজকন্যা রূপবতীকে বাড়ির নফরের সঙ্গে গোপনে বিয়ে দিয়ে বনবাসে পাঠায়।

নিশিরাইতে ডাক্যা যায় মাঝিমাল্লা আনে।
... ...
নিশিরাইতে বাইয়া তারা যায় তরীখানি।
পাল টাঙাইয়া চলে তের বাঁক পানি॥ (মৈ.গী.পৃ ২৫১)

নৌকায় চড়ে দেওয়ান ঈসা খাঁ দিল্লি গমন করেছিলেন। সাড়ে সাত হাজার হাত দীর্ঘ ছিল তার পানসী। তার দাড়ী ছিল দুই সহস্র।

সাড়ে সাত হাজার হাত দীঘ তার ছিল।
সাড়ে হাজার হাত উচা পন্ত্রাশ দিল॥
দুই হাজার দাড়ি আছিল সেই নায়ের।
মাঝি আছিল সাধন পদ্মার পাড়ের॥ (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ৩৬৬)

শাসক-শক্তির পূজা-পালনের তথ্য একাধিক গাথায় বিবৃত হলেও পূজা-পালনের চিত্র একটি মাত্র গাথায় অঙ্কিত হয়েছে। 'কমলা' গাথায় জমিদার কর্তৃক নরবলি দিয়ে কালীপূজা পালনের বিবরণ পাওয়া যায় পূজা পালনের নামে এ-ধরনের বিকৃত মানসিকতার উন্মোচন অন্যত্র দৃষ্ট নয়। অন্য গাথায় শাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে শিবপূজা, দুর্গাপূজা ও মনসা পূজা প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিসের বাদ্য বাজে আজি রাজার পুরীর মাঝে।
নরবলি দিয়া রাজা রক্ষাকালী পূজে॥ (মৈ.গী.পৃ ১৫১)

তৎকালীন সমাজে নরবলি দিয়ে কালীপূজা পালনের প্রচলন ছিল — এই গাথার বিবরণ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাজগৃহে অতিথি-আপ্যায়নের নিমিত্ত উন্নত খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন ও আলপনা অঙ্কনের প্রচলন ছিল — এমন প্রমাণ 'কাজলরেখা' গাথায় পরিদৃষ্ট হয়। এই সূত্রে রাজপরিবারের খাদ্যতালিকা সম্পর্কেও একটি ধারণা পাওয়া যায়। অতিথি আপ্যায়নের জন্য কাজলরেখা কবুতরের মাংস, নানা ধরনের মাছ রান্না করে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার পিঠা ও মিস্টান্ন তৈরি করে। এর মধ্যে আছে : পায়েস, চন্দ্রপুলি, চিতে, মালপুয়া, পুলি প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

জোয়া কইতর রান্ধে আর মাছ নানাজাতি ।
পায়েস পরমান্ন রান্ধে সুন্দর যুবতী ॥
নানা জাতি পিঠা করে গন্ধে আমোদিত ।
... ...
চই চপড়ি গোয়া সরস রসাল ।
... ...
ক্ষীরপুলি করে কন্যা ক্ষীরেতে ভরিয়া । (মৈ.গী.পৃ ৩৩১)

চিকন সাইল চালের ভাত সোনার থালায় সাজিয়ে লেবু সহযোগে অতিথিকে খেতে দেওয়া হত । এর সঙ্গে সোনার বাটীতে থাকত দধি-দুগ্ধ-ক্ষীর, থাকত পাকা সবরি কলা প্রভৃতি ।

চাউল ভিজিয়ে বেটে তা দ্বারা বিভিন্ন রকম চিত্র ঘরের মেঝেতে আলপনা রূপে অঙ্কন উচ্চবিত্ত সমাজে নারীর গুণ হিসেবে বিবেচিত হত । কাজল রেখা সাইলের চাল ভিজিয়ে তা বেটে প্রথমে পিতা-মাতার চরণ অঙ্কন করে, অতঃপর লক্ষীর পা, ধানের গাছ, শিবদুর্গা, পদ্মপত্রে লক্ষী-নারায়ণ, হংসরথে জয়া-বিষহরী প্রভৃতি চিত্র অঙ্কন করে ।

শিব-দুর্গা আঁকে কন্যা কৈলাস ভবন ।
পদ্মপত্রে আঁকে কন্যা লক্ষী-নারায়ণ ॥
হংসরথে আঁকে কন্যা জয়া - বিষহরি ।
ডরাই ডাকুনী আঁকে কন্যা সিদ্ধ বিদ্যাধরী ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩৩২)

অত্যাচার-নির্যাতনের চিত্র একাধিক গাথায় অঙ্কিত হয়েছে । শাসক-শক্তি চিরদিন অন্যায়-অবিচারের মাধ্যমে স্বার্থ উদ্ধারের মানসে 'শাস্তি' প্রদানের নানা উপকরণ ব্যবহার করে । ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে বিবৃত এসব উপকরণের মধ্যে রয়েছে : কারাদন্ড, কারাগারে পাষাণচাপা দেওয়া, জীবন্ত সমাহিত করা, শূলে চড়ানো প্রভৃতি । 'মলুয়া' গাথায় চান্দ বিনোদকে জীবন্ত সমাহিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয় । চান্দ বিনোদ প্রসঙ্গে কাজীর নির্দেশ :

বিনোদেরে লইয়া যাও নিরলইক্কার ময়দানে ॥
জেতায় রাখিয়া তারে কব্বরে মাটি দিও । (মৈ.গী.পৃ ৮৬)

'কাজলরেখা' গাথায় নকল রাণীকে জীবিত সমাহিত করা হয় । 'মলুয়া' গাথায় কাজীকে দেওয়ান শূলে চড়িয়ে হত্যা করে ।

হুকুম করিয়া দেওয়ান কোটালেরে বলে ।
"কাজীরে ধরিয়া শীঘ্র দেও নিয়া শূলে ॥ (মৈ.গী.পৃ ৯০)

কারাদন্ড ও কারাগারে পাষাণ-চাপা দেওয়ার বিবরণ 'কমলা , ' দেওয়ান ভাবনা ', 'ভারাইয়া রাজার কাহিনী', 'রাজা রঘুর পালা' প্রভৃতি গাথায় পাওয়া যায় ।'কমলা' গাথায় জমিদার তার অধীনস্থ চাকলাদারকে নির্যাতন করছে :

Dhaka University Institutional Repository

মানিকে বান্ধিয়া তবে রাখে খুন-গালে ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৩৯)

পিতাকে উদ্ধারের জন্যে পুত্র অনুরোধ জানালে তাকেও কারাদন্ড দেওয়া হয় :

পাষাণ চাপিতে বুকে হুকুম করিল ॥

পিতাপুত্রে একসঙ্গে দেও পাষাণ-চাপ । (মৈ গী.পৃ ১৪১)

'দেওয়ান-ভাবনা' গাথায় মাধবের ওপর নিগ্রহ আরও নির্মম । লোহার শিকল দ্বারা হাত-পা বেঁধে পাষাণ-চাপা দিয়ে কারাবন্দী করে রাখা হয় তাকে :

বন্দী খানায় বন্দী মাধব বুকেতে পাথর ।

হাতে পায়ে আছে তার লোহার শিকল ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৯০)

'ভারাইয়া রাজার কাহিনী'তে ধৃত ক্ষত্রিয় রাজা বীরসিংহ ও তার পুত্রকে কারাগারে পাষাণ-চাপা দিয়ে রাখা হয় ।

বন্দিখানা বাপ বেটা হায় মরেত কান্দিয়া ।

বাইশ মুণী পাত্থর দেছেত ভালা বুকের উপুর তুলিয়া ॥

(পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ১৬৪)

বণিকশ্রেণী

অর্থ-সম্পদের দিক থেকে সমাজে শাসক-শক্তির পরেই ছিল বণিক শ্রেণীর স্থান । কোনো কোনো ক্ষেত্রে বণিকের সম্পত্তির পরিমাণ হয়ত শাসক-শক্তিকেও অতিক্রম করে গিয়েছিল । ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে আমরা কোনো কোনো ধণিকের জীবনে যে-বিলাসবাহুল্য লক্ষ্য করি, তা অনেক ক্ষেত্রে শাসক-শক্তির বৈভবকে ম্লান করে দিয়েছে । 'ভেলুয়া' গাথায় উজানী নদী তীরবর্তী শঙ্খপুরে ছিল মুরাই সাধুর বাস । সীমাহীন ধনরত্নের অধিকারী মুরাই সাধুর বাড়িতে যে একাধিক আটচালা চৌচালা ঘর ছিল তার মাথা মুড়ানো ছিল সোনা দিয়ে । তিনি নৌকার সুউচ্চ মাস্তুলই শুধু নয়, বৈঠাও সোনা দিয়ে মুড়িয়েছিলেন :

বড় বড় ঘর তার আটচালা চৌচালা আর

সোনা দিয়া মুড়াইয়াছে মাথারে ।

রূপাতে দিয়াছে ঠুনি সোনার পাতে দিছে ছানি

টুইয়ের মধ্যে রত্ন অলঙ্কার

... ...

সোনার মাস্তুল তার আসমানেতে উঠে

সোনার বৈঠা সোনার নাও সোনার নিশান তায় ।

(পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ১৪১-১৪২)

কাঞ্চননগরের মানিক সওদাগরের বিলাসব্যসন ছিল আরও উচু মাত্রায় । তিনি তার বসতগৃহ শুধু স্বর্ণ দিয়ে মুড়িয়েই ক্ষান্ত হননি, বায়ান্ন দরজাবিশিষ্ট গৃহটির আচ্ছাদনে তিনি অভ্র নামক মূল্যবান

Dhaka University Institutional Repository

খনিজ ধাতু ব্যবহার করেছিলেন । আচ্ছাদনের স্থানে স্থানে মণিমুক্তা-খচিত ছিল । বাড়ির পুকুরের ঘাট তিনি রুপা দিয়ে বাঁধিয়েছিলেন ।

পাঁচ খন্ড বাড়ী তার সোনাতে বান্ধিয়া ।
বড় বড় ঘর সাধু রাখ্যাছে ছান্দিয়া ॥
বায়ান্ন দুয়াইরা ঘর আভে দিছে ছানি ।
মধ্যে মধ্যে বসাইয়াছে সাধু যত মুক্তামণি ॥
... ...
বড় বড় পুস্কুনি রুপায় বান্ধ্যা ঘাট ।
পুরীর মধ্যে আছে সাধুর পাতা লক্ষীর পাট ॥ (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ১৪৩)

বণিক শ্রেণীর ঐশ্বর্যের পরিচয় অন্যত্রও দুর্লক্ষ্য নয় । 'মহুয়া' গাথায় দুরন্ত সওদাগর মহুয়া-র প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে স্ত্রী হিসেবে লাভ করার জন্য তার সামনে বিলাসিত জীবনের যে-চিত্র তুলে ধরেছিল, তাতে বণিক জীবনের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় । সওদাগরের বর্ণনায় তার বাড়িতে সোনার পালঙ্ক, অজস্র দাস-দাসী, হাতী-ঘোড়া, শান-বাঁধা পুকুর, পুষ্পবন প্রভৃতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় ঃ

গন্ধতেল দিয়া তোমার বান্ধ্যা দিবাম কেশ ।
ঘরে আছে দাসীবান্দী তোমার নাই ক্লেশ ॥
শয্যা তারা পাইতা দিব চরণ দিব ধুইয়া ।
সুবর্ণ পালঙ্কে তুমি থাকবা কন্যা বইয়া ॥
শীতের রাইতে দুঃখ নাই লেপ তুলাভরা ।
মন যোগাইতে দাসী তোমার সামনে থাকবে খাড়া ॥
হাতীঘোড়া আছে আমার লোকলস্কর ।
সবার ঠাকুরাইন হইয়া থাকবা আমার ঘর ॥ (মৈ.গী.পৃ ২৮)

মহুয়াকে বহুমূল্যের অলঙ্কার প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি দেয় সওদাগর, তাতেও তার সমৃদ্ধশালী জীবনের পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে । লক্ষ লক্ষ টাকার স্বর্ণ দিয়ে সওদাগর মহুয়ার সমগ্র শরীরকে অলঙ্কার-সজ্জিত করার অভিলাষ ব্যক্ত করে ঃ

হীরামণি যথায় পাইবাম ভালা বান্ধ্যা দিয়া ।
লক্ষ টাকার হার তোমায় দিবাম গড়াইয়া ॥
আর যে কত দিবাম কন্যা নাহি লেখাযোখা ।
সোনাতে বান্ধাইয়া দিবাম কানরাঙা শাখা ॥
উদয়তারা সাড়ী দিবাম লক্ষ টাকা মুল ।
হীরামণি দিয়া তোমার জুইয়া দিবাম চুল ॥
চন্দ্রহার গড়াইয়া দিবাম নাকে দিবাম নথ ।
নুপুরে ঝুনঝুনি কন্যা দিবাম শত শত ॥ (মৈ.গী.পৃ ২৯)

যাতায়াত ও গমনাগমনের বিষয়টি বণিকবৃত্তির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট । তৎকালীন সমাজে

Dhaka University Institutional Repository

জলপথ ও নৌকাই ছিল যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম । নদী ও নৌকা বণিক জীবনের আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না তথা সামগ্রিক পরিণাম-নিয়তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল । বণিক জীবনের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে নদীর প্রভাবও ছিল সর্বাত্মক । হয়ত নদীর গতিশীল ভাঙাগড়ার সংগ্রামময় প্রবাহের স্বতঃপ্রাণস্পন্দনশীল ধারার প্রভাবেই বণিক জীবনে গতিময়তা ও কর্মময়তার স্বাচ্ছন্দ্য এসেছিল । নদীকে কেন্দ্র করেই বণিক জীবন আবর্তিত হতে দেখা যায় । নদীতীরে গৃহ-নির্মাণ, নৌকা নোঙরের ঘাট নির্মাণ, প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনে নদীজলের ব্যবহার প্রভৃতি অনুকূল উপাদানের বিপরীতে ঝড়-ঝঞ্ঝায় নদীবক্ষে সম্পদ-নিমজ্জনের মধ্য দিয়ে বণিক জীবনের বিপর্যয় সূচিত হতেও দেখা যায় । নদীপথে পালতুলে বণিকের সারি সারি নৌকা চলাচলের বর্ণনা একাধিক গাথায় পাওয়া যায় ঃ

এইনা আসে সাধুর ডিঙ্গা ভরা বোঝাই খানি ।।
পঙ্খী নয় পঙ্খী নয়রে উড়াইয়া দিছে পাল । (মৈ.গী.পৃ ২৬)

কিংবা, কত সাধু আইসে যায় কত ডিঙ্গা বাইয়া ।
নানা দেশে যায় তারা এই পথ দিয়া ।। (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ১৩১)

নদীতীরে গৃহ-নির্মাণ কিংবা ঘাটে নৌকা নোঙরের বর্ণনা একাধিক গাথায় দৃষ্ট হয় ।

উত্তর হইতে আলে ভাঙাইয়া খান ।
নদীর পারে লাগাইল ডিঙ্গা পাঁচখান ।। (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ২১)

কিংবা, চৌখন্ডী করিয়া তবে শিঙ্গাখালীর পারে ।
বড় বড় ঘর বান্ধে দক্ষিণ দুয়ারে ।। (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ৪৭)

'মইষাল বন্ধু' ও 'ভেলুয়া' গাথায় বণিক পরিবারের বধূ-কন্যাগণের নদীজলে স্নানের দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে । নির্জন বলেই হয়ত উন্মুক্ত আকাশ-তলে বণিক বধূ-কন্যারা উত্তমরূপে শরীর মার্জনা করে স্নান করতে সক্ষম হত । কিন্তু নদীপথে চলমান সওদাগরদের চোখে স্নানরতা বধূ-কন্যাদের সিক্ত বসনভেদী রূপ যে কখনও কখনও পরিদৃষ্ট হয়ে মনে যন্ত্রণার সৃষ্টি করত তার বিবরণও গীতিকা-সমূহে উল্লিখিত হয়েছে । নদীতীরে বাস বলেই হয়ত বণিক পরিবারে পুকুরে স্নানের প্রচলন ছিল না । কেননা 'ভেলুয়া' গাথায় রূপায় বাঁধানো ঘাট বিশিষ্ট পুকুরের অস্তিত্ব থাকলেও ভেলুয়া-র নদীজলে স্নানের দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে । 'মইষাল বন্ধু' গাথায় নদীর জলে বণিক-বধূ সাদ্ভুতীর স্নানের দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে ঃ

পাটেতে সাদ্ভুতী কইন্যা বইসা করে স্নান ।
সুরূপ সুন্দরী কন্যা পুন্নিমাশীর চান্ ।।
ভিজা নীলাম্বুরী ফুট্যা বাহির হয় গায়ের রূপ ।
ঘাটেতে বসিয়া কইন্যা খেলায় পক্ক খুপ ।। (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ৫৩)

'ভেলুয়া' গাথায় পঞ্চ ভাইয়ের বধূদের সঙ্গে ভেলুয়ার সদলবলে দাসী সমভিব্যাহারে স্নানে গমনের দৃশ্য পাওয়া যায় । মানিক সওদাগরের ঐশ্বর্যময় জীবনের পরিচয় মূল্যবান স্নানোপকরণের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয় ।

সোনার বাটায় গাইস্ঠ্য গিলা রূপার বাটায় পান ।

Dhaka University Institutional Repository

স্নান করিতে যায় কন্যা অগ্নির সমান ॥
পাঞ্চ ভাইয়ের বউ সঙ্গে চল্যা ঘাটে যায় ।
তেলুয়ার বার দাসী সঙ্গে সঙ্গে যায় ॥ (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ১৪৫)

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সর্বস্বহারা হওয়ায়, নদীজলে শুধু বণিজ্যের ধন হারানোই নয়, প্রাণ হারানোর কিংবা হারানোর উপক্রম হওয়ার কাহিনীও বিবৃত হয়েছে 'মইষাল বন্ধু', 'আয়না বিবি', 'পীর বাতাসী', 'জীরালনী' প্রভৃতি গাথায় ।

শিবের জটা পিঙ্গল আসমানেতে খেলে ।
কুন্দিয়া তোফান আসে দরিয়ার জলে ॥
পাড় পর্বত ভাইঙ্গা ঢেউ ফলকিয়া উঠিল ।
কে জানে দুষমণ মঘুয়া কইবা ভাগ্যা গেল ॥ (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স. পৃ ৭৫)

'আয়না বিবি' গাথায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মামুদ উজ্জ্যালের নৌকা নিমজ্জনের কাহিনী আছে । মামুদ উজ্জ্যালও নিমজ্জিত হয়েছিল জলে এবং পরে মৃত-প্রায় অবস্থায় চরে আটকে গিয়ে বেঁচে গিয়েছিল । 'পীর বাতাসী' গাথায় বিনাথও মৃত-প্রায় অবস্থায় নদীজলে ভাসছিল । সর্পওঝা তাকে উদ্ধার করে বাঁচিয়ে তুলেছিল :

রাত্রি নিশাকালে শুন দেয়ার গরজন ॥
মেঘেতে আসমান ছাইল তুফান হইল জারী ।
কতেক পানসীর দেখ কাছি নইল ছিড়ি ॥
সুতের মুখেতে যেমুন জলুইর কুটা ভাসে ।
বিনাথে ভাসাইয়া নিল কংসনদীর পাকে ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৩৩৫)

'জীরালনী' গাথায় চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজিয়ে সাধু-পুত্র গমন করলে দুর্লঙ্ঘ্য সাগরে মেঘের গর্জন শুনে মাঝিমাল্লারা যাত্রা স্থগিত রাখার পরামর্শ দিয়েছিল । কিন্তু সাধু-পুত্র সে-কথায় কর্ণপাত করেনি । তার পরিণতি হয়েছিল নিম্নরূপ :

সাজ্যা আইল বার দেওয়া ঘন ঘন ডাকে ।
বান পাথালে পড়ে চৌদ্দ ডিঙ্গা পাকে ॥
ঘুরিতে ঘুরিতে ডিঙ্গা বেসামাল হইল ।
পর্বত পরমান ঢেউ গর্জিয়া উঠিল ॥
ঝিনাই হেন ভাসে ডিঙ্গা করে টলমল ।
একে একে চৌদ্দ ডিঙ্গা করে উডে হইল তল ॥
ভাসিল সাধুর পুত্র ঢেউয়ের উপরে । (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স. পৃ ৪৫০ - ৫১)

প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে সচরাচর ঘটত তার প্রমাণ পাওয়া যায়,এ-নিয়ে বণিক-বধূদের দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে । 'বগুলার বারমাসী'তে বগুলা বাণিজ্য গমনোদ্যত স্বামীকে সতর্ক করে দিচ্ছে :

ঝড় তুফানেতে ডিঙ্গা কিনারায় লাগাইও ॥

Dhaka University Institutional Repository

...   .

দক্ষিণা সায়র বাণে নাই সে ধর নাও ॥
উত্তর ময়ালেরে বন্ধু বেশী দূর না যাইও ।
পাহাড়িয়া নদীর বাঁকে নৌকা না বাহিও ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ২১৩)

বাণিজ্য যাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে নৌকা নির্মাণ ও মেরামতের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'আয়না বিবি' গাথায় । আষাঢ় মাসে যখন মাঠ-ঘাট বৃষ্টি ও জোয়ারের জলে পরিপূর্ণ, চাষাবাদের কাজ নেই, তখন মামুদ উজ্জ্যাল বাণিজ্য-যাত্রার উদ্যোগ গ্রহণ করছে । মিস্ত্রি ডেকে নৌকা মেরামত করছে সেকারণে :

সুতার আনিয়া মামুদ উজ্জ্যাল নায়ের বান্ধে খিলি ।
লোয়ার টক্কর মাইরা দিল গাব কালী ॥
ছৈ ছাপ্পর বান্ধে যতেক আলিমাছি ।
অক্কর করিয়া বান্ধে নাও বান্ধার কাছি ॥ (পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি.স.পৃ ১৯৫)

জলপথের নির্জনতায় ডাকাতের উপদ্রব ছিল বণিক-জীবনের নিত্যসঙ্গী । সেকারণে একত্রে বহু সাধুর গমনাগমন, রাত্রিকালে যাতায়াত স্থগিত রেখে কোনো লোকালয়ে নোঙর করা, তদুপরি প্রতিরক্ষার জন্য সঙ্গে অস্ত্রবহনের যে-প্রচলন ছিল, তা একাধিক গাথায় পরিস্ফুটিত হয়েছে । রাত্রির বিপদ লক্ষ্য করে লোকালয়ে নৌকা নোঙর করে মামুদ উজ্জ্যাল অগ্নি-সংগ্রহের জন্য গ্রামের পথে বের হয়ে আয়না বিবির সাক্ষাৎ পেয়েছিল । এরকম ঘাটে-বাঁধা তরী থেকেই মদন সাধুর সঙ্গে ভেলুয়ার চার-চক্ষুর সাক্ষাৎ ঘটেছিল । 'বীর নারায়ণের পালা'য় গ্রামের ঘাট থেকে কন্যা অপহরণকারী সওদাগরের নৌকায় যে বহুবিধ অস্ত্র মোতায়েন ছিল, বীর নারায়ণ কর্তৃক সেসব অস্ত্র নদীজলে বিসর্জনের ঘটনা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায় :

চুপচাপ গিয়া কুমার হাতিয়ার পাতি যতে ।
এক এক কর্‌য়া ফালাইল গাঙ্গের মধ্যেতে ॥
বাছিয়া লইল কুমার ভালা রামদাও খানি । (পূ.গী চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৩০০)

এসব অস্ত্র যে শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বীর নারায়ণ কর্তৃক অপহৃতা যুবতীকে যখন উদ্ধার করা হচ্ছে, তখন তা মোকাবেলার জন্য সওদাগরের অস্ত্রের শরণাপন্ন হওয়ার দৃশ্যে :

হাতিয়ার পাতি আনতে সাধু ডিঙ্গার মাঝে গেল ।
(পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৩০১)

সওদাগরেরা যেসব দ্রব্য বেচাকেনার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করত, তার মধ্যে ধান, চাল, সরিষা, লবন, মরিচ, আদা প্রভৃতি সামগ্রীর উল্লেখ পাওয়া যায় । এছাড়া শুটকি মাছ, বাতাবী লেবু-পান-সুপারী-নারিকেল-কলা প্রভৃতি দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা লাভের তথ্যও গীতিকাসমূহে পাওয়া যায় । যে-স্থানে যে-দ্রব্যের উৎপাদন বেশি এবং মূল্য তুলনামূলকভাবে অনধিক, সে-অঞ্চল থেকে সে-

Dhaka University Institutional Repository

সামগ্রী ক্রয় করে যেসব এলাকায় ঐসব পণ্যের উৎপাদন কম, চাহিদা অধিক, মূল্যও অধিক, সেখানে তা বিক্রয়ই ছিল বাণিজ্যের মূল কর্মকান্ড। গুদামজাত করার বিষয়টি তখনও ব্যবসার অনুষঙ্গী হয়ে ওঠেনি।

পীরের বান্দা তানসা গাজী ধানের বেপারী।
পাঁচ খানা পান্‌সী লইয়া করে সদাগরী॥ (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ২১)

'মইষাল বন্ধু' গাথায় গুবাল্যা বেপারীর বাণিজ্য আরও বিস্তৃত; কেবলমাত্র ধান চাল ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যেই তার ব্যবসাকর্ম সীমিত নয়, তার সঙ্গে আছে সরিষা-লবন-মরিচ-আদা প্রভৃতি রবিশস্যও:

গুবাল্যা বেপারী যায় সাত ডিঙ্গা বাইয়া॥
এক ডিঙ্গায় ধান চাউল এক ডিঙ্গায় সয়।
লবন মরিচ আদা লইয়াছে গুরু॥ (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স. পৃ ৪৬)

'মইষাল বন্ধু' গাথায় মঘুয়ার মুখ থেকে উত্তরাঞ্চলের অপরিচিত এলাকায় শুটকী মাছ-বাতাবী লেবু-পান-সুপারী-নারিকেল-কলার বিশেষ চাহিদা ও দুর্মূল্যের তথ্য উচ্চারিত হয়েছে:

শুকণা মাছ কিন্যা লয় সোনার ঘটি দিয়া।
জামুরা বদল করে হীরামণি দিয়া॥
পান সুপারী তারা না দেখে নয়নে।
ঝিনাইর মুক্তা দিয়া তবে পাইলে তাহা কিনে॥
কলা নারিকেল আদি মিস্ট দ্রব্য যত।
সোনার পাতে কিন্যা লয় মনে ধরে যত॥ (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ৫৫)

নদীপথে বাণিজ্য উপলক্ষে মুনাফা লাভের আশায় বণিকেরা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ভ্রমণ করে কেবল অর্থ-সম্পদই যে অর্জন করত, তা নয়, অপরিচিত অঞ্চলের সংস্কৃতির সঙ্গেও পরিচয় ঘটত তাদের। বাড়িতে প্রিয়জনদের জন্য বিভিন্ন অপরিচিত সামগ্রী যেমন বণিকরা গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় সঙ্গে নিয়ে আসত, তেমনি বাণিজ্য ব্যাপদেশে অর্জিত নতুন নতুন অভিজ্ঞতাও এসে বর্ণনা করত প্রিয়জনদের নিকট। বণিক-সংস্কৃতি যে সামন্ত-যুগের বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ স্থবির অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার পরোক্ষ প্রমাণ এই অপরিচিত জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের ঘটনা থেকে পাওয়া যায়। 'ধোপার পাট' গাথায় তানসা গাজী বাণিজ্য-শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় আশ্রিতা কন্যা কাঞ্চনমালার জন্য ঐ অঞ্চলে সহজপ্রাপ্য নয় এমন বহু দ্রব্য-সামগ্রী এনেছিল। তার মধ্যে ছিল: ঝিনুকের ফুল, মোতির মালা, অগ্নিপাটের শাড়ী, নাকের নোলক, কোমরের ঘুঙুর, পায়ের বেক খাড়ু, খাবার দ্রব্য হিসেবে ঝাঁপি ভরা মৌমাছির চাক, শুটকি মাছ প্রভৃতি।

ঝিনাইর ফুল আনিয়াছে কটরা ভরিয়া।
মতীর মালা আনিয়াছে কন্যার লাগিয়া॥
আরত কিনিয়া আনছে অগ্নিপাটের সাড়ী।
আরত কিনিয়া আনছে কমরের ঘুঙুরী॥

Dhaka University Institutional Repository

আর বেশী বেক্তায়ু নারের বলাক ।
খাইবার জন্য আনছে মৌমাছির চাক ॥
শুকনা মাছ আটীর আটী ধাগায় ভরিয়া । (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ২২-২৩)

শুধু দ্রব্য-সামগ্রীই আনেনি তামশা গাজী অনেক অভিনব দৃশ্য অবলোকন করে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছেন এবং তা নিয়ে স্ত্রীর নিকট গল্প করছেন । তিনি নারিকেল দেখে এসে গল্প করছেন গাছের শীর্ষে পানি দেখেছেন, দেখেছেন বেদে-জীবন যেখানে নারীরা উপার্জন করে এবং পুরুষেরা গৃহ তদারকী করে । ঝরণার জল পানরত অবস্থায় তিনি হরিণ দেখেছেন । তিনি শুনে এসেছেন কাঞ্চনমালার পিতা জমিদার-বাড়ীর বৃদ্ধ ধোপার করুণ কাহিনী ।

এক দেশ দেইখ্যা আইলাম উলুছনের ছানি ।
আর এক দেশ দেখ্যা আইলাম গাছের আগ্‌ পানি ॥
মর্দ্দানাতে রান্ধে বাড়ে নারীতে বায় হাল ।
হাটবাজারে নারী ফিরে পালের পাল ॥
নদীর কিনারে দেখলাম মইষের বাতান ।
ছড়াতে পড়িয়া হরিণ করে জল পান ॥ (পূ.গী.দ্বি খ.দ্বি.স.পৃ ২৩)

বিদেশে বাণিজ্যে গমনোদ্যত পুত্রের সঙ্গে যে-খাদ্য-সামগ্রী মামুদ উজ্জ্যালের মা দিয়েছেন, তা বণিক পরিবারের সাধারণ আহার হিসেবে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয় । কেননা ঐ খাদ্য-সামগ্রী অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের । মামুদ উজ্জ্যাল তখন কেবল বণিক জীবনে প্রবেশ করছে, তখনও তার পরিবারে কৃষক জীবনের দারিদ্র মিশে আছে । কাঞ্চননগরের মানিক সওদাগর, যার বাড়িতে পুকুরের ঘাট বাঁধানো হয়েছে রূপা দ্বারা এবং ঘরের ছাউনিতে মণিমুক্তা ব্যবহৃত হয়েছে, তার গৃহে নিশ্চয়ই মামুদ উজ্জ্যালের গৃহের খাদ্য ব্যবহৃত হয় না । তবুও এখানে বাণিজ্যে গমনোদ্যত বণিকের প্রতি প্রিয়জনের আনুরিকতার পরিচয় স্পষ্ট :

খাইবার চাউল দিলা মায় পুত্রের লগে ।
... ...
কিছু কিছু দিল মায় বিন্নি ধানের খই ।
কিছু কিছু দিল লগে ঘয়ুয়া মৈষের দৈ ॥
আপত্তোস খাইতে দিল জল খইর খাজিয়ার চাউল ।

(পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি.স.পৃ ১৯৫-৯৬)

নিতান্তই এসব কৃষক-গৃহের খাদ্যসামগ্রী । পোষাকের ক্ষেত্রে বণিক পরিবারে অধিক সমৃদ্ধশালী বণিক ও কম সমৃদ্ধশালী বণিকের পার্থক্য দৃষ্ট হয় । 'ময়ুয়া' গাথার সওদাগর ময়ুয়াকে বহু মূল্যবান উদয়তারা শাড়ী পরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল । 'ধোপার পাটে' তামশা গাজী কাঞ্চনমালার জন্য এনেছিল অগ্নি পাটের শাড়ী । আবার 'মইষাল বন্ধু' গাথায় সাধুতীর শরীরে আমরা নীলাম্বুরী শাড়ী দেখতে পাই ।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষক সমাজ

কৃষক সমাজের সম্পদের মধ্যে জমি আর হালের বলদই প্রধান অংশ জুড়ে আছে। শাসক সম্প্রদায় ও বণিক শ্রেণীর জীবনে যে ঐশ্বর্য ও বৈভব, উচ্চবিত্ত সম্পদশালী কৃষকের জীবনে তার অংশবিশেষও পরিলক্ষিত হয় না। ময়মনসিংহের গীতিকায় সবচেয়ে যে-বিত্তবান কৃষক-জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, সেখানে সম্পদের প্রাচুর্য আছে, কিন্তু বিলাসিতা কিংবা আড়ম্বরতার লেশমাত্র নেই। 'মহুয়া' গাথায় হীরাধর দাস বিত্তশালী কৃষক। তার পাঁচ পুত্র এক কন্যা। গোলা-ভর্তি ধান ও সরিষা, দশটি দুগ্ধবতী গাভী, বাইশ আরা (প্রায় আটাশ বিঘা) জমি এবং তা চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় হালের বলদ — এই তার সম্পদের বিবরণ। পিতা-মাতার শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ-ভোজন কিংবা পূজা পার্বনের প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান-কর্ম সাধনে তার তেমন দুশ্চিন্তা করতে হয় না।

> সষু শস্যে ভরা টাইন গোলা ভরা ধান ॥
> ঘরে আছে দুধবিয়ানী দশগোটা গাই।
> হালের বলদ আছে তার কোন দুঃখ নাই ॥
> বাইশ আরা জমীন তার সাইল আর আম। ৫ (মৈ.গী.প ৫৬)

তার যে বসতগৃহ তাতেও ধনাঢ্যতার চিহ্ন তেমন স্পষ্ট নয়। কৃষক-জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তার এই বসতবাটীতে আছেঃ বহির্দ্বারবিশিষ্ট ঘর, সামনে পুকুর, পুকুরে সান-বাঁধা ঘাট, ঘরের কপাটে লাগানো হয়েছে আয়না, বাড়ির সমানে-পেছনে আছে ফুলের বাগান।

> এই পথে যাইতে দেখবা বার-দুয়াইরা ঘর ॥
> সামনে আছে পুস্কুনি সানে বান্ধা ঘাট।
> পুব মুখ্যা বাড়ীখানি আয়নার কপাট ॥
> আগে পাছে বাগ-বাগিচা আছে সারি সারি। (মৈ.গী.পৃ ৫৯)

বিত্তবান কৃষক জীবনের চিত্র 'দেওয়ানা মদিনা' গাথায়ও অঙ্কিত হয়েছে। ধনুয়া নদীর তীরে অবস্থিত কাঞ্চনহান্দা গ্রামের হীরাধর বেপারী জীবিকা নির্বাহের পরেও বছরে একশ পুরা ধান বিক্রি করতে পারেন, এতেই তার সচ্ছলতার প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ 'গিরস্থি করিয়া বেচে এক্শ পুড়া ধান'।

কৃষকের সচ্ছল জীবনের পাশাপাশি দরিদ্র অর্ধাহারী-অনাহারী-বস্ত্রহীন কৃষক জীবনের চিত্রও ময়মনসিংহের গীতিকায় পরিলক্ষিত হয়। 'মহুয়া' গাথায় চান্দ বিনোদ দরিদ্র কৃষক। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শস্যহানি হলে তাকে অনাহারে থাকতে হয়। ছিন্ন বস্ত্রের কারণে শীতের কষ্টকর জীবন নির্বাহের পাশাপাশি অর্থাভাবে ধর্মকর্ম থেকেও নিবৃত্ত থাকতে হচ্ছে তাকে।

> উত্তরিয়া শীতে পরাণ কাঁপে থরথরি।
> ছিড়া বসন দিয়া মায় অঙ্গ রাখে মরি ॥
> ... ...
> ঘরে নাই সে লক্ষ্মীর দানা লক্ষ্মীপূজার তরে ॥ (মৈ.গী.পৃ ৪৭)

অন্যত্র,
> ঘরে নাই খুদের অন্ন কি রান্ধিব মায়।
> উপাস থাকিয়া পুত্র শীগারেতে যায় ॥ (পৃ ৪৯)

Dhaka University Institutional Repository

'আয়না বিবি' গাথায়ও দরিদ্র কৃষক জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ষোল বছর বয়সে হালের বলদ কিনে মানুদ উজ্জ্যাল কৃষিকাজ শুরু করেছে। চাষাবাদে নিজেই শ্রম দিচ্ছে, কখনও কখনও প্রয়োজনে অন্যেরও সাহায্য নিচ্ছে। ধানের ক্ষেতে সেচের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে নিজের কায়িক শ্রমের মাধ্যমেই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাকে চাষাবাদ করতে হচ্ছে।

আগুন মাসেতে উজ্জ্যাল ক্ষেতে হাল বায়।
কিছু কাম নিজে করে কিছু কামলায়॥
... ...
মুয়া না পাইয়া মানুদ উজ্জ্যাল ক্ষেতে সিঞ্চে পানি।
মাথার ঘাম পায়ে পড়ে দেইখ্যা ঝুরে তালা কান্দে মা জননী॥
(পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি.স.পৃ ১৯৩)

দরিদ্র কৃষক নিজেই ধান কাটে এবং মাথায় বহন করে বাড়িতে আনে। অতঃপর তা মাড়াই করে এবং খাদ্যোপযোগী করার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ার অবলম্বন করে। কৃষকবধূরাও কখনও কখনও এসব কাজে অংশগ্রহণ করে। 'মলুয়া' গাথায় চান্দ বিনোদের ধান কাটার উদ্দেশে বারমাসী গেয়ে মাঠে যাওয়ার দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে। 'দেওয়ানা মদিনা' গাথায় দুলাল ধান কেটে আনলে দুলাল-মদিনা একত্রে তা মাড়াই করে। 'আয়না বিবি' গাথায় মানুদ উজ্জ্যালের ধান কাটার উদ্দেশ্যে ধারালো কাঁচি নিয়ে মাঠে গমনের দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে। ধান কাটা এবং বাড়িতে বহন করে এনে মাড়াই করার বিবরণ পাওয়া যায় এই গাথায়ঃ

ধারের কাঁচি লইয়া সাধু চলিল বাওরে॥
... ...
পাকিল সাইলের ধান কিছু কিছু দায়॥
ধান না দাইয়া উজ্জ্যাল সাধু বাড়ীতে আসিল।
বাতরে সাজান দিয়া মারিয়া লইল॥ (পূ.গী. তৃ.খ.দ্বি.স. পৃ ১৯৩)

কৃষক জীবনে খাদ্যসামগ্রীর যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা সচ্ছল গৃহস্থ ঘরের। খাদ্যদ্রব্যের উপকরণ ও অন্যান্য জীবনাচারের মধ্যে সচ্ছলতার চিত্র পরিস্ফুট হয়। মলুয়ার পিতা হীরাধর দাস বিত্তবান কৃষক, গাঁয়ের মোড়ল, তাঁর বাড়িতে অতিথি আপ্যায়নের জন্য যেসব খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করা হয়, তাতেই তাঁর সমৃদ্ধিশালী জীবনের চিত্র স্পষ্ট। চান্দ বিনোদের আপ্যায়নের জন্য আয়োজিত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে রয়েছেঃ মানকচু ভাজা, চালতার অম্বল, জিরার সম্বারসহ মাছের ঝোল, কই মাছ ভাজা, ছত্রিশ প্রকার ব্যঞ্জন, শুটকি মাছ পোড়া প্রভৃতি।

মানকচু ভাজা আর অম্বল চালিতার।
মাছের সুরুয়া রান্ধে জিরার সম্বার॥
গাইট্টা লইছে কইমাছ চরচরি খাসা।
ভালা কইরে রান্ধে বেগুন দিয়া কল্যাতিরা॥ (মৈ.গী.পৃ ৬০)

অতিথি একমাত্র চান্দ বিনোদ, তার জন্য এত আয়োজন। দরিদ্র শ্রমজীবী কৃষক জীবনে এত খাবারের আয়োজন তার কাছে অকল্পনীয়। তার জন্য কেবলমাত্র মাছ-তরকারীই রান্না করা হয়নি, বহু প্রকার

Dhaka University Institutional Repository

পিঠাও তৈরি করা হয়েছে । এসব পিঠার মধ্যে আছে : পুলি, পাত, বরা, চিত, চন্দ্রপুলি, গোয়া, চই প্রভৃতি । মলুয়ার পঙ্ক ভ্রাতার সঙ্গে একত্রে পিড়িতে বসে চান্দ বিনোদ খাচ্ছে :

শুকত খাইল বেনুন খাইল আর ভাজা বরা ।
পুলি পিঠা খাইল বিনোদ দুধের পিগ্যায় ভরা ॥
পাত পিঠা বরা পিঠা চিত চন্দ্রপুলি ।
গোয়া চই খাইল কত রসে ঢলাঢলি ॥ (মৈ.গী.পৃ ৬১)

দরিদ্র কৃষক জীবনে ব্যবহৃত খাদ্যসামগ্রীর বিবরণ পাওয়া যায় না । চান্দ বিনোদের কাচালঙ্কা সহযোগে পানি-ভাত ভক্ষণের একটিমাত্র চিত্র 'মলুয়া' গাথায় পাওয়া যায় । যেমন,

ঘরে আছিল পানিভাত বাড়িয়া দিল মায় ।
কাচালঙ্কা দিয়া বিনোদ কিছু কিছু খায় ॥ (মৈ.গী.পৃ ৬৫)

'মলুয়া' গাথায়ই কৃষক-গৃহে বিবাহ আয়োজনের একটি সামগ্রিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে । ইতঃপূর্বে জমিদার-গৃহে বিবাহ-আয়োজনের দৃশ্য আমরা প্রত্যক্ষ করেছি । কিন্তু সেখানকার আড়ম্বরতার চিহ্ন এখানে মোটেই দৃশ্যমান নয় । বিবাহ-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও প্রয়োজনীয় সকল আয়োজনই এখানে পরিদৃষ্ট হয়, কেবল জৌলুষের দিকটিই অনুপস্থিত । ঢোল বাজছে, বাজি পুড়ছে, আর ঘোড়ায় চড়ে বর আসছে, এ-উপলক্ষে হীরাধর দাসের বাড়িটিকে আলোকিত করা হয়েছে ; বরযাত্রীর মধ্যে আছে গ্রামের যুবকবৃন্দ, বরযাত্রী ছাড়া হীরাধর দাসের আত্মীয়-স্বজনও এসেছে, বরকে জয়মাল্য দিয়ে কন্যা-পক্ষের নারীগণ বরণ করছে, মলুয়ার মা পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের নিকট কন্যার কল্যাণে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন, আশীর্বাদ-প্রার্থনার জন্য তিনি যখন প্রতিবেশীর বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন, তখন তার পেছনে পাড়ার অন্য নারীরা গান গাচ্ছে ।

শ্বশুরবাড়ী গিয়া কন্যা থাকুক সোহাগে ।
তেকারণে কন্যার মাও জল সোহাগ মাগে ॥
মাথায় লক্ষ্মীর কুলা অঞ্চলে ঘুড়িয়া ।
সোহাগ মাগিল মায়ে বাড়ী বাড়ী গিয়া ॥ (মৈ.গী.পৃ ৬৭)

অতঃপর শুভলগ্নে বিয়ে অনুষ্ঠিত হল । পরবর্তী কালরাত্রি, ফুলশয্যা, বাসররাত্রিসহ বিবাহ-অনুষ্ঠানের সামগ্রিক চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে । বাসর-রাত্রির বিবরণটি মনোজ্ঞ, বস্তুনিষ্ঠ এবং কৃষক জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ । গ্রাম-জীবনে বাসর-রাত্রির প্রাণবন্ত পরিবেশের একটি চমৎকার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে এখানে । মলুয়া তার অপরিণত বয়সের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঐরাত্রে নিবৃত্ত থাকার জন্য অনুরোধ করছে চান্দ বিনোদকে । অনুরোধের আরও একটি কারণ : নবদম্পতির বাসররাত্রির কার্যকলাপ নিরীক্ষণের জন্য পঙ্কভ্রাতার বধূ যে বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে এবং এনিয়ে যে পরবর্তী দিন তার সঙ্গে রসিকতা করবে, সে-সম্পর্কে মলুয়ার সতর্কতা । এসব বিষয়ে নারীসমাজের সচেতনতা যে পুরুষদের তুলনায় অধিক, তারও একটি বস্তুনিষ্ঠ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এখানে ।

পঙ্ক ভাইয়ের বউ নিদ্রা নাহি গেছে ।
বেড়ার ফাক দিয়া তারা তোমায় দেখিছে ॥
ভূষণের ঝুণঝুণু শব্দ শুনি কানে ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিহাস করবে তারা প্রতিকা বিশানে ।। (মৈ.গী.পৃ ৬৯)

বস্তুনিষ্ঠতায় উজ্জ্বল এসব কৃষক-জীবনচিত্রের অন্যান্য উপাদান এ-প্রসঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। কন্যার প্রথম শ্বশুরবাড়ি গমনোপলক্ষে তার সঙ্গে নানা প্রকার দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে দেওয়া হচ্ছে । এসব সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে : দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য থালি, পেটরা, নানা প্রকার মসলা, চিকন চাল, খৈ তৈরির জন্য বিন্নি ধান প্রভৃতি ।

থাইল পেটেরা দিল সঙ্গেতে করিয়া ।
সজ মসলা দিল থলিতে ভরিয়া ।।
আরও সঙ্গে দিল সাও চিকনের চাইল ।
তৈলসিন্দুর দিল খৈয়া বিন্নির ধান ।। (মৈ.গী.পৃ ৭০)

কন্যা বিদায়ের সময় মলুয়ার মার মতো সকল বঙ্গজননীই হয়ত একই অনুরোধ করে কন্যাকে : সে যেন তার আচরণ দ্বারা শ্বশুরবাড়ির সকলের মন তুষ্ট রাখে, এমন আচরণ যেন কখনওই না করে, যাতে তার পিতৃকুলকে কেউ নিন্দা করতে পারে । ক্রন্দনরতা মায়ের বিদায়কালীন অনুরোধ :

ভালা কইরা থাক্য মাও শ্বশুরের ঘরে ।
পাড়াপড়সি যাতে মন্দ না কহিতে পারে ।। (মৈ.গী.পৃ ৭০)

কৃষক-গৃহে বধূবরণের চিত্রটিও অত্যন্ত মনোরম ও তাৎপর্যময় করে অঙ্কিত হয়েছে । ঘরের লক্ষ্মী হিসেবে কল্পিত বধূকে শাশুড়ী যখন বরণ করছে, তখন পাড়ার অন্য সকল নারীও সেখানে উপস্থিত, তারা জয়ধ্বনি করছে;বধূবরণের সময় মঙ্গলঘটে ব্যবহৃত গঙ্গাজল কল্যানময় ভবিষ্যতের প্রার্থনা ও প্রতীক । বধূবরণের পর খুড়ী-মাসী-জেঠীসহ নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীগণ কর্তৃক সোনারুপা উপহারদানের মাধ্যমে নববধূর মুখদর্শন করার রীতি এখনও গ্রামজীবনে প্রচলিত ।

বউগড়া লইল মায় পিড়িতে বসিয়া ।
ঘরের লক্ষ্মী ঘরে মায় লইল তুলিয়া ।।
জয়াদি জুকার দেয় পাড়ার যত নারী ।
রাখিল মঙ্গলঘট গঙ্গাজলে ভরি ।। (মৈ.গী.পৃ ৭১)

গ্রামের মধ্যেই বসতগৃহ থেকে অনতিদূরে জঙ্গলঘেরা স্থানে বৃহদাকারের সানবাঁধানো ঘাট সমন্বিত একটি পুকুর গ্রামীন জনগণের খাবার জলের উৎস । সম্পন্ন কৃষকের বাড়িতে এ-ধরনের পুকুর থাকে এবং তা কখনও কখনও সর্বজনীন ব্যবহারেরও উপাদান হয়ে ওঠে । কাজের অবসরে বিকেল কিংবা সন্ধ্যায় কৃষকবধূ ও কন্যারা কলসী-কাঁখে দলবেঁধে কিংবা একাকী গ্রামের নির্জন মেঠো পথ ধরে সেখানে খাবার জল সংগ্রহের জন্য গমন করে—এ-এক সাধারণ গ্রামীণ চিত্র । এমনই একটি পুকুর ঘাটে, নির্জনে চান্দ বিনোদের সঙ্গে মলুয়ার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল ।

গায়ের পাছে আন্ধাপুখুর ঝাড়জঙ্গলে ঘেরা ।
চাইর দিগে কোগাছ বান্দার গাছের বেড়া ।।
... ...
সাত ভাইয়ের বইন মলুয়া জল ভরিতে আসে ।
সন্ধ্যাবেলা নাগর ধুইয়া একলা জলের ঘাটে ।। (মৈ.গী.পৃ ৫১)

Dhaka University Institutional Repository

সংসারের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিশেষ গ্রামের হাটে কৃষকের গমন এবং গমন-কালে প্রয়োজনীয় সংসার-সামগ্রীর বাইরে সখের দ্রব্য কিনে আনার জন্য কৃষক-বধূর বায়না — এও কৃষক-জীবনের এক প্রাণবন্ত চিত্র। নদের চাঁদ যদিও কৃষক নয়, কিন্তু মহুয়ার সঙ্গে বনবাসজীবনে হাটে যাওয়ার সময় মহুয়া কর্তৃক নাকের নথ কিনে আনার আবদার প্রকাশের মধ্যে কৃষক জীবনের ব্যঞ্জনাই পরিস্ফুট হয়েছে।

হাটে যায়রে বন্দ্যার চান সোনাগুনি পথ।
বাদ্যার ছেরি ডাক্যা বলে "কিন্যা আইন নথ" ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩৬)

'আয়না বিবি' গাথায় বিধৃত এ-ধরনের চিত্রটি অধিকতর উজ্জ্বল। মামুদ উজ্জ্যালের হাট-গমনকালে আয়না বিবির বায়নার তালিকা আরও দীর্ঘ। তালিকায় রয়েছে : অভ্রের চিরুনী, নাকের নথ, আসমান তারা শাড়ী, সুগন্ধী তৈল প্রভৃতি।

উজ্জ্যাল সাধু হাটে যায়রে কিন্যা আনবে কি।
আয়নার লাগ্যা কিন্যা আনবে আসমান তারা শাড়ী ॥
আসমান তারা শাড়ী নারে মধ্যে মধ্যে ফুল।
এই শাড়ী পিন্ধিয়া কন্যা যাইব জলের ঘাটে ॥ (পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি.স.পৃ ২০৩)

কৃষক-বধূর জলের ঘাটে গমন ছাড়া আর যাওয়ার স্থান কোথায়। আর আছে প্রতিবেশীর বাড়ি। কিন্তু কাজের চাপে সে-অবকাশ বের করা কঠিন। তাই নতুন শাড়ি পরিধান করে কেবলমাত্র জলের ঘাটে যাওয়ার কামনাই তার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়।

বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়

সাধারণ দরিদ্র পরিবারগুলির গৃহ ও গৃহ-পরিপার্শ্ব চিত্রই তাদের দারিদ্র্যের স্বাক্ষর। 'মহুয়া' গাথায় বেদে-দলকে জমিদার নদের চাঁদ কর্তৃক বসবাসের জন্য জমি দেওয়া হলে, তারা সেখানে গৃহ ও বাসোপযোগী পরিবেশ রচনা করে। চৌচালা গৃহের চারিপাশে বেগুন, শিম, কচু ও কলা গাছ রোপনের মধ্যেই তাদের দীনতার স্বাক্ষর স্পষ্ট :

নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা বানলো জুইতের ঘর।
লীলুয়া বয়ারে কইন্যার গায়ে উঠল জ্বর ॥
নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা লাগাইল বাইঙান।
... ...
নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা লাগাইলো উরি।
... ...
নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা লাগাইলো কচু।
... ...
নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা লাগাইলো কলা।
... ...
নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা বানালো চৌআরী। (মৈ.গী.পৃ ১০)

Dhaka University Institutional Repository

আতিথেয়তার আহ্বানের মধ্যেও দৈন্যের পরিচয় মেলে । মহুয়া নদের চাঁদকে অতিথি হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে যেসব সামগ্রী দিয়ে অতিথেয়তা করা হবে, তার একটি বিবরণ দিচ্ছে । তাকে পিড়িতে বসতে দেওয়া হবে এবং মহিষের দধি, সবরী কলা ও সালি ধানের চিরা সংযোগে তার জলাহারের ব্যবস্থা করা হবে :

আমার বাড়ীত যাইওরে বন্ধু বইতে দিয়াম পিরা ।
জল পান করিতে দিয়াম সালি ধানের চিরা ॥
সালি ধানের চিরা দিয়াম আরও সবরী কলা ।
ঘরে আছে মইষের দইরে বন্ধু খাইবা তিনো বেলা ॥ (মৈ. গী. পৃ ১৬)

সেসময় গরুর বদলে মহিষ পালনের প্রচলন অধিক ছিল বলে অনুমিত হয় । একাধিক গাথায় মহিষ লালন-পালন, হালচাষের বাহন হিসেবে মহিষের ব্যবহার এবং গৃহস্থ পরিবারে মহিষের দধি খাবার তথ্য পাওয়া যায় । সাধারণ গৃহস্থ পরিবারেই শুধু নয়, অন্যত্রও অতিথি সেবার জন্যই সবচেয়ে উন্নত সামগ্রী ব্যবহৃত হয় । অতিথি সেবার জন্য ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর এই বর্ণনা থেকেই অনুমান করা যায়, সাধারণ দরিদ্র পরিবারগুলোর আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল । 'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় সাধারণ ব্রাহ্মণ পরিবারে দৈনন্দিন জীবনে আহার্য দ্রব্যসামগ্রীর বর্ণনা আছে ।

সিকায় তুলা দুগ্ধ কলা খাওয়ায় কঙ্কেরে ॥ (মৈ. গী. পৃ ২৬৯)
অন্যত্র, তোমার মাইগা ছিকায় তোলা গামছা-বান্ধা দৈ ॥
গামছা-বান্ধা দৈরে বন্ধু শালিধানের চিড়া । (মৈ. গী. পৃ ২৭৩-৭৪)

ব্রাহ্মণ পরিবারের খাবার দ্রব্য দুগ্ধ-কলা-দধি-চিড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । সাধারণ কৃষক পরিবারে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে পানি-ভাতের প্রচলনও দৃষ্ট হয় :

ঘরে আছিল পানিভাত বাইরা দিল মায় ।
কাচালঙ্কা দিয়া বিনোদ কিছু কিছু খায় ॥ (মৈ. গী. পৃ ৬৫)

কাচালঙ্কা সংযোগে পানিভাত খাওয়ার প্রচলন আজও কৃষক পরিবারে বিদ্যমান । খাবার উপকরণের পাশাপাশি ব্যবহার্য সামগ্রীর বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য । ধনীগৃহে যখন আবের পাখা ব্যবহৃত হচ্ছে, তখন সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে তালের পাখাই একমাত্র ভরসা । 'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় :

আইস আইস বন্ধু খাওরে বাটার পান ।
তালের পাংখায় বাতাস করি জুড়াক রে পরাণ ॥ (মৈ. গী . পৃ ২৭৩)

রাজ পরিবারে যেখানে আমরা শুক পাখী লালনের চিত্র দেখি, সেখানে ব্রাহ্মণগৃহে তোতা পাখী এবং সাধারণ গৃহস্থ ঘরে বুলবুলের বাচ্চা পালনের তথ্য অবহিত হই । 'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় :

ঘরে আছে পোষারে পাখী হীরামণ শারী ।
... ...
রৈল রৈল লীলা তোমার তোতা শারী । (মৈ. গী. পৃ ২৮৫)

'দেওয়ানা মদিনা' গাথায় :

সেইত বুলবুল্যার বাচ্চা জুগুয়ায় রাখিয়া ।

Dhaka University Institutional Repository

দুইজনে পালে তারে যতন করিয়া ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩৮৩)

সাধারণ জ্বরে বা দারিদ্র্যের পীড়নে মানুষের মৃত্যু সংঘটনের চিত্রে কেবল দারিদ্র্যের যন্ত্রণাই সুপরিস্ফুট নয়, সাধারণ মানুষের প্রকৃতি-নির্ভরতা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের নিকট অসহায়ত্ব, চিকিৎসা ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং শাসক ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সাধারণ প্রজাগণের প্রতি চরম অবহেলার প্রমাণও স্পষ্ট। 'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় পর পর পাঁচটি মৃত্যুর তথ্য বিবৃত হয়েছে :

দারুণ রোগেতে হইল মাতার মরণ ॥ (মৈ.গী.পৃ ২৬৭)
চিন্তাজ্বরে গুণরাজ মৈল অবশেষে । (পৃ ২৬৭)
তেরাখিয়া জ্বরে মৈল চন্ডাল সুজন ॥ (পৃ ২৬৭)
অনাহারে অনিদ্রায় মরে চন্ডালিনী ॥ (পৃ ২৬৮)
গায়ত্রী জননী মৈলা শীতলা রোগেতে । (পৃ ২৬৯)

পোষাক পরিধানের ক্ষেত্রেও সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের দীনতার প্রকাশ লক্ষণীয় । ধনাঢ্য সচ্ছল পরিবারে যেখানে অগ্নিপাটের শাড়ী পরিধানের প্রচলন রয়েছে, সেখানে সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের মেয়েরা পরছে সাধারণ সুতীর শাড়ী । 'দেওয়ান ভাবনা' গাথায় :

মামায়ত দিয়াছে কিন্যারে পাছা নীলাম্বরী । (মৈ.গী.পৃ ১৭৫)

ব্রাহ্মণ ভাটুক ঠাকুর অতিশয় স্নেহবশত প্রথমবারের জন্য ভাগ্নীকে যে-শাড়ীটি কিনে দিয়েছে, সেটি হয়ত নীলাম্বরী হয়েছে, কিন্তু অন্যসময় নিশ্চয়ই আরও মোটা কাপড় পরার প্রচলন ছিল । এই বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে 'কাজলরেখা' গাথায় পরিলক্ষিত হয় । বণিক-কন্যা হিসেবে কাজলরেখা বাড়িতে অগ্নিপাটের শাড়ী পরিধান করত, কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বনার কারণে সে দাসীতে পরিণত হয়ে সাধারণ তাঁতের শাড়ী পরছে, ফলে তার মনে ক্ষোভ :

বাপেতে কিনিয়া দিত অগ্নিপাটের শাড়ী ।
সেই অঙ্গে পইরা থাকি জোলার পাছাড়ী ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩৩৪)

সামান্য অর্থলাভের জন্য শত্রুতা সাধনের একটি মর্মান্তিক ঘটনা বিবৃত হয়েছে 'দেওয়ান ভাবনা' গাথায় । বাঘরা নামক এক ব্যক্তি কয়েকমন ধান পাওয়ার লোভে কামাসক্ত দেওয়ানকে অবহিত করছে যে, ব্রাহ্মণ ভাটুক ঠাকুরের গৃহে এক সুন্দরী কন্যা রয়েছে । বাঘরার এই অমানবিক সংকীর্ণ স্বার্থপর আচরণের পেছনে দরিদ্র-জীবনের কশাঘাত ক্রিয়াশীল বলে অনুমান করা যায় ।

দারুণ দুর্জন্যা বাঘরারে কোন্ কাম করে ।
খবর কইল গিয়া ভাবনার গোচরে ॥
...   .
"পরগণা মহালে আছে পরম সুন্দরী ।
ভাটুক বামুনের কন্যা যেমন হুর পরী ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৮১)

খবর প্রদানের জন্য বাঘরার পুরস্কার প্রাপ্তি :

কথা শুন্যা দেওয়ান ভাবনা কোন্ কাম করিল ।
বাঘরারে মাপিয়া কাঠায় যত ধন দিল ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৮২)

Dhaka University Institutional Repository

গোয়ালিনী কর্তৃক দুধে পানি মিশানোর বিষয়টিও দরিদ্র-জীবনেরই প্রতিফলন। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণী-অবস্থানের বৈশিষ্ট্যগুলোই মানুষের আচরণ নির্ধারণে প্রভাব সৃষ্টি করে। দরিদ্র-জীবনকে সহনীয় করে তোলার অভিপ্রায়ে গোয়ালিনী দুধে পানি মিশ্রিত করছে। 'কমলা' গাথায় ঃ

শুন শুন গোয়ালিনী কই যে তোমারে।
আজিকালি উচিত শিক্ষা দিবাম তোমারে॥
চোকা দইয়ে পোকা তোর দুধে দোনা পানি।
এমন বয়স তবু না গেল ভন্ডামী॥ (মৈ.গী.পৃ ১৩০)

নদীজলে স্নান সমাপন ও নদী থেকে খাবার জল সংগ্রহের বর্ণনা একাধিক গাথায় লক্ষ্য করা যাবে। স্নান করার জন্য কিংবা খাবার জল আহরণের জন্য বাড়িতে পুকুর না থাকাই এর সহজ ব্যাখ্যা। তবে গৃহস্থ জীবনের দৈন্যের চিত্রও এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। 'মহুয়া' গাথায় মহুয়া জল আনতে নদীর ঘাটে যায় ঃ

কলসী করিয়া কাঙ্খে মহুয়া যায় জলে।
নদ্যার চান ঘাটে গেল সেইনা সইন্ধ্যা কালে॥ (মৈ.গী.পৃ ১১)

'চন্দ্রাবতী' গাথায় চন্দ্রাবতী ঃ

কলসী লইয়া জলের ঘাটে করিল গমন॥
করিতে নদীর জলে স্নানাদি তর্পণ॥ (মৈ.গী.পৃ ১১৮)

পূজার জন্য পুষ্প সংগ্রহ একটি ধর্মভীরু হিন্দু পরিবারের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনাচারের অঙ্গ। প্রতিদিন প্রত্যুষের এই সাধারণ দৃশ্যটি 'চন্দ্রাবতী' গাথায় চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। চন্দ্রাবতী বলছে ঃ

প্রভাতকালে আইলাম আমি পুষ্প তুলিবারে।
বাপেত করিব পূজা শিবের মন্দিরে॥

বাছ্যা বাছ্যা ফুল তুলে রক্তজবা সারি।
জয়ানন্দ তুলে ফুল ঐ না সাজি ভরি॥
জবা তুলে চম্পা তুলে গেন্দা নানাজাতি।
বাছিয়া বাছিয়া তুলে মল্লিকা-মালতী॥ (মৈ.গী.পৃ ১০৩)

রাজগৃহে পত্রলেখার যেমন প্রচলন ছিল, সাধারণ গৃহস্থ পরিবারেও তেমন প্রচলন ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে রাজগৃহে পত্র লেখার জন্য যে-উপাদান ব্যবহৃত হত, সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে নিশ্চয়ই সেসব উপাদান ব্যবহারের প্রশ্ন ছিল না। 'কমলা' গাথায় জমিদার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রণপত্র লিখছেন সোনার কালী দিয়ে, অথচ 'দেওয়ান ভাবনা' গাথায় সাধারণ গৃহস্থ পরিবেশে পদ্মপত্রের ওপর প্রণয়পত্র রচনার বিবরণ পাওয়া যায় ঃ

কালি দিয়া লেখাম পত্রলো ঐ না পদ্মের পাতে। (মৈ.গী.পৃ ১৭৯)

'চন্দ্রাবতী' গাথায় পুষ্পপত্রের ওপর প্রণয়পত্র রচনায় স্বাক্ষর মেলে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

পরখমে লিখিল পত্র চন্দ্রার গোচরে ।
পুষ্পপাতে লেখে পত্র আড়াই অক্ষরে ॥ (মৈ. গী. পৃ ১০৪)

সাধারণ দরিদ্র পরিবারে বিবাহের আয়োজনে আড়ম্বরতার পরিবর্তে ধর্মানুষ্ঠান পালনের প্রবণতাই অধিকতর লক্ষ্যযোগ্য । ধনী জমিদারগৃহের (কমলা) ও উচ্চবিত্ত কৃষক পরিবারের বিবাহ উৎসব (মলুয়া) আমরা ইতঃপূর্বে লক্ষ্য করেছি । সেখানকার আয়োজনের আড়ম্বরের তুলনায় চন্দ্রাবতীর বিবাহ আয়োজন অতিমাত্রায় অনাড়ম্বরপূর্ণ । এখানে সন্তানের কল্যান কামনায় পিতা-মাতার ধর্মাবেগই প্রধান :

আব্যধিক করে বাপে মন্ডপে বসিয়া ।
তার মাটি কাটে যত সধবা মিলিয়া ॥
সেই না মাটিতে ইটা তৈয়ার করিয়া ।
পঞ্চনারী মিলি দিল তৈল সাল দিয়া ॥
আব্যধিক হইল শেষ জানি এই মতে ।
সোহাগ মাগিল আর মায় বিধিমতে ॥
আগে চলে কন্যার মায় ডালা মাথায় লইয়া ।
তার পাছে কন্যার খুড়ি সোটা হাতে লইয়া ॥
তারপরে যত নারী গীত গুলারে ।
সোহাগ মাগিল কত বাড়ী বাড়ী ফিরে ॥ (মৈ. গী. পৃ ১১০ - ১১)

অমঙ্গলের প্রতীক হিসেবে নানা পশু-পাখির উচ্চারণ কিংবা অন্য কোনো শঙ্কা-কল্পনা সমাজে প্রচলিত ছিল — এমন উদাহরণ বিভিন্ন গাথায় লক্ষ্য করা যায় । যেমন : 'দেওয়ান ভাবনা' গাথায় সুনাই যখন জানতে পারে যে তার মামা তাকে দেওয়ান ভাবনার নিকট সমর্পণ করবে, তখন তার ভেতরকার শংকা সকল কর্মে অমঙ্গলের সংকেত অনুসন্ধান করছে । নদীর ঘাটে জল আনতে যাওয়ার সময় কাকের কর্কশ কন্ঠ, হাঁচি ও টিকটিকির ডাক তার কাছে অশুভ কোনো ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বলে অনুমিত হচ্ছে ।

শুকনা ডালেতে বস্যা কাগায় করে রাও ॥
জলের ঘাটে যাইতে মোরে করিছে বারণ ।
হাঁচি টিকটিকি আর যত অলক্ষণ ॥ (মৈ. গী. পৃ ১৮৩)

'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় গর্গ যখন কঙ্ক ও লীলার প্রাণসংহারে হয়েছে উদ্যত, তখনও তার মনে শংকাভাব পরিলক্ষিত হয় । এই মনের শংকা থেকেই সে প্রকৃতিতে অকল্যানের প্রতীক অনুসন্ধান করছে :

আসিতে পথের মাঝে অমঙ্গল নানা ।
চারিদিকে যেন প্রেত-পিশাচের থানা ॥
কাক সাচান করে দিবসেতে রা ।
ডাক শুনি মুনির কাঁপিল সর্ব্ব গা ॥

Dhaka University Institutional Repository

পথ কাটি শিবা ধায় না চায় ফিরিয়া । (মৈ.গী.পৃ ২৯০)

'দেওয়ানা মদিনা'য়ও একই চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে । দুলাল দেওয়ান হয়ে কৃষক বধু মদিনাকে অস্বীকার এবং স্বীয় পুত্রকে মর্যাদার অজুহাত তুলে অবহেলা করার ফলে তার মনে যে অপরাধবোধ জাগ্রত হয়েছে,সেই অপরাধবোধ থেকেই তার মনে জাগ্রত হয়েছে শংকা । অন্তর্জগতের এই ভীতি বহির্জগতের নানা উপাদানকে অমঙ্গলের প্রতীক রূপে কল্পনায় সহায়ক হয়েছে ।

যাইবার কালে হাঁচির শব্দে বাধা যে পড়িল ।
কতক্ষণ দুলাল মিঞা বাম যে চাহিল ।।
তারপরে মেলা দিয়া সামনে দেখে তেলি ।
ডাইনেতে দেখিল এক গাভীন শিয়ালী ।।
মাথার উপরে ডাকে কাউয়া ছিল রইয়া ।
নানা অলক্ষণ দেখে পন্থে মেলা দিয়া ।। (মৈ.গী.পৃ ৩৮৩)

উপর্যুক্ত উদাহরণসমূহে অমঙ্গলের প্রতীক হিসেবে যেসব উপাদানের উল্লেখ করা হয়েছে, তা এখনও আমাদের গ্রামীণ সমাজে অকল্যানের চিহ্ন হিসেবে সংস্কারাচ্ছন্ন মনে স্বীকৃত । এসব প্রতীক ব্যবহারে রচয়িতার শিল্পচাতুর্যের পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট । রচয়িতাগণ ভবিষ্যৎ অমঙ্গলকে ইঙ্গিতময় করেছেন এসব প্রতীক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ।

রোগে-শোকে দেবতা বা পীরের উদ্দেশ্যে মানত করার প্রচলন ছিল সমাজে । এর মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের ধর্মচিন্তায় সমন্বয়মূলক উপাদানের চিত্র সুপরিস্ফুট হয়েছে । 'মলুয়া' গাথায় চান্দ বিনোদের জ্বর হলে "জোড়া মইষ দিয়া মায় মানসিক করে" । অন্যদিকে 'আয়না বিবি' গাথায় মামুদ উজ্যালের মা পুত্রের ধ্যোপার্জিত ধান থেকে কিছু অংশ প্রথমে পীরের শিরনীর জন্য আলাদা করে রাখছেন : "আগ মুলা হইতে মায় যতনে রাখিল । সেই ধানে পীর মাদারের সিন্নি যে করিল ।।" এছাড়া মামুদ উজ্যালের বাণিজ্যযাত্রার সময় তার মা পুত্রের কল্যাণ কামনায় পীরের উদ্দেশ্যে শিরনী মানত করছে : "পীরের সিন্নি মান্যা মায় আগে পীরেরে ছেলাম জানায় ।" মহুয়া গাথায়ও দেখা যায় : " নদ্যার ঠাকুর খাইতে বইছে গলায় লাগল কাটা । বাদ্যার ছেরি মান্যা থুইছে কালা ধলা পাঠা ।।" সংকটকালে পীর কিংবা দেবতার উদ্দেশ্যে সংকট থেকে উত্তরণের জন্য মানসিক করার প্রচলন থেকে আজও আমাদের পশ্চাদপদ সমাজ বিমুক্ত নয় ।

তৎকালীন সমাজে মেয়েদের অল্পবয়সে বিয়ে দেওয়ার যে-প্রচলন ছিল, একাধিক গাথায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় । ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে এগার-বার বছর বয়সী কন্যার বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবককুল যে উদ্বিগ্ন ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় । বিশেষত এধরনের বয়সে কন্যা অবিবাহিত থাকলে সমাজে যে তা নিয়ে গুঞ্জন উঠত, সেটাই ছিল পিতা-মাতার উদ্বেগের প্রকৃত কারণ । 'মলুয়া' গাথায় উচ্চবিত্ত কৃষক গায়ের মোড়ল হীরাধর দাস ভাবছে :

Dhaka University Institutional Repository

বার না বছরের কন্যা পরমসুন্দরী ।
না হইল বিয়া কন্যার চিন্তা মনে ভরি ॥ (মৈ.গী.পৃ ৫৬)

পিতা-মাতার চিন্তার বিশেষ কারণ সমাজের গুঞ্জনঃ

ঘুরা না যায় অঙ্গের বসন করে টানাটানি ।
তারে দেখ্যা পাড়ার লোক করে কানাকানি ॥
কানাকানি করে কেউ করে ব্যাখলি । (পৃ ৬২)

'দেওয়ান ভাবনা'য় এগার বছরের পিতৃহীন বালিকার বিয়ের ব্যাপারে দরিদ্র বিধবা মাতার উদ্বেগঃ

দশ বচ্ছর গিয়া সুনাই গো এগারতে পড়ে ।
কন্যার যৈবন দেখ্যাগো ভাব্যা চিন্তা মরে ॥
এতেক সুন্দর কন্যাগো তাহেত যুবতী ।
কেবা বিয়া দিব কন্যারগো কেবা করে গতি ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৭৪)

'রূপবতী' গাথায় তিন বছর রাজা রাজ্যে থেকে অনুপস্থিত থাকায় রাজকন্যার বয়স চৌদ্দ বছর হয়ে গেছে । এ-নিয়ে রানীর সীমাহীন উদ্বেগ , সমাজের গুঞ্জন রাজকন্যা বলে নিস্তব্ধ থাকেনি ।

ঘরেতে কুমারী কন্যা বিয়ার যোগ্য হইল ।
চৌদ্দ বছরের কন্যা আবিয়াইত রইল ॥
পাড়ার লোকে কানাকানি রানী তাহা শুনে ।
কি মতে ধরায় কহ নায়ের পরানে॥(মৈ. গী. পৃ ২৪১)

'কাঞ্চনরেখা' গাথায় সওদাগর বণিকও বার বছরের কন্যার বিয়ের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ঃ

এগার বছরের কন্যা বারয় নাই সে পড়ে ।
বিয়ার কাল হইল কন্যার চিন্তে সদাগরে ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩১৮)

দরিদ্র বিধবা থেকে শুরু করে গায়ের মোড়ল, বণিক, রাজা কেউই সম্পদ ও প্রতিপত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও দশ থেকে চৌদ্দ বছরের কন্যার বিবাহ নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে মুক্ত থাকতে পারছে না । অর্থ কিংবা প্রতিপত্তির তুলনায় মধ্যযুগের ধর্মাচ্ছন্ন পশ্চাদপদ পরিবেশে সামাজিক সংস্কারের অধিক শক্তির পরিচয় সুস্পষ্ট হয় এসব কাহিনী থেকে ।

সমৃদ্ধি ও আনন্দের প্রতীক হিসেবে ঘৃতবাতি ব্যবহার, প্রতিরক্ষা কিংবা আত্মহননের জন্য বিষলক্ষের ছুরি (বিষাক্ত ছুরি) ব্যবহার ও কবিরাজী চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন সম্পর্কে গীতিকাসমূহের বিবরণ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় । 'মহুয়া' গাথায় আছে ঃ

জ্বালিয়া ঘীয়ের বাতি ফু দিয়া নিবাই । (মৈ.গী.পৃ ২৪)

কিংবা, আমার বুকে মারবাম আমি এই বিষলক্ষের ছুরি ॥ (পৃ ২৪)

কিংবা, বনে আছে গাছের পাতা তুইল্যা দিবাম আমি ।
এই গাছে বাঁচিবে তোমার পতির পরাণী ॥ (পৃ ৩৩)

Dhaka University Institutional Repository

শ্রাবণ মাসে ভরা বর্ষার দিনে নৌকাবাইচের প্রচলন সম্পর্কে 'দেওয়ানা মদিনা' গাথায় তথ্য পাওয়া যায় ।

নয়া পানিতে আরে দৌড়ের নাও সাজাইয়া ।
আরং জমিব কত দেশ ভাসাইয়া ।। (মৈ.গী.পৃ ৩৬৫)

নিঃসন্তান দম্পতিদের সমাজে অমঙ্গলের প্রতীক হিসেবে কল্পনা করার সংস্কার প্রচলিত ছিল । 'দস্যু কেনারামের পালা'য় তার পরিচয় বিধৃত হয়েছে ঃ

তিনকাল গেলরে তার অপুত্রক হৈয়া ।
মুখ নাহি দেখে লোকে আটখুর বলিয়া ।। (মৈ.গী.পৃ ১৯২)

নিঃসন্তান হওয়ার পারিবারিক বা ব্যক্তিগত যন্ত্রণা থেকে সামাজিক যন্ত্রণাই যে অধিক, তার প্রমাণ এখানে সুস্পষ্ট । নিঃসন্তানদের প্রতি যেমন, তেমনি শিশু বয়সে পিতৃমাতৃহীন হলে তার প্রতিও সমাজের চরম অবহেলা পরিলক্ষিত হয় । 'কঙ্ক ও লীলা'য় কঙ্কের ছয়মাস বয়সকালে পিতামাতার মৃত্যুর ফলে তাকে অমঙ্গলের প্রতীক কল্পনা করে অবহেলা করা হচ্ছে ঃ

খাকুরা বলিয়া কেউ নাহি লয় কোলে ।
সংসারেতে কেউ নাহি শিশুরে যে পালে ।। (মৈ.গী.পৃ ২৬৭)

দাসী ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা তৎকালীন সমাজে যে বিদ্যমান ছিল তার প্রমাণ 'কাজলরেখা' গাথায় স্পষ্ট । গরিব মানুষেরা অর্থের অভাবে সন্তান পালনে ব্যর্থ হয়ে ধনীদের নিকট তাদের বিক্রি করে দিত । 'কাজলরেখা' গাথায় দেখা যায়, আর্থিক অনটনের শিকার এক ব্যক্তি তার তের-চৌদ্দ বছরের কন্যাকে বিক্রির জন্য পথে বেরিয়েছে, কিন্তু কারো কাছে সে কন্যাকে দাসী হিসেবে বিক্রি করতে পারেনি । বনবাসী সওদাগর-কন্যা কাজলরেখা এই কন্যাকে তার হাতের কঙ্কণ দিয়ে দাসী হিসেবে ক্রয় করে ঃ

কর্মদোষে কাজলরেখা হইছিল বনবাসী । 384588
কঙ্কণ দিয়া কিনল ধাই নাম কাঙ্কণ দাসী ।। (মৈ.গী.পৃ ৩২৫)

গুপ্তধন প্রাপ্তির ঘটনা এবং সেই ঘটনার প্রতি জমিদারের সহজ বিশ্বাসের কাহিনী বিধৃত হয়েছে 'কমলা' গাথায় ঃ

চাকলাদার পাইছে ধন মাটি যে খুড়িয়া ।
সাত ঘড়া মোহর কেবল গনিয়া বান্ধিয়া ।।
না জানায় এই কথা মানিক গোচরে ।
জমিদারের ধন আইন্যা রাখছে নিজ ঘরে ।। (মৈ. গী.পৃ ১৩৯)

তৎকালীন সমাজে যে মাটি খুড়ে ধন পাওয়া সম্ভব ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় । কেননা ঐসময়ে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেনি । ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ সঞ্চিত অর্থ মাটির নিচে লুকিয়ে রাখবে — এটা খুবই সম্ভব ছিল বলে অনুমান করা যায় । এবং সেই লুক্কায়িত ধন পরবর্তীকালে ঘটনাচক্রে সন্ধান পাওয়ার বিষয়টিও তাই বিশ্বাসযোগ্য ।

Dhaka University Institutional Repository

গীতিকাসমূহের দুইস্থানে দুর্ভিক্ষের চিত্র আছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শস্যহানির ফলে 'নছুয়া' গাথায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। 'দস্যু কেনারামের পালা'য় আমরা ভয়াবহ মন্বন্তরের চিত্র লক্ষ্য করি। অনাবৃষ্টির ফলে শস্যহানি ঘটায় এই মন্বন্তরের সৃষ্টি হলো খাদ্যাভাবে, অনাহারে লোক মারা যাচ্ছে। খাদ্যের অভাবে প্রথমে অখাদ্য, যেমনঃ গাছের পাতা, ঘাস, খেয়েও জীবন ধারণ করতে সক্ষম হচ্ছে না।

আকাল হইলোগো অনাবৃষ্টির কারণ ॥
এক মুষ্টি ধান্য নাহি গৃহস্থের ঘরে।
অনাহারে পথে ঘাটে যত লোক মরে ॥
আগেত বৃক্ষের ফল করিল ভোজন।
তাহার পরে গাছের পাতা করিল ভক্ষণ ॥
পরেত ঘাসেতে নাহি হইল কুলান।
ক্ষুধায় কাতর হৈল যত লোকজন ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৯৫-৯৬)

এমন ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে যখন মানুষের আহারের কোনো ব্যবস্থা নেই, তখন স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি, গরু-বাছুর, এমনকি স্ত্রী-পুত্র সবকিছু বিক্রি করে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছে :

গরু বাছুর বেচিয়া খাইল খাইল হালিধান।
স্ত্রী পুত্র বেচে নাহি গো গণে কুলমান ॥
পরমাদ ভাবিল মাতুল কেমনে বাঁচে প্রাণ।
কেনারামে বেচ্যা লইয়া পাঁচ কাঠা ধান ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৯৬)

গর্ভবতী রমনীর শারীরিক লক্ষণ এবং সুবিধা-অসুবিধার বিবরণের ন্যায় একান্ত প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'দস্যু কেনারামের পালা'য় :

সুগোল সুন্দর তনু গো লাবণিজড়িত।
সর্ব্ব অঙ্গ দিনে দিনে হইল পূরিত ॥
অজীর্ণ অরুচি আর মাথাঘোরা আদি।
আলস্য জড়তা হৈল আছে যত ব্যাধি ॥
সর্ব্ব অঙ্গে জ্বালা মাথা তুলিতে না পারে।
আহার করিয়া মাত্র ফেলে বমি করে ॥
রুচি হৈল চুলা আর ছিকর মাটীতে।
বিছানা ছাড়িয়া শুয়ে কেবল ভূমিতে ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৯৪)

মধ্যযুগের সাহিত্যে গৃহস্থ জীবনের হাসি-কান্না, আনন্দ-যন্ত্রণার চিত্র অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে চিত্রিত হয়েছে। ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে উল্লিখিত বিবরণ থেকে মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ময়মনসিংহের গীতিকায় প্রোষিতভর্তৃকা নারীর বিরহ-দুঃখ নিয়ে 'বারমাসী' বর্ণনার রীতি থেকে মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রভাব আরও প্রমাণিত হয়। বিষয়টি পৃথকভাবে আলোচিত হয়েছে।

মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি তৎকালীন সমাজে নিঃসন্দেহে প্রবল ছিল। এবং প্রতিকূলতার

Dhaka University Institutional Repository

আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাদের আত্মহত্যার কোনো বিকল্প ছিল না । প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলার আশংকা থাকলে, তাই তারা বিষদ্রব্য সঙ্গে রাখত–এমন তথ্য একাধিক গাথায় লক্ষ্য করা যায় । 'দেওয়ান ভাবনা'য় ঃ

সঙ্গে লইল জহরের লাড়ু কটরায় ভরিয়া । (মৈ.গী.পৃ ১৮৯)

'মহুয়া'য় ঃ পাহাড়ীয়া অঙ্গের বিষ দিয়ে বান্ধা ছিল । (মৈ.গী.পৃ ২৯)

'মহুয়া তার কেশমধ্যে বাহিত বিষ আত্মহত্যায় কাজে ব্যবহার করেনি । শত্রুর নিধন-কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল এই বিষ । তবে আত্মরক্ষার লক্ষ্য থেকেই তাকে শত্রুর নিধনের জন্য বিষ ব্যবহার করতে হয়েছিল ।

তৎকালীন সমাজে ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে শিব, দুর্গা ও মনসা পূজার প্রচলন ছিল, এমন প্রমাণ ময়মনসিংহের গীতিকায় পাওয়া যায় । 'চন্দ্রাবতী' গাথায় বংশীদাশ কর্তৃক শিব পূজা প্রদানের তথ্য আমরা ইতঃপূর্বে অবহিত হয়েছি । মনসার কৃপায় কেনারামের মা কেনারামকে গর্ভে ধারণ করেছিল – এমন তথ্য 'দস্যু কেনারামের পালা'য় বিবৃত হয়েছে ঃ

রাত্রি না নিশার কালে ঘোরে অচেতন ।
যশোধারা দেখিল এক অপূর্ব্ব স্বপন ॥
দেখিল শিয়রে এক দেবী অধিষ্ঠান ।
চতুর্ভুজ ত্রিনয়নী পদ্মা মূর্ত্তিমান ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৯৩)

সাধারণ ব্রাহ্মণ গৃহে মনসার আবির্ভাব এখানে লক্ষ্য করা যায় । হয়ত সে সময়ে মনসা পূজার প্রচলন হয়েছে সর্বত্র । এছাড়া 'দেওয়ান ভাবনা' গাথায় জমিদার-গৃহে দুর্গা ও মনসার পূজা প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

'শায়ন মাসেতে দূতী পূজিল মনসা ।' (মৈ.গী.পৃ ১৮৭)

এবং 'আশ্বিন মাসেতে দূতী দুর্গাপূজা দেখে ।' (পৃ ১৮৭)

ঋতুবৈচিত্র্যময় বাংলাদেশে ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়ার পরিবর্তন, খাওয়ার রুচি পরিবর্তন, বিভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন ফলের সমারোহ এবং ফলের সহজলভ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন প্রকার পিঠা তৈরির প্রচলন আজও সমগ্র দেশে লক্ষ্য করা যায় । বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আম, ভাদ্র মাসে পাকা তালের সঙ্গে তালের পিঠা প্রচলনের কথা গীতিকাসমূহে বিধৃত হয়েছে । 'চন্দ্রাবতী' গাথায় ঃ

বৈশাখ মাসেতে হয় রবি খরতর ।
গাছেতে পাকিল আম অতি সুবিস্তর ॥ (মৈ.গী.পৃ ১১৪)

'দেওয়ান ভাবনা' গাথায় ঃ

জ্যৈষ্ঠ মাসেতে দূতী গাছে পাকনা আম । (মৈ.গী.পৃ ১৮৮)

Dhaka University Institutional Repository

অন্যত্র, ভাদ্র মাসেতে দুটী গাছে পাকন তাল । (পৃ ১৮৭)

'কমলা' গাথায় ঃ

ভাদ্র মাসে তালের পিঠা খাইতে মিস্ট লাগে । (পৃ ১৬২)

ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে প্রধানত শাসক ও বণিক শ্রেণীর গৃহে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে উচ্চবিত্ত কৃষকের গৃহেও, সোনার বহুল ব্যবহার একটি বৈশিস্ট্যপূর্ণ উপাদান হিসেবে লক্ষণীয় । সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে স্বর্ণব্যবসায়িদের (সুবর্ণবণিক) অস্তিত্ব কিংবা স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় ।[১৮] ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে সোনার বহুল ব্যবহার থেকেও অনুমান করা যায়, প্রাচীনকাল থেকে এদেশে গার্হস্থ্য জীবনে স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহারের প্রচলন ছিল । সচ্ছল পরিবারে, বর্তমানকালের মতো সেযুগেও ফ্যাশন ও প্রতিপত্তির প্রতীক হিসেবে স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ।

বিভিন্ন শ্রেণী বা স্তরের জনগণের জীবনোপকরণ আলোচনায় স্পস্ট হয়েছে যে শাসক জমিদার-দেওয়ানগণ দন্ডমুন্ডের কর্তা হলেও বণিক শ্রেণীর হাতে নগদ অর্থের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি । বণিক শ্রেণীর জীবনাচরণে প্রতিপত্তির দীপ্তি অনেক বেশি উজ্জ্বল ।

জীবনাচরণ ও জীবনোপকরণের বৈভিন্ন্য দ্বারা শ্রেণী-বৈষম্য দৃস্টিগ্রাহ্য হলেও কতগুলো সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার শ্রেণী ও স্তরনির্বিশেষে সকলের জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে । প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের দিক থেকে উচ্চ-নিচ-শ্রেণী-স্তরের জনগণের জীবনসীমায় যে ব্যবধান ছিল না, তারই প্রমাণ এখানে সুস্পস্ট । এর বড় কারণ, সমাজের পশ্চাদপদতা । এই পশ্চাদপদতার সঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কৃষক যেমন ফসল হারিয়ে নিঃস্ব ও উন্মূলিত হয়েছে, তেমনি বণিকের নৌকাভুবিও তাকে সর্বস্বহারায় পরিণত করেছে । স্নান ও পানীয় জলের জন্য নদী-নির্ভরতা সাধারণ দরিদ্র পরিবারের পাশাপাশি প্রতিপত্তিশালী বণিক পরিবারের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল । অর্থাৎ অর্থ ও প্রতিপত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের অনুপস্থিতির ফলে সমাজের উচ্চতর স্তরের ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে দরিদ্র ব্যক্তিদের সংস্কারগত মানসিকতার ব্যবধান সৃস্টি হয়নি ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নীতিবোধ ও নৈতিকতা

ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে বিধৃত বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনাচরণ ও জীবনাকাঙ্ক্ষায় সামগ্রিকভাবে যে-জীবনবোধের উজ্জীবন ঘটেছে, তা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিমন-আশ্রয়ী। শাস্ত্র-শাসিত, শাস্ত্র-পীড়িত কিংবা শাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত নয় এই জীবনচেতনা; চরিত্রসমূহ তাদের জীবন-অভীপ্সা ও জীবন-সংঘর্ষের নানা টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়ে উজ্জীবিত হয়েছে এই জীবননীতিতে। একই কাল-পরিধিতে সৃষ্ট মঙ্গলকাব্যসমূহে আমরা যে-প্রকার ধর্মচিন্তা বা ধর্মানুশীলন প্রত্যক্ষ করি ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে তা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। অনুপস্থিতির কারণ ইতঃপূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে[১৯], এ-পর্বে অনুপস্থিতির স্বরূপ বিশ্লেষণ আবশ্যক।

অনুল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের কোথাও ধর্মবুদ্ধির জয় ঘোষিত হয়নি। ব্যক্তিজীবনউদ্দীপনা বা ব্যক্তিজীবনতৃষ্ণাই সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই জীবনতৃষ্ণা ধর্মচেতনামুক্ত, এবং এর উৎসমূলে রয়েছে: ব্যক্তির অভিরুচি, অভিলাষ এবং তা চরিতার্থতাকালে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও তার মধ্য দিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা। ফলে গীতিকাসমূহে প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যবোধ সুপরিস্ফুট। মধ্যযুগের সাহিত্যে বিশেষত মঙ্গলকাব্যে ধর্মচিন্তাচ্ছন্নতা প্রবল থাকায় সেখানে ব্যক্তি-জীবনের স্পন্দন আছে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের জাগরণ নেই; ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু বিচার্য হওয়ায় ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যচিন্তা বিকাশের অবকাশ পায়নি। কিন্তু ময়মনসিংহের গীতিকার রচয়িতাগণ ধর্মবুদ্ধিতাড়িত না হওয়ায় এখানে ব্যক্তিত্বের জাগরণ অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে গীতিকাসমূহে ধর্ম আছে, ধর্মকৃত্য আছে, ধর্মচিন্তাও আছে, নেই ধর্মাচ্ছন্নতা। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যচেতনার উন্মেষ ও বিকাশের ফলে ব্যক্তিজীবন-আশ্রয়ী নীতিবোধের বিকাশও ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমেই ধর্মপ্রসঙ্গটি বিবেচ্য। ময়মনসিংহের গীতিকার ঊনচল্লিশটি গাথার মধ্যে ধর্মপ্রসঙ্গ এসেছে এগারটি গাথায়। এরমধ্যে তিনটি গাথাই কেবল সম্পূর্ণভাবে ধর্মচিন্তা-আশ্রয়ী। 'দস্যু কেনারামের পালা', 'গোপিনী-কীর্তন' ও 'চন্দ্রাবতীর রামায়ন'-এ প্রবল ধর্মবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। 'দস্যু কেনারামের পালা'র অধিকাংশ স্থান জুড়ে মনসার ভাসান গীত হয়েছে। সে-কারণে এর নামকরণ 'দস্যু কেনারামের পালা' না হয়ে 'মনসার ভাসান' হলে অধিকতর যৌক্তিক হত। মনসার ভাসান শুনিয়ে দস্যু কেনারামকে দস্যুবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত করার কাহিনীই এর মূল প্রতিপাদ্য। 'গোপিনী-কীর্তন'-এ রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা এবং 'চন্দ্রাবতীর রামায়নে'-এ চন্দ্রাবতীকৃত রামায়ণের আংশিক বাংলা-ভাষ্য বিবৃত হয়েছে। এই তিনটি গীতিকাই গাথা-ধর্মের মূল স্রোত থেকে বিচ্যুত। এই বিচ্যুতির কারণে ময়মনসিংহের গীতিকার ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনায় উল্লিখিত গাথাত্রয় অনুল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হিসেবেই চিহ্নিত থাকবে।

অন্য যে আটটি গাথায় ধর্মপ্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে, তার মধ্যে 'কমলা' গাথায় ধর্মের নামে বিকৃত মানসিকতার অর্থাৎ নরবলি দিয়ে কালীপূজা পালনের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'সমাজ ও সংস্কৃতি' এবং 'জীবনোপকরণ' শীর্ষক আলোচনায় ধর্মক্রিয়া প্রসঙ্গে এ-বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। 'মুকুট রায়' গাথায় আকস্মিক ইসলামী আধ্যাত্মিকতার প্রসঙ্গ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গাথাটির বস্তুনিষ্ঠতা ক্ষুন্ন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গাথাটি যৌক্তিক পরিণতি অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে । মূল গাথাটি পরবর্তীকালে কোনো মুসলিম রচয়িতার হাতে পড়ে এমন বিকৃতরূপ ধারণ করেছে বলে অনুমিত হয় । ফলে 'মুকুট রায়' গাথায় বিধৃত পীরের অলৌকিকতার বিষয়টিও ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক ।

মূলত ছয়টি গাথার ধর্মপ্রসঙ্গই এক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য । এরমধ্যে 'মলুয়া,' 'চন্দ্রাবতী' এবং 'কঙ্ক ও লীলা'য় ধর্মীয় কঠোর অনুশাসনের রূপ পরিদৃশ্ট হয় । তবে ব্যক্তিজীবনঅভীপ্সা এই অনুশাসনকে হার মানিয়েছে । 'রূপবতী', 'কমলারাণীর গান' ও 'বারতীর্থের গান' গাথাত্রয়ে আমরা ধর্মের সামাজিক রূপ প্রত্যক্ষ করি । ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে ধর্মচিন্তার স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য সামাজিক কল্যাণ-অকল্যাণের সঙ্গে ধর্মের সমন্বয়ধর্মী অন্বয়েের দিকটিই মুখ্যভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন ।

'মলুয়া' গাথায় দেওয়ান কর্তৃক অত্যাচার-পীড়িত হয়ে নিজের সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় তিন মাসকাল মলুয়া দেওয়ান-গৃহে অবস্থান করায় চান্দ বিনোদের নিকটাত্মীয় ব্রাহ্মণগণ তাকে শাস্ত্র-অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করার অর্থাৎ স্ত্রী হিসেবে মলুয়াকে পরিত্যাগ করার বিধান দেন । এই বিধান জাগতিক বিচার-বিবেচনার ঊর্ধ্বে । দেওয়ানের গৃহে থাকলেও মলুয়ার ধর্মচ্যুতি ঘটেছে কিনা, মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিচার-বিবেচনা ব্রাহ্মণেরা করেননি । চান্দ বিনোদ এই ব্রাহ্মণ্য-বিধান বাধ্য হয়ে মেনে নিলেও গাথায় মলুয়ার একনিষ্ঠ প্রণয়াকাঙ্ক্ষা, তার প্রতি সমগ্র সমাজের সহানুভূতি এবং চান্দ বিনোদের মনে স্ত্রীর মর্যাদায় মলুয়ার অবস্থান অব্যাহত থাকা প্রভৃতির ফলে ব্যক্তিজীবন-তৃষ্ণার নিকট ধর্মীয় অনুশাসনের পরাজয় ঘটেছে । এই পরাজয় 'চন্দ্রাবতী' এবং 'কঙ্ক ও লীলা'য়ও লক্ষণীয় । 'চন্দ্রাবতী' গাথায় চন্দ্রাবতীর প্রণয়প্রত্যাশী জয়ানন্দ ধর্মান্তরিত হলে বংশীদাস তার কন্যা চন্দ্রাবতীকে জয়ানন্দ-প্রসঙ্গ বিস্মৃত হয়ে ধর্মপালনের নির্দেশ দেন । এই নির্দেশ চন্দ্রাবতী কর্তৃক কঠোরভাবে পালন করায়, এমনকি জয়ানন্দের শেষ বিদায়ক্ষণে একবারমাত্র দর্শন-প্রার্থনাও পিতৃআদেশে ধর্মসাধনাবিচ্যুতির ভয়ে প্রত্যাখ্যাত হলে আপাতঃদৃষ্টিতে ধর্মচর্যার জয় হয়েছে বলে প্রতিভাত হয় । কিন্তু গাথার শেষ দৃশ্যে জয়ানন্দের শেষ বিদায় ও আত্মবিসর্জনের ঘটনায় চন্দ্রাবতীর হৃদয়চাঞ্চল্য ও অশ্রুবর্ষণের দৃশ্যই আমাদের বলে দেয়, হৃদয়ানুভূতির নিকট ধর্মভাবনার পরাজয় ঘটেছে । 'কঙ্ক ও লীলা'য় প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণগণ শিশুকালে কয়েক বছর চণ্ডালগৃহে লালিত-পালিত হওয়ার দায়ে কঙ্ককে ব্রাহ্মণ-সমাজভুক্ত করার বিরোধিতা করেন । কিন্তু প্রবল কবিত্বশক্তির বলে কঙ্কের সমাজ-প্রতিষ্ঠালাভের এমন কাহিনী বিধৃত হয়েছে গাথায়, যার ফলে ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের অসারতা সহজেই পরিদৃশ্ট হয় । ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের পরাজয় সম্পূর্ণ হয়েছে গাথার শেষ দৃশ্যে, ব্রাহ্মণ গর্গের ধর্মচিন্তা মুক্ত একান্ত মানবীয় জীবনস্ফূর্তি লাভের মধ্য দিয়ে ।

ধর্মচিন্তার সঙ্গে সামাজিক সমন্বয়ের বিষয়টি রূপবতী গাথায় প্রথমে দৃষ্ট হয় । রাজা রামচন্দ্র প্রতিপত্তি ও মর্যাদা অর্জনের বিনিময়ে কন্যা রূপবতীকে নবাবের নিকট সমর্পন করার জন্য নবাব কর্তৃক আদিষ্ট হন । কিন্তু মুসলমান নবাবের নিকট ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র তার কন্যাকে অর্পণ করতে কিছুতেই সম্মত হতে পারছেন না । তিনি প্রতিজ্ঞা করছেন যে পরদিন প্রভাতে প্রথমে যার সঙ্গে দেখা হবে, সে যে-ই হোক, তার নিকট কন্যার বিয়ে দেবেন, কিন্তু নবাবের নিকট কন্যা সমর্পণ করবেন না ।

Dhaka University Institutional Repository

রামচন্দ্রের এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণের অনুরাগে ধর্মভাবনার চেয়েও অধিকতর ক্রিয়াশীল তার ব্যক্তি-রুচি ও নির্লোভ-স্বার্থশূন্য-স্বাতন্ত্র্যবাদী জীবনচেতনা। তৎকালে ভারতবর্ষীয় হিন্দু রাজাগণ মুসলিম শাসকদের হস্তে কন্যা অর্পণ করে প্রতিপত্তি ও সম্মান বৃদ্ধি করে কৃতার্থ হতেন। এটাই ছিল সাধারণ প্রবণতা। কিন্তু এই প্রবণতার বিপরীতে সম্পদ, প্রতিপত্তি ও মর্যাদা-লোভ পরিত্যাগ করে জীবনের ঝুঁকি গ্রহণের মধ্যে রামচন্দ্র-চরিত্রের যে-দৃঢ়তা পরিস্ফুট হয়েছে, তা ধর্মভাবনাতাড়িত নয়; তার ধর্মচিন্তার সঙ্গে সামাজিক কল্যাণ-অকল্যাণবোধের সুসমন্বয় সাধনের ফলেই এই দৃঢ়তা প্রদর্শন সম্ভব হয়েছে। 'কমলা রাণীর গান' গাথায় ধার্মিক রাজা দীঘি খনন করিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে জলের আবির্ভাব না ঘটায় সংস্কারাচ্ছন্ন মনে ধর্মভীতি জাগ্রত হয়েছিল। তবে যখন একমাত্র রাণীর আত্মবিসর্জনের বিনিময়েই জলের আবির্ভাবে ঘটা সম্ভব এই প্রশ্নটির মুখোমুখি হলেন রাজা, তখন দেখা গেল, তার ধর্মভাবনা ম্লান হয়ে গেছে এবং তিনি রাণীর আত্মবিসর্জনে কোনোভাবেই সম্মতি দিতে পারছেন না। অন্যদিকে রাণী সংস্কারবশত আত্মবিসর্জনে উদ্যোগী হলেও, দেখা গেল, পরলোকে বসেও দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা বিস্মৃত হতে পারছেন না এবং তাকে দুগ্ধসেবনের ব্যবস্থা করছেন। রাজা ও রাণী উভয়ের আচরণেই ধর্মবুদ্ধির চেয়ে মানবীয় কল্যাণ-আকাঙ্ক্ষাই প্রবল। ধর্মের একটি সামাজিক রূপ এর মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটিত হয়। 'বারতীর্থের গান' গাথায় বিষয়টি আরও স্পষ্ট। রাজা ভগদত্ত দীঘি খনন করে, বারতীর্থের জল দ্বারা তার জল পবিত্র করে মায়ের পুণ্যস্নানের অন্তিম-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছিলেন। বারতীর্থের জল সংগ্রহের জন্য তৎকালে পশ্চাদপদ যাতায়াত ব্যবস্থায় দুর্গম পথ অতিক্রম করার জন্য রাজা ভগদত্তকে অপরিসীম ক্লেশ স্বীকার করতে হয়েছিল। তবে তার এই ক্লেশ স্বীকারের মধ্যে ধর্মচিন্তা যত-না ক্রিয়াশীল, তার তুলনায় প্রবল হয়ে উঠেছিল মাতৃআজ্ঞা পালনের মানবীয় প্রেরণা। তিনি তার মনোভাবের কথা ব্যক্ত করে বলেছেন, যে-মায়ের জন্য তিনি পৃথিবীর সুখভোগে সক্ষম হয়েছেন, সেই মায়ের অন্তিম-ইচ্ছা পূরণের জন্য রাজ্য বিসর্জন দিতেও তিনি নির্দ্বিধ।

তখন ভগদত্ত বলছে ভাইরে দুঃখ কইর না।
এই না দেখ পয়দা করছে আমার সোনার মা ॥
হে-হে-হে
সেইত মায়ের মোন বাসনা মিটাইবার যদি না পারি
ধন বেসাতি বেবাক মিথ্যা দালান কোঠাবাড়ী ॥
হে-হে-হে (পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি.স.পৃ ৫১৯)

অন্যত্র, মুনীরা কয় রাজামশয় কথা কইতে হয় যে ভয়।
এই দীঘি কাটিতে হৈল রাজ্য হলো ক্ষয় ॥
হে-খে-হে
রাজা কৈল মায়ের কুমে প্রতিজ্ঞা কইরাছি যা।
রাজিত্বি আর পরাণ গেলেও ছৈরব আমি তা ॥
হে-হে-হে (পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি.স.পৃ ৫২৪)

এখানেই মানবীয় জীবন দৃষ্টির এই উদাহরণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করার শাস্ত্রীয় অনুশাসনটি আর অনুশাসন নেই, তার সামাজিক সমন্বয় ঘটেছে প্রবলভাবে। 'মলুয়া' ও 'চন্দ্রাবতী' গাথায় ধর্মের সামাজিক রূপের প্রতিফলন বিচ্ছিন্নভাবে লক্ষ্য করা যায়। চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও মলুয়া সচ্ছল পিত্রালয়ে যেতে অনিচ্ছুক। কেননা তার কাছে শ্বশুরালয়ই তীর্থস্থান। শাশুড়ীর সেবা করা ধর্মপালনেরই অঙ্গ হিসেবে তার কাছে প্রতিভাত হয়েছে। স্বামী-গৃহে অনুপস্থিত, শাশুড়ী

Dhaka University Institutional Repository

মুগ্ধ — শত দারিদ্র্যের মধ্যেও এমন পরিস্থিতিতে তার স্বামীগৃহত্যাগ অনুচিত — মলুয়া এক্ষেত্রে ধর্মীয় যুক্তি হয়ত দাঁড় করিয়েছে, কিন্তু এর অন্তরালে ধর্মভাবনার চেয়েও সামাজিক কল্যাণ-অকল্যাণবোধই প্রবল। মলুয়ার ঔচিত্যভাবনা সমাজসতর্কতারই নামান্তর। 'চন্দ্রাবতী' গাথায় বংশীদাস পূজায় বসে বিবাহযোগ্যা কন্যার শীঘ্র বিবাহ ও ভালো বরের প্রার্থনা করেছেন শিবের নিকট। ব্যক্তি-জীবনের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ের সঙ্গে ধর্মচর্যাকে সমন্বিত করার বিষয়টি সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। ব্যক্তি-জীবনকামনা পূরণের জন্য ইতিবাচক অর্থে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণের মধ্যে ধর্মের সামাজিক রূপটিই অভিব্যক্ত হয়।

ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যচিন্তার যে-প্রাণচাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হয়, তা তিনটি শাখায় পত্রপল্লবিত হয়েছে। নারীর ব্যক্তি-অভিরুচি-আশ্রয়ী সতীত্বভাবনা, পতিনির্বাচনে স্বাধীন-মনস্কতা এবং প্রণয়ে একনিষ্ঠতা, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা — এই তিন ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যচিন্তার বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। সতীত্বভাবনার বিষয়টি প্রথমেই বিবেচ্য। এক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটেছে সুস্পষ্ট ও প্রবলভাবে। 'মলুয়া', 'কমলা', 'কঙ্ক ও লীলা', 'কাজলরেখা', 'ধোপার পাট', 'মহুয়া মা', 'শ্যাম রায়ের পালা', 'আয়নাবিবি', 'আঁধা বন্ধু', 'বীর নারায়ণের পালা', 'রতন ঠাকুরের পালা', 'পীর বাতাসী' প্রভৃতি গাথায় সতীত্বের প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে। সর্বত্রই সমাজের ধর্মাচ্ছন্ন মানসিকতার পটভূমিতে বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট নারী চরিত্রগুলি তাদের ব্যক্তিজীবনপ্রতীক্ষা, অভিরুচি ও দৃঢ়তার বলে সতীত্বকে অক্ষুণ্ন রেখেছে কিংবা স্বীয় প্রণয়াকাঙ্ক্ষার পট-ভূমিতে সতীত্ব-চিন্তার বিকাশ ঘটিয়েছে। একাধিক গাথায় নারী চরিত্রগুলি শাসক-শক্তির লালসার শিকার হয়েছে, কিন্তু শাসক-শক্তির কামলালসার কাছে একটি চরিত্রও আত্মসমর্পণ করেনি, বুদ্ধিপ্রয়োগে সতীত্বকে অক্ষুণ্ন রেখেছে কিংবা যখন সে-পথ পুরোপুরি বন্ধ হয়েছে, তখন বিষপানে আত্মবিসর্জন দিয়েছে, কিন্তু সতীত্ব হারায়নি। অবাঞ্ছিতজনের কামলালসার নিকট আত্মসমর্পণ করলে সতীত্বহানি ঘটে, কিন্তু বাঞ্ছিতজনের নিকট দেহমন সমর্পণে সতীত্বহানির কারণ হয় না — এজাতীয় সতীত্বচিন্তাই ময়মনসিংহের গীতিকার নায়িকাদের মনে ক্রিয়াশীল ছিল। মলুয়া তিনমাস দেওয়ান-গৃহে অবস্থান করে, কমলা নিরুদ্দেশযাত্রী হয়ে কিংবা জমিদারপুত্র প্রদীপকুমারের তত্ত্বাবধানে থেকে, কঙ্ক ও লীলা পারিবারিক আবহে পারস্পরিক অনুরাগে দগ্ধ হয়ে সুপ্ত প্রণয়বাসনাকে হৃদয়মধ্যে লালন করে, কাজলরেখা স্বামীর বন্ধুর কূটচক্রের শিকার হয়ে, আয়না বিবি স্বামী অনুসন্ধানে নিরুদ্দেশগামী হয়ে, অন্ধ বংশীবাদকের প্রতি অনুরাগবশত রাজকন্যার স্বামীগৃহ ত্যাগে কিংবা বীরনারায়ণের সঙ্গে সোনার একরাত্রির নৌকাযাত্রায় কোথাও সতীত্বহানির কারণ ঘটেনি। পশ্চাদপদ সমাজ মলুয়া, লীলা, কাজলরেখা, আয়নাবিবি, সোনা প্রমুখের সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, কিন্তু গাথা-মধ্যে সতীত্বহানির কোনো সাক্ষ্য পরিলক্ষিত হয় না। সমাজের প্রশ্ন উত্থাপনকে অযৌক্তিক বলেই প্রতিভাত হয়। এঁরা সকলেই স্বীয় ব্যক্তিত্ববলে, প্রণয়বাসনার প্রতি আন্তরিকতাবলে সতীত্বকে অক্ষুণ্ন রেখেছে। অবাঞ্ছিতজনের নিকট দেহমন সমর্পণে সতীত্বহানি আর বাঞ্ছিতজনের নিকট আত্মনিবেদনে সতীত্ব অক্ষুণ্ন থাকার বোধটি 'মহুয়া মা', 'শ্যামরায়ের পালা' ও 'পীর বাতাসী' গাথায় ভিন্নতর মাত্রায় সুস্পষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হয়েছে। গাথাত্রয়ে বিবাহিত স্বামীর পরিবর্তে প্রণয়ীর নিকট আত্মনিবেদনের কাহিনী বিধৃত হয়েছে। প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিতে এদের ব্যভিচারী ও অসতী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ত চলে, কিন্তু গাথা-রচয়িতাগণ মহুয়া মা, ডোম-বধূ ও পীর বাতাসীকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

কাউকে অসতী অভিধায় আখ্যায়িত করা সম্ভব হয় না, বরং তারা যদি প্রণয়ীকে বিস্মৃত হয়ে পতিপ্রাণা হয়ে উঠত, তাহলেই হয়ত তাদের অসতী মনে হত।

স্বাতন্ত্র্যচেতনার উজ্জীবন ঘটেছে পতি বা প্রণয়ী নির্বাচনে স্বাধীনমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে। 'মহুয়া', 'দেওয়ান ভাবনা', 'মইষাল বন্ধু', 'ভেলুয়া', 'ফিরোজ খান দেওয়ান', 'মান্জুর মা', 'বগুলার বারমাসী', 'বীর নারায়ণের পালা', 'পীর বাতাসী', 'ময়নার বারমাসী', 'জীরালনী' প্রভৃতি গাথায় স্বাধীনভাবে পতি নির্বাচনের উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, প্রাচীন যুগে স্বয়ম্বর সভা আয়োজনের মাধ্যমে উচ্চবিত্ত পরিবারে কন্যা কর্তৃক স্বাধীনভাবে বর নির্বাচনের প্রচলন ছিল। স্বয়ম্বর প্রথার একাধিক পদ্ধতির কথা জানা যায়। কিন্তু এই প্রথার সঙ্গে ময়মনসিংহের গীতিকার নারী-চরিত্রসমূহ কর্তৃক স্বাধীন পতি-নির্বাচনের মৌলিক ব্যবধান সহজেই লক্ষণীয়। এই ব্যবধানের প্রধান দিক হল : স্বয়ম্বর প্রথার শ্রেণী-সীমাবদ্ধতা বা শ্রেণী-অনুশাসন। একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী কাঠামোর মধ্যে এই নির্বাচন সীমাবদ্ধ ছিল। রাজকন্যাগণকে স্বশ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ ক্ষত্রিয় রাজপুত্রগণের মধ্যেই কাউকে বরমাল্য পরাতে হত। পতি-নির্বাচনে স্বাধীনতার অর্থ ছিল আভিজাত্য ও শ্রেণীঅহঙ্কার অক্ষুণ্ণ রেখেই স্বাধীনতা ভোগ। স্বয়ম্বর সভায় শ্রেণীনির্বিশেষে সকলের প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু ময়মনসিংহের গীতিকায় নারীচরিত্রগুলি তাদের পতি-নির্বাচনে শ্রেণী-নিরপেক্ষ স্বাধীনতার প্রমাণ দিয়েছে। কখনও স্বশ্রেণীভুক্ত কারো সঙ্গে, কখনও উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে, কখনও আবার নিম্নশ্রেণীর সঙ্গে তারা প্রণয়াসক্তায় সংশ্লিষ্ট হয়েছে। পতি-নির্বাচনে অর্থনৈতিক ভিত্তিকে অতিক্রম করে মানবীয় জীবনতৃষ্ণায় উজ্জীবিত হয়েছে। শ্রেণীবোধ তাদের মধ্যে যে একেবারেই ক্রিয়াশীল ছিল না, তা নয়, তবে ব্যক্তি-অভিরুচি ও ব্যক্তি-অভীপ্সা দ্বারাই তারা মূলত পরিচালিত হয়েছে। তাদের এই স্বাধীন নির্বাচন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজ কিংবা পরিবার কর্তৃক সহজ-স্বীকৃতি লাভ করেনি এবং তার ফলে প্রণয়াবেগ চরিতার্থ করার জন্য প্রণয়ীযুগলকে নানা প্রকার লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা, নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছে, এবং প্রায়শ বিয়োগান্তক পরিণতিকে বরণ করতে হয়েছে। স্বাধীন নির্বাচনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কখনও পিতৃদ্রোহী হতে হয়েছে। মহুয়া, ভেলুয়া, সখিনা (ফিরোজ খান দেওয়ান), সোনা (বীর নারায়ণের পালা), পীর বাতাসী, মলয়া, জীরালনী প্রমুখ বিদ্রোহিনীর শিরোপা ধারণ করেছে। বিয়োগান্তক পরিণতি ঘটেছে 'মহুয়া', 'দেওয়ান ভাবনা', 'ফিরোজ খান দেওয়ান', 'বীর নারায়ণের পালা', 'পীর বাতাসী' প্রভৃতি গাথায়। মহুয়া বুকে ছুরিকাঘাত করে, সোনাই (দেওয়ান ভাবনা) বিষ পান করে, সখিনা (ফিরোজ খান দেওয়ান) পতিবিচ্ছেদের আকস্মিক আঘাতের অসহনীয়তায়, পীর বাতাসী প্রণয়ীর সঙ্গে নদীজলে আত্মবিসর্জনে জীবন ত্যাগ করেছে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের মহিমাকে উজ্জ্বল ও উদাহরণীয় করে গেছে। মহুয়া, ভেলুয়া, সখিনা, মান্জুর মা, সোনা, পীর বাতাসী, মলয়া, জীরালনী প্রত্যেককে তাদের স্বাধীন প্রণয়বাসনা চরিতার্থ করার জন্য গৃহত্যাগী হতে হয়েছে। এতই জীবনসম্ভবা এসব নারী যে জীবনতৃষ্ণা চরিতার্থ করার জন্য তারা কেবল গৃহত্যাগীই হয়নি, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংঘাত-সংঘর্ষেও ব্যাপৃত হতে হয়েছে তাদের। মহুয়াকে ব্যবসায়ী ও সন্ন্যাসীর লালসার বিরুদ্ধে, ভেলুয়াকে আবু রাজার বিরুদ্ধে, সখিনাকে পিতার সেনাবাহিনী ও দিল্লির বাদশাহ্-র সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে, মলয়াকে বনবাস যাপনের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হতে হয়েছে। এসব সংঘর্ষে তারা যে সাহসিকতা, বীরত্ব, দৃঢ়তা, স্বার্থহীনতা ও সর্বোপরি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে, তা অতুলনীয়; এসব গুণাবলী

Dhaka University Institutional Repository

তাদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যবোধকে উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান করেছে ।

প্রণয়াকাঙ্ক্ষার প্রতি একনিষ্ঠতা, আনুরক্তি ও বিশ্বস্ততা এবং সেজন্য নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে স্থির-অচঞ্চল থাকার দৃঢ়তা ও সাহসিকতা প্রদর্শন ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের চরিত্রসমূহকে ব্যক্তিত্বময় করে তুলেছে । এই বিশ্বস্ততার উৎস প্রতিপ্রবৃত্তি । প্রণয়-প্রতিপ্রবৃত্তির প্রতি এই বিশ্বস্ত থাকার অনুপ্রেরণা সামাজিক নীতি-আদর্শ, পারলৌকিক ভীতি কিংবা ধর্মীয় অনুভূতিসঞ্জাত নয় । এই অনুপ্রেরণার পেছনে ব্যক্তি-অভিরুচি ও ব্যক্তিজীবনকে মর্যাদাবান করে তোলার উপলব্ধি বা চেতনাই সর্বাংশে ক্রিয়াশীল । স্বীয় প্রতিপ্রবৃত্তির প্রতি, স্বীয় জীবন-উপলব্ধির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার মধ্যে যে নীতিবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তার সঙ্গে শাস্ত্র-নীতি কিংবা সামাজিক নীতির হয়ত সামঞ্জস্য প্রদর্শন সম্ভব, কিন্তু স্মর্তব্য যে ধর্মনীতি ও সমাজনীতির সঙ্গে এর মৌলিক ব্যবধান রয়েছে । ব্যক্তিজীবনের অন্তর্গত নীতিচেতনা ও মানবিক বৃত্তি সাশ্রিত হয়ে এই বিশ্বস্ততাবোধের উৎসারণ ঘটেছে । ময়মনসিংহের গীতিকার অধিকাংশ স্থান জুড়ে প্রণয়াকাঙ্ক্ষার কাহিনী বিধৃত হয়েছে, আর যেখানে প্রণয়ানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে, সেখানেই প্রতিপ্রবৃত্তির প্রতি আনুরক্তির ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ পাওয়া যায় । একটিমাত্র ব্যতিক্রম 'ধোপার পাট' পালা — যেখানে জমিদার-পুত্র ধোপা-কন্যার প্রতি তার প্রণয়বাসনাকে অমর্যাদা করে এক জমিদার-কন্যাকে গ্রহণ করে । সকল পালায় আনুরক্তির পরিচয় উপস্থাপিত হলেও কয়েকটি পালায় এর সুস্পষ্ট ও বিশেষত্বপূর্ণ প্রকাশ লক্ষণীয় । 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'চন্দ্রাবতী', দেওয়ান ভাবনা', 'দেওয়ানা মদিনা', 'কইষাল বন্ধু', 'ভেলুয়া', 'ফিরোজ খান দেওয়ান', 'মাঞ্জুর মা', 'আয়না বিবি', 'শ্যাম রায়ের পালা', 'ভারাইয়া রাজার কাহিনী', আঁধা বন্ধু', 'রতন ঠাকুরের পালা', 'পীর বাতাসী', 'জীরালনী' প্রভৃতি পালায় বিশ্বস্ততার প্রমাণ পাওয়া যায় । এর মধ্যে কয়েকটি পালার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গানুরোধে আলোচিত হয়েছে । এছাড়া প্রণয়বাসনার প্রতি একনিষ্ঠতার কারণে মলুয়াকে কাজী, দেওয়ান ও ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে আত্মবিসর্জন দিতে হয়েছে, চন্দ্রাবতী কঠোর ধর্মসাধনার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়েও বিস্মৃত হতে পারেনি স্বীয় প্রণয়বাসনাকে, মদিনা আত্মবিসর্জন দিয়েছে, সাধুতি (কইষাল বন্ধু) শত দারিদ্র্যের মধ্যেও কোচেনের নিকট আত্মসমর্পণ করেনি, মাঞ্জুর মা গৃহত্যাগী হয়েছে, আয়না বিবি বনবাসজীবন যাপন ও বেদে দলের সঙ্গে ভ্রমণ করেছে, ডোম-বধূ (শ্যাম রায়ের পালা) গৃহত্যাগী হয়েছে এবং সহমরণে উদ্যোগী হয়েছে, ভারাইয়া রাজার কন্যা পিতার শত্রু হওয়া সত্ত্বেও স্বামীকে সহযুক্ত করায় রাজ্য ধ্বংস হয়েছে, রাজকন্যা অন্ধ বংশীবাদকের জন্য গৃহত্যাগী হয়েছে এবং নদীজলে বংশীবাদকের সঙ্গে আত্মবিসর্জন করেছে, মালী-কন্যা রতন ঠাকুরের সঙ্গে গৃহত্যাগী হয়েছে এবং আশ্রয় নিয়েছে যে-দেশে সেই দেশের রাজার লালসার হাত থেকে বাঁচার জন্য আত্মহত্যা করেছে । প্রণয়াকাঙ্ক্ষার প্রতি আনুরক্তি ও বিশ্বস্ততা রক্ষার জন্য গৃহত্যাগ, লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ ভোগ, আত্মবিসর্জন দান প্রভৃতি পরিণতি বরণে চরিত্রগুলির দৃঢ়চিত্ততা ও ব্যক্তিত্বময়তারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ।

ব্যক্তিত্বের উন্মেষের অনুরাগে লোকজ উপাদানও ক্রিয়াশীল থাকে । ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে লোকায়ত জীবনাচরণ, জীবনাগ্রহ ও জীবনচিত্রের যে প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়, তা মানবিকতাস্পর্শী হওয়ায় আনুর্গারেই ব্যক্তিত্বচিন্তা ও স্বাতন্ত্র্যচেতনায় প্রাণাবেগের উদ্ভব ঘটিয়েছে । সমাজে শাস্ত্রানুশাসন বা সামাজিক অনুশাসনের কঠোরতা শিথিল থাকলে ব্যক্তির জীবনানুভূতি ও সহজাত প্রবৃত্তির স্বাধীন

Dhaka University Institutional Repository

স্ফুরণের যে-সম্ভাবনা থাকে, ব্যক্তিত্ববিকাশের যে-অর্গলমুক্তি ঘটে — তারই প্রমাণ বহন করছে ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহ। হৃদয়ানুভূতির স্বাধীনস্ফূর্তি ও বাধাহীন প্রাণচাঞ্চল্য প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে যেমন ব্যক্তিত্বের জাগরণ ঘটিয়েছে, তেমনি সেই ব্যক্তিত্বের আবেগময়তায় প্রতিটি ব্যক্তিই এক-একটি নীতিবোধের স্বাতন্ত্র্য নির্মানে সক্ষম হয়েছে। ব্যক্তিত্বের কারণেই এই নীতিবোধ একান্তই ব্যক্তিজীবন-আশ্রয়ী, ব্যক্তিমন - আশ্রয়ী, ব্যক্তি-অনুভূতি-আশ্রয়ী।

তথ্যনির্দেশ

১. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (ইংরাজ প্রভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত), দীনেশচন্দ্র সেন, দাশগুপ্ত এন্ড কোং লিঃ, কলিকাতা, অষ্টম সংস্করণ : ১৩৫৬ সাল, পৃ ৭৩
২. ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০ , বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সম্পাদক : মুহম্মদ আব্দুল হাই, বৈশাখ ১৩৭১, পৃ ৪০
৩. বাঙলার কাব্য, হুমায়ুন কবির, আহমদ ছফা সম্পাদিত, খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা, ১৪ আগস্ট ১৯৭০, পৃ ৩১
৪. মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, অরবিন্দ পোদ্দার, উচ্চারণ, ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ : জুলাই ১৯৮১, প্র.প্র. অক্টোবর ১৯৫২, পৃ ৭১
৫. মৈমনসিংহ-গীতিকা, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, রায় বাহাদুর, বি.এ., ডি.লিট. কর্তৃক সঙ্কলিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৩, প্র.প্র.১৯২৩, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য।
৬. প্রাগুক্ত
৭. প্রাগুক্ত
৮. বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খন্ড : আলোচনা), শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, পরিবর্ধিত দ্বি.স.১৯৫৭, পৃ ৩০০
৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৩০১-০২
১০. ফোকলোর পরিচিতি এবং লোক সাহিত্যের পঠন-পাঠন, ডক্টর মযহারুল ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা , পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৭৪, প্র.প্র.১৯৬৭,পৃ ৩৯৯
১১. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯৮
১২. প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন, ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থ নিলয়, কলিকাতা, ১৩৬৬, পৃ ১৫০-৫১
১৩. লোক-সাহিত্য (দ্বিতীয় খন্ড), ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, মুক্তধারা, ঢাকা, দ্বি.স.১৯৮০, প্র.প্র ১৯৬৩, পৃ ৪৯-৫০
১৪. মৈ.গী. = 'মৈমনসিংহ - গীতিকা', শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সঙ্কলিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৩ (প্র.প্র.১৯২৩)। বর্তমান অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিসমূহ উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।
১৫. পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স. = পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৬। বর্তমান অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিসমূহ উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬. পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি.স. = পূর্ববঙ্গ গীতিকা, তৃতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩০। বর্তমান অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিসমূহ উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

১৭. পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স. = পূর্ববঙ্গ গীতিকা, চতুর্থ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২। বর্তমান অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিসমূহ উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

১৮. বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, প্রথম খন্ড, নীহাররঞ্জন রায়, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, প্রথম সাক্ষরতা সংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) : ১৯৮০, প্র.স.১৩৫৬, পৃ ৪২৭-২৮ দ্রষ্টব্য।

১৯. দ্রষ্টব্য, অভিসন্দর্ভ, পৃ ৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
ময়মনসিংহের গীতিকার কাব্যমূল্য

প্রথম পরিচ্ছেদ
চরিত্র-চরিত্রায়ণ, সংগঠন ও রসনিষ্পত্তি

ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের চরিত্রায়ণ বৈশিষ্ট্য, ঘটনাবিন্যাস পদ্ধতি ও রসনিষ্পত্তি বিবেচনার ক্ষেত্রে, মধ্যযুগের সাহিত্য-নিদর্শনসমূহের তুলনায়, এর স্বাতন্ত্র্যই সর্বাগ্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত একই কাল-পরিধিতে রচিত হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য সাহিত্য-নিদর্শন অপেক্ষা গীতিকাসমূহের এই ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যের উৎস মূলত এর জীবনভাবনা ও বিষয়বৈচিত্রের মধ্যেই নিহিত। পূর্ব-অধ্যায়ে জীবনধর্ম আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি যে সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্য যেখানে গভীরভাবে ধর্মচিন্তায় আচ্ছন্ন, সেখানে কী বিস্ময়করভাবে ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহ ধর্মাচ্ছন্নতামুক্ত। এর প্রভাব চরিত্র-চিত্রণ, সংগঠন ও কাহিনীর পরিণতির ওপরও ব্যাপক এবং গভীর।

চরিত্র-সৃজনে রচয়িতাদের বাস্তবোচিত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কোনো ধর্মনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চরিত্রগুলি সৃষ্ট হয়নি, কিংবা নয় তারা ধর্মভাবনা-আশ্রিত। গ্রামজীবনের পটভূমিতে লালিত রক্তমাংসের মানুষেরা গীতিকার চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণী ও বৃত্তিজীবী মানুষ, — যেমনঃ জমিদার, দেওয়ান, কাজী, চাকলাদার, মোড়ল, ব্রাহ্মণ পন্ডিত ও পুরোহিত, ধোপা, ডোম, কৃষক, বণিক, সর্পওয়া, কুটনী, গোয়ালিনী, কর্মচারী, ডাকাত, বেদে, রাখাল, জেলে, পীর প্রভৃতি, — স্ব স্ব শ্রেণী ও বৃত্তির বৈশিষ্ট্যকে উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুটিত করে গীতিকাসমূহে বিধৃত হয়েছে। স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করার পাশাপাশি তাদের চরিত্রে মানবোচিত আচার-উপাদান-সমূহ, — যেমনঃ সংবেদনশীলতা, প্রণয়াকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, ভীরুতা-সাহসিকতা, ক্রোধ, ক্ষমাশীলতা, নির্দয়তা ও সহনশীলতা, রূপলালসা, সংযম-অসংযম, বাৎসল্য, বিবাহ-পূর্ব অনুরাগ, পতিভক্তি-পত্নীপ্রেম, বন্ধুত্ব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যও, —মূর্ত হয়ে উঠেছে।

চরিত্র উপস্থাপনের ক্ষেত্রে রচয়িতাগণের নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব কিংবা কারও প্রতি প্রতিকূল মনোভাব ব্যক্ত না করে, সকল চরিত্রের নিকট থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখেছেন গীতিকার রচয়িতাগণ [১]। চরিত্রের গুণাবলী কিংবা ত্রুটি-দুর্বলতা বিশ্লেষণ করেননি, চরিত্রসমূহের আচরণ ও উচ্চারণের মধ্য দিয়েই রচয়িতাগণ তাদের বৈশিষ্ট্যকে উন্মোচন করেছেন [২]। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রচয়িতাগণ কোন নায়িকার দেহসৌন্দর্য বর্ণনার জন্য একটি পংক্তিও ব্যবহার করেননি, অথচ ঐ নারীর দেহসৌন্দর্যের মাদকতায় একাধিক পুরুষের বিচলিত হওয়ার ঘটনা কাহিনীমধ্যে বিবৃত হয়েছে [৩]। মূলত অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য, চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনার মাধ্যমে উপস্থাপন না-করে, অন্য কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনাবিন্যাসের ক্ষেত্রে ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য : এর নাটকীয়তা, সংলাপ-ধর্মিতা, দৃশ্যময়তা ও চিত্রময়তা । কাহিনীর অন্তর্গত রসমাধুর্যকে পাঠক-শ্রোতার মনে সার্থকভাবে সঞ্চারিত করার জন্য উল্লিখিত চাররূপ বৈশিষ্ট্যের অপূর্ব সমাবেশ ঘটানো হয়েছে । কোনো কোনো গীতিকায় রয়েছে গীতময়তার প্রাধান্য, আবার কোনো কোনো গীতিকায় প্রশ্নউত্তরসংলগ্নতার বৈচিত্রপূর্ণ সমন্বয় সাধন করা হয়েছে । সংলাপধর্মী-নাটকীয়-দৃশ্যময়তার ক্ষেত্রে ময়মনসিংহের গীতিকার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য : দ্বিমাত্রিক সংলাপ উচ্চারণ । আধুনিক নাটকে যেমন একই সময়ে বহু ব্যক্তির পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একে একে প্রত্যেকের মুখ থেকে পৃথক পৃথক সংলাপ উচ্চারণের দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, ময়মনসিংহের গীতিকায় তার অভাব রয়েছে । এখানে দুই ব্যক্তির অধিক জনের সংলাপ একই সময়ে উচ্চারিত হতে দেখা যায় না । যেখানে পঙ্কভ্রাতা ও পঙ্কভ্রাতৃবধূ[৪] কিংবা আরও অধিকসংখ্যক লোকের মুখ থেকে সংলাপ উচ্চারিত হতে দেখা যায়, সেখানেও একাধিক সংখ্যক লোক একটিমাত্র চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে একটিমাত্র সংলাপ উচ্চারণ করে । ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে নাটকীয়তা, সংলাপ-ধর্মিতা ও দৃশ্যময়তার প্রাধান্য ঘটার কারণ, গাথাগুলি কেবল কৃষকদের কন্ঠে আপন-মনে শ্রোতা-নিরপেক্ষ উচ্চারণের জন্যই নয়, শ্রোতা-সমাবেশে গায়েনদের দ্বারা মঞ্চে পরিবেশনের উপযোগী করেও রচিত হত । সংলাপধর্মী-দৃশ্যময়তার মধ্যে লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত চিত্র-ময়তা সংযোগসেতু নির্মাণ করেছে । রচয়িতা তাঁর নিজস্ব অনুভূতিকে ব্যক্ত করার জন্য চরিত্রের মনোজাগতিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমানুরাল প্রাকৃতিক বিবরণ উপস্থাপন করেছেন । রচয়িতা একদিকে যেমন বর্ণনার মাধ্যমে চিত্রময়তা সৃষ্টি করেছেন, তেমনি যুগপৎ সংলাপ উচ্চারণের মাধ্যমে নাটকীয়তা সঞ্চার করেছেন । সমগ্র আখ্যানভাগের কাহিনী উপস্থাপনের জন্য কোনও কোনও গাথায় চলচ্চিত্রের মতো ক্যামেরা কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় চরিত্রের ওপর নিবদ্ধ থেকেছে, একটিবারের জন্যও ক্যামেরার দৃষ্টি ঐ চরিত্রকে এড়িয়ে অন্যত্র নিবদ্ধ হয়নি[৬] ।

ঘটনাবিন্যাসের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, রচয়িতাগণের অসাধারণ পরিমিতিবোধ । পরিমিতি-বোধের অভাব ঘটেছে অল্পসংখ্যক গাথায়[৭] । কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও ইঙ্গিতপূর্ণ সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে এবং বর্ণনার অতিরিক্ত বিবৃতি পরিহার করা হয়েছে । আর-একটি বৈশিষ্ট্য হল, আখ্যানভাগে সকল ঘটনার বিবরণ উপস্থাপন না করে কেবলমাত্র ইঙ্গিত দিয়ে পাঠকের কল্পনার ওপর নির্ভরশীল হয়ে কাহিনী বিবৃত করা হয়েছে, অথচ ঘটনার পারম্পর্য ক্ষুণ্ণ হয়নি[৮] । পরিমিতি-বোধের উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর এটি ।

ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে প্রণয়সম্পর্ক স্থাপন, বিরহ-বিচ্ছেদ কিংবা অপহরণ প্রভৃতি সংঘটিত হওয়ার স্থানকাল হিসেবে প্রায়শ নদীতীর ও সন্ধ্যান্ধকারের নির্জনতাকে ব্যবহার করা হয়েছে ঘটনাস্থল ও ঘটনাকালের এই রোমান্সধর্মিতার মধ্যে বাস্তবতার স্পর্শ অত্যন্ত স্পষ্ট । সমাজ ও পরিবারবৃত্তের মধ্যে নরনারীর স্বাধীন প্রণয়বাসনা চরিতার্থ হওয়া অসম্ভব ছিল । তাছাড়া প্রাত্যহিক জীবনে যুবতী নারী কিংবা গৃহবধূদের পরিবারবৃত্তের বাইরে বের হওয়ার উপলক্ষ ছিল কেবলমাত্র স্নান ও পানীয় জল সংগ্রহ, এজন্য নদীই ছিল একমাত্র উপায়স্থল । নদীতীর ও সন্ধ্যার অন্ধকার ঘটনার স্থানকাল হিসেবে উত্থাপিত হওয়ার বাস্তব কারণ তাই সহজেই পরিদৃষ্ট হয় । তবে গীতিকার রচয়িতাগণের মনে বৈষ্ণব-ঐতিহ্য ক্রিয়াশীল ছিল — এমন অনুমানও হয়ত করা সম্ভব । বৈষ্ণব সাহিত্যে নদীতীর ও সন্ধ্যান্ধকারের ব্যবহার দুর্লক্ষ্য নয় ।

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনাবিন্যাসের ক্ষেত্রে রচয়িতাগণের দক্ষতার চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে বিভিন্ন বারমাসী বর্ণনায়। বারমাসী বর্ণনার মধ্য দিয়ে চরিত্রের ব্যক্তিগত শোক-দুঃখের বিবরণ যেমন উপস্থাপন করা হয়েছে, তেমনি সত্য উন্মোচনের কৌশলও বিধৃত হয়েছে বারমাসীর বিন্যাসে। তাছাড়া বারমাসী বর্ণনায় চমৎকার নাটকীয়তা সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। আখ্যানভাগে বহু ঘটনা অনুল্লিখিত রেখে বারমাসী বর্ণনায় সেসব অনুচ্চারিত ও অনুদ্ঘাটিত তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে বিশেষ নাটকীয় সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।[৯]

বাচনভঙ্গির একটি নির্দিষ্ট স্টাইল ময়মনসিংহের গীতিকায় লক্ষ্য করা যায়। প্রাত্যহিক গ্রামীণ জীবনে উচ্চারিত ভঙ্গিই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে[১০]। তাছাড়া বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেও চরিত্রসমূহের মুখ থেকে কখনও ঈশ্বরনির্ভরতার ধ্বনি উচ্চারিত হয়নি, কিংবা এসকল ক্ষেত্রে ঈশ্বর উপাসনায়ও নিমগ্ন হয়নি তারা। বরং প্রকৃতির সমগ্র উপাদানকে জীবনের সাক্ষ্য হিসেবে, সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে আহ্বান করা হয়েছে[১১]। গ্রামজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণেই চরিত্রসমূহের আত্মগত অনুভূতি, তাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হর্ষ-বিষাদের সহায় হিসেবে, প্রকৃত বন্ধু হিসেবে প্রকৃতিকে মানুষের হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে একাত্ম করে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রকৃতির এরূপ আর্কিটাইপ ব্যবহার সংস্কৃত সাহিত্য কিংবা মধ্যযুগীয় সাহিত্যেও লক্ষ্য করা যায়।

মধ্যযুগীয় সাহিত্যে সার্থক ট্রাজিক রস সৃষ্টির কোনো উদাহরণ নেই। এর মুখ্য কারণ, ঐসময়কালে রচিত সাহিত্যের ধর্মনির্ভর বৈশিষ্ট্য। এদিক থেকে ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহ বিরল উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। সার্থক ট্রাজিক রস সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহ যে-ব্যতিক্রমধর্মী উদাহরণ সৃষ্টি করেছে তার অন্যতম কারণ, এর জীবনমুখিনতা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রাচীনকালে কিংবা বর্তমানকালেও শিল্পদক্ষতার দিক থেকে অদক্ষ রচয়িতার দ্বারা এমন কিছু ট্রাজেডি সৃষ্টি হতে দেখা যায়, — যা বাহ্যিক ঘটনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, — ব্যাখ্যা-অসাধ্য কোনো অতিলৌকিক কারণ কিংবা কোনো দুর্জ্ঞেয় শক্তির অনুপ্রবেশের ফলে কোনো আখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্র কিংবা নায়ক-নায়িকার অকস্মাৎ বিয়োগান্তক পরিণতি সংঘটিত হয়[১২]। স্বভাবতঃই পাঠকমনে এ ধরনের ট্রাজিক বেদনার আবেদন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। তবে এর বিপরীতে গুণী শিল্পীর হাতে এমন ট্রাজেডি সৃষ্টির উদাহরণ রয়েছে, — যেখানে চরিত্রসমূহের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য, তাদের ভুল সিদ্ধান্ত কিংবা ত্রুটিপূর্ণ চারিত্রিক উপাদানই বিয়োগান্তক পরিণতিকে অনিবার্য করে তোলে। এধরনের শিল্পসম্মত ট্রাজিক পরিণতির সঙ্গে পাঠকমন সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে পড়ে এবং এর আবেদনও হয় সুদূরপ্রসারী ও গভীর। আর সার্থক ট্রাজেডিতে মৃত্যুই একমাত্র পরিণাম নয়, বেঁচে থেকে কষ্টভোগের মধ্যে, অনুশোচনাবিদ্ধ যন্ত্রণাভোগের মধ্যে সার্থক ট্রাজিক পরিণতির উদাহরণও আধুনিক সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয়। ময়মনসিংহের গীতিকায় আবেদনে অনুরাগভরা, চরিত্রকেন্দ্রিক ট্রাজিক পরিণতি সৃষ্টির উদাহরণ প্রচুর[১৩]। খুব অল্প সংখ্যক পালায়ই মিলনান্তক পরিণতি সূচিত হয়েছে[১৪]। ময়মনসিংহের গীতিকায় কোথাও ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষ, কোথাও সমাজশাসনের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতার দ্বন্দ্ব বিয়োগান্তক পরিণতি সংঘটিত করেছে। তবে সর্বত্রই এসব দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে নারীর ব্যতিক্রমধর্মী দেহসৌন্দর্য প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভূমিকা নিয়ে ক্রিয়াশীল থেকেছে[১৫]।

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে নানা উপাদান ময়মনসিংহ-গীতিকার বিভিন্ন গাথায় বিভিন্ন মাত্রা, সম্পূর্ণ ব্যঞ্জনা ও আবেদনের নিজস্বতাসহ নিয়ে বিধৃত হয়েছে। গাথাসমূহের পৃথক আলোচনায়ই তা পরিস্ফুট হয়।

মহুয়া

সমাজ প্রশ্নের হীনতা, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক বিভেদবোধ, রূপলালসার ঊর্ধ্বে সমুন্নত প্রণয়মহিমা ও উচ্চতর মানবীয় চেতনারই জয় ঘোষিত হয়েছে 'মহুয়া'[১৬] গাথাটিতে। গাথার প্রধান দুই চরিত্র মহুয়া ও নদের চাঁদের জীবনবৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করেই এই উন্নততর মহিমার অভিব্যক্তি ঘটেছে। পারস্পরিক পরম আস্থাশীলতা ও প্রণয়-উচ্ছ্বাসে পারিপার্শ্ব-বিস্মৃত এই দুই যুবক-যুবতী লোকায়ত জীবনধারায়, প্রণয়াবেগে-ধন্যরত্ব-লাভের আদর্শ সৃষ্টি করেছে। পালক-পিতার আশৈশব স্নেহ ও সখীর সহানুভূতিপূর্ণ বন্ধুত্বে লালিত মহুয়া ব্যবসায়ী ও সন্ন্যাসীর প্রতিপত্তিমোহ ও জীবনভীতি উপেক্ষা করে সততা ও একনিষ্ঠতার উচ্চমহিমান্বিত গুণাবলীকে ধারণ করে অনুসরণীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে নদের চাঁদ তার সামাজিক প্রতিপত্তি, সম্পদলোভ, বৃদ্ধা জননীর প্রতি কর্তব্যকর্ম সবকিছু বিসর্জন দিয়েছে এক পরম মানসিক ও যৌবন-আবেগে। বন্ধু-বৎসলতায় সর্বত্যাগী মনোবৃত্তির এক গৌরবময় উদাহরণ পালঙ্ক সখীর চরিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর, এর পাশাপাশি অর্থলোভী, ব্যবসায়সতর্ক, বিষয়মনস্ক হুমরা বেদে চরিত্রের অমানবিকতা, নীচতা, অকৃতজ্ঞতা, সংকীর্ণ স্বার্থপরতা, ক্রুরতা, জিঘাংসাবৃত্তি এবং ব্যবসায়ী ও সন্ন্যাসী চরিত্রের রূপলালসা, বিপদাপন্ন ব্যক্তির প্রতি নির্দয় মনোভাব প্রভৃতির মাত্রাও এই গাথায় সুপরিস্ফুট। তবে এসব ক্ষুদ্রতা-সংকীর্ণতাকে আচ্ছন্ন করে পাপস্পর্শহীন, স্বাধীনমনস্ক শুভতাযুক্ত দুই মানব-মানবীর অকৃত্রিম মানবীয় আবেগ, অনুরাগ ও সুগভীর প্রণয়ের উজ্জ্বলতায় গাথাটি গৌরবদীপ্ত হয়েছে।

গাথার কেন্দ্রীয় চরিত্র মহুয়ার মধ্যে সাহসিকতা ও কোমলতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। তার সতীত্ব ব্যক্তিত্বের দ্যোতক। প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় যেমন সে একনিষ্ঠ, তেমনি প্রত্যাশিতজনের প্রতি বিশ্বস্ত। সে যেমন 'মুনির মন ভুলানো' রূপৈশ্বর্যশালী সৌন্দর্যের অধিকারিণী তেমনি প্রখর বুদ্ধিমত্তা তার চরিত্রের অন্যতম প্রধান গুণ। তার অপূর্ব রূপবহ্নি অনেককেই উন্মত্ত করেছে, সন্ন্যাসীর মনকে আকস্মিকভাবেই করেছে বিচলিত; আবার এদের লোভনীয় প্রস্তাব তাকে প্রত্যাখ্যানও করতে হয়েছে। এমনকি ক্ষেত্রে তার প্রণয়ীর প্রতি নিবেদিত, সমর্পিত ও একাগ্র মন মুহূর্তের জন্যও দ্বিধান্বিত কিংবা বিচ্যুত নয়। প্রণয়ী নির্বাচনে তার স্বাধীনমনস্কতার মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পালক-পিতা ও অভিভাবক হুমরা বেদে কর্তৃক আবাল্য-সঙ্গী সুজনের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে, মহুয়ার নির্দ্বিধ প্রত্যাখ্যানের মধ্যেই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্ট :

আমার বন্ধু চান্দ-সুরুজ পাঙ্খা সোনা জ্বলে।
তাহার সঙ্গে সুজন বাদ্যা জোনাকি যেমন জ্বলে॥
সোনার তনুয়া বন্ধু একবার দেখ।
আমার চক্ষু তুমি নিয়া নয়ন ভইরা দেখ॥ (মৈ.গী.পৃ ৪০)

Dhaka University Institutional Repository

সওদাগরের মোহময়, লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, সন্ন্যাসীর মধুবচন উপেক্ষা প্রভৃতি আচরণেও মহুয়া চরিত্রের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুটিত হয়েছে ।

স্বাধীন প্রণয়াকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি তার চরিত্রে বাঙালী নারীর লজ্জা কিংবা গৃহসুখিনতার পরিচয়ও দুর্লক্ষ্য নয় । প্রথম দর্শনে সে প্রণয়ীর অনুরাগ সম্পর্কে অবহিত হলেও তার সঙ্গে গৃহত্যাগে বিলাসিত হয়নি । বিরহতপ্ত হৃদয়ে নিদারুণ কাতরতা সত্ত্বেও নিজের দুঃখের ভারে অন্যের জীবনকে অসুখী করতে চায়নি সে, বরং প্রণয়ীর মঙ্গল কামনা করে গৃহে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে কুলমর্যাদা রক্ষারই পরামর্শ দিয়েছে । তবে এক্ষেত্রে নদের চাঁদের দৃঢ়চিত্ততা, প্রণয়বাসনায় একাগ্রতা প্রভৃতি মহুয়ার মনকে আস্থাশীল করে তাকে গৃহত্যাগী হতে উদ্বুদ্ধ করে । গৃহত্যাগের পর মহুয়া চরিত্রের সক্রিয়তা, সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ঋজুতা, শত প্রতিকূলতার মধ্যেও দৃঢ়চিত্ত থেকে সম্মুখগামী হওয়ার প্রবণতা প্রভৃতি পাঠকহৃদয়ের আকর্ষণীয় উপাদান[১৭] । মহুয়া চরিত্রে সাহসিকতার সঙ্গে আশাবাদিতার সুসমন্বয় ঘটেছে । বেদে-দলের বাসনাপন্না ত্যাগের পর তার মানসিক শক্তি দারুণভাবে হ্রাস পেলেও কিংবা নদীতে নিমজ্জিত নদের চাঁদ সম্পর্কে তার মনে প্রবল নিরাশার সৃষ্টি হলেও কখনও সে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েনি । আত্মবিসর্জনকালেও তার সাহসিকতা প্রশংসনীয় ।

মহুয়া চরিত্রে বুদ্ধিমত্তা এক উজ্জ্বলতম প্রান্ত । এখানে উল্লেখ্য যে রচয়িতা মহুয়ার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কিংবা অন্য কোনো চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেননি বরং তার আচার-আচরণ-উচ্চারণের মাধ্যমেই বৈশিষ্ট্যগুলোকে উন্মোচিত করা হয়েছে । মহুয়ার সক্রিয়তার মধ্যেই আমরা তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাই । প্রতিকূল অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য সে যেসব কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাতেই তার চরিত্রের এই প্রান্তটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । হুমরা বেদের নিয়ন্ত্রণব্যূহ থেকে তার ও নদের চাঁদের পলায়ন, সওদাগরকে সদলবলে হত্যা করে নিজের উদ্ধারলাভ, সন্ন্যাসীর লোলুপ-বৃত্ত থেকে পলায়ন - সর্বত্রই তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে । নদের চাঁদের সঙ্গে সম্পর্কের পূর্বরাগ পর্যায়ে মহুয়ার বাক্যালাপের মধ্যেও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বিধৃত হয়েছে ।

এই দেশে দরদী নাইরে কারে কইবাম কথা ।
কোনজন বুঝিবে আমার পুরা মনের বেথা ॥
মনের সুখে তুমি ঠাকুর সুন্দর নারী লইয়া ।
আপন হালে করছ ঘর সুখেতে বান্ধিয়া ॥ (মৈ.গী.পৃ ১১-১২)

মহুয়া ভারতীয় পৌরাণিক কোনো নারী চরিত্রের মতো বাস্তববর্জিত অতিমানবীয় উপাদান থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত । তার চরিত্রের সতীত্বধর্ম, প্রণয়ধর্মে একনিষ্ঠতা, সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা, আশাবাদিতা সক্রিয়মযতা, নীতিনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণাবলী একান্তই মানবীয় রসে সিক্ত ।

গাথা-রচয়িতা মহুয়া চরিত্রে এত অধিক পরিমাণে আদর্শমূলক উপাদান সংযুক্ত করেছেন এবং তাকে এত মহিমান্বিত করে তুলেছেন যে, এর ফলে গাথার অন্য কোনো চরিত্রের পক্ষে তার সমান সহানুভূতি লাভ সুকঠিন । মহুয়াকে কেন্দ্র করেই গাথার অন্য সকল চরিত্র আবর্তিত হয়েছে । নদের চাঁদ মহুয়ার প্রতি প্রণয়বাসনায় অন্ধ ও একনিষ্ঠ, পালঙ্ক সখী মহুয়ার প্রতি বন্ধুত্ব ও সহানুভূতিতে উজ্জ্বল, হুমরা বেদে মহুয়াকে আপন পুত্রবধূ করে নিজের দলে নিজের তত্ত্বাবধানে স্থায়িভাবে রাখতে

Dhaka University Institutional Repository

আগ্রহী, মহুয়ার প্রতি বাৎসল্য তার তীব্র, সওদাগর কিংবা সন্ন্যাসী উভয়ে মহুয়ার রূপের আকর্ষণে লালসাদীর্ণ। অর্থাৎ সকল চরিত্রই মহুয়াকে কেন্দ্র করে গতিশীল, ফলে তুলনামূলক মূল্যমাত্রায় দীপ্তিমান।

একারণে নদের চাঁদ এই গাথার নায়ক-চরিত্র হওয়ার পরও তুলনামূলকভাবে অনুজ্জ্বল। অনুজ্জ্বলতার কারণ, তার নিষ্ক্রিয়তা। মহুয়ার অনুরাগে পিতামাতা-গৃহ-প্রতিপত্তি-কুলমর্যাদা পরিত্যাগ করে পথবাসী হওয়া এবং সেকারণে অবর্ণনীয় কষ্টভোগ ভিন্ন তার চরিত্রের সক্রিয়তা অন্যত্র দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। সওদাগর কর্তৃক নদীতে নিমজ্জিত হয়ে সেখান থেকে উদ্ধারলাভ কিংবা সন্ন্যাসীর ষড়যন্ত্র থেকে নিষ্কৃতিলাভ, কিংবা বেদে-দলের মুখোমুখি হয়ে পৌরুষের সঙ্গে সংগ্রামশীল হওয়া — কোনো ক্ষেত্রেই তার সক্রিয়তা পরিদৃষ্ট হয় না। যদিও মহুয়া ও নদের চাঁদ উভয়ের আন্তরিকতা, প্রবলতর আবেগ-অনুরাগ, পারস্পরিক আস্থা ও ত্যাগ, সংকীর্ণতা-উর্দ্ধ আচরণ প্রভৃতি পাঠক-হৃদয়ে উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত করে, তথাপি নদের চাঁদ চরিত্রের নিষ্ক্রিয়তার ফলে উভয়ের বিয়োগান্তক পরিণতির সময়ে মহুয়ার প্রতি পাঠকহৃদয় সহানুভূতিতে যতটুকু আর্দ্র হয়, নদের চাঁদের জন্য ততটুকু হয়না।[১৮] তবে নদের চাঁদ চরিত্রের মহত্ত্ব অন্যত্র। প্রণয়াবেগে সে বিস্মৃত হয়েছে তার জাতধর্ম, সম্পদ, প্রতিপত্তি, সমাজ ও পরিবার। তার এই আত্মত্যাগের সঙ্গে গাথার অন্য কোনো চরিত্রের আত্মত্যাগ তুল্য নয়। এক্ষেত্রে তার সচেতনতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ত্যাগের এই উচ্চ মহিমাই তাকে অন্য সকল চরিত্র অপেক্ষা মহৎ এবং নায়কোচিত মর্যাদায় গৌরবদীপ্ত করেছে।

এই গাথায় হুমরা বেদের সক্রিয়তা কাহিনীকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ, এবং কখনও নিয়ামক, ভূমিকা পালন করেছে। শিশু অবস্থায় মহুয়াকে অপহরণ, বেদে-দল গঠন করে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে কসরৎ প্রদর্শন, বামনকান্দায় গমন, সেখানে নদের চাঁদ কর্তৃক দানকৃত ভূমি লাভ করে স্থায়িভাবে বসবাসের উদ্যোগ গ্রহণ, কিন্তু পরবর্তীকালে প্রতিকূল পরিস্থিতির আভাস পেয়ে দ্রুত পলায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কার্যকর করা, যে-ব্যক্তি তার বেদে-ব্যবসায় সংকট সৃষ্টি করেছে তাকে প্রতিহত করা, এমনকি নিশ্চিহ্ন করা প্রভৃতি কার্যসাধনে হুমরা বেদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে পটুত্ব এবং তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে তার অবিচলতা বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। তার চরিত্রের সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা, অকৃতজ্ঞতা, কুটিলতা, ক্রুরতা, জিঘাংসাবৃত্তি প্রভৃতির পাশাপাশি স্নেহশীতল হৃদয়ের উত্তাপও লক্ষণীয়। আশৈশব স্নেহে-লালিত মহুয়া যখন তারই প্রদত্ত বিষলক্ষের ছুরির আঘাতে আত্মবিসর্জন করে, তখন তার মুখ থেকে অনুশোচনাপূর্ণ যেসব উক্তি উচ্চারিত হয়, তাতেই তার দয়াহীন হৃদয়ের স্নেহার্দ্র প্রবৃত্তির উন্মোচন ঘটে।

> ছয় মাসের শিশু কন্যা পাইল্যা করলাম বড়।
> কি লইয়া ফিরবাম দেশে আর না যাইবাম ঘর ॥
> শুন শুন কন্যা আরে একবার আখি মেইলা চাও।
> একটিবার কহিয়া কথা পরাণ জুড়াও ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩১)

এই গাথার পালঙ্ক সখী চরিত্রটি বন্ধুত্বের মহিমায় গৌরবদীপ্ত। পাঠকহৃদয়ে এই চরিত্রটি ভিন্ন মাত্রায় উজ্জ্বল। বন্ধুত্বের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য যে কল্যাণকামনা, পালঙ্ক সখী নিজের জীবন উৎসর্গ করে তার প্রমাণ দিয়েছে। কোনো হার্দ্য আবেগানুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ স্বীয় চরিত্রের মহত্ত্বকেই প্রকাশ করে;— পালঙ্ক চরিত্রে এই মর্যাদাবোধ পূর্বাপর ক্রিয়াশীল। মহুয়া-নদের চাঁদের প্রণয়াসক্তির সূচনাপর্ব থেকে

Dhaka University Institutional Repository

হুমরা বেদে যেমন তার বিনষ্টি সাধনের জন্য ষড়যন্ত্রপূর্ণ আচরণে সক্রিয়, তেমনি সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে পালঙ্ক সখী তাদের প্রণয়-সাফল্যের চেষ্টায় ব্রতী থেকেছে। বন্ধুত্বের জন্য আত্ম-নিবেদনেই তার চরিত্রের মাধুর্য নিঃশেষিত নয়। বুদ্ধির দীপ্তিও তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হুমরা বেদে যখন দলবলসহ মহুয়া ও নদের চাঁদকে অনুসন্ধান করে ফিরছে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে, তখন পালঙ্ক সখীই বাঁশীর সুরধ্বনির সাহায্যে সতর্ক-সংকেত ঘোষণা করছে। পার্শ্বচরিত্রের ভূমিকায় উপস্থাপিত হলেও এই চরিত্রটি হুমরার ভ্রাতা মাণিকের মতো নিষ্ক্রিয়, অথর্ব কিংবা অনুজ্জ্বল নয়। পালঙ্ক সখীর চরিত্র সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্যের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> সে মহুয়ার সুখদুঃখভাগিনী এবং জীবন ও মৃত্যুর সহচরী। মহতের ত্যাগ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু ক্ষুদ্রের ত্যাগ সকলের দৃষ্টিপথের অন্তরালেই থাকিয়া যায়। তথাপি মহৎ ও ক্ষুদ্র উভয়েরই প্রেরণা তাহাদের আত্মা হইতে আসে — আত্মায় আত্মায় ছোটবড় কোনও পার্থক্য নাই, সেইজন্য পালঙ্ সই বাহিরে ক্ষুদ্র হইয়াও অন্তরে মহৎ। জীবনের সুখ-দুঃখের ভাগিনী সখীর জন্য সে আত্মোৎসর্গ করিয়া তাহার অন্তরের অসীম মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছে।[১৯]

গীতিকাব্যের তুলনায় মহাকাব্যিক উপাদানের প্রাধান্যই 'মহুয়া' গাথাটির মূল বৈশিষ্ট্য। বর্ণনার চেয়ে ঘটনা বা নাট্যিক গতিময়তায় গাথাটি বিশেষভাবে উজ্জ্বল। দৃশ্যময়তা, নাটকীয়তা, সংলাপধর্মিতা ও চিত্রময়তা প্রভৃতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে 'মহুয়া'র আখ্যানভাগে।[২০] তুলনামূলক স্বল্প পরিসরের মধ্যে রচয়িতা এখানে বিপুল ঘটনাধারাকে সুসংবদ্ধ করেছেন। কেন্দ্রীয় চরিত্রসহ অন্য সকল চরিত্রকে বিকশিত করে তোলার ক্ষেত্রেও বিস্তৃত বিশ্লেষণ বা বর্ণনা এড়িয়ে পাঠক-শ্রোতার কল্পনার ওপর নির্ভর করা হয়েছে। হুমরা বেদে কিংবা তার ভ্রাতা মানিক, মহুয়া-সখী পালঙ্ক — কারো দেহরূপ বর্ণনায় একটি বাক্যও ব্যবহার করা হয়নি। কেন্দ্রীয় চরিত্র মহুয়ার দেহসৌন্দর্য বর্ণনার ক্ষেত্রেও অপরিহার্য বিষয়-অতিরিক্ত বাক্যব্যয় থেকে রচয়িতা বিরত থেকেছেন। একান্ত প্রয়োজনীয় পংক্তিগুলিই ব্যবহৃত হয়েছে মহুয়ার রূপবর্ণনায় :

> সাপের মাথায় যেমন থাইক্যা জ্বলে মণি।
> ... ...
> আন্ধাইর ঘরে থুইলে কন্যা জ্বলে কাঞ্চা সোনা ॥
> হাট্টীয়া না যাইতে কন্যার পায়ে পরে চুল।
> মুখেতে ফুট্টা উঠে কনক চম্পার ফুল ॥ (মৈ.গী.পৃ ৫)

গাথার নায়ক-চরিত্র নদের চাঁদের দেহরূপ বর্ণনায় একটিমাত্র পংক্তি ব্যবহৃত হয়েছে :

> আসমানে তারার মধ্যে পূর্ণ মাসীর চান ॥ (মৈ.গী.পৃ ৭)

এরকম একটিমাত্র পংক্তি ব্যবহৃত হয়েছে সন্ন্যাসীর রূপবর্ণনায় :

> ছিঙ্গালা পিঙ্গালা জটা কটা মুখ দাড়ি। (মৈ.গী.পৃ ৩২)

একইসঙ্গে 'মহুয়া'-রচয়িতার পরিমিতিবোধ অসাধারণ। রচয়িতার পরিমিতিবোধের পরিচয় গাথাটির অন্যত্রও দৃষ্টিগ্রাহ্য। যে-হুমরা বেদে মহুয়া-নদের চাঁদের এমন নিষ্পাপ প্রণয়াবেগকে

Dhaka University Institutional Repository

নির্মমভাবে অপমানিত ও পিষ্ট করা, তার বিরুদ্ধে রচয়িতা একটি শব্দও উচ্চারণ এই গাথায় উচ্চারিত হয়নি। রচয়িতা হুমরা বেদের অন্যায়, নির্দয় ও পাশবিক আচরণকে যেমন সমালোচনা করেননি, তেমনি তার এসব কর্মকাণ্ডকে যুক্তিগ্রাহ্য করারও প্রয়াস পাননি। গাথার সকল চরিত্রের সঙ্গেই রচয়িতা সমান-দূরত্ব সমান-নৈকট্যের সম্পর্ক রক্ষা করেছেন। কারো প্রতি সুবিচার কিংবা অবিচার, কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব কিংবা শত্রুভাবাপন্ন আচরণ দ্বারা তিনি তার রচয়িতাসুলভ নিরাসক্তিবোধকে ক্ষুণ্ণ করেননি।[২১] সকল ঘটনার আবেগহীন বর্ণনাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রচয়িতা সীমাহীন সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। মহুয়া-নদের চাঁদের আবেগ-উচ্ছ্বসিত প্রণয়সম্পর্ক যখন প্রচলিত সামাজিক নিয়ম কিংবা জাতপ্রথার বিরুদ্ধতায় পরিতৃপ্ত, তখনও রচয়িতা যেমন কোনোপ্রকার মন্তব্য প্রদান থেকে বিরত রয়েছেন, তেমনি দুই যুবক-যুবতীর মর্মান্তিক মৃত্যুর ক্ষেত্রেও তার বর্ণনা সংযত ও আবেগশূন্য।

> ...ইহার ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া পল্লীকবি একটি কথাও অপব্যয় করেন নাই, প্রত্যেকটি কথাই ওজন করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন।... পল্লীকবি একটি নাটকীয় ঘটনার বিবরণ সুদীর্ঘ বর্ণনার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার লোভ সংবরণ করিয়াছেন।[২২]

গাথাটির কাঠামো বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যাবে, প্রারম্ভ-পর্যায়ের পর বামনকান্দা গ্রাম থেকে পলায়ন পর্যন্ত ঘটনা যত দ্রুত অগ্রসর হয়েছে, পরবর্তী পর্যায়ে তত নয়। প্রথম পর্যায়ে কাহিনীতে সংকট সৃষ্টি হয়েছে মাত্র এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে সংকট ঘনীভূত হয়েছে ও বিয়োগান্তক পরিণতির মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ঘটনার গতি শ্লথ। ঘটনার বাহুল্যই এর কারণ। একটি পরিবেশগত বর্ণনার মধ্য দিয়ে গাথার ঘটনাংশের শুরু: সেখানে রয়েছে গারো পাহাড়, জনবসতিহীন ও চন্দ্র-সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারেনা এমন ঘন গভীর জঙ্গল, যেখানে বাঘ-ভালুক ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী ছাড়া হুমরার মতো ডাকাতদের শুধু বাস। প্রথম পরিচ্ছেদের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা মহুয়াকে অপহরণ এবং তার দেহসৌন্দর্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। এরপরে ঘটনাগুলি অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে একটির পর একটি সংঘটিত হতে থাকে। বেদের দল কসরৎ দেখাতে যায় বামনকান্দা গ্রামে। সেখানে মহুয়ার রূপবহ্নি ও দেহ-কসরৎ ব্রাহ্মণ-তনয় নদের চাঁদের মনে অনুরাগ সঞ্চার করে। উভয়ে উভয়ের প্রণয়াসক্তিতে উদ্বেল হয়ে ওঠে। — এসব ঘটনা ও দৃশ্যের বর্ণনায় অতিরিক্ত বাক্যব্যয়ের বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়না। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও প্রয়োজনীয় উক্তির মাধ্যমে পরস্পরের গোপন সংবেদনার প্রকাশ ঘটে। এমনকি মহুয়া যখন তার আবাল্য-সখী পালঙ্কের নিকট তার গোপন প্রণয়াবেগের কথা ব্যক্ত করে, তখনও রচয়িতার সংযম অক্ষুণ্ণ থাকে। এরপরে পরবর্তী ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে কিছুক্ষণের নাটকীয় বিরতির পর্যায়ে একটি গীতময় বর্ণনার উপস্থাপনা লক্ষণীয়। ময়মনসিংহের গীতিকার সকল গাথায় ঘটনাবিন্যাসের এই কৌশলটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। দৃশ্যময় নাটকীয় সংলাপধর্মী দুই ঘটনার মধ্যে রচয়িতার সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহারের মাধ্যমে উপস্থাপিত চিত্রময় বর্ণনা সংযোগ-সেতুর ভূমিকা পালন করেছে।

> ফাল্গুন মাসে চল্যা যায়রে চৈত্র মাসে আসে।
> সোনার কুইল চুতাতে বইস্যা গাছে গাছে॥ (মৈ.গী.পৃ ১৪)

মহুয়ার সঙ্গে নদের চাঁদের গভীর প্রণয়সম্পর্কের পরিচয় পেয়ে হুমরা বেদের দল গোপনে বামনকান্দা পরিত্যাগ করে। নদের চাঁদের বদান্যতায় বেদের দল ঐগ্রামে স্থায়িভাবে বসবাসের সুযোগ পেয়েছিল। বেদে-দলের আকস্মিক অন্তর্ধানে নদের চাঁদের বিরহী চিত্তে যে সুগভীর বেদনা

Dhaka University Institutional Repository

উদ্রিক্ত হয়, তা একটি চিত্রময় বর্ণনার মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভাঙা ঘর পড়িয়া রইছে চালে নাইরে ছানি।
পিঞ্জিরা করিয়া খালি উইড়াছে পঙ্খিনী ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৭)

এরপর শুরু হয় ঘটনার বাহুল্য, বর্ণনাও তাই এ-পর্যায়ে শিথিলতাদুষ্ট। তবে ঘটনার নাটকীয় সংবেদনা, আকস্মিকতা ও বৈচিত্র্যময়তার কারণে পাঠকদের মনোযোগ বিঘ্নিত হয় না। ফলে বিন্যাসগত শিথিলতার ত্রুটি তেমন দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। মহুয়াকে অন্বেষণের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগী নদের চাঁদ পথবাসী হয়ে বহু অনভ্যস্ত দুর্দশা ভোগ করে অবশেষে মহুয়ার সন্ধানলাভে সক্ষম হয়। নদের চাঁদের আগমনে বিরহকাতর মহুয়ার প্রাণে সজীবতার পুনঃসঞ্চার হলেও ('ছয় মাইস্যা মরা যেন উঠ্যা হইল খাড়া'॥) হুমরা ভীত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। মহুয়ার মাধ্যমে হুমরা নদের চাঁদকে হত্যার উদ্যোগ গ্রহণ করলে তা ব্যর্থ হয়, উপরন্তু নদের চাঁদের সঙ্গে অজানার উদ্দেশ্যে পলায়নপর হয় মহুয়া। পথে নদী পারাপারের জন্য উভয়ে এক সওদাগরের শরণাগন্ন হলে সওদাগর মহুয়ার দেহসৌন্দর্যের মাদকতায় আবিষ্ট হয়ে কুটিল ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। ব্যবসায়ী কর্তৃক নদীতে নিক্ষিপ্ত হয় নদের চাঁদ, অন্যদিকে মহুয়ার বুদ্ধিমত্তার ফলে সওদাগর সদলবলে নিহত হয়। বহু অনুসন্ধানের পর মুমূর্ষু নদের চাঁদের সঙ্গে মহুয়ার সাক্ষাৎ ঘটলেও সেখানে সওদাগরের মতো আর এক অনুরায় হয়ে দাঁড়ায় সন্ন্যাসী। মহুয়ার প্রতি রূপলালসায় আসক্ত সন্ন্যাসীর বেষ্টনী থেকে মহুয়া বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নদের চাঁদসহ মুক্ত হয়। এরপর কয়েকটি দিন এই দুই যুবক-যুবতী তাদের আবেগময় উচ্ছ্বাসদীপ্ত মুক্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষার সফলতায় জনহীন বনমধ্যে এক অনির্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ-লাভে ধন্য হয়। কিন্তু কয়েকটি দিনমাত্র। বেদের দল পশ্চাদানুসরণে এসে তাদের সন্ধান লাভ করে। নিরুপায় হয়ে মহুয়া আত্মবিসর্জন করে। বেদে-দল কর্তৃক নির্মমভাবে নিহত হয় নদের চাঁদ। উভয়ের মৃতদেহ সেই বনমধ্যে একত্রে সমাধিস্থ হয়। মহুয়ার আত্মবিসর্জনে হুমরার কঠিন হৃদয়েও বাৎসল্য ও অনুশোচনা উদ্রিক্ত হয়। পালঙ্ক সই সমাজ-বিচ্ছিন্ন মুক্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত যুবক-যুবতীর নিষ্কলঙ্ক হৃদয়বৃত্তির প্রতি মর্যাদাশীল হয়ে তাদের সমাধি-পাশে বাকী জীবন উৎসর্গ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে স্বীয় চরিত্রের মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটায়।

সামগ্রিক বিচারে মহুয়া গাথাটির আখ্যানভাগ সুসংবদ্ধ, শিথিল বিন্যাসে দুষ্ট নয়। আখ্যানভাগের দ্বিতীয় পর্যায়ে ঘটনার দীর্ঘসূত্রিতা এর সাংগঠনিক বিন্যাসে কিছুটা শিথিলতার সৃষ্টি করলেও রোমাঞ্চকর ঘটনার প্রতি পাঠক- শ্রোতার বিশিষ্ট আবেদন থাকার কারণে এই ত্রুটি অনুভবগ্রাহ্য নয়। এখানে ঘটনা কেন্দ্রীয় চরিত্রকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিতভাবে আবর্তিত, সংকটগ্রস্ত এবং একটি যুক্তিপরম্পরার পরিণতি-অভিমুখে অগ্রসরমান। এই আবর্তন ও অগ্রসরতার ক্ষেত্রে ঘটনা কিংবা বর্ণনার কোথাও অতিরিক্ত শাখাস্ফীতির লক্ষণ দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়।

> আখ্যান গ্রন্থনের কেন্দ্র-সংযুক্ত নিপুণ নিটোল ঐক্য, নাট্যরস, রোমান্স রস এবং প্রকৃতির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা — এই চার উপকরণের রাসায়নিক সংযোগ মহুয়ার সাহিত্যমূল্যের শ্রেষ্ঠত্বের নিদান।[২৩]

প্রকৃতির ভূমিকা কেবলমাত্র মহুয়া গাথায় নয়, ময়মনসিংহের গীতিকার সর্বত্র দৃষ্টিগ্রাহ্য। প্রকৃতি চরিত্রের ভাবানুবর্তী হয়ে উঠেছে। বিপদকালে প্রকৃতিসান্নিধ্য, জীবন ও সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতিকে আহ্বান, প্রকৃতির সহায়তা কামনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে মানুষের বন্ধু ও পরিচর্যাকারীর ভূমিকায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সওদাগর কর্তৃক নদের চাঁদকে নদীজলে নিক্ষেপের পর মহুয়া যখন নদীতীরে নদের চাঁদকে অনুসন্ধান করছে, তখন তার নৈঃসঙ্গ্যপূর্ণ অসহায় জীবনের একমাত্র সহায় ছিল প্রকৃতি:

> কও কও কও পঙ্খি আরে কও তরুলতা।
> ঢেউয়ের কূলে পইড়া বন্ধু এখন গেল কোথা॥
> শুন আরে বাঘ-ভালুক পরে আমায় খাও।
> বন্ধুর উদ্দেশ মোরে পরখাইয়া জানাও॥ (মৈ. গী. পৃ ৩০)

'মহুয়া' গাথার পরিণতি ট্রাজিক। ময়মনসিংহের গীতিকার অধিকাংশ গাথার পরিণতি ট্রাজিক হলেও চারিত্র্যধর্মে পারস্পরিক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ট্রাজেডি একানুভাবে বাহ্য ঘটনার দ্বারা সংঘটিত হয়। ফলে এর আবেদন চরিত্র-কেন্দ্রিক না হয়ে, হয় ঘটনা-নির্ভর। পাঠকমনে এর প্রতিক্রিয়া গভীর ও সুদূরপ্রসারী নয়। কিন্তু 'মহুয়া' গাথার ট্রাজেডি বহিরারোপিত নয়, বরং অনুরস্পর্শী। হুমরা বেদে তার সংকীর্ণ ব্যবসাসতর্কতার জন্যই সূচনা পর্যায় থেকে মহুয়া-নদের চাঁদের প্রণয়বাসনায় অন্তরায় সৃষ্টি করেছে এবং পরিশেষে তার ক্রূর হাতেই জীবনহানি ঘটেছে দুই নিষ্কলুষ মুক্ত-প্রণয়াকাঙ্ক্ষী মানব-মানবীর। হুমরা যেমন মহুয়া-নদের চাঁদের বিয়োগান্তক পরিণতি তথা এই গাথার ট্রাজিক পরিণতির জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী, তেমনি সে-ই গাথার ট্রাজিক বেদনাকে ধারণ করেছে। মহুয়ার আত্মবিসর্জনের পর তার তীব্র অনুশোচনাবোধের মধ্যে এই বেদনা পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া এই ট্রাজেডির পেছনে আরও একটি প্রবল কারণ, — মহুয়ার ব্যতিক্রমধর্মী, 'মুনির মন ভুলানো' দেহসৌন্দর্য, — যা প্রত্যক্ষ করে কেবল নদের চাঁদই গৃহ ও সমাজত্যাগী হয়নি, সওদাগর ও ব্রহ্মচারীর মনেও লালসা জাগ্রত হয়েছে। হুমরা বেদে মহুয়াকে নিজ দলে স্থায়িভাবে আঁকড়ে রাখার ব্যাপারে এত অধিকমাত্রায় সঙ্কল্পপরায়ণ হওয়ার পেছনেও মহুয়ার রূপবহ্নি ক্রিয়াশীল। স্মর্তব্য যে মহুয়ার রূপযৌবনই বেদে-দলের প্রধান আকর্ষণ এবং তাদের ব্যবসায়িক সাফল্যেরও মৌল উৎস। সার্বিক বিচারে 'মহুয়া' গাথার ট্রাজেডির বৈশিষ্ট্যকে বহির্নির্দেশিত বলার পরিবর্তে অনুর্নির্দিষ্ট বলাই যুক্তিসঙ্গত।

> ...মহুয়া ও নদের চাঁদের মৃত্যুর জন্য হোমরার দায়িত্ব কিন্তু একানু বহিরাগত নয়। প্রথম থেকেই মহুয়া-নদের চাঁদের মিলন-মধুর, বিরহ-করুণ প্রেমের পশ্চাতে হোমরার রুদ্রদৃষ্টির আগুন জ্বলছিল। প্রথম থেকেই সে মহুয়াকে নদের চাঁদ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছে, এমনকি নদের চাঁদকে হত্যা করেও মহুয়ার জীবনের সহজগতিকে বাধাহীন করতে চেয়েছে।...মহুয়ার এই সৌন্দর্যের উন্মাদনা কেবল নদের চাঁদকে গৃহের শানু জীবন থেকে টেনে আনেনি, বারবার সদাগর অথবা ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণেরও নেতিহান লালসা জাগিয়ে তুলেছে। ঐ সৌন্দর্যের মধ্যে একটী ভীষণ অগ্নিতেজে ধ্বংসক্ষমতার ইঙ্গিত কবি করেছেন। এই কাব্যে তাই ট্রাজেডি অনুর-ধর্মে উৎসারিত।[২৫]

উল্লেখ্য যে মহুয়া-নদের চাঁদের বিয়োগান্তক পরিণতির কারণে উভয়ের প্রতি পাঠকহৃদয়ের সহানুভূতি অতিমাত্রায় তীব্র, ফলে হুমরা বেদে ট্রাজেডির বেদনাকে ধারণ করলেও পাঠকহৃদয় তার প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

সহানুভূতিশীল নয়। হুমরা বেদের অন্তরের নিগূঢ়তম প্রদেশে যে স্নেহ-বাৎসল্য ক্রিয়াশীল, তা সংকীর্ণ স্বার্থে হিতাহিত জ্ঞানবিস্মৃত উন্মত্তবৎ প্রতিহিংসায় আচ্ছন্ন কঠিন হৃদয় ভেদ করে মহুয়া-নদের চাঁদের মৃত্যুর পর যখন উদ্ভিন্ন হয় তখন, দুঃখজনক যে, তার বেদনার প্রতি পাঠকহৃদয় একাত্ম নয়। ট্রাজেডির বেদনাকে ধারণ করে অনুশোচনায় দগ্ধ হুমরা বেদের হৃদয় তখন নিঃসঙ্গ, একাকী ও সমব্যথীহীন।[২৬]

মলুয়া

মলুয়া[২৭] গাথার কেন্দ্রীয় চরিত্র মলুয়া সক্রিয়তায়, প্রণয়ে একনিষ্ঠতায়, বুদ্ধিমত্তায়, পতিভক্তিতে, দৃঢ়চিত্ততায় ও আত্মত্যাগের গৌরবে অন্য সকল চরিত্র অপেক্ষা উজ্জ্বল চারিত্রিক মাহাত্ম্য অর্জন করেছে। কোনো প্রকার সংকীর্ণতা, ভীরুতা, নিশ্চেষ্টতা তার চারিত্রিক ঔজ্জ্বল্যকে ম্লান করতে পারেনি। তার চরিত্রে পতিভক্তি ও সতীত্বভাবনার যে আদর্শময় অভিপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, তা ধর্মচিন্তাপ্রসূত নয়, বরং এ-দুটি উপাদান তার ব্যক্তিত্বকেই উদ্ভাসিত করে তুলেছে।[২৮]

নির্জন পুকুরঘাটে চান্দ বিনোদকে দর্শনের পর তার মধ্যে যে-পূর্বরাগের সৃষ্টি হয়, তা চরিতার্থ করার জন্য তার সচেষ্টতা লক্ষণীয়। যদিও চান্দ বিনোদের সঙ্গে দাম্পত্য-সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে চান্দ বিনোদের সক্রিয়তাই অধিকতর মাত্রায় দৃষ্ট হয়, তবু মলুয়ার ভূমিকা এক্ষেত্রেও অত্যন্ত নিয়ামক। অপরিচিত চান্দ বিনোদের নিকট সে তার অনুরাগের প্রকাশ না ঘটালে কিংবা নিজ বাড়িতে তাকে নিমন্ত্রণে সাহসী না হলে হীরাধরের বাড়িতে ঘটক পাঠানোর দুঃসাহস চান্দ বিনোদের হত কিনা সন্দেহ। তবে পরবর্তী সময়ে মলুয়ার সক্রিয়তাই সর্বাধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কাজীর অন্যায় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে, কাজীর অত্যাচারে সর্বস্বহারা চান্দ বিনোদের পরিবারে চরম দারিদ্র্যময় জীবন-যাপনে এবং দরিদ্র-জীবনেও কাজীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের দৃঢ়চিত্ততায়, সর্পদংশিত স্বামীর জীবনপ্রাপ্তির প্রচেষ্টায় তার পতিভক্তি যেমন প্রবল, তেমনি কাজীর ষড়যন্ত্রে স্বামী চান্দ বিনোদের প্রাণসংহারের যখন আয়োজন চলছে, তখন পোড়াপাখীর মাধ্যমে পাঁচ ভাইকে খবর পাঠিয়ে এনে স্বামীর উদ্ধার-প্রচেষ্টায় কিংবা দেওয়ানের গৃহে তিনমাসের ব্রত পালনের কৌশলের আশ্রয় নিয়ে সতীত্ব রক্ষা ও পলায়নের সুযোগ-সন্ধান, কাজীকে শূলে চড়ানো প্রভৃতি ঘটনায় তার বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। কিন্তু তার সকল বুদ্ধি, কৌশল, মানসিক শক্তি, আন্তরিকতা শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ-সমাজাধিপতিদের নিকট হার মানতে বাধ্য হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীলতা এমনই নির্মম ও অনড় যে ন্যায়ান্যায় যাচাইয়ের দৃষ্টি তার কেবল সংকুচিত নয়, পুরোপুরি অন্ধত্বে পর্যবসিত। তবে ব্রাহ্মণদের যুক্তিহীন শাস্ত্রনির্ভর বিচারে প্রথমবারে যখন স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়, তখনই সে হতাশাগ্রস্ত নয়। স্বামীগৃহে দাসীবৃত্তির জীবন গ্রহণ করে তার সেবায় নিয়োজিত থেকে পরম ধৈর্য ও আশা নিয়ে এমন একটি দিনের জন্য প্রতীক্ষা করেছে, যেদিন শাস্ত্রনিষ্ঠ জীবনবিচ্ছিন্ন ব্রাহ্মণকুলের চোখে সত্যদর্শন সম্ভব হবে এবং নিজেদের ত্রুটি উপলব্ধি করে স্বামীর সঙ্গে তার দাম্পত্য জীবন অব্যাহত রাখায় তারা স্বীকৃত হবে। কিন্তু তার সে আশা বারংবার আঘাতের সম্মুখীন হয়েছে। সর্পদংশিত মৃত্যুমুখ পতিকে জীবনহানি থেকে উদ্ধার-প্রচেষ্টায় সে যে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে, তাতে

Dhaka University Institutional Repository

সমগ্র সমাজ তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তার স্বামী-পরিত্যক্ত-জীবনের অবসান কামনা করলেও ব্রাহ্মণ সমাজাধিপতিদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয়নি । কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ সমাজের চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও নির্দয় অমানবিক আচরণই অবশেষে তাকে আত্মবিসর্জনে উদ্যোগী হতে বাধ্য করেছে । দাম্পত্য জীবনের আশার পথের প্রতিবন্ধকতা যে দুর্মোচ্য, তা উপলব্ধি করেই তাকে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে । এমন উদ্যোগে কাপুরুষতা নেই । কেননা প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করার জন্য সে সংগ্রাম করেনি — তার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আনা যায় না । অনুনয় অতিক্রমণের জন্য সর্বাধিক সচেষ্টতা সত্ত্বেও যখন তা নিস্ফলতায় পর্যবসিত হয়, তখন আত্মবিসর্জনের আর বিকল্প থাকে না ।

ভাবিয়া চিন্তিয়া মলুয়া না দেখে উপায় ।
আপনি থাকিতে নাহি স্বামীর দুঃখ যায় ।।
বদনাম কলঙ্ক যত না যাইব সোয়ামীর ।
পরান ত্যজিবে কন্যা মনে কৈল স্থির ।। (মৈ.গী.পৃ ৯৭)

গাথার এই অংশের বক্তব্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ রয়েছে । কেননা এ বক্তব্য থেকে সহজেই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, মলুয়া স্বামীর সুখের কথা চিন্তা করেই আত্মবিসর্জনে উদ্বুদ্ধ হয়েছে । কিন্তু এই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি সঠিক নয় । গাথার ঘটনাবলী এই সাক্ষ্য দেয় না যে মলুয়া নিজের দাম্পত্য জীবনাগ্রহ ছাড়া কেবল স্বামীর সুখের কথা চিন্তা করেই আত্মবিসর্জন করে । তার কারণে স্বামীর সুখ বিনষ্ট হচ্ছে এমন কোনো সাক্ষ্য গাথায় নেই । অথচ কোনো কোনো সমালোচক গাথার এই অংশের বক্তব্য ধরে মন্তব্য করেছেন যে

> ... She sacrifices herself for the sake of her husband, not seeking her own happiness, but exclusively his benefit, not fighting for her love, but for his well-being ...[২৯]

এক্ষেত্রে বরং আশুতোষ ভট্টাচার্যের বক্তব্য সত্যের অনেক কাছাকাছি । তিনি বলেছেন,

> ...সমাজ ও স্বামীর প্রতি প্রচ্ছন্ন অভিমান লইয়া মলুয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, সীতার পাতাল প্রবেশের সঙ্গে তাহার মৃত্যুর তুলনা হইতে পারে, কিন্তু এক অনতিক্রম্য অবস্থার সম্মুখীন হইয়া স্বামীপ্রেমের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য মহুয়া আত্মত্যাগ করিয়াছে, অতএব উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে ।[৩০]

গাথার ঘটনাবলীর প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে এটা মানতেই হয় যে মলুয়া স্বীয় দাম্পত্য জীবন পুনরায় অব্যাহত ও সুখী রাখার জন্যই দাসীবৃত্তিসহ সকল কার্যক্রমে মনোনিবিষ্ট থেকেছে । তবে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে স্বামীকে পুনর্বিবাহে সম্মত করার মধ্যে তার স্বামী-সুখই আরাধ্য এমন যুক্তি দেওয়া যেতে পারে । কিন্তু স্মর্তব্য যে তাই যদি হত, তাহলে মলুয়া দাসীবৃত্তির জীবন গ্রহণ করত না । স্বামীর পুনর্বিবাহের পর সে চলে যেত । স্বীয় দাম্পত্য জীবন পুনরায় শুরু করার কামনা থেকেই যে সে দাসীবৃত্তির জীবন বেছে নিয়েছে, তা স্পষ্টত বলা যায় ।

গাথার অন্য চরিত্রসমূহ মহত্ত্ব বিচারে তুলনামূলকভাবে অনুজ্জ্বল । গাথার নায়ক-চরিত্র চান্দ বিনোদের সক্রিয়তা গাথার প্রথম অংশের পর আর পরিদৃষ্ট নয় । মলুয়ার রূপে মুগ্ধ চান্দ বিনোদ

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃক মলুয়ার নির্দেশ অনুযায়ী তার পিতৃগৃহে আতিথ্য গ্রহণ এবং পরবর্তীকালে পরিণয় উদ্দেশ্যে ঘটক প্রেরণ, দারিদ্র্যের কারণে বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে আর্থিক অবস্থা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা — এই পর্যন্তই চান্দ বিনোদের সক্রিয়তা। কিন্তু পরবর্তীসময়ে কাজীর অন্যায়-অত্যাচার, দেওয়ানের নির্যাতন কিংবা ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্যায় বিবেচনার বিরুদ্ধে সে কর্তব্যবিমুখ। কাজীর অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদী নয়, কিংবা সমস্যা সমাধানের জন্য ভিন্ন উপায় উদ্ভাবনেও সক্রিয় নয়। সমাজাধিপতি-দের বিরুদ্ধেও সে সমান নির্বাক। উভয় ক্ষেত্রে তার নিশ্চেষ্টতা, নিষ্ক্রিয়তা তার নায়কোচিত মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

এই গাথার অন্য চরিত্রসমূহের মধ্যে মলুয়ার পিতা হীরাধর দাস সন্তানের কল্যাণ কামনায়, ঐশ্বর্য ও সংকীর্ণ স্বার্থ চিন্তায় একটি বাস্তবোচিত চরিত্র। তার পাঁচ পুত্রও একমাত্র বোনের কল্যাণ-চিন্তায় সদাসতর্ক। পাঁচ ভাইয়ের ভূমিকা একটি একক চরিত্রের মতো — গাথায় এদের কারও স্বতন্ত্র ভূমিকা নেই। বোনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় পাঁচ ভাই একাধিকবার সম্মিলিত প্রয়াসের শক্তিময় উপাদানের প্রকাশ ঘটিয়েছে। চান্দ বিনোদের মায়ের চরিত্রটিও গ্রামজীবনের সন্তানবৎসল মায়ের শাশ্বত রূপকে অভিব্যক্ত করেছে। এদিক থেকে কুটনী চরিত্রটি সবচেয়ে জীবন্ত। এ-ধরনের চরিত্র গ্রামজীবনের চিরাচরিত কাঠামোর সঙ্গে যেন অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে আছে। গ্রামজীবনের স্বাভাবিক পশ্চাৎপদ জীবনধারা যেন এদের উপস্থিতি ছাড়া কল্পনা করা যায় না।

দেওয়ান ও কাজীর চরিত্র ভারতে মুসলিম শাসনের একটি প্রান্তকে উন্মোচিত করেছে। জিঘাংসা ও রিরংসাবৃত্তি যে তাদের শাসন প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত ছিল, তা এ দুটি চরিত্রের সক্রিয়তায়ই স্পষ্ট। মধ্যযুগের সামন্ত শাসক-শক্তির উপযুক্ত প্রতিনিধি হিসেবে তাদের চরিত্রও বাস্তবোচিত। বিপুল সংখ্যক সুন্দরী রমণী দ্বারা অন্তঃপুর সমৃদ্ধ রাখা কেবলমাত্র মুসলমান শাসকদেরই নয়, মধ্যযুগের প্রায় সকল সামন্ত শাসক-শক্তিরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেই কাজী ও দেওয়ান চরিত্র বাস্তবানুগ হয়ে উঠেছে। এখানে দেওয়ানের চেয়ে কাজীর অত্যাচারের মাত্রাই প্রবলভাবে দৃশ্যমান। কিন্তু তাই বলে এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না যে দেওয়ান কাজীর চেয়ে কম অত্যাচারী। প্রকৃতপক্ষে প্রজাসাধারণের নিকট কাজীর অবিচার-নির্যাতন যতটা প্রত্যক্ষ, দেওয়ানের বিষয়টি তত নয়। স্মর্তব্য যে কাজীর মাধ্যমেই দেওয়ানের নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

এই গাথায় সবচেয়ে পীড়নকারী নির্মম চরিত্র চান্দ বিনোদের মামা ও পিসা। এই পীড়ন শারীরিক নয়, মানসিক। জাতপাত বিচারে তারা হিন্দুকুলের শিরোমণি ঃ ব্রাহ্মণ। কে জাতিভ্রষ্ট কে সমাজচ্যুত, কার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে — এসব সামাজিক বিচারের দায়িত্ব তাঁদের এক্তিয়ারভুক্ত। তাঁদের রায় অখন্ডনীয়। সমগ্র সমাজ যখন মলুয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল, তখনও ব্রাহ্মণ্য হৃদয় একটুকু আর্দ্র হয় না। প্রতিক্রিয়াশীল মনের শাশ্বত অনড়তাই এ দুটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটিত হয়েছে।

এই গাথার চরিত্রসমূহ নির্মাণে গাথা-রচয়িতার বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় সুস্পষ্ট। গাথার আখ্যানভাগ যেমন সুবিস্তৃত তেমনি এখানে অনেকগুলি চরিত্রের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্রের সংখ্যাধিক্য চরিত্র নির্মাণে রচয়িতার দক্ষতাকে ক্ষুণ্ণ করেনি ; বরং প্রতিটি চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে দীপ্তিমান । প্রতিটি চরিত্র তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে, পরস্পরের ভিন্নতাকে সুস্পষ্ট করে তুলে, রচয়িতার চরিত্র নির্মাণের দক্ষতারই প্রমাণ দিয়েছে । রচয়িতার চরিত্র নির্মাণের আর-একটি বৈশিষ্ট্যও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । চরিত্রগুলোকে পরিস্ফুট করার জন্য রচয়িতা তাদের গুণাবলীর বিশ্লেষণ করেননি বরং তাদের আচার-আচরণ-উচ্চারণের মাধ্যমে তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহকে উন্মোচন করেছেন । যেমন, মলুয়ার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কথা ব্যাখ্যা করে বলা হয়নি, দেওয়ানগৃহে তিন মাসের ব্রত যাপনের কৌশল গ্রহণের মধ্যেই তার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হয়েছে ।

এই গাথার আখ্যানভাগ বিস্তৃত পরিসরে ব্যাপ্ত । কিন্তু কেবলমাত্র ব্যাপ্তিই ত্রুটির লক্ষণ নয়, যদি ঐ ব্যাপ্তির মধ্যে বাহুল্য-দোষ না ঘটে । মলুয়া গাথার আখ্যানভাগে বাহুল্য-দোষ বর্তমান । এখানে কাহিনী সুগ্রথিত নয় ।

> মলুয়ার গল্প-গ্রন্থনে ত্রুটি আছে, আরও পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে, কোন সচেতন কবির হাতের ছাপ এতে পড়েনি, বহুজনের হাতের চাপে এর অঙ্গ-বিকৃতি ঘটেছে । গল্পে ঐক্য নেই, ভাবলক্ষ্য বহু-দীর্ণ, সমাপ্তির মুখোমুখি নতুনতর সমস্যা যোজনার চেষ্টা আছে — সর্বসাকুল্যে মৈমনসিংহ-গীতিকায় কাব্য গঠনের যে সাধারণ নৈপুণ্য, মলুয়ায় তার সাধর্ম্য লক্ষিত হয় না ।[৩১]

এই গাথার আখ্যানভাগ স্পষ্টত দুটি অংশে বিভক্ত । একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত প্রথম অংশের সঙ্গে পরবর্তী অংশের ভাবগত ও কাঠামোগত ভিন্নতা সহজেই দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় । প্রথম অংশটি গাথার মৌল সংকট থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন । গাথার মৌল সংকট দ্বিতীয় অংশেই শুরু । মলুয়ার সঙ্গে চান্দ বিনোদের সাক্ষাৎ, উভয়ের মধ্যে প্রণয়বাসনার উদ্রেক এবং তা দাম্পত্য জীবনে পরিণতিলাভের মধ্য দিয়ে প্রথমাংশের সমাপ্তি । মূল সংকট শুরুর পূর্বেই গাথার অর্ধেক অংশ জুড়ে কেবলমাত্র দাম্পত্যজীবন সূচনার কাহিনী বর্ণিত হওয়ায় আখ্যানভাগের নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ হয়েছে । এ-অংশের বিবাহ-বর্ণনা বাহুল্য-দোষে দুষ্ট । এ-অংশটি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল । এই অংশের গল্প-বর্ণনায় চমৎকারিত্ব কিংবা পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে এমন কোনো কৌতুহলোদ্দীপক সংকটের স্বাক্ষর নেই । দারিদ্রের কারণে চান্দ বিনোদের নিকট কন্যা সম্প্রদান না করার যে-সিদ্ধান্ত নেয় হীরাধর, তাতে এই অংশের আখ্যানভাগে যে সংকট সৃষ্টির সম্ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠেছিল — তা অতি সহজে অলৌকিকভাবে চান্দ বিনোদের বিপুল অর্থ প্রাপ্তির ঘটনায় দূরীভূত হয় । অন্য কোনো দ্বন্দ্ব-সংকট প্রথম-অংশের আখ্যানভাগকে মৈমনসিংহ-গীতিকার উপযোগী উজ্জ্বল করতে পারেনি । অন্যদিকে প্রথম অংশে চান্দ বিনোদের সক্রিয়তা দৃষ্ট হলেও দ্বিতীয় অংশে সে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় চরিত্র । বরং দ্বিতীয় অংশে মলুয়া চরিত্রই তার বুদ্ধিমত্তা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সক্রিয়তা, প্রণয়বাসনায় একনিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বারা বীরত্বব্যঞ্জক হয়ে উঠেছে । আখ্যানভাগের প্রথম অংশে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হেতু সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে । অন্যদিকে দ্বিতীয় অংশে সামন্ত শাসক-শক্তির অত্যাচার-নির্যাতন, হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট । দ্বিতীয় অংশের গল্প-গ্রন্থন দ্বন্দ্ব-সংকটে গতিশীল । গাথার অধিকাংশ ঘটনাই ঘটেছে এই অংশে । চান্দ বিনোদের নববিবাহিতা সুন্দরী স্ত্রী মলুয়ার দেহসৌন্দর্য দর্শনের পর তাকে স্ত্রী হিসেবে লাভ করার জন্য নানা প্রকার ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে কাজী । নেতাই কুটনীর মাধ্যমে কাজীর অন্যায় প্রস্তাব প্রেরণ, মলুয়া কর্তৃক দৃঢ়তার সঙ্গে সে-প্রস্তাব

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাখ্যান, প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ কাজী কর্তৃক চান্দ বিনোদের জমি ক্রোক, চান্দ বিনোদের দৈন্য-অবস্থায় পুনরায় কাজীর প্রস্তাব এবং পুনর্বার প্রত্যাখ্যান, চান্দ বিনোদ স্বীয় অবস্থার উন্নতি করার পর পুনরায় কাজীর অত্যাচার, দেওয়ানের দ্বারা তার মৃত্যুদন্ড দান ও স্ত্রী হরণ, স্বীয় বুদ্ধিমত্তায় দেওয়ানের কবল থেকে মলুয়ার মুক্তি, দেওয়ান কর্তৃক কাজীর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা, পাঁচ ভাইয়ের সহায়তায় স্বামীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো, সামাজিক কুসংস্কারের শিকার হয়ে স্বামী পরিত্যাক্ত মলুয়ার দাসীবৃত্তি গ্রহণ, স্বামীর সর্প দংশনের পর পাঁচ ভাইয়ের সহায়তায় তাঁকে বাঁচিয়ে তোলা, এতদসত্ত্বেও সমাজ তার দাম্পত্য জীবনে অনুরায় হয়ে থাকলে মলুয়ার আত্মবিসর্জন প্রভৃতি ঘটনার ঘনঘটায় দ্বিতীয় অংশের আখ্যানভাগ পাঠকদের মনোযোগ-বিচ্ছিন্ন হতে দেয় না। দ্বন্দ্ব-সংকটে এই অংশের আখ্যানভাগ গতিশীল হলেও ঘটনার আধিক্যের ফলে কিছুটা ভারবাহীও হয়েছে। তাছাড়া এই অংশেও অপ্রয়োজনীয় ঘটনার সন্নিবেশ দুর্লক্ষ্য নয়ঃ

> মলুয়াকে হরণ করবার আগে চাঁদ বিনোদকে কবর দেবার চেষ্টা এবং পাঁচ ভাইয়ের বীরত্বে তার উদ্ধার সাধন ঘটনার বোঝা বাড়িয়েছে, গল্পের সুগভীর তাৎপর্যের কোন দ্বার উন্মুক্ত করেনি। আবার প্রায় সমাপ্তির কাছে এসে চাঁদ বিনোদের কোড়া শিকারে গিয়ে সর্পাঘাতে মৃত্যু ও জীবন-লাভ গল্পের এক নবতর উপশাখা-যোজনার প্রচেষ্টা হিসেবেই উপস্থাপিত।...[৩২]

এই গাথার আখ্যানভাগে নৈয়ায়িক শৃঙ্খলার স্খলন অত্যন্ত কম। এধরনের একটি শৃঙ্খলার উদাহরণ লক্ষ্য করা যাবে, যখন মলুয়ার পিতৃগৃহের নিকটস্থ ঘাটে চান্দ বিনোদ সন্ধ্যাকালেও নিদ্রা যায়, তখন এই অসময়ের নিদ্রার সমর্থনে রচয়িতার উক্তিঃ

> জৈষ্ঠ মাসের ছোট রাইত ঘুমের আরি না মিটে।
> কদমতলায় শুইয়া বিনোদ দিনের দুপুর কাটে॥ (মৈ.গী.পৃ ৫১)

নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার এলাকা এই গাথার আখ্যানভাগে একাধিক। চান্দ বিনোদের বিবাহিত জীবনের ছয়মাস অতিবাহিত হওয়ার পর কাজী তার কাছে বিয়ের ভেট দাবি করেছে। এবং তার পরিমাণ এতই বেশি যে শোধ করার জন্য তাকে সর্বস্বহারা হতে হচ্ছে। প্রথমত শাসক-শক্তিকে বিয়ের ভেট দেওয়ার বিষয়টি যদি সামাজিক নিয়ম হয়, তাহলে চান্দ বিনোদ তা বিস্মৃত হল কেন? দ্বিতীয়ত ভেটের পরিমাণ যদি স্বভাবত এত বেশি না হয়, তাহলে সে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করল না কেন? তৃতীয়ত সে অর্থ সংস্থানের ভিন্ন উপায় সন্ধান করল না কেন? এ সব প্রশ্ন পাঠক মনে জাগ্রত হলেও গাথায় তার সদুত্তর মেলে না। আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। চরম দরিদ্র অবস্থায় চান্দ বিনোদ নিজে না গিয়ে মলুয়া ও তার নিজের মাকে শ্বশুরালয়ে প্রেরণের কথা বললে মলুয়া তাতে সম্মত হয় না। স্বামীকে রেখে সে যেতে অনিচ্ছুক — এটা বোঝা যায়, কিন্তু স্বামীসহ কেন যাওয়ার জন্য সে চেষ্টা করছে না — তার কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। আর একটি ঘটনায় দেখা যায়, মলুয়া পাঁচ ভাইয়ের সাহায্যে দেওয়ানের কবলমুক্ত হয়। ঠিক তার পরের পংক্তিতেই উল্লিখিত হয় যে স্বামীর সঙ্গে সে পিত্রালয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার স্বামী সেখানে কোত্থেকে কিভাবে এল তার কোনো ব্যাখ্যা নেই।

আখ্যানভাগের এসব ত্রুটির সঙ্গে কিছু কিছু বিষয়ের বাহুল্য-বর্ণনার ত্রুটির কথা উল্লেখ করা যায়। মলুয়ার পিত্রালয়ে চান্দ বিনোদের প্রথম আতিথ্য গ্রহণকালে বহুবিধ রান্নার বর্ণনা, পরবর্তী-

Dhaka University Institutional Repository

সময়ে বিবাহ-অনুষ্ঠানের একটি সামগ্রিক বর্ণনা, বাসর রাতের কথোপকথন, পুত্র ও পুত্রবধূকে বরণের দৃশ্য প্রভৃতি অংশের বর্ণনা কাহিনীর কেন্দ্রীয় সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বাহুল্য-দোষে দুষ্ট। তবে এসকল অংশের বর্ণনায় যে চমৎকারিত্ব, গীতিময়তা এবং আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের স্বাক্ষর পাওয়া যায়, তা অপূর্ব। বাসর রাতের বর্ণনাটি উল্লেখযোগ্য :

কি কর পরাণের বন্ধু শুন মোর কথা।
আজি রাতে মাথা দেও খাও মোর মাথা॥
না ফুটিতে ফুল কেন তুল্যা লও কলি।
মধু না জন্মিতে ফুলে নাহি আসে অলি॥
খিধা লাগলে তাপ্তা ভাত জুড়াইয়া সে খায়।
এমন হইতে বন্ধু তোমায় না জুয়ায়॥
গঙ্গু ভাইয়ের বউ নিদ্রা নাহি গেছে।
বেড়ার ফাক দিয়া তারা তোমায় দেখিছে॥
ভূষণের ঝুণুঝুনু শব্দ শুনি কানে।
পরিহাস করবে তারা পালিকা বিহানে॥
পরদীপ নিবাইয়া বন্ধু আজি কাট নিশি।
চিত্তে ক্ষেমা দিও বন্ধু না বানাইও দোষী॥ (মৈ.গী.পৃ ৬১)

রূপকথাধর্মিতা এই গাথার আখ্যানভাগের আর একটি ত্রুটির দিক। বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পর চান্দ বিনোদের আর্থিক সচ্ছলতার রাতারাতি পরিবর্তন, সর্পদংশনে মৃত চান্দ বিনোদের অতি সহজে জীবনলাভ এবং সবশেষে মহুয়ার মৃত্যু দৃশ্যে রহস্যময় মন পবনের নৌকার উল্লেখের মধ্যে রূপকথা-ধর্মিতার স্পর্শ আছে।

মহুয়া গাথার পরিণতি বিয়োগান্তক। অনতিক্রম্য সামাজিক পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে পর্যুদস্ত একটি নারী-হৃদয় তার অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মবিসর্জন করলে গাথার করুণ ট্রাজেডি সংঘটিত হয়। মহুয়া চরিত্রের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যগুণ এই পরিণতির জন্য প্রত্যক্ষত দায়ী নয়। সমাজে ব্রাহ্মণ্য শাসনের প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবই এই গাথার ট্রাজিক পরিণতির জন্য দায়ী।

> ... একটি নারী চরিত্রের অন্তর্মুখী শাশ্বত সংস্কার ও আর একটি হিন্দু সমাজের বহির্মুখী অনুশাসন — এই সংঘাতই এই কাহিনীর ট্রাজেডির মূল।[৩৩]

মহুয়ার আত্মবিসর্জনকে আশুতোষ ভট্টাচার্য 'আত্মহত্যা' বলে আখ্যায়িত করেছেন, অন্যদিকে মহুয়ার হত্যাকে বলেছেন আত্মত্যাগ।[৩৪] বক্তব্যটি যথার্থ কিনা, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। মহুয়াকে প্রকৃতপক্ষে হত্যা করা হয়েছে। হুমরা বেদে মহুয়ার প্রণয়ী নদের চাঁদকে হত্যা করার জন্য অনুসন্ধান করে ফিরছে। তাকে হত্যা করা আর মহুয়াকে হত্যা করা সমার্থক, কেননা এক্ষেত্রে দুজন প্রণয়াবেগে এতই একাত্ম যে পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়। মহুয়া নিজে বুকে ছুরি বসিয়েছে — এটা এখানে বড় কথা নয়। তেমনি মহুয়ার আত্মবিসর্জনকে আত্মহত্যা বলাও যুক্তিযুক্ত নয়। 'আত্মহত্যা' শব্দটির মধ্যে যে-নেতিবাচক সুর রয়েছে, তা মহুয়ার প্রতি আরোপ করা যথার্থ নয়। মহুয়া বেঁচে থাকার জন্য কম চেষ্টা করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

সে-ঘরের সর্বময় কর্ত্রী ছিল সে, সেই ঘরেই দাসীবৃত্তি অবলম্বন করেছে, সর্পদংশনে মৃত স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মলুয়া দাম্পত্য জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। সমাজের প্রতিক্রিয়াশীলতা এমনই নির্দয় যে তা মলুয়ার কাছে যথার্থভাবেই অনতিক্রম্য বলে বোধ হয়েছে এবং তাকে আত্মবিসর্জনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। মলুয়ার আত্মবিসর্জন গৌরবদীপ্ত। সে সংগ্রাম থেকে নিশ্চেষ্ট নয়। ফলে তার আত্মবিসর্জনের প্রতি পাঠকচিত্তের সহানুভূতি সক্রিয়।

তবে এই গাথার পরিণতি বিষয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্যের অন্য একটি বক্তব্য আলোচনার দাবি রাখে। তিনি বলেছেন,

> কিন্তু আর একদিক দিয়া বিচার করিতে গেলে মনে হইতে পারে যে, চাঁদ বিনোদের চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাবের মধ্যেও এই কাহিনীর ট্র্যাজেডির বীজ নিহিত ছিল। চাঁদ বিনোদের প্রেম রূপজ মোহ জাত — তাহার প্রেমে যদি সত্য থাকিত, তাহার যদি সুদৃঢ় চরিত্রবল থাকিত, তবে ব্রাহ্মণ্য শাসন এই ক্ষেত্রে কিছুই করিতে পারিত না। কারণ, চাঁদ বিনোদের চরিত্রে কোন ব্রাহ্মণ্য নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অতএব চাঁদ বিনোদের চারিত্রিক দৌর্বল্য ব্রাহ্মণ্য শাসনকে উপলক্ষ্য করিয়া এই ট্র্যাজিডি সংঘটিত করিয়াছে।[৩৫]

এই বক্তব্য অখণ্ডনীয়। সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল বিবেচনাবোধের বিরুদ্ধে মলুয়ার সংগ্রাম একান্তই নিঃসঙ্গ। এই সংগ্রামে চান্দ বিনোদ তার সঙ্গী হলে পরাজয়ের গ্লানি মলুয়ার জীবনে এমন মারাত্মক হত না, যেজন্য তাকে আত্মবিসর্জন করতে হত। মলুয়ার জীবনের বিয়োগান্তক পরিণতির জন্য সামন্ত শাসক-শক্তির উদগ্র লালসাদীর্ণ জীবনাচার এবং মধ্যযুগীয় সমাজের ধর্মীয় পশ্চাদপদ প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতার পাশাপাশি নায়ক চান্দ বিনোদ চরিত্রের নিশ্চেষ্টতাও অংশত দায়ী। সে-কারণে এই গাথার ট্র্যাজিক পরিণতিকে সম্পূর্ণভাবে বহিরারোপিত বলাও যথার্থ নয়।

চন্দ্রাবতী

'চন্দ্রাবতী'[৩৬] গাথায় চরিত্র-সংখ্যা অল্প। জয়ানন্দ, চন্দ্রাবতী ও চন্দ্রাবতীর পিতা বংশীদাস — এই তিনটি মাত্র চরিত্রের কোনোটিই পূর্ণরূপে বিকশিত নয়। জয়ানন্দ-চন্দ্রাবতী আবাল্য সাথী। চন্দ্রাবতীর পিতা বংশীদাস ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, দরিদ্র, তবে বংশগৌরবমণ্ডিত। মানুষের অন্তর্গত আবেগ-অনুভূতির মূল্য তার কাছে শূন্য। তিনি ধর্মাচরণ এবং বিদ্যাচর্চাকেই একমাত্র কর্তব্য-জ্ঞান করেন। তার চরিত্রটি গুণবান, কিন্তু রূপবান নয়। তার চরিত্রে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, সংকট নেই, সে-কারণে অনাকর্ষণীয়ও। অথচ এই চরিত্রটির বীপরীতে গাথার রচয়িতা দুইটি চমৎকার চরিত্র অঙ্কন করেছেন অত্যন্ত সার্থকভাবে। জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতী — উভয় চরিত্রে দ্বন্দ্ব আছে, সংকট আছে, ত্রুটি আছে আর ত্রুটির জন্য অনুশোচনা আছে।

জয়ানন্দ তার আবাল্য সাথী চন্দ্রাবতীর প্রতি অনুরাগবশত যেমন তার প্রণয়নিবেদন করে, তেমনি সুন্দরী মুসলমান যুবতীর রূপ দেখে মোহগ্রস্ত হয়ে ধর্মান্তরিতও হয়। আবার সেই জয়ানন্দই অনুশোচনা-দগ্ধ হৃদয় নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে। চন্দ্রাবতীর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে প্রত্যাখ্যাত হৃদয় নিয়ে আত্মবিসর্জন করে।

Dhaka University Institutional Repository

বংশীদাস চরিত্রটির সম্পূর্ণ বিপরীত এই চরিত্রটি অত্যন্ত রূপবান। জয়ানন্দ অন্যকে যেমন ভুলাতে পারে, নিজেও তেমন ভুলতে পারে। চন্দ্রাবতী ও মুসলমান যুবতীর সাথে আচরণের ক্ষেত্রে তার চরিত্রের এই বৈপরীত্য প্রকাশ পেয়েছে। সে যেমন অপমান করতে পারে, তেমনি মর্যাদা দিতেও জানে। অত্যন্ত সক্রিয় এই চরিত্রটি গতিশীলতায় অপূর্ব। সে নিজেই প্রণয়যাচঞা করে চন্দ্রাবতীর,— এ ক্ষেত্রে তার সাহসিকতা প্রশংসনীয়। নায়িকা চন্দ্রাবতীর অনুকূল সাড়া পেয়ে সে ঘটক প্রেরণ করে এবং এক্ষেত্রেও তার প্রচেষ্টা সফল হয়। কিন্তু চন্দ্রাবতীর সঙ্গে বিবাহের পূর্বেই এক সুন্দরী যুবতী রমণীর রূপলালসা তার হৃদয়ে এমনই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে যে ধর্মাধর্ম জ্ঞান, বাবাল্য সাথীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের মতো সামাজিক ক্রিয়ার প্রতিশ্রুতি – সবকিছু সে বিস্মৃত হয়। বিস্মৃতির কাল অবসিত হলে আবার সে এমনই অপরাধবোধ অনুশোচনায় পীড়িত হয় যে আত্মবিসর্জন ভিন্ন বিকল্প তার কাছে অভাবনীয়। এই চরিত্রটি দোষে-গুণে, ন্যায়-অন্যায়ে, ভুল-নির্ভুল উভয় প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণে, অপরাধ-কর্ম সম্পাদন ও সেজন্য অনুশোচনাবোধে সক্রিয় ও গতিশীল।

চন্দ্রাবতী চরিত্রে গুণ ও রূপ — এই উভয় ধর্মের সুসমন্বয় ঘটেছে। জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীর প্রণয়ভাজন। কিন্তু জয়ানন্দের প্রণয়নিবেদনের পূর্বে সে তা প্রকাশ করতে পারেনি। নারীসুলভ স্বাভাবিক লজ্জাবশত সে জয়ানন্দের প্রণয়যাচ্ঞার পরও নিজের মনোভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারেনি। তবে তার বক্তব্য থেকে তার অনুকূল মনোভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট :

"ঘরে মোর আছে বাপ আমি কিবা জানি।
আমি কেমনে দেই উত্তর অবলা কামিনী"। (মৈ. গী. পৃ ১০৭)

এরপরে জয়ানন্দের সঙ্গে তার বিবাহ-উদ্যোগের মধ্য দিয়ে, তার মনের সুপ্ত প্রণয়বাসনা চরিতার্থ হওয়ার আশায় তার হৃদয় যখন উল্লাসে উচ্ছল, তখনই জয়ানন্দের নিকট থেকে আসে মর্মান্তিক আঘাত। পরনারীগামী, ধর্মান্তরিত জয়ানন্দের আচরণ তার নিকট এতই অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল যে 'অধিক শোকে পাথর' হয়ে যাওয়ার মতো বেদনায় সে মূক হয়ে যায়। যন্ত্রণাদগ্ধ, প্রণয়-লাঞ্ছিত, অপমানিত হৃদয়ে সে পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য করে ধর্মনিষ্ঠা ও বিদ্যা-চর্চায় ব্রতী হয়। বিস্মৃত হওয়ার এ-যে কঠিন উপায় নয় — তা গাথারচয়িতার হয়ত জানা ছিল। জয়ানন্দ যখন প্রত্যাবর্তন করে, তখনই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের বাণীকেই যেন তার হৃদয়মধ্যে তখন উচ্চারিত হয় : "ভুলে থাকা নয় সেতো ভোলা,/বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা। / নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, / নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই ;" (ছবি : বলাকা)। কঠিন কঠোর তপস্যাও জয়ানন্দকে বিস্মৃত করতে পারেনি। জয়ানন্দের সাক্ষাৎ প্রার্থনায় সাড়াদানে তাই তার মৌন সম্মতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এবারও চন্দ্রাবতী পিতামুখী। কেননা যে-হৃদয়াকাঙ্ক্ষা তাকে নিয়ন্ত্রণহীন করেছে ধর্মনিষ্ঠা ও সমাজ-সংস্কারের কারণে তাতে তার একজন অবলম্বন প্রয়োজন। এখানে অবলম্বন হয়েছে পিতা। পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করে সে হৃদয়বাসনা ত্যাগ করেছে। কিন্তু মানুষের হৃদয় যে পিতৃআজ্ঞা, ধর্মনিষ্ঠা, সমাজ-সংস্কার — কোনোকিছুরই অধীন নয়, তা যে মনুষ্যশরীরের সম্পূর্ণ স্বাধীন, সার্বভৌম ও স্বশাসিত একটি সত্তা — তা পুনরায় প্রমাণিত হল যখন জয়ানন্দের চিরবিদায়ের সংবাদে তার চক্ষু হল অশ্রুসিক্ত এবং নদীজলে আত্মবিসর্জিত জয়ানন্দের মরদেহ দর্শনে তার হৃদয় হল উন্মাদিনী। প্রণয়বাসনা, ধর্মনিষ্ঠা, সমাজসংস্কার প্রভৃতির পারস্পরিক দ্বন্দ্বে আবর্তিত চন্দ্রাবতীর চরিত্রটি বিভিন্ন দিক থেকে আত্মাবদ্ধ,

Dhaka University Institutional Repository

ধ্যানমগ্ন ও অহিংসাপ্রিয় ।

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতীর চরিত্র সম্পর্কে যেকটি উক্তি করেছেন তার যথার্থতা নিয়ে সহজেই প্রশ্ন উঠতে পারে । তিনি লিখেছেন : "জয়ানন্দের চরিত্রে দৃঢ়তা নাই, সেইজন্য প্রেমেও নিষ্ঠা নাই, অতএব সে যেমন তাঁহার প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কামিনীতে আসক্ত হইতে পারে, তেমনই সে আকস্মিক উত্তেজনায় জীবনও বিসর্জন দিতে পারে । কিন্তু এই জীবন বিসর্জনের মধ্যে তাহার আত্মহত্যার পাপই বৃদ্ধি পাইয়াছে, আত্মত্যাগের গৌরব প্রকাশ পায় নাই । জীবন বিসর্জন না দিয়াও চন্দ্রাবতী তাঁহার প্রেমের নিষ্ঠার জন্য যে গৌরবের অধিকারিনী হইয়াছে, হতভাগ্য চঞ্চলমতি জয়ানন্দ মৃত্যুর মধ্যেও তাহার একাংশেরও অধিকারী হইতে পারে নাই । তাহার জন্য চন্দ্রাবতীও এক বিন্দু অশ্রুপাত করিবে না —"[৩৭] । আশুতোষ ভট্টাচার্যের এ-বক্তব্যে জয়ানন্দ-চরিত্রের মহত্ত্বের প্রান্তটি উপেক্ষিত হয়েছে । প্রণয়ে নিষ্ঠা না থাকলে জয়ানন্দের পক্ষে অনুশোচনাবিদ্ধ হৃদয়ে প্রত্যাবর্তন ও সেজন্য আত্মবিসর্জন করা সম্ভব ছিল না । সর্তব্য যে গীতিকাসমূহের অন্যান্য অধিকাংশ নায়ক-চরিত্রের মধ্যে যে আদ্যান্ত প্রণয়ে একনিষ্ঠা বজায় রাখার গুণটি ক্রিয়াশীল জয়ানন্দ-চরিত্রে তার অভাব এ-চরিত্রটিকে বরং প্রাত্যহিক জীবনধারায় বস্তুনিষ্ঠ করে তুলেছে । অন্যান্য নায়ক-চরিত্র যেখানে ক্ষণিকের রূপদর্শনে উন্মাদনার পরিচয় দিয়েছে, সেখানে জয়ানন্দের প্রণয় তুলনামূলকভাবে গভীর । কেননা এ-গাথায় দুজনের প্রণয়াবেগ স্ফীত ও দৃঢ়মূল হয়েছে আবাল্য বন্ধুত্ব ও নৈকট্যলাভের মধ্য দিয়ে । ক্ষণিকের রূপদর্শনে এরূপ গভীরতা সম্ভব নয় । জয়ানন্দের প্রত্যাবর্তনে তার গভীর প্রণয়াবেগেরই প্রমাণ পাওয়া যায় । তার আত্মবিসর্জনের ঘটনাও মোটেই আকস্মিক নয় । স্বীয় অপরাধবোধের অনুশোচনা তাকে আত্মবিসর্জনে উদ্বুদ্ধ করেছে । আত্মবিসর্জনের পরিকল্পনা নিয়েই সে শেষবারের মতো চন্দ্রাবতীর সাক্ষাৎ-প্রার্থী হয়েছে । সাক্ষাৎ-প্রার্থনার ভাষায়ই তার প্রমাণ পাওয়া যায় : 'একবার দেখি তোমায় জন্মশেষ দেখা' । কিংবা, আরও স্পষ্টভাবে সে বলেছে :

জলে ডুবি বিষ খাই গলাই দেই দড়ি ।
তিলেক দাড়াইয়া তোমার চান্দ মুখ হেরি ॥
ভাল নাহি বাস কন্যা এই পাপিষ্ঠ জনে ।
জন্মের মতন হইলাম বিদায় ধরিয়া চরণে ॥
এই দেখা চক্ষের দেখা এই দেখা শেষ ।
সংসারে নাহিক আমার সুখ শান্তির লেশ ॥ (মৈ.গী.পৃ ১১৫)

জয়ানন্দের শেষ পত্রের বক্তব্যেও কোনো অস্পষ্টতা নেই । অন্যায় সে করেছে, আহত উভয়ের পুনর্মিলন যে অসম্ভব, সেটা যথার্থভাবে উপলব্ধি করেই সে আত্মবিসর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে । এরমধ্যে আকস্মিক উত্তেজনা ক্রিয়াশীল নয়, বরং রয়েছে গভীর প্রণয়নিষ্ঠা । 'জয়ানন্দের আত্মবিসর্জনে গৌরব নেই কিংবা চন্দ্রাবতীও তার জন্য একবিন্দু অশ্রু বিসর্জন করবে না' — এ-তথ্য আশুতোষ ভট্টাচার্য কোথায় পেলেন — তা আমাদের বোধগম্য নয়, কেননা গাথার অভ্যন্তরসাক্ষী ভিন্নতর । জয়ানন্দের সাক্ষাৎ-প্রার্থনার চিঠি পড়েই তো কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে চন্দ্রাবতী : "পত্র পড়ি চন্দ্রাবতী চক্ষের জলে ভাসে । / শিশুকালের কথার কথা মনের মধ্যে আসে ॥" চন্দ্রাবতী যে পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করে তপস্যারত থেকেছে তাতেতো তার হৃদয়বাসনা লুপ্ত হয়নি, তপস্যাভঙ্গের পর জয়ানন্দের আগমন ও চিরবিদায়ের তথ্য জেনে সে আবারও অশ্রু বিসর্জন করছে : "জলে গেল চন্দ্রাবতী চক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

বহে পানি ।" আবার নদীতে জয়ানন্দের মৃতদেহ দর্শনে তার উন্মাদিনী রূপ ঃ "আখিতে পলক নাহি মুখে নাই সে বাণী । পারেতে খাড়াইয়া দেখে উমেদা কামিনী ।।।" জয়ানন্দের চিরবিদায়ে চন্দ্রাবতীর ধর্মনিষ্ঠ মন যেমন চোখের জলে ভাসে কিংবা তার মৃত্যুতে যেমন সে উন্মাদিনী হয় , জয়ানন্দের অনুতাপ-দগ্ধ হৃদয়ের প্রতি পাঠকহৃদয়ও একইরূপ সহানুভূতিশীল থাকে ।

'চন্দ্রাবতী' গাথার আখ্যানভাগে গল্পগ্রন্থন সুনিপুণ, ত্রুটিহীন । আখ্যানভাগ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে রচয়িতা একটি হার্দ্য সংকটকে যেভাবে বিকশিত ও পরিসমাপ্ত করেছেন — তা প্রশংসনীয় । ঘটনার আকস্মিকতা, ঘটনা সঙ্কুলতা ও ব্যক্তিত্বের পারস্পরিক সংকটের মধ্য দিয়ে কাহিনীর প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট রাখা, সংকটের একটি চূড়াস্পর্শী পর্যায় নির্মাণ এবং তা থেকে বিমোক্ষণ ঘটানো, দৃশ্যের পর দৃশ্য পরিকল্পনা প্রভৃতি নাটকীয় গুণাবলী এই গাথায় সুস্পষ্ট-ভাবে পরিদৃশ্যমান ।[৩৮]

গাথাটিতে নাট্যিক পরিচর্যাও সর্বব্যাপ্ত । জয়ানন্দ কর্তৃক চন্দ্রাবতীকে প্রণয়নিবেদন করে পত্রপ্রেরণ এবং পত্রপাঠে চন্দ্রাবতীর হৃদয়চাঞ্চল্য , বিবাহের প্রাক্কালে অকস্মাৎ জয়ানন্দের মতিভ্রমের সংবাদে চন্দ্রাবতীর স্বপ্নসাধ ভেঙে যাওয়ার দৃশ্যগুলি চমৎকার নাটকীয় পদ্ধতিতে উপস্থাপিত হয়েছে । শেষ দৃশ্যের নাট্যিক পরিচর্যাটিও চমৎকারিত্বে উজ্জ্বল । শেষ দৃশ্যটিতে নাট্যিক পরিচর্যার সঙ্গে চিত্রময়তা ও করুণ রসের সঞ্চার ঘটেছে । প্রণয়ে বিশ্বাসহন্তা নায়ক জয়ানন্দ অনুশোচনা-দগ্ধ হৃদয়ে চন্দ্রাবতীর দেখা পাবে কি পাবে না সেরকম অমীমাংসিত মন নিয়ে ধীর পদবিক্ষেপে যেন এগিয়ে আসছে । এসে মন্দির দ্বারে অনেক আকুতি-মিনতি করার পরও যখন চন্দ্রাবতী দ্বার খুলছে না, তখন বিফল মনোরথ হয়ে পাশে প্রস্ফুটিত মালতী ফুল তুলে তার রস দিয়ে মন্দিরে দ্বারে চিরবিদায় বাণী খোদিত করে নদীঘাটে প্রত্যাবর্তন করছে । এই প্রত্যাবর্তনের পদক্ষেপে যেন ক্লান্তি নেই, এবারে তার মন মীমাংসিত, আনন্দের সঙ্গেই যেন সে নদীজলে আত্মবিসর্জন করছে । ট্রাজেডি কল্পনার সঙ্গে সমন্বিত হওয়ায় শেষ দৃশ্যের নাটকীয় ও চিত্রময় পরিচর্যাটি নতুনতর মাত্রায় তাৎপর্যপূর্ণ ।

কাহিনী নির্মাণে গাথা-রচয়িতার পরিমিতি-বোধ অপূর্ব । প্রয়োজন -অতিরিক্ত একটি বাক্যও তিনি উচ্চারণ করেননি । অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যেও চরিত্রের অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব, ঘটনা-সঙ্কুলতা, সংকটের উদ্ভব বিকাশ ও পরিসমাপ্তি টেনে কাহিনীর একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দান প্রভৃতি ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় । প্রথম দৃশ্যেই পূর্বরাগ ঃ জয়ানন্দের সহায়তায় পিতার পূজার ফুল তুলছে চন্দ্রাবতী। বাল্যকাল থেকে যুবক-বয়স অবধি তারা যে এই একইরূপ সখ্যের পরিচয় দিয়ে আসছে — তার বর্ণনা মাত্র আঠার পংক্তিতে শেষ । দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে জয়ানন্দের পত্র লেখা ও চন্দ্রাবতীর নিকট পত্র হস্তান্তরের দৃশ্য । তাতেও কোনো বাহুল্য কথা নেই । চতুর্থ দৃশ্যে চন্দ্রাবতীর পিতা বংশীদাস কন্যার জন্য বরকামনা করছেন । পঞ্চম পরিচ্ছেদে চন্দ্রাবতী একান্ত গোপনে জয়ানন্দের পত্র পড়ে তার দুই বাক্যের সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখে জয়ানন্দের কাছে প্রেরণ করছে এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে গোপনে মনে মনে জয়ানন্দকে বর হিসাবে প্রার্থনা করছে । সপ্তম পরিচেছদে জয়ানন্দের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব এসেছে, প্রস্তাব গৃহীত ও দিন-তারিখ নির্ধারিত হয়েছে । অষ্টম দৃশ্যে বিয়ের আয়োজন, নবম দৃশ্যে মুসলমান যুবতীর প্রতি জয়ানন্দের রূপলালসা, প্রণয়নিবেদন, ধর্মান্তর গ্রহণ করে মুসলমান যুবতীর

Dhaka University Institutional Repository

পানিগ্রহণের ঘটনা ঘটেছে । দশম দৃশ্যে বিয়ের আয়োজনের মধ্যে মর্মভেদী সংবাদ এল : "অনাচার কৈল জামাই এতি দুরাচার । যবনী করিয়া বিয়া জাতি কৈল পার ।। " যদিও এই মর্মান্তিক সংবাদ রচয়িতা সংকেতধর্মী বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশন করে বলেছেন : "মুনির হইল মতিভ্রম হাতীর খসে পা । ঘাটে আস্যা বিনা ঝরে ডুবে সাধুর না " । একাদশ দৃশ্যে চন্দ্রাবতীর বেদনাদীর্ণ মানসিক অবস্থার বর্ণনা আছে, তবে এই পরিচ্ছেদটির বর্ণনাও চিত্রময় । দ্বাদশ বা শেষ পরিচ্ছেদে জয়ানন্দের অনুশোচনা প্রকাশ ও চন্দ্রাবতীর ক্ষমা ও সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে পত্রপ্রেরণ, চন্দ্রাবতী কর্তৃক সাক্ষাৎ দানে অসম্মতি ও জয়ানন্দের আত্মবিসর্জনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে বাহুল্য-বর্জিত বাক্যব্যবহারের মধ্য দিয়ে ।

গাথাটির সমগ্র আখ্যানভাগ নিখুঁত পরিকল্পনায় সজ্জিত । এক্ষেত্রে রচয়িতার যত্নশীল পরিচর্যার ছাপ সুস্পষ্ট । আঙ্গিক নির্মাণের ক্ষেত্রে বিষয়ভাবনাকে চমৎকারভাবে সমন্বিত করা হয়েছে । যেমন, ময়মনসিংহের গীতিকার সর্বত্র নায়িকার রূপ বর্ণনা একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিলক্ষিত হলেও এই গাথায় তা অনুপস্থিত । চন্দ্রাবতীর দেহসৌন্দর্যের কোনো বর্ণনা নেই । কেননা কাহিনীর বাস্তবতায়ই তা পরিত্যজ্য হয়েছে । অন্যান্য অধিকাংশ গাথায়ই নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ ঘটেছে অকস্মাৎ, সেকারণে ক্ষণিকের দর্শনে আসক্তি জন্মানোর জন্য নায়িকার দেহসৌন্দর্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল । এখানে জয়ানন্দ-চন্দ্রাবতীর প্রণয়ানুভূতি বাল্যাবধি নৈকট্য ও সখ্যসম্পর্কের মধ্য দিয়ে বর্ধিত হয়েছে । সুতরাং নায়িকার সৌন্দর্যবর্ণনা অপ্রয়োজনীয় ।

চন্দ্রাবতী গাথার পরিণতি বিয়োগান্তক । একদিকে রূপলালসায় মোহাবিষ্ট ও ধর্মান্তরিত যুবক জয়ানন্দের প্রণয়ে বিশ্বাসঘাতকতা, অন্যদিকে সেই জয়ানন্দের প্রতি অনুরক্ত, ধর্মনিষ্ঠ ও সমাজসংস্কারাচ্ছন্ন চন্দ্রাবতীর পারস্পরিক দ্বন্দ্বই এই গাথার ট্রাজিক পরিণতি ত্বরান্বিত করেছে । জয়ানন্দের আত্মবিসর্জনেই ট্রাজেডির করুণ রস দৃষ্ট হলেও মূলত ট্রাজেডির বেদনাকে ধারণ করেছে চন্দ্রাবতী । জয়ানন্দের আত্মবিসর্জনের অনেক পূর্বেই চন্দ্রাবতীর বেদনাদীর্ণ ট্রাজিক জীবনাচারের শুরু হয়েছে ।

জয়ানন্দের সঙ্গে বিয়ের আয়োজনের পরিপূর্ণ অবস্থায় জয়ানন্দের পরনারীগামী ও ধর্মান্তরগ্রহণের যে সংবাদ এল, চন্দ্রাবতীর মনে তার আঘাত ছিল মারাত্মক । আবাল্যসাথী জয়ানন্দকে সে মনে মনে বর হিসেবে কল্পনা করেছে বহুদিন পূর্ব থেকে, মনের গহন গভীরে জয়ানন্দকে নিয়ে তার একটি স্বপ্ন-প্রাসাদ রচিত হয়েছে । ঐ সংবাদে সেই স্বপ্ন-প্রাসাদ খন্ড-বিখন্ড হয়ে ভেঙে পড়েছে । চন্দ্রাবতীর মনে এই আঘাত কেবল কতকগুলো বাহ্যিক ঘটনার আঘাত নয়, তার হৃদয়ের প্রণয় বাসনার ওপর আর একটি হৃদয়ের আঘাত, একটি সহৃদয়হৃদয়সংবেদী মনের ওপর আর একটি মনের আঘাত । ফলে চন্দ্রাবতীর মানসিক বেদনার মাত্রা অপরিসীম । শোকে সে পাথর হয়ে গেল । গীতিকার অন্য নায়িকার মতো বারমাসী দুঃখের কান্নায় তার চোখ ভেজে নয় :

> না কান্দে না হাসে চন্দ্রা নাহি বলে বাণী
> আছিল সুন্দরী কন্যা হইল পাষাণী ।। (মৈ.গী.পৃ ১১৩)

বহু দেশ থেকে বহু সম্বন্ধের প্রস্তাব এল । কিন্তু চন্দ্রাবতী আমৃত্যু কুমারী থাকার সঙ্কল্প নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

শিবপূজায় মনোনিবেশ করন । তার অবস্থা সত্যই পাষাণবৎ ; মনের অবস্থার সঙ্গে সাংকেতিক সাযুজ্য রেখে বর্ণিত হয়েছে ঃ

নির্মাইয়া পাষাণশিলা বানাইয়া মন্দির ।
শিবপূজা করে কন্যা মন করি স্থির ॥ (মৈ.গী.পৃ ১১৪)

আমৃত্যু কুমারীব্রত পালন এবং শিবপূজায় মন স্থির করার সঙ্কল্পের মধ্যে চন্দ্রাবতীর জীবনের বড় ট্রাজেডি লুক্কায়িত । এই গাথার ট্রাজেডির প্রকৃতি বহিরাশ্রিত নয় । চরিত্রের অন্তর্গত দৌর্বল্যই ট্রাজেডির করুণ রসকে ঘনীভূত করেছে এবং দুইটি সজীব প্রাণকে করেছে নির্জীব । 'চন্দ্রাবতী' গাথার ট্রাজেডির আবেদন সম্পূর্ণরূপেই অনুরাগপ্রয়ী ।

কমলা

'কমলা'[৩৯] গাথার কেন্দ্রীয় চরিত্র কমলার মধ্যে সামাজিক অবস্থান-সচেতনতাগত আত্মসম্মানবোধ এবং বুদ্ধিমত্তা, আত্মপ্রত্যয়ী মনোবৃত্তি, সহনশীলতা ও মানবিক দায়িত্ববোধের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে । আখ্যানভাগের প্রারম্ভে তার চরিত্রে যে-চাপল্য, হাস্যপরিহাসপ্রিয়তা এবং নিদানের প্রণয়নিবেদন প্রত্যাখ্যানের মধ্যে গৃহভৃত্য তথা নিম্ন শ্রেণীর লোকদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক মানসিকতার সংকীর্ণ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, তা পরবর্তীকালের বিপর্যস্ত জীবনে সংগ্রামশীলতার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষাদীপ্ত পর্যায়ে দুর্লক্ষ্য । সংগ্রাম-কঠোর জীবনে তার চরিত্রের দৃঢ়তা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়তা, আত্মমর্যাদা-বোধ, বুদ্ধিমত্তা, প্রত্যয়শীলতা, সহিষ্ণুতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সাহসিকতা প্রভৃতি নারীজনোচিত ও গৌরবদীপ্ত উপাদান । কমলা চরিত্র সম্পর্কে একটি যথার্থ বিবেচনা প্রণিধানযোগ্য ঃ

> দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও আত্মসম্মান, দৃঢ়তর সংযম ও নিষ্ঠা এবং দৈবের বিরুদ্ধে একক সংগ্রামের দুঃসাহসী অটলতায় কমলা চরিত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল ।[৪০]

নিদানের প্রণয়যাচঞ্চা প্রত্যাখ্যানের ঘটনায় কমলা চরিত্রে প্রতিপত্তির অহমবোধ এবং ভৃত্যপ্রতিম ব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞাসূচক সঙ্কীর্ণতার যে প্রকাশ ঘটেছে, তা প্রত্যাখ্যাত নিদানের প্রতিহিংসাপরায়ণ কুটিলতা, মিথ্যাচার, অকৃতজ্ঞতা ও অন্য চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপের মতো হীন মনোবৃত্তির কাছে ম্লান হয়ে গেছে । যুবকের প্রণয়বাসনা প্রত্যাখ্যানে এক সময় সংকীর্ণতার নেতিবাচক রূপ পরিস্ফুটিত হলেও পরবর্তী সময়ে একই প্রত্যাখ্যান হয়ে উঠেছে কমলার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়তা ও আত্মমর্যাদাবোধের ইতি-বাচক প্রকাশ ঃ

এই কথা শুনিয়া কমলা কয় কারকুনেরে ।
"শুনছনি কেউ করে বিয়া নরপিশাচেরে ॥
আমার বাপের নুন খাইয়া বাচিলা পরাণে ।
তার গলায় দিতে দড়ি না বাসিল প্রাণে ॥
পরাণের সোদর ভাইয়ে দুঃখ যেই দিল ।
মুখে মারি ঝাটা তার পিঠে লাথি দিল ॥

Dhaka University Institutional Repository

বনে জঙ্গলায় থাকবাম নাহি ইতে ডর ।
তবু নাই গো যাবাম এমন রাক্ষসার ঘর ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৪২)

কমলা চরিত্রের এই ব্যক্তিত্বময়তা ও আত্মসম্মানচেতনা গাথার অন্যত্রও সুপরিস্ফুট । নিদানের লালসার অগ্নিতে স্বেচ্ছায় দগ্ধ হয়নি কমলা । ধনৈশ্বর্য ও প্রতিপত্তির লোভ ত্যাগ করে মাকে নিয়ে কমলা পথবাসী হয়েছে । মামার বাড়িতে আশ্রয়লাভের পর নিদানের প্রচারিত মিথ্যা কলঙ্কের দায়ে মামা যখন তাদের বিতাড়িত করার নির্দেশ দিয়েছে, তখনও তার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় । মামার পত্রপাঠে কমলার হৃদয়মধ্যে জাগ্রত অভিমানাহত প্রতিক্রিয়া ঃ

বাপে জন্ম দিয়া থাকে যদি হই সতী ।
বিপদে করিবে রক্ষা দুর্গা ভগবতী ॥
জলে ডুবি বিষ খাই গলে দেই কাতি ।
মামার বাড়ি না থাকিব দন্ড দিবা রাতি ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৪৫)

অতঃপর তার আত্মসম্মানসচেতন ব্যক্তিত্বময় প্রস্থানের এক চমৎকার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে ঃ

একবার না গেল কন্যা মামীর সদনে ।
একবার না চাইল কন্যা মায়ের মুখপানে ॥
একবার না ভাবিল কন্যা মোতিফুল মান ।
একবার না ভাবিল কন্যা পথের আন্ধান ॥
একবার না ভাবিল কন্যা কি হইবে আমার গতি ।
একলা পন্থেতে পড়ি কি হবে দুর্গতি ॥
একবার না ভাবিল কন্যা আশ্রয় কেবা দিবে ।
সন্ধ্যাবেলা তারা ফুটে সূর্য্য ডুবে ডুবে ॥
এমন সময় কন্যা কোন কাম করে ।
বনদুর্গা স্মরি কন্যা পন্থে মেলা করে ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৩৫)

সন্ধ্যার অন্ধকারে অজানা-পথে যুবতী নারীর এমন প্রস্থানে যে-দুঃসাহসিকতার পরিচয় আছে, তার উৎস মূলত কমলার অনুর্গত হৃদয়ে প্রিয়জনের অনাকাঙ্ক্ষিত আঘাতদানের মধ্যে গ্রেথিত । পিতা ও ভ্রাতাকে কারাবাসদান এবং মাসহ কন্যাকে গৃহচ্যুত করেও গৃহভৃত্য নিদান কমলার মনকে যতটুকু না ব্যথিত করতে সক্ষম হয়েছে, তার চেয়ে মামার একটি চিঠির আঘাতদানের তীব্রতা অধিক । প্রিয় ও অপ্রিয়ের ব্যবধানই এর মূল কারণ । ধনাঢ্য পরিবেশে লালিত হয়েও মইষাল বন্ধুর নিমন্ত্রিত গৃহে কমলার স্বাধীন অথচ কঠোর জীবনযাপনে কোনো ক্লান্তি নেই । জমিদার-পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাতের পর কমলার মধ্যেও হয়ত প্রণয়বাসনা জাগ্রত হয়েছিল ; কেননা জমিদার-পুত্রের আগ্রহে যখন তার সঙ্গী হয়েছিল কমলা, তখন তার মধ্যে কোনো অনাগ্রহ ছিলনা, হয়ত জমিদার-পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাতের পর পিতা-ভ্রাতাকে উদ্ধার করার সম্ভাবনা নিয়ে ক্ষীণ আশা জেগেছিল তার মনে । স্মর্তব্য যে, জমিদার-পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব ও উত্তরকাল কমলার জীবনের দুই পর্বে বিভক্ত । প্রথম পর্বে কমলার আত্মমর্যাদাবোধ ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণই সুস্পষ্ট । পরবর্তীকালে তার বুদ্ধিমত্তা, দায়িত্ববোধ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং ধৈর্যশীলতার পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে । জমিদার-পুত্রের মনে তাকে নিয়ে জাগ্রত রূপজমোহ

Dhaka University Institutional Repository

ও পূর্বরাগের দৌর্বল্যকে সে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পিতা-ভ্রাতার জীবনদান ও স্বীয় সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি উদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যবহার করেছে। কিন্তু যুবতী নারী কমলা যৌবনাবেগশূন্য নয়। তবে তার প্রণয়বাসনা মুক্তপ্রেমের আদর্শে পল্লবিত কিংবা দায়িত্বজ্ঞানবর্জিত আকাশচারী নয়। পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তার প্রণয়বাসনা সংযত ও যুক্তিশীল। জমিদার-পুত্রের সঙ্গে স্বীয় পরিচয় গোপন রেখে বৈবাহিক সম্পর্কের আনুষ্ঠানিকতাকে বিলম্বিত করার পেছনে তার মর্যাদাপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনাই ক্রিয়াশীল। পরিচয়-দানের অনুষ্ঠানটি কমলার সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার পরিচয়বাহী। রচয়িতা তার চরিত্রের গুণাবলীকে ব্যাখ্যা না করে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন।

সমগ্র গাথা জুড়ে কমলাই সকল ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু। তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে পুরো কাহিনী। তার দেহসৌন্দর্য ও আত্মমর্যাদাবোধ যেমন তার নিজের ও পারিবারিক জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে, তেমনি তার আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের ক্ষেত্রেও এই দুই উপাদানই সমানভাবে ক্রিয়াশীল। সমগ্র কাহিনী জুড়ে কমলা চরিত্রের doing and suffering কোনো সার্থক ট্র্যাজেডির কেন্দ্রীয় চরিত্রের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

গৃহভৃত্য নিদান ও জমিদার-পুত্র প্রদীপকুমার কেউই নায়ক চরিত্রের মর্যাদায় উন্নীত নয়। প্রথম ব্যক্তি বিরোধী শক্তি হিসাবে এবং শেষোক্তজন গৌণ সাহায্যকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। একজনের মনে সংকীর্ণতা, অন্যজনের মধ্যে ঔদার্যের প্রকাশ। একজনের মনে রূপলালসা, দেহজ-কামনা, অন্যজনের মধ্যে রূপজমোহ। একজন তার কাঙ্ক্ষিত জনকে লাভ করার জন্য অতিশয় উদগ্রীব এবং এক মুহূর্ত ধৈর্য ধরতে অপারগ, অন্যজন শত শত বছর নিজেকে সংযত রাখতেও অসম্মত নয়। একজন সংযত ব্যক্তিত্বময়ী নারীর দুই পার্শ্বে বিপরীতধর্মী দুই যুবক চরিত্রকে বিন্যস্ত করার ফলে তিনটি চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্যগুলি সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হতে পেরেছে। এই গাথার সকল চরিত্রই কমলাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়ায় এবং রচয়িতা কমলা চরিত্রের বিন্যাসেই অধিকতর মনোযোগী হওয়ায় অন্য চরিত্রসমূহ নিতান্তই অনুজ্জ্বল। তবে এই অনুজ্জ্বলতার মধ্যেও চিকন গোয়ালিনী চরিত্রটি স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। অন্য চরিত্রের মধ্যে সইবান বন্ধু চরিত্রটি লোকায়ত গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে অঙ্কিত সহজ-সরল একজন সাধারণ শ্রমজীবীর চরিত্র হিসেবে চমৎকারভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে।

চিকন গোয়ালিনী চরিত্রটি নানাকারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইতোমধ্যে আমরা সমধর্মী একটি চরিত্র নেতাই কুটনীর সাক্ষাৎ লাভ করেছি 'মহুয়া' গাথায়। তবে নেতাই কুটনীর রচয়িতার তুলনায় চিকন গোয়ালিনীর রচয়িতার শিল্পনৈপুণ্য, বাস্তব সমাজাভিজ্ঞতা ও দক্ষ হাতের পরিচয় সহজেই দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়। গ্রামীণ সমাজজীবনে এ ধরনের চরিত্রের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির ফলে রচয়িতার শিল্পদৃষ্টি বাস্তব অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ হয়েছে বলে ধারনা করা যায়। যৌবনকালে রূপবতী এই গোয়ালিনী যেমন বহু পুরুষগামী ছিল, তেমনি অন্য কুলবধূদের বা কুলনারীদের পথভ্রষ্ট করতেও ছিল সিদ্ধহস্ত। বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে তার সেই বদগুণটিও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ব্যাপারে তার স্বীকারোক্তি: "মরিচ যতই পাকে তত হয় ঝাল। সময়ে বয়স যায় নাহি যায় রস।" (মৈ.গী.পৃ ১২৭)। অন্য নারীকে পথভ্রষ্টা করার ব্যাপারে তার অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে গ্রামে কিংবদন্তী আছে। সে পানপড়া জানে, তেল পড়া জানে। এছাড়া শল-পনা মাছ, পেচার মাংস প্রভৃতি সহযোগে সে এমন এক ধরনের ঔষধ তৈরি

Dhaka University Institutional Repository

করতে সক্ষম, যেটি এ-গজে পুরোপুরি ব্যর্থ :

বাসী জলে বড়ী খায় উঠিয়া বিয়ানে ।
সতী নারী পতি খাড়ে ঔষধের গুণে ।। (মৈ. গী. পৃ ১২৪)

চিকন গোয়ালিনীর এই অলৌকিক শক্তি কেবলমাত্র বর্ণিতই হয়নি, ঘটনার প্রত্যক্ষ উপস্থাপনেও তার প্রমাণ সুস্পষ্ট । কমলার সঙ্গে কথোপকথনে যখন সে যুবতী নারীর বিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপনের মাধ্যমে তার এ-সম্পর্কিত মানসিক অবস্থা যাচাইয়ে উদ্যোগী হয়, তখন কমলাও প্রসঙ্গটি এড়ানোর জন্য রতি-মদনের কাহিনী উপস্থাপন করে । এক্ষেত্রে চিকন গোয়ালিনীর চতুরতার প্রমাণ সহজেই লক্ষ্য করা যায় । দুর্বৃত্ত সে কমলার রতি-মদন কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অন্য এক কাহিনীর অবতারণা করে এবং স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত বাক্যগুলি ব্যবহার করে :

গোয়ালিনী কয় "কন্যা শুন মোর কথা ।
সত্য কহিবাম যত না হইবে অন্যথা ।।
একদিন দই লইয়া যাই স্বর্গ পুরে ।
পন্থেতে লাগাল পাই তোমার মদনেরে ।।
তোমায় লাগিয়া মদন ফিরে পাগল হইয়া ।
আসমানের চান্দ যেমন আমারে পাইয়া ।।
মদন কহিছে তুমি থাক মর্ত্তপুরে ।
একদিননি দেখিয়াছ আমার রতিরে ।।
... ...
"আমি কইলাম রতি তোমার রাজার ঘর আলা ।
জনম লইয়াছে কন্যা নামেতে কমলা ।।
বাড়ীঘরের কথা কইলাম বাপ-মায়ের নাম ।
উবুৎ হইয়া মদন করে আমারে সেলাম ।।
একখানি পত্র মদন যত্নেতে লিখিয়া ।
যত্ন করিয়া আঁচে মোর দিয়াছে বান্ধিয়া ।। (মৈ. গী. পৃ ১৩৩-৩৪)

সতী নারীকে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করার জন্য গোয়ালিনী যে অত্যন্ত সুচতুর বাকপটুতার পরিচয় দিয়েছে, তার প্রমাণ এখানে সুস্পষ্ট । মদনের প্রতি কমলার দুর্বলতা লক্ষ্য করে মদনের নাম করে নিজেদের পত্রটিই সে কমলার হস্তে অর্পণ করেছে । এই চরিত্রটির সুদক্ষ বিন্যাস সম্পর্কে সমালোচকের একটি যথার্থ উক্তি স্মর্তব্য :

> অননুকরণীয় বক্র সরস বাচনভঙ্গী এবং ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চাতুর্য এই হীনমনা ঘৃণ্য নারীকে সাহিত্যিক দরবারে উচ্চ আসনে বসিয়ে রাখবে ।[৪১]

'কমলা' গাথার আখ্যানভাগ গঠন-প্রকরণে নিখুঁত - একথা নিশ্চিত করে বলা কঠিন । কেননা কাহিনী একটি কেন্দ্রীয় ঐক্যে আবর্তিত এবং নাটকীয় ঘটনা বিন্যাসের মতো সংকটের উদ্ভব, বিকাশ, চূড়া-স্পর্শ এবং সেখান থেকে বিলোকনের সুত্রবদ্ধ পর্বগুলি অতিক্রম করলেও কিছু কিছু অংশের বর্ণনায়

Dhaka University Institutional Repository

অতিরঞ্জন ও পুনরাবৃত্তি দোষ দুর্লক্ষ্য নয়। হয়ত এ কারণেই কোনো সমালোচক কমলার কাহিনী-গ্রন্থনকে 'প্রায় ত্রুটিহীন'[৩২] বলে থাকবেন।

গাথা রচয়িতা এর আখ্যানভাগের অধিকাংশ স্থানই ব্যয় করেছেন কাহিনীতে সংকটের উদ্ভব এবং সংকটের বিমোক্ষণের বর্ণনায়। সংকটগ্রস্ত, বিপর্যস্ত জীবন বর্ণনায় কিংবা কমলা-প্রদীপ-কুমারের প্রণয়বাঞ্ছিত ঘটনা বর্ণনায় রচয়িতা পরিমিতিবোধের স্বাক্ষর রেখেছেন। বিস্তৃত বর্ণনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটেছে অতিশয়োক্তি। আখ্যানভাগে সংকটের উদ্ভবকালে নিদানের প্রণয়যাচ্ঞা, কমলা কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যান, প্রণয়-প্রত্যাখ্যাত নিদান কর্তৃক প্রতিহিংসা কিংবা প্রতিশোধ চরিতার্থ করার ঘৃণ্য উপায় অবলম্বন প্রভৃতি ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়। নিদান তার প্রণয়-অভিলাষ ব্যক্ত করার জন্য যে-চিকন গোয়ালিনীর শরণাপন্ন হয়, তার পরিচয় বিবৃত করতে বত্রিশ পংক্তি, চিকন গোয়ালিনীর সঙ্গে নিদানের বাক্যালাপ ও প্রণয়নিবেদনার্থে কমলার কাছে পত্র প্রেরণের ঘটনা নিয়ে ছিয়াত্তর পংক্তি, কমলার সমীপে চিকন গোয়ালিনীর আবির্ভাব, বাকচাতুর্যের মাধ্যমে নিদানের পত্র হস্তান্তর এবং সেজন্য রূঢ় পুরস্কার লাভের ঘটনা উপস্থাপনের জন্য দুইশত ষোল পংক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। আখ্যানভাগের এই অংশগুলো সহজেই সংক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব ছিল। এ-পর্যায়ে কমলার রূপবর্ণনায়ও রচয়িতা বাইশটি পংক্তি ব্যবহার করেছেন। এমন দীর্ঘ রূপ বর্ণনা অন্যত্র দুর্লক্ষ্য। তাছাড়া গাথার শেষ পর্বে কমলার পরিচয় প্রদানের ঘটনায় দুইশত ছিয়ানব্বই পংক্তি এবং বিবাহ অনুষ্ঠানের বর্ণনায় যে নব্বই পংক্তি ব্যবহৃত হয়েছে, তা-ও অতিশয়োক্তির প্রমাণবহ। পরিচয় প্রদানের অংশটি পুনরাবৃত্তি-দোষে দুষ্ট। তবে নিদান কর্তৃক প্রতিশোধ গ্রহণের ঘটনায় জমিদার কর্তৃক মানিক চাকলাদার ও তার পুত্র সুধনকে কারাদণ্ডদান, মিথ্যাচার করে নিদানের চাকলাদারী লাভ, ক্ষমতার দম্ভে ও বলপ্রয়োগে নিদান কর্তৃক প্রণয়বাসনা চরিতার্থ করার উদ্যোগ গ্রহণ, মাসহ কমলার মামা বাড়ি যাত্রা, সেখান থেকে মামার পত্র পাঠ করে সন্ধ্যার অন্ধকারে সকলের অজান্তে কমলার নিরুদ্দেশ গমন, মইষাল বন্ধুর নিকট আশ্রয় লাভ, অতঃপর জমিদার পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তার সঙ্গে জমিদারগৃহে গমন প্রভৃতি অংশগুলির বর্ণনা অত্যন্ত নিখুঁত ও পরিমিতিবোধের স্বাক্ষরবাহী। মামার বাড়িতে গমন এবং সেখান থেকে মইষাল বন্ধুর গৃহে গিয়ে আশ্রয় লাভ — এই দুইটি ঘটনা সংকটের উদ্ভব ও পরিসমাপ্তি পর্বের মাঝখানে একটি অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, ফলে তা পল্লবিত হলে গল্পগ্রন্থন শিথিল হত। এই ঘটনা দুটি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় আখ্যানভাগের গতিময়তা বাধাহীন হয়েছে। ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত এ-সম্পর্কে বলেছেন :

> পার্শ্ব কাহিনীর একাগ্র একমুখীন সংক্ষেপিত উপস্থাপন সচেতন কবিমানসের পরিচয় বহন করে।[৪৩]

এই গাথায় আখ্যানভাগের গঠন-সৌষ্ঠবে জ্যামিতিক নিয়ম অনুসৃত হয়েছে। প্রারম্ভে মানিক চাকলাদারের ধনাঢ্য সচ্ছল জীবনাচারের যে সুখ ও আনন্দ তা গৃহভৃত্য নিদানের কুটিল চক্রান্তে অবসিত হলেও পরবর্তীকালে কন্যার বুদ্ধিমত্তা ও সৌন্দর্যগুণে পুনঃস্থিত হয়েছে। নাটকীয় উত্থান-পতনের ক্রমধারায় কাহিনী-বিন্যাসের পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। নিদানের দেহজ লালসা, প্রণয়নিবেদন, প্রত্যাখ্যাত হওয়া, প্রতিহিংসা গ্রহণের ঘৃণ্য সংকল্প প্রভৃতির ফলে কমলার পারিবারিক জীবনে ঘটেছে বিপর্যয়, পিতা-ভ্রাতার কারাদণ্ডভোগ, সম্পদ-প্রতিপত্তি অপহরণ, মামা-বাড়িতে আশ্রয়লাভ প্রভৃতি ঘটনায়ও বিপর্যয়ের শেষ হয়নি। চরিত্রে কলঙ্ক রটনার ফলশ্রুতিতে মামা কর্তৃক আশ্রয়চ্যুত করার নির্দেশপত্রে এবং পত্র পাঠান্তে কমলার সন্ধ্যান্ধকারে নিরুদ্দেশযাত্রায় কাহিনী সংকটের চূড়াস্পর্শ

Dhaka University Institutional Repository

(climax) করেছে । মইষাল বন্ধুর সিঁটি আত্মমূলক , জমিদারপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তার সঙ্গে জমিদার-গৃহে গমন এবং পরিচয় প্রদান অনুষ্ঠান প্রভৃতি সংকটের নির্গামী পর্যায় — যা ক্রমশ বিমোক্ষণে সমাপ্ত হয়েছে । কাহিনীর গতিপ্রবাহেই কেবল জ্যামিতিক নিয়ম অনুসরণের উদাহরণ সীমাবদ্ধ নয়, সুরের বিন্যাসেও এর পরিচয় সুস্পষ্ট । আনন্দের দ্রুতগতিময়তা এবং বেদনার ধীর গতির মধ্যেও জ্যামিতিক নিয়ম অনুসরণের দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করা যায় । হাস্য-রসিকতা, লঘু পরিহাসপ্রিয়তা প্রভৃতি গুণাবলী কমলার মধ্যে কাহিনীর প্রারম্ভে লক্ষ্য করা গেলেও মধ্যবর্তী পর্যায়ে বিরুদ্ধ শক্তির দংশনে বেদনার গাঢ় রঙে রঞ্জিত হয়েছে তার ব্যক্তিত্বময় রূপ । লঘু পরিহাসপ্রিয়তার পরিবর্তে এ-পর্যায়ে তার চরিত্রে ব্যক্তিত্বময়ী গাম্ভীর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে । পরিচয় প্রদান এবং নিদান ও চিকন গোয়ালিনীর বিচারপর্বের পর প্রদীপকুমারের সঙ্গে বিবাহ পর্যায়ে পুনরায় সুরের উল্লাসময় লঘুতা দৃষ্টিগ্রাহ্য ।

লক্ষণীয় যে, প্রদীপকুমারের সঙ্গে কমলার প্রণয়সম্পর্কের বিষয়টি অন্য গাথার মতো বিস্তৃত বর্ণনার সুযোগ পায়নি । এক্ষেত্রে আখ্যানভাগের প্রস্থন এমন যৌক্তিক শৃঙ্খলায় বিন্যস্ত যে বিস্তৃত বর্ণনার অবকাশ ছিলনা । আখ্যানভাগে নিদান যে সংকটের উদ্ভব ঘটিয়েছে, তার বিমোক্ষণের পর্যায়ে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে প্রদীপকুমার-কমলার প্রণয়কাহিনী বিন্যস্ত হওয়ায় তা প্রয়োজনানুযায়ী সংক্ষিপ্ত হয়েছে ।

এই গাথার ঘটনাবিন্যাসের আরও দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য । গাথার কেন্দ্রীয় চরিত্র কমলাকে কেন্দ্র করে কাহিনী আবর্তিত ও অগ্রসর হয়েছে । এরূপ বৈশিষ্ট্য অন্য গাথায়ও লক্ষ্য করা যাবে, কিন্তু এর তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল : এখানে রচয়িতার দৃষ্টি কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় চরিত্র কমলার ওপরই প্রক্ষিপ্ত হয়েছে । গাথার শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত রচয়িতার মনোযোগ কমলা ভিন্ন অন্য কোনো চরিত্রের ওপর নিবদ্ধ হয়নি । কমলার মাধ্যমেই অন্য চরিত্রগুলো উপস্থাপিত হয়েছে ।

আর-একটি বৈশিষ্ট্য কমলার বারমাসী বর্ণনায় পরিস্ফুটিত হয়েছে । জমিদার গৃহে পরিচয় প্রদান অনুষ্ঠানটি কমলার বারমাসী দুঃখের ইতিবৃত্ত বর্ণনায় পর্যবসিত । এই বর্ণনায় নাটকীয় চমৎকারিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় । কমলার জীবনের অনেক তথ্য, যা গাথার অন্যত্র উপস্থাপন করা হয়নি , নতুনভাবে তা এখানে বিবৃত করার মধ্যে এই নাটকীয়তার পরিচয় ফুটে উঠেছে । এর ফলে কাহিনীর অসম্পূর্ণতার যেমন অবসান ঘটেছে, তেমনি পরিচয় প্রদান অনুষ্ঠানটিও হয়েছে চমৎকারিত্বময় ।

এই গাথার সমগ্র আখ্যানভাগ জুড়ে কমলা চরিত্রের doing ও suffering বিবৃত হলেও এর পরিণতি হয়েছে মিলনাত্মক । এই পরিণতির জন্য কেন্দ্রীয় চরিত্র কমলার ভূমিকা সর্বাংশে প্রত্যক্ষ নয় । তাই এই পরিণতির বৈশিষ্ট্যকে বহিরারোপিত বলে নির্দেশ করাই যুক্তিযুক্ত । কমলা কর্তৃক নিদানের প্রণয়নিবেদন-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের ফলেই নিদান কর্তৃক প্রতিহিংসাপরায়ণতার উদ্যোগ গ্রহণ ও আখ্যানভাগে সংকট সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে — এমন বিশ্লেষণে গাথার সংকটের জন্য কমলাকেও হয়ত দায়ী করা চলে । তবে নিদানের ন্যায়, অকৃতজ্ঞ আচরণের জন্য, কমলা কেন , কেউই প্রস্তুত ছিল না ।

Dhaka University Institutional Repository

এই আচরণে আকস্মিকতা ও প্রয়োজন-ভিত্তিক তীব্রতা উভয়ই বিদ্যমান। মইষাল বন্ধুর গৃহে অবস্থানকালে জমিদার-পুত্রের সঙ্গে কমলার সাক্ষাতের ঘটনাটিও আকস্মিক। কমলার দেহসৌন্দর্যই হয়ত নিদানের মধ্যে রূপলালসা এবং প্রদীপকুমারের মনে প্রণয়াসক্তির সঞ্চার করেছে, কিন্তু নিদানের কুটিলতা – ক্রুরতা কিংবা মইষাল বন্ধুর গৃহে প্রদীপকুমারের আগমন — এর কোনোটিতেই কমলার কোনো ভূমিকা ছিলনা। শেষ পর্যন্ত কমলার বুদ্ধিমত্তাই হয়ত তাকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে, সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধারে এবং আনন্দময় জীবনে প্রত্যাবর্তনে সক্ষম করেছে। কিন্তু স্মর্তব্য যে এরূপ পরিণতির জন্য দায়ী সকল ঘটনার ওপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রত্যক্ষ নয়। তবে স্বীকার্য যে রচয়িতা গাথার আখ্যানভাগের পরিকল্পনা ও বিন্যাস করেছেন এমনভাবে যে গাথার মিলনাত্মক পরিণতি অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

দেওয়ান ভাবনা

সক্রিয়তায়, সাহসিকতায়, প্রণয়ে একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতায়, বুদ্ধিদীপ্ততা ও আত্মত্যাগের মহিমায় সুনাই চরিত্রটি 'দেওয়ান ভাবনা'[৪৪] গাথার উজ্জ্বলতম প্রান্ত জুড়ে দীপ্যমান। কৈশোরে পিতৃহীন এই বালিকা মাতৃ-নিয়ন্ত্রণে নিরাপত্তাহীনতার কারণে মাতুলালয়ে হয়েছে আশ্রিতা। কিন্তু আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ মাতুলের হীন বিষয়লোভী মানসিকতার ফলে তার জীবনে ঘটেছে বিপর্যয়। শাসক-শক্তির উচ্ছিষ্টভোগী, গ্রামীণ জীবনের আবহে লালিত, ক্ষুদ্র-নীচ মানসিকতাসম্পন্ন, বাঘরা নামক ব্যক্তির মাধ্যমে সুনাইয়ের দেহসৌন্দর্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে দেওয়ান তাকে অপহরণে হয়েছে উদ্যত। মাতুল ব্রাহ্মণ ভাটুক ঠাকুর দেওয়ানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি, বরং তাতে সম্মতি দিয়েছে। কিন্তু সুনাই ইতোমধ্যে জমিদার-পুত্র মাধবের সঙ্গে প্রণয়সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। প্রণয়ে একনিষ্ঠা ও আন্তরিকতার কারণে সে দেওয়ান-বিমুখ। অপহরণের পূর্বেই মাধব কর্তৃক তাকে উদ্ধারের জন্য মাধবের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে সে সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। তার চরিত্রের গৌরবময়তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে তার আত্ম-বিসর্জনের ঘটনায়। পতি ও প্রণয়ী মাধবের জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যেই সে আত্মবিসর্জনে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। পতির প্রাণরক্ষায় আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত বাঙালি নারী চরিত্রে আবহমানকাল থেকে পরিদৃষ্ট হলেও, সুনাইয়ের আত্মদান ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্বে উজ্জ্বল। স্বামীর জীবনরক্ষার জন্য সে অগ্নিকুণ্ডে জীবন্ত দগ্ধ হওয়ার সাহস দেখিয়েছে।

> প্রেমিককে বাঁচাতে সে মূর্তিমান কালের নিকট নিজেকে সমর্পণ করেছে। বিষপানে মৃত্যু বাইরের রূপমাত্র, না দেখালেও কাহিনীর মাহাত্ম্য কিছুমাত্র খর্ব হত না, বৃদ্ধিই পেত।[৪৫]

মাধবের সঙ্গে প্রণয়াসক্তির প্রথম পর্যায় থেকে আত্মদান পর্যন্ত সর্বত্র সুনাই চরিত্রটি সক্রিয়তায় ও একনিষ্ঠতায় উজ্জ্বলতায় স্বাক্ষর রেখেছে। কোনোপ্রকার সংকীর্ণতা তার চরিত্রে প্রবেশ করতে পারেনি, বরং ঔদার্য ও মহত্ত্বই সর্বত্র সুপরিস্ফুট। আত্মদানের ঘটনার বাইরেও সবসময়ই সে প্রণয়ীর কল্যাণ-কামনায় আন্তরিক। এমনকি দেওয়ানের বাহিনীর দ্বারা অপহৃত হওয়ার পরেও তার উদ্ধারকল্পে মাধবের না-আসার জন্য মাধবের প্রতি সে ক্ষুব্ধ নয়, বরং সেই বিপদের মধ্যেও প্রণয়ীর বিপদাশংকা করে সে চিন্তিত। ঐ পরিস্থিতিতেও প্রণয়ীর প্রতি কল্যাণকামী ক্ষমাশীল চিত্তের পরিচয় দিয়ে সুনাই স্বীয় মহত্ত্বকেই

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্ফুটিত করেছে ঃ

আসিব বলিয়া বন্ধু না আসিল কেনে ।
না জানি পরানের বন্ধু পড়িল কি ফেরে ॥
না আইল না আইল বন্ধু ক্ষতি নাই সে তাতে ।
না জানি বিপদে বন্ধু পড়িল কি পথে ॥

প্রণয়ীর প্রতি পরম বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত এটি ।

এই গাথার নায়ক-চরিত্র মাধবের মধ্যেও নায়কোচিত গুণাবলীর প্রকাশ ঘটেছে । মাধব চরিত্রে যে সাহসিকতা, বীরত্ব ও পৌরুষের সুসমন্বয় ঘটেছে, তা নদের চাঁদ, চাঁদ বিনোদ, জয়ানন্দ, প্রদীপকুমার, কঙ্ক, কিংবা বিনাথ চরিত্রেতো নয়ই এমনকি মামুদ উজ্জ্যাল, মুকুট রায়, কিংবা বীর নারায়ণের চরিত্রেও প্রত্যক্ষ করা যায় না । দেওয়ানের বাহিনীর কবল থেকে স্বীয় প্রণয়িনীকে উদ্ধারকল্পে সে যে সাহসিকতাপূর্ণ লড়াই পরিচালনা করে, তাতেই তার এই বীরত্ব ও পৌরুষ সর্বাধিকরূপে দীপ্তিমান ।

জলের উপর হইল রণ পিঞ্জির আমলে ।
কোথা রইল দাড়ী মাঝি পইরা মরে জলে ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৮৬)

অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার পরও তার সংগ্রামশীলতা অব্যাহত থেকেছে । সুনাইকে শুধু সে উদ্ধারই করেনি, তার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধও হয়েছে । এসব ঘটনায় ক্ষুব্ধ দেওয়ান কর্তৃক তার পিতা কারারুদ্ধ হলে, বিপদ জেনেও, পিতৃউদ্ধারকল্পে সে দেওয়ানের মুখোমুখি হয়েছে; সুনাইয়ের জন্যই তার ও পরিবারের ওপর নিপীড়নের খড়গ নেমে এসেছে, তা জেনেও স্বীয় স্ত্রী ও প্রণয়িনীকে নিরাপদে রেখে নিজেই বিপদ মোকাবেলা করেছে — এমন কর্মকান্ড তার বীরত্ব-ব্যঞ্জক ব্যক্তিত্বকেই শুধু পরিস্ফুটিত করেনি তার কর্তব্যবোধ, প্রণয়ে একনিষ্ঠতা ও বিশ্বস্ততারও পরিচয় তুলে ধরেছে ।

সুনাই ও মাধব চরিত্র ছাড়া এই গাথার অন্য কোনো চরিত্র পূর্ণরূপে বিকশিত নয় । তবে গাথার অন্য চরিত্রগুলি যতটুকু পরিস্ফুটিত, তাতেই তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ তথা তাদের ক্ষুদ্রতা, নীচতা ও সংকীর্ণতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে । মাত্র এককমন ধানের লোভে বাঘরা নামক চরিত্রটি সুনাইয়ের দেহসৌন্দর্য সম্বন্ধে দেওয়ানকে অবহিত করে দেওয়ানের নারীলালসা চরিতার্থ করার পক্ষে সহায়ক-শক্তির ভূমিকা পালন করছে । বাঘরার ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে গেছে ভাটুক ঠাকুরের ব্রাহ্মণকুলত লোভনীয়তা । সুনাইয়ের সঙ্গে ভাটুক ঠাকুরের যে কেবল ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক, তা-ই নয়, এই পিতৃহীনা অসহায় বালিকা তারই গৃহে আশ্রিতা । কিন্তু যখন সে বৈষয়িক সম্পদের বিনিময়ে ঐ বালিকাকে মুসলমান দেওয়ানের হস্তে অর্পণের প্রস্তাব পেয়েছে, তখন তার মধ্যে ধর্মনীতি, অভিভাবকের কর্তব্য-চিন্তা, মানবিকতা, বিবেকবোধ কোনো কিছুই জাগ্রত হয়নি, একমাত্র সম্পদের লোভে অন্ধ হয়ে ব্রাহ্মণ ভাটুক ঠাকুর নিজ ভগ্নী-কন্যাকে যৌনলালসাগ্রস্ত শাসক-শক্তির হস্তে অর্পণে হয়েছে উদ্যত । মাধবের পিতার চরিত্রটিও একানুভাবে পুত্রস্নেহের প্রকাশে সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন । পুত্রের প্রেমাবেগের বিনিময়ে নিজের কারামুক্তি ঘটার পর বিপদের উৎস পুত্রবধূকে সে দেওয়ানের হস্তে অর্পণের মাধ্যমে পুত্রের জীবন বাঁচানোকেই একমাত্র উপায় হিসেবে ভেবেছে । সত্য যে, পুত্রবধূ অপেক্ষা পুত্রের প্রতিই পিতার

Dhaka University Institutional Repository

স্নেহ হবে নধিক। কিন্তু পুত্রবধূর বিনিময়ে পুত্রকে উদ্ধার না করে অন্য উপায় অনুসন্ধানও সে করতে হয়ত পারত। কিন্তু সেক্ষেত্রেই ঘটেছে তার দুর্বলতা।

এই গাথায় অত্যাচারী নারী-লালসাপরায়ণ দেওয়ান ভাবনার চরিত্রটি নিকৃষ্টতম উপাদানে বিশিষ্ট। নারী-লালসা চরিতার্থ করার জন্য সে গ্রামে গ্রামে সহায়তাকারী নিয়োগ করেছে, এমনই এক সহায়তাকারী বাঘরা। লালসা চরিতার্থ করার জন্য সে ক্ষমতার সকল উৎসই ব্যবহার করেছে। ভাবনা চরিত্র থেকে অনুমিত হয় যে মধ্যযুগে শাসক-শক্তির যেন এ-ছাড়া অন্য কোনো কাজ ছিল না।

এই গাথার আখ্যানভাগের সুগ্রন্থনা ও নিখুঁততার ক্ষেত্রে রচয়িতার শৈল্পিক দক্ষতা ও পরিমিতিবোধ তাৎপর্যপূর্ণ। প্লট বিন্যাসে নাটকীয় উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি ঘটনায় দ্রুতগতি আনয়ন ও বর্ণনার চমৎকারিত্ব প্রদানের ক্ষেত্রেও এই পারদর্শিতার স্বাক্ষর বিদ্যমান।

'চন্দ্রাবতী' গাথার ন্যায় এখানেও আখ্যানভাগের শুরুতে কোনো বন্দনা নেই। বরং কাহিনীর শুরু হয়েছে সরাসরি ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে। এরকম সূচনায় আকস্মিকতা ও নাটকীয় স্পন্দন উভয়ই বিদ্যমান। সুনাইয়ের ক্রমবিকশিত দেহ-সৌন্দর্য বর্ণনার ভেতর দিয়ে কাহিনীর সূচনা ঘটেছে। যেমন,

ছয়না বচ্ছরের সুনাইগো ইরামতী ত্রুলে।
হাসিয়া খেলিয়া উঠে সুনাইগো আপন মায়ের কোলে ॥
সাতনা বচ্ছরের সুনাইগো মুখে মধুর হাসি।
মায়ের কোলে উঠে সুনাইগো পুণ্ণিমার শশী।
আটনা বচ্ছরের সুনাইগো খাইয়া বান্ধে চুল।
মুখেতে ফুট্যাছে সুনাইর গো শতেক পদ্মফুল ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৭৩)

ক্রমবিকশিত এই দেহরূপ বর্ণনার পাশাপাশি সুনাই-র পিতার মৃত্যু, মাতুল ভাটুক ঠাকুরের গৃহে আশ্রয়, সুনাই-র যৌবনে পদার্পণের ফলে মায়ের কন্যা নিয়ে বিবাহ-চিন্তা, ঘটকের আসা-যাওয়া প্রভৃতি তথ্যও বিধৃত হয়েছে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে। তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই বিস্তৃত তথ্যের জন্য মাত্র ছিয়াত্তরটি পংক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে পরবর্তী অধ্যায়ে সুনাই-র সঙ্গে মাধবের পরিচয়, উভয়ের মধ্যে প্রণয়বাসনা জাগ্রত হওয়া, চিঠি আদান-প্রদান প্রভৃতি ঘটনারই বিস্তৃত বর্ণনা পাই, আটাশি পংক্তি ব্যবহৃত হয়েছে এই অধ্যায়টিতে। এরপরে ঘটনাগুলো অত্যন্ত দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়। বাঘরা কর্তৃক দেওয়ানকে সুনাই সম্পর্কে অবহিত করা, বাঘরাকে দেওয়ানের পারিতোষিক প্রদান, বাপান্ন পুরা জমিদানের শর্তে সুনাইকে দেওয়ানের হস্তে অর্পণের জন্য ভাটুক ঠাকুরের নিকট দেওয়ানের প্রস্তাব, ভাটুক ঠাকুর কর্তৃক এই প্রস্তাবে সম্মতি দান প্রভৃতি ঘটনার বিবরণে পঞ্চম অধ্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র আটাশটি পংক্তি। এর পরের অধ্যায়ে দেওয়ানের অপহরণ থেকে উদ্ধার করার প্রার্থনা জানিয়ে সুনাই কর্তৃক মাধবকে পত্র প্রেরণ, মাধবের পৌঁছার পূর্বেই দেওয়ানের লোকদের দ্বারা সুনাইয়ের অপহরণ, পথিমধ্যে মাধব কর্তৃক সুনাইকে উদ্ধার প্রভৃতি ঘটনা বিধৃত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এই অংশটির বর্ণনা বিস্তৃত। অথচ মাধবের সঙ্গে সুনাইর বিয়ের প্রসঙ্গটি মাত্র আট

Dhaka University Institutional Repository

পরিণতি নিঃশেষিত হয়, সপ্তম অধ্যায়ে দেওয়ান কর্তৃক মাধবের পিতাকে কারাদণ্ডদানের ঘটনা শুনে পিতৃউদ্ধার মানসে মাধবের দেওয়ান সমীপে গমন এবং পিতার পরিবর্তে পুত্রকে কারাদণ্ড প্রদানের ঘটনা বিধৃত হয়েছে বিরহ তপ্ত সুনাইয়ের দুঃখ জীবনের বারমাসী বর্ণনাসূত্রে। গাথার বারমাসী বর্ণনাটি সংক্ষিপ্তির কারণেই বিশেষভাবে চমৎকারিত্ব অর্জন করেছে। মাত্র বত্রিশ পংক্তিতে বারমাসী বর্ণনাটি সমাপ্ত। শেষ অধ্যায়ে সুনাইর শ্বশুর কারামুক্ত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে বলছেন :

শুন বধু তুমি যদি ফিরপা নাইসে ঘর।
অকালেতে পুত্র আমার যাইব যমের ঘর ॥
দুরন্ত দুর্জন ভাবনা পরতিজ্ঞা যে করে।
তোমারে পাইলে ছাইরা দিব মাধবেরে ॥ (মৈ. গী. পৃ ১৮৯)

এমন সংবাদে সুনাইর বিচলিত মন স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে-সেটাই স্বাভাবিক। স্বামী উদ্ধারমানসে সে দেওয়ানের নিকট গমন করে। সঙ্গে নেয় বিষবড়ি। স্বামীর মুক্তির পরে সে আত্মবিসর্জন করে। সুনাইয়ের ক্রমবিকাশমান দেহসৌন্দর্যের বর্ণনার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল যে-কাহিনীর, পরোক্ষভাবে সেই দেহসৌন্দর্যই তার জন্য হল অভিশাপ ও প্রাণসংহারের কারণ এবং এই প্রাণবিসর্জনের মধ্য দিয়েই কাহিনীর হল পরিসমাপ্তি। কাহিনীর মধ্যে ঘটনাধারার এই সুগ্রথিত ঐক্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনী অগ্রসর হয়েছে অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে, বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কোথাও থমকে দাঁড়ায়নি কিংবা অকারণ স্ফীত হয়নি। গল্পগ্রন্থনে নাটকীয়তা, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে আখ্যানভাগের সরল ও একমুখীন অগ্রগতি এবং পরিণতিতে মহিমান্বিত ট্র্যাজিক চেতনার ব্যাপ্তি সমগ্র গাথার আখ্যানগত বিন্যাসকে ত্রুটিহীন, রসগ্রাহী ও উজ্জ্বল করে তুলেছে।

> মহুয়া, কমলা ও চন্দ্রাবতী ছাড়া মৈমনসিংহ গীতিকার অপর কোন কাব্যেই এমনি নাটকীয় সৌন্দর্য ও অসূচিভেদ্য গঠন-নৈপুণ্যের সন্ধান মিলবে না।[৪৬]

ঘটনাবিন্যাসের অপর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখযোগ্য। বিপদগ্রস্ত হয়ে প্রকৃতিকে বন্ধু হিসেবে, সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে আহ্বানের যে কৌশলটি বিভিন্ন কাহিনীতে ব্যবহৃত হয়েছে, তা এই গাথায়ও লক্ষণীয়। দেওয়ানের অনুচরদের দ্বারা অপহৃত অসহায় সুনাইয়ের একমাত্র সহায় হয়েছে প্রকৃতি। যেমন,

উইড়া যাওরে বনের পাখী নজর বহু দূরে।
বন্ধেরে কহিয়ো সুনাই লইয়া গেছে চোরে ॥
গাঙের পাড়ের হিজল গাছ শুন আমার কথা।
প্রাণ-বন্ধুরে নাগাল পাইলে কইও যত কথা ॥ (মৈ. গী. পৃ ১৮৪)

সুনাইয়ের মহিমামন্ডিত আত্মবিসর্জনের ঘটনা এই গাথার ট্র্যাজিক পরিণতি নির্দেশ করেছে। সুনাই চরিত্রের পূর্বাপর ঋজুতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা তার আত্মত্যাগের ঘটনায়ও স্ফুটমান। তাঁর আত্মদানের চিত্রে যে বীরাঙ্গনা মূর্তি পাঠকের চোখের সম্মুখে দৃশ্যমান হয়, তা মহুয়া বা মলুয়ার মধ্যে লক্ষ্য

Dhaka University Institutional Repository

করা যায় না । শাসক-শক্তির রিরংসাবৃত্তি এবং তজ্জনিত নিপীড়নমূলক আচরণই এই গাথার ট্রাজিক পরিণতি তথা সুনাই চরিত্রের গৌরবময় আত্মবিসর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ দায়ী । তবে গাথার এই পরিণতি সমগ্র আখ্যানভাগ ও সুনাই চরিত্রের জীবন প্যাটার্ণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অনিবার্যতা-সূচক । গাথার কাহিনী এমনভাবে বিন্যস্ত এবং বিশেষত সুনাই চরিত্র পূর্বাপর এমন সাহসিকতা, ব্যক্তিস্বময়তা ও একনিষ্ঠতায় মহিমান্বিত যে গাথার অন্য কোনো পরিণতি যেন কল্পনাতীত । সুনাই দেওয়ানের নিকট উপস্থিত না হলেও পারত — কিন্তু সুনাই চরিত্রের পক্ষ থেকে তেমন আচরণ যে মোটেই স্বাভাবিক হত না । এমনকি মাধব চরিত্রের পক্ষ থেকেও নয় । পিতৃউদ্ধারে ব্রতী না হয়ে মাধব সুনাইসহ যদি দেওয়ান ভাবনার রাজ্য ছেড়ে দূরে চলে যেত বা এমন কত বিকল্পইতো চিন্তা করা সম্ভব — যা হলে এই দম্পতি সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের প্রণয়-বাঞ্ছিত জীবন অব্যাহত রাখতে সক্ষম হত । কিন্তু মাধবের পৌরুষদীপ্ত চরিত্র পিতৃউদ্ধারের কর্তব্যপরায়ণতা থেকে পলায়নপর হলে সেরকম আচরণ যেমন তার চরিত্রানুগ হতনা । তেমনি সুনাইয়ের ব্যক্তিস্বময়ী নারীধর্মের থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতনা স্বামী উদ্ধারকে ভাবনার নিকট আত্মসমর্পণ ভিন্ন অন্য কোনো আচরণ । প্রকৃতপক্ষে গাথার ট্রাজিক পরিণতি এর কাহিনীর নিখুঁত বিন্যাসের সঙ্গে অনিবার্য-সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে সার্থকতা লাভ করেছে ।

রূপবতী

'রূপবতী'[৪৭] গাথার কোনো চরিত্রই পূর্ণবিকশিত নয় । মূলত রূপকথাধর্মিতা এবং অংশত ধর্মনিষ্ঠা এই গাথার চরিত্রসমূহের বিকাশের পথে অনুরায় সৃষ্টি করেছে ।

গাথার নায়িকা-চরিত্র রূপবতী যৌবনপ্রাপ্ত হলে তার মাতা কন্যার বিবাহ নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয় । কিন্তু রূপবতীর যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার কোনো চিত্র কিংবা যুবতী নারীর যৌবনধর্মের কোনো আচরণ গাথায় অঙ্কিত হয়নি, তার মাতার চিন্তাগ্রস্ততা থেকেই পাঠক কন্যার যৌবনপ্রাপ্তির সংবাদ অবহিত হয় । পাঠকের সম্মুখে তার প্রথম চিত্র উদ্ঘাটিত হয় এক ব্যক্তিস্বহীন পরিবেশে : নবাবের শহর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাজা যখন রানীকে বললেন যে রানীর চিঠি পড়ে নবাব কন্যাকে তার হস্তে অর্পণের নির্দেশ দিয়েছে, তখন বিচলিত রানী রাতের নির্জনে গোপনে ঘুমন্ত কন্যাকে ডেকে তুলে ধর্ম-নাশের ভয়ে গৃহভৃত্যের হস্তে অর্পণ করে নিস্তব্ধ রাত্রির সহায়তায় দূরদেশে প্রেরণ করে । সাধারণ গৃহভৃত্যের সঙ্গে, অকস্মাৎ, এই বিয়ের আয়োজনে কিংবা স্বজনহীন নিরুদ্দেশ গমনে রূপবতীর মন এতটুকু জিজ্ঞাসাদীর্ণ কিংবা বিদ্রোহিণী নয়, এমনকি আতঙ্কিতও নয় । কেমন এক প্রকার আবেগহীন, নিরুত্তাপ, আত্মসমর্পণোন্মুখ, ব্যক্তিস্বহীন চরিত্র রূপবতীর । ধর্মভয়, কিংবা ধর্মনিষ্ঠা, কিংবা মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য করার স্বাতন্ত্র্যহীন কর্তব্যচিন্তাই যেন তার মধ্যে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল । ময়মনসিংহের গীতিকার নায়িকাচরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহের কোনোটিই তার মধ্যে দৃষ্টিগ্রাহ্য নয় । জীবনতৃষ্ণাও তার প্রবল নয় । জেলে পরিবারে পতির অনুপস্থিতিতে পতি-বিরহে কাতরতার যে-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, সেখানেও তার জীবন-তৃষ্ণার পরিবর্তে পতিপ্রাণা রাণীর পতি-উন্মুখতার প্রমাণই অধিকতর স্পষ্ট । কাতরতাই তার প্রকৃত পরিচয়, কাতরতা থেকে মুক্তির জন্য যে-সক্রিয়তা প্রয়োজন, তা তার মধ্যে নেই ।

Dhaka University Institutional Repository

পতি-বিরহ থেকে সে নিজের সক্রিয়তা দ্বারা উদ্ধারলাভ করেনি, উদ্ধারলাভের জন্য তার সততা-দৃষ্টে সহানুভূতিশীল জেলে পরিবারের লোকদের সক্রিয়তাই প্রধান । পতির জীবন বাঁচানোর জন্যও তার কোনো বুদ্ধিমত্তাতো দূরের কথা, সক্রিয়তাও গাথায় স্পষ্ট নয় ।

নায়ক চরিত্রটি আরও অস্পষ্ট ও ব্যক্তিত্বহীন । রূপবতীর সঙ্গে একত্র বনবাসের পূর্বে তার কোনো সক্রিয়তাই দৃষ্ট হয় না । বনবাসেও সে স্ত্রীয় স্ত্রীকে গৃহভৃত্যের ভূমিকায় পরিচর্যা করার আগ্রহ ব্যক্ত করে । যদিও এক্ষেত্রে রূপবতীর ধর্মজ্ঞান অত্যন্ত টনটনে, সে গৃহভৃত্য-স্বামীকে স্বামী হিসেবেই মর্যাদা দিতে আগ্রহী । মদন চরিত্রটির সক্রিয়তা কেবল পিতৃমাতৃদর্শনে প্রবৃত্ত হওয়ার ঘটনায়ই নিঃশেষিত । গৃহভৃত্যই তার প্রকৃত পরিচয় । সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে রাজকন্যার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেও সে তার প্রকৃত পরিচয় ছাড়িয়ে উর্ধ্বে উঠতে পারেনি ।

এই গাথায় নবাব চরিত্রটি সুন্দরী যুবতী নারীর সন্ধান লাভ করেই তাকে হস্তগত করার এক লালসাদীর্ণ অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটিত হয়েছে । রাজা জয়চন্দ্রের চরিত্রটি অনেকটা স্পষ্ট, তবে সবসময় মীমাংসিত বলে মনে হয় না । নবাবকে ভেট দানের ঘটনায় তার বিষয়সচেতনতা যেমন স্পষ্ট, কন্যাকে নবাবের হস্তে অর্পণের প্রস্তাব শুনে বিচলিত অবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সে মীমাংসিত নয় । ধর্মভয়ে ভীত রাজা নবাবের পরিবর্তে যে-কারো হাতে কন্যা সমর্পণে উদ্যত — এই সিদ্ধান্তে বিষয়সচেতনতা বিলুপ্ত । তবে গাথার আখ্যানভাগের বিশৃঙ্খলা প্রকৃতনই এই চরিত্রটি অস্পষ্ট হওয়ার জন্য দায়ী । একদিক থেকে বিচার করলে জয়চন্দ্রের মীমাংসিত বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান পাওয়া যাবে । আখ্যানাংশের ভিন্ন পাঠে দেখা যায়, নবাবের সঙ্গে বিরোধে প্রবৃত্ত না হয়ে রাজা জয়চন্দ্র স্বীয় কন্যাকে নবাবের হস্তে অর্পণ করতে উদ্যোগী হয় । এক্ষেত্রে তার বিষয়সচেতনতার পরিচয় সুস্পষ্ট । কিন্তু রানী গোপনে কন্যাকে গৃহভৃত্যের হস্তে অর্পণ করে গোপনে দূরদেশে প্রেরণ করে । রাজা জয়চন্দ্র কর্তৃক কন্যার অপহরণকারীকে দণ্ডদানে উদ্যত হওয়ার ঘটনা এই গাথায়ই ব্যক্ত হতে দেখা যায় । জয়চন্দ্রের এই আচরণে পৌরুষের পরিচয় আছে ।

এই গাথার দুই নারী চরিত্র ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল । জয়চন্দ্র-স্ত্রীর মধ্যে ধর্মনিষ্ঠা প্রবল । সে রাজার অগোচরে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মুসলমান নবাবের হাতে কন্যা সমর্পণ করবে না । ধর্মনিষ্ঠার কারণেই সে গৃহভৃত্যের কাছে কন্যাকে সমর্পণ করে দূরদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করেছে । জয়চন্দ্র-স্ত্রীর এই আচরণে তার চরিত্রের ধর্মনিষ্ঠার পাশাপাশি বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্বময়তা, সাহসিকতা ও দৃঢ়চিত্ততা সুস্পষ্ট । দৃঢ়চিত্ততা এজন্য যে একমাত্র কন্যাকে ধর্মনিষ্ঠার জন্য বনবাসে প্রেরণে তার মন দ্বিধাহীন।
অন্য চরিত্রটি জেলে-গৃহিণী সুনাই । বনবাস জীবনে রূপবতী ও মদনের ধর্মমাতা সে । মদনের অনুপস্থিতিতে বিরহ-কাতর রূপবতীর দুঃখ-মোচনকল্পে সে-ই সক্রিয় হয়ে জয়চন্দ্রের রাজদরবারে উপস্থিত হয়েছে এবং তারই সক্রিয়তা ও সাহসিকতার ফলে মদন কারামুক্ত ও মৃত্যুদণ্ড-মুক্ত হয়ে রূপবতীর সঙ্গে পুনর্বার পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সুখী দাম্পত্য জীবনে ব্রতী হতে সক্ষম হয়েছে । সাধারণ গ্রামীণ জীবনের আবহে লালিত এই চরিত্রটি ব্যক্তিত্বময়তা, বাৎসল্য, সাহসিকতা ও সক্রিয়তায় তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে । তবে সামান্য জেলে-গৃহিণী হয়ে রাজদরবারে এসে সাহসিকতাপূর্ণ আচরণ করা সম্ভব কিনা — সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ হওয়ায় এই চরিত্রটি অংশত বস্তুনিষ্ঠতা হারিয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

'রূপবতী' গাথার আখ্যানভাগে গল্পগ্রন্থন শিথিল ও ত্রুটিসঙ্কুলতায় আবর্তিত।[৪৭] ঘটনার পারম্পর্য রক্ষার ক্ষেত্রে যেমন ত্রুটি আছে, তেমনি কাহিনীতে নৈয়ায়িক শৃঙ্খলার অভাবও বিদ্যমান। আখ্যানাংশে বস্তুনিষ্ঠতা ব্যাহত হয়েছে এবং তার স্থান জুড়েছে রূপকথাধর্মিতা। কাহিনী কোনো কেন্দ্রীয় ঐক্যসূত্রে সুসংবদ্ধ নয়।

কোন ঘটনাই কাহিনীর প্রবাহকে খুব বেশী দূর অনুসরণ করেনি। ঘটনাগুলির মধ্যে যেন কিছুমাত্র স্থিতিস্থাপকতা নেই, সেগুলি যেন কাহিনীর বৃন্তে বিধৃত হয়নি, উড়ে বেড়াচ্ছে।[৪৮]

প্রথমেই রাজা জয়চন্দ্রের খাজনা পরিশোধকল্পে নবাবের শহরে গমনে যে ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা ক্ষুণ্ণ হয়েছে জয়চন্দ্রের সেখানে তিন বছরকাল অবস্থিতির মধ্য দিয়ে। কেন জয়চন্দ্র এত দীর্ঘ সময় নবাবের শহরে অবস্থান করছে, তার কোনো কারণ বা ব্যাখ্যা কাহিনী-অংশ থেকে উদ্ধার করা যায় না। দ্বিতীয়ত, কন্যার যৌবনে পদার্পণে জয়চন্দ্র-স্ত্রীর মনে তার বিবাহ নিয়ে দুশ্চিন্তা এবং সেজন্য জয়চন্দ্রের নিকট পত্র প্রেরণ, সেই পত্র পাঠ করে নবাব কর্তৃক তার নিকট কন্যা সমর্পণের নির্দেশ দান, জয়চন্দ্র কর্তৃক কন্যা সম্প্রদানের নির্দেশ পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কিন্তু ধর্মনাশের ভয়ে গোপনে জয়চন্দ্র-স্ত্রী কর্তৃক গৃহভৃত্যের কাছে কন্যা সমর্পণ ও দূরদেশে প্রেরণ প্রভৃতি ঘটনায়ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা বা বস্তুধর্মিতা লক্ষ্যযোগ্য, কিন্তু পরবর্তীকালে নবাবের নিকট রূপবতীকে অর্পণের প্রসঙ্গ আর উচ্চারিত হয় না। নবাবের যুবতী-লালসা অকস্মাৎ অন্তর্হিত হল কি প্রকারে সে-জিজ্ঞাসা পাঠকহৃদয়ে থেকেই যায়। প্রকৃতপক্ষে এই গাথার কোনো ঘটনাই যেন অনিবার্য ঐক্যে সুগ্রথিত নয়।

গাথার কাহিনী যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেই এর স্বাভাবিক সমাপ্তি হওয়া উচিত কিনা — তা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। ঘটনা-বিন্যাসে অনিবার্যতা লুপ্ত হওয়ায় রূপবতী গাথার আখ্যানাংশের গল্প-গ্রন্থন তাৎপর্যময়তা হারিয়েছে।

আখ্যানভাগের এক পর্যায়ে একটি নতুন ঘটনা যুক্ত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের পাঠান্তর নামে যুক্ত এই ঘটনার কাহিনী নিম্নরূপ: নবাবের শহর থেকে প্রত্যাবর্তন করে চিন্তিত জয়চন্দ্র নবাবকে কন্যা সমর্পণের বিষয়টি নিয়ে রানীর সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করেছেন যে পরদিন প্রভাতে যার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটবে তার হস্তে কন্যা সমর্পণ করবেন, কিন্তু মুসলমান নবাবের নিকট কন্যা প্রেরণ করবেন না। রানী রাজার অগোচরে গৃহভৃত্য মদনকে পরদিন প্রভাতে জয়চন্দ্রের শয্যা কক্ষের সম্মুখে ফুল হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছে, যাতে প্রভাতে প্রথমেই মদনের সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ ঘটে। রানীর সিদ্ধান্তই কার্যকরী হল। রাজা মদনের নিকট কন্যার বিয়ে দিলেন। কিন্তু এই কাহিনীর সঙ্গে আখ্যানভাগের পরবর্তী অংশের কাহিনী সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। রূপবতী-মদনের বনবাস, সেখানে প্রেত-পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ, পরে মিলন-সবকিছুর মধ্যে বস্তুনিষ্ঠতার পরিবর্তে একপ্রকার রূপকথাধর্মিতার ছোঁয়া আছে।

আখ্যানভাগের ত্রুটির কারণে এই গাথাটি তুলনামূলকভাবে শ্রীহীন, ঘটনা যেমন বৈচিত্র্যহীন, তেমনি বর্ণনাও শিল্পমানে অনুত্তীর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

এই গাথার রসনিষ্পত্তিও প্রশ্নাতীত নয় । গাথার আখ্যানভাগ যে-মিলনাত্মক পরিণতি লাভ করেছে, তা সমগ্র কাহিনীর সৌন্দর্যপ্রেরণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় । এ ধরনের পরিণতি অনিবার্যতাসূচকও হয়নি । এই গাথার আখ্যানভাগে এমন কিছু ঘটনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে, যা স্বধর্মে ট্রাজিক পরিণতিমুখী, কিন্তু ঐসব ঘটনা যৌক্তিক বিকাশ লাভ করতে পারেনি । প্রথমত নবাবের রূপলালসায় জয়চন্দ্রের পরিবারে কিংবা রূপবতীর জীবনে যে বিপর্যয় সৃষ্টির অবকাশ ছিল তা অকস্মাৎ বিনা কারণে নবাবের ইন্দ্রিয়জ লালসার প্রসঙ্গ অন্তর্হিত হওয়ায় ট্রাজিক পরিণতিমুখী হতে পারেনি । স্মর্তব্য যে 'মহুয়া' বা 'দেওয়ান ভাবনা'য় শাসক-শক্তির লালসাময় অভিলাষই ঐসব গাথার বিয়োগাত্মক পরিণতির জন্য দায়ী । দ্বিতীয়ত যে-গৃহভৃত্যের সঙ্গে রূপবতীর বিয়ে দেওয়া হয়, তার সঙ্গে হার্দ্য সম্পর্কের কোন পূর্ব-দৃষ্টান্ত এই গাথায় যুক্ত নেই । সেক্ষেত্রে রূপবতী কোনোরূপ ব্যক্তিত্বময়ী কিংবা স্বাধীন জীবনাকাঙ্ক্ষায় উচ্চকিত হলে ট্রাজিক পরিণতির দিকে কাহিনী অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল । কিন্তু ধর্মনিষ্ঠ, আত্মসমর্পণে-সন্তুষ্ট রূপবতী গৃহভৃত্যকে পতিরূপে গ্রহণে কোনোরূপ জিজ্ঞাসাদীর্ণ না হওয়ায় কাহিনী বিপর্যয়মুখী হতে পারেনি । তৃতীয়ত কন্যা-অপহরণকারী হিসেবে বিবেচিত মদনকে রাজা জয়চন্দ্র যখন মৃত্যুদণ্ড দিতে উদ্যোগী হয়, তখন সেখানেও তো ট্রাজিক পরিণতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল । কিন্তু জেলে পরিবারে রূপবতীর ধর্ম-মাতা হিসেবে পরিচিত পুণাই-র অলৌকিক ও সাহসী আবির্ভাবে সে-সম্ভাবনাও দূরীভূত হল । গাথার মিলনাত্মক পরিণতি আরোপিত, আখ্যানভাগ কিংবা চরিত্রসমূহের স্বানুধর্ম অনুযায়ী স্বাভাবিক বা অনিবার্য নয়, ফলে তাৎপর্যহীন ।

কঙ্ক ও লীলা

'কঙ্ক ও লীলা'[৪৯] গাথার কেন্দ্রীয় চরিত্র কঙ্ক, কিন্তু দ্বন্দ্বপীড়িত চরিত্র হিসেবে এবং ট্রাজেডির বেদনাকে ধারণ করে মহিমান্বিত হয়েছেন গর্গ সাধু । তাঁর চরিত্রে গভীর পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের পাশাপাশি সহানুভবতা, ঔদার্য ও মানবীয় অন্য গুণাবলীর দ্বন্দ্বমূলক সমন্বয় ঘটেছে বিস্ময়করভাবে । ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও চন্ডাল শিশুর ক্রন্দনে তার হৃদয় আর্দ্র ও সহানুভূতিশীল হয় । শ্মশান থেকে ঐ শিশুকে উদ্ধার করে তিনি গৃহে এনে আপন পুত্রবৎ স্নেহে লালন করেন দ্বিধাহীন চিত্তে । আবার ঐ শিশু কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যখন তরুণ বয়সী, শাস্ত্র সম্পর্কে অনুশীলনশীল এবং গীতিকার ও গায়ক হিসেবে অভিনন্দিত, তখন তাকে শাস্ত্রজ্ঞ করার জন্যও তিনি উদ্যোগী হন । এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াপন্থী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিতর্কে তার ভূমিকা অত্যন্ত প্রগতিমুখী, মানবিক, বাস্তবানুগ ও ধর্মীয় সংকীর্ণতা-ঊর্ধ্ব । কিন্তু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়েরই একজন হয়ে সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে তিনি পারেননি । তাঁর চরিত্রের মধ্যে থেকে গেছে দ্বন্দ্বের বীজ । তিনি প্রতিক্রিয়া-পন্থীদের ঘৃণ্য রটনায় বিভ্রান্ত হয়ে পালিত পুত্র কঙ্ক ও স্বীয় কন্যা লীলার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করেন । তার বিভ্রান্তির পরিণতি হয় মারাত্মক । স্বীয় ত্রুটি অনুধাবনে দ্রুত সক্ষম হলেও ইতোমধ্যে ঘটে যায় চরম বিপর্যয় । এ-পর্যায়ে তার দ্বন্দ্ব-জীর্ণ অনুশোচনা-দগ্ধ হৃদয়-যন্ত্রণার যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তা ট্রাজেডির নায়কের সঙ্গেই তুল্য :

গর্গের হৈল কিবা খুন বিবরণ ।
চৌদিকে পাগলপ্রায় করিল ভ্রমণ ॥

Dhaka University Institutional Repository

সারারাতি অনিদ্রায় ফিরি ঘুরে ঘুরে ।
প্রভাতে ফিরিল গর্গ আপনার ঘরে ॥
আসিতে পথের মাঝে অমঙ্গল নানা ।
চারিদিকে যেন প্রেত-পিশাচের থানা ॥
... ...
ঝটিতে চলিল মুনি আশ্রমে ধাইয়া ॥
চারিদিক শূন্যময় শুধু হাহাকার । (মৈ.গী পৃ ২৯০)

এই হাহাকারময় শূন্যতা প্রকৃতিতে নয়, গর্গের হৃদয়ের অভ্যন্তরে । লীলার মৃত্যুর পর গর্গ সাধুর যন্ত্রণা-দগ্ধ হৃদয়ের উচ্চারণ আরও মর্মগ্রাহী ঃ

কে মোর মরণকালে বসিবে শিয়রে ।
কাহারে লইয়া আমি রব শূন্য ঘরে ॥
আর একবার আলো চাও মেলি আঁখি ।
নয়ন ভরিয়া তোমায় জন্মশোধ দেখি ॥
... ...
বন্ধু সঙ্গে চিতা সাজি প্রদক্ষিণ করে ।
সন্ধ্যা লাগিয়া গর্গ কান্দে হাহাকারে ॥
গর্গের ক্রন্দনে দেখ ঝরে বৃক্ষের পাতা ।
উপরে আকাশ কান্দে নীচে বসুমাতা ॥
... ...
বজ্রাঘাতে বৃক্ষ যেমন দুলিয়া উঠিল ।
হাহাকার করি গর্গ স্তম্ভেরে ধরিল ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩১০-১১)

বজ্রাঘাতে ভগ্নপ্রায় বৃক্ষের মতো তখন তার হৃদয়-যন্ত্রণা; মূলত তখন সে উৎপাটিত বৃক্ষের মতোই নিরালম্ব, লীলার অবর্তমানে একমাত্র অবলম্বন তার কণ্ঠ ।

ফিরে সংসার-ঘর কি হবে আমার ।
মায়ের বিহনে আমার সকল অন্ধকার ॥
... .
শোধিতে প্রতিমা আমার ডুবাইলাম জলে ।
কি হবে এ কর্মফল আছিল কপালে ॥
আর না ফিরিব ঘরে তোমরা সবে যাও ।
শালগ্রাম শিলা যত সাগরে ভাসাও ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩১১)

গর্গ-চরিত্রের জীবন-বহির্ভূত মানবীয় উপলব্ধির এ-এক মহৎ উচ্চারণ । গর্গ সাধু একজন ব্রাহ্মণ এবং শাস্ত্রজ্ঞ — এটা কেবলমাত্র একটি তথ্যমাত্র, কিন্তু সমগ্র গাথা জুড়ে তাঁর মহৎ মানুষের ছবিই দীপ্যমান ।

Dhaka University Institutional Repository

এই গাথার কেন্দ্রীয় ও নায়ক চরিত্র কঙ্ক বৈশিষ্ট্য হিসেবে অত্যন্ত গুণবান। শিশুর পিতামাতাসহ দুইজন পিতা ও তিনজন মাতার মৃত্যু মুহূর্তে সে না দেখলে প্রতিপালিত হয়েছে। তার দুঃখজীর্ণ, বিনীত, নিবিড়ময় এবং শাস্ত্রানুশীলনী জীবনভাবনায় চাঞ্চল্য নেই, তবে গভীরতা আছে। সম্ভাবনায় প্রতিভাই তাকে অনন্য করেছে। কিন্তু এই লোকপ্রিয়তার মধ্যে তার যেমন কেটে-পড়া উল্লাস নেই, তেমনি তার প্রণয়ভাবনাও অত্যন্ত সংযত ও উচ্চারণ-হীন। কঙ্ক সম্পর্কে শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য প্রশ্নাতীত নয়। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে গাথার অভ্যন্তর-সাক্ষ্য দুর্লক্ষ্য।

এইবার সে মাতৃহারা গর্গ-কন্যা লীলাকে নূতন পরিচয়ের ভিতর দিয়া লাভ করিল, কিন্তু তাহার সম্পর্কিত কোন অনুভূতিই বাহিরে প্রকাশযোগ্য নহে — লীলা গুরুকন্যা, সহোদরার তুল্য। এই দ্বন্দ্ব কঙ্কের দুর্জয় হইয়া উঠিল। সে ব্রাহ্মণ মাতা পিতার সন্তান হইয়া চণ্ডালের গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছে, পুনরায় সে ব্রাহ্মণের সংসর্গে আসিয়াছে — ইহার ফলে সে তাহার জীবনের সুস্পষ্ট গতিপথটি হারাইয়া ফেলিল। গোপনে গিয়া সে এক পীরের নিকট দীক্ষা লইল। কিন্তু কোন আধ্যাত্মিক সাধনার প্রেরণা তাহার জীবনে সত্য ছিল না, একমাত্র যাহা সত্য ছিল, তাহা সে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিত না, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া বলিবারও নহে।[৫০]

কঙ্কের হৃদয়ে দুর্জয় দ্বন্দ্বের উপস্থিতি, কিংবা তার জীবনের সুস্পষ্ট গতিপথ হারানো, গোপনে পীরের নিকট দীক্ষাগ্রহণ কিংবা আধ্যাত্মিক সাধনার পরিবর্তে জাগতিক প্রেমভাবনাই তার মধ্যে অধিকতর ক্রিয়াশীল প্রভৃতি তথ্যের সাক্ষ্য গাথাভ্যন্তরে লক্ষ্য করা যায় না। কঙ্ক চরিত্র পুরোপুরি দ্বন্দ্বহীন, নিঃসংশিত। পঞ্চম পরিচ্ছেদে গর্গ-গৃহে মাত্র পংক্তিতে তার পুত্রগুলো শাস্ত্রানুশীলন, বংশীবাদক হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জনের তথ্য পাওয়া যায়। সপ্তম পরিচ্ছেদে কঙ্কের চমৎকার বাঁশীর সুর শুনে মুগ্ধ পীর কর্তৃক কঙ্ককে ডেকে নিয়ে মাধবের পাঁচালী শ্রবণের তথ্য আছে। কঙ্ক কিন্তু পীরের নিকট স্বেচ্ছায় বা গোপনে যায়নি। পীরই বাঁশীর সুরে মুগ্ধ হয়ে তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। এবং তার সুরেলা কণ্ঠ ও কবিত্বশক্তির পরিচয় পেয়ে তাকে গোপনে দীক্ষা দিয়েছে (অষ্টম পরিচ্ছেদ)। পঞ্চম পরিচ্ছেদে বরং কঙ্ককে নিয়ে লীলার প্রণয়ভাবনা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। যদিও লীলা কঙ্কের নিকট তার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেনি। কঙ্ক তার শাস্ত্রানুশীলন, ধেনু চরানো, বাঁশী বাজানো, পীরের নির্দেশে সত্য পীরের পাঁচালী রচনা প্রভৃতি কার্য স্বচ্ছন্দেই সমাধা করছে। তাকে নিয়ে ব্রাহ্মণ-দ্বন্দ্বেও তার কোনো ভূমিকা নেই। এসব থেকে বহুদূরে সে তার সৃজনশীল জগতে নিঃসঙ্গভাবে বিচরণশীল। লীলা যেদিন গর্গ সাধু কর্তৃক তাকে হত্যার পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করে সেদিনও সে তেমন বিচলিত, দ্বন্দ্বজীর্ণ কিংবা উত্তেজিত নয়। লীলার নিকট সে স্বাভাবিকভাবে বিদায় নিয়েছে এবং তার অবর্তমানে লীলার নিঃসঙ্গ বেদনার্ত জীবন কিভাবে সহনীয় হতে পারে, সে-সম্পর্কে অত্যন্ত অবিচলিতভাবে কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছে। আধ্যাত্মিক ভাবনায় ধ্যানমগ্ন না হলে বিদায়কালেও এমন অবিচলিত থাকা মুহুর্তে সুকঠিন। এমনকি এ-পর্যায়ে তার গার্হস্থিতা সম্পর্কেও তার মনে কোনো ক্ষোভ বা দ্বন্দ্ব নেই। পিতার প্রতি লীলার কর্তব্য সম্পর্কে তার বিদায়কালীন সতর্কবাণী এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য :

তোমার মায়ের মুখে লীলা রইলেন পিতা।
জীবন মরণে যিনি সাক্ষাৎ দেবতা॥ (মৈ. গী. পৃ ২৮৬)

একমাত্র বিদায়দৃশ্যেই কঙ্ক চরিত্র সবচেয়ে বিস্তৃতভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। পরে প্রত্যাবর্তনের

Dhaka University Institutional Repository

দৃশ্যে তার চরিত্র কোনো উন্মোচিত নয়। দ্বিতীয় দৃশ্যে তার সাবলীল, নির্দ্বন্দ্ব ও সীমাসংযত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে তার জীবনে প্রণয়ভাবনার পরিবর্তে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রেরণাই যে-সত্য তা-ই সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। আশুতোষ ভট্টাচার্য যে-কথা বলতে চান যে সাধনার উর্ধ্বে তার জীবনে প্রণয়ভাবনাই সত্য, তার পরিচয় গাথার কোথাও পাওয়া যায় না। শেষ দৃশ্যে লীলার মৃত্যু-সংবাদ শ্রুত হয়ে কঙ্ক প্রত্যাবর্তন করছে। প্রণয়ভাবনাই যদি একমাত্র সত্য হত তাহলে তার অভিব্যক্তি এই দৃশ্যেই সর্বাধিক পরিস্ফুট হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু এই দৃশ্যের চৌষট্টি পংক্তির মাত্র সাতটি পংক্তিতে কঙ্ক প্রসঙ্গ আছে, বাকী পুরোটাই গর্গের অনুশোচনাদগ্ধ হৃদয়ের হাহাকার। কঙ্ক প্রসঙ্গের পংক্তিগুলো উদ্ধৃত করলেই উপলব্ধি করা যাবে এক্ষেত্রে তার প্রণয়ভাবনা সত্য, না আধ্যাত্মিক সাধনার প্রেরণা সত্য।

বিচিত্রের মুখে তার বারতা পাইয়া।
শীঘ্রগতি হইয়া কঙ্ক ঘরে আসে ধাইয়া॥
আসিয়া দেখিল কঙ্ক সব অন্ধকার।
গৃহে না জ্বলয়ে বাতি সকলি আঁধার॥
শ্মশানে পড়িয়া গর্গ কান্দে উচ্চস্বরে।
শীঘ্র গতি হইয়া কঙ্ক গেল নদীতীরে॥
বহুকষ্টে চিতা জ্বালি প্রদক্ষিণ করে।
কন্যার সাথিয়া গর্গ কান্দে হাহাকারে॥
... ...

অনলে তাপিত হৃদি করিতে শীতল।
কঙ্কের সহিত মুনি যায় নীলাচল॥ (মৈ.গী.পৃ ৩১০-১২)

দ্রুতগতিতে শ্মশানে গমন ছাড়া কঙ্কের হার্দ্য অনুভূতির কোনো বর্ণনা নেই। স্ত্রীর কন্যার মৃত্যুতে গর্গ ব্রাহ্মণ ও পন্ডিত হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে বিচলিত, কান্নাভারাতুর, তার বিপরীতে প্রণয়িনীর বিয়োগব্যথাকে সংযত চিত্তে ধারণ করে কঙ্কের যে অবিচলিত অবস্থা অঙ্কিত হয়েছে, তা কেবল আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধ হলেই সম্ভব।

এই গাথার সবচেয়ে মানবিক অনুভূতিতে উজ্জ্বল চরিত্র লীলা। সে সাত বছর বয়সে মাতৃহারা হয়ে মাতৃহারা কঙ্কের হৃদয়-বেদনাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করে তার প্রতি সহানুভূতিশীল। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে প্রণয়িনী-সত্তার বিকাশ যেমন লক্ষণীয়, তেমনি উপর্যুক্ত সহানুভূতিজাত মাতৃত্বও তার মধ্যে ক্রিয়াশীল। কঙ্কের বাঁশীর সুরে মুগ্ধ লীলা কৈশোর ও যৌবনে তার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় বিভোর। যদিও সে অন্য গাথার নায়িকাদের মতো তার প্রণয়বাসনা প্রণয়ীর নিকট ব্যক্ত করেনি। কেননা তার প্রয়োজন ছিল না। সে তার প্রণয়বাসনা মুখ দিয়ে উচ্চারণ না করে সকল কর্মেই ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছে, কেননা প্রণয়ী এখানে একই গৃহের বাসিন্দা। বিভ্রান্ত পিতার হত্যা-পরিকল্পনা থেকে উদ্ধারের জন্য কঙ্ককে বিদেশগমনের পরামর্শ দান এবং বিদেশগমনের পর বিরহকাতর লীলার স্বাভাবিক মাত্রায় বিচলিত অবস্থা এবং কঙ্কের মৃত্যুসংবাদ শুনে নিজেও মৃত্যুযাত্রী হওয়ার মধ্যে একজন সাধারণ বাঙালি নারীর একান্ত বৈশিষ্ট্যই পরিস্ফুট হয়েছে। গাথার অন্য নায়িকা চরিত্রের মতো সক্রিয়তা কিংবা বিপদে ভেঙে-না-পড়ে উদ্ধার লাভের প্রচেষ্টা গ্রহণের ন্যায় প্রশংসনীয় সাহসী উপাদান তার চরিত্রে দুর্লভ। প্রণয়ে একনিষ্ঠতা, আন্তরিকতা ও প্রণয়ীর কল্যাণ কামনায়ই কেবল তার চরিত্রের মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গর্গ, কঙ্ক ও লীলা ব্যতীত এই গাথায় গর্গ-শিষ্য বিচিত্র ও মাধব চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় । গুরুভক্তি ছাড়া এই দুই চরিত্রের আর কোনো বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয় না । এছাড়া এই গাথায় শাস্ত্রের জীবনবিচ্ছিন্ন প্রয়োগে অভ্যস্ত ব্রাহ্মণ সমাজের সক্রিয়তা পরিদৃষ্ট হয় । ব্যক্তি হিসেবে তাদের পরিচয় পরিস্ফুট না হলেও গোষ্ঠী হিসেবে তাদের কঠোর মনোভঙ্গি, শাস্ত্রপ্রিয়তা, জ্ঞানবিকৃতা, এমনকি কুৎসা প্রচারের মতো নীচতা-হীনতার প্রমাণও লক্ষ্য করা যায় । মলুয়া গাথায় বিধৃত ব্রাহ্মণ চরিত্রের সঙ্গেই কেবল এদের তুলনা করা চলে ।

কাহিনীর ঠাসবুনন ও নিখুঁত গঠনপ্রকরণে 'কঙ্ক ও লীলা'র আখ্যানভাগ সুসংবদ্ধ । নাটকীয় উপস্থাপনা কৌশল, ঘটনার কেন্দ্রীয় ঐক্য, উপজীব্য বিষয়কে যথার্থভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে পরিণতিমুখী করার জন্য কাহিনীর প্রয়োজনীয় বিন্যাসসাধন প্রভৃতি আখ্যানাংশের তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ।

'কঙ্ক ও লীলা'র আখ্যানভাগ কয়েকটি দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ । প্রথমত, চারজন কবি এই গাথা রচনা করেছেন । চারজনের মধ্যে ভাবগত বা দৃষ্টিভঙ্গিগত ভিন্নতাও বিদ্যমান । দ্বিতীয়ত, এই গাথায়ই প্রথম দুই ধরনের ছন্দ ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায় । ইতঃপূর্বে আমরা কেবলমাত্র দ্বিপদী পয়ার ছন্দের সঙ্গেই পরিচিত ছিলাম, কিন্তু এই গাথায় দ্বিপদী পয়ার ছন্দের পাশাপাশি ত্রিপদী ছন্দের ব্যবহারও লক্ষণীয় । তৃতীয়ত, তৎসম ও যৌগিক শব্দ ব্যবহারের আধিক্য এবং 'ধ্রুপদী মেজাজ' সৃষ্টির প্রয়াসও দৃষ্টিগ্রাহ্য ।[৫১]

গাথার আখ্যানভাগে দামোদর দাস যেখানে ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহারের মাধ্যমে মানবীয় গতিময়তা সৃষ্টির ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগী সেখানে রঘুসুত অনেকটা ধর্মনিষ্ঠ এবং অদৃষ্টবাদী, তার কণ্ঠ থেকে কপালের লিখন খণ্ডন করা অসম্ভব — এমন অসহায়োক্তি প্রায়শ উচ্চারিত হতে দেখা যায় ঃ

কর্মফল কে খণ্ডায় কহে রঘুসুত ॥ (মৈ.গী.পৃ ২৬৭)
কঙ্কের কপাল মন্দ কয় রঘুসুতে ॥ (পৃ ২৬৯)
বুঝি কঙ্কের দিন গেল   রঘুসুত কহে কেল,
        দুঃখিতের দুঃখ নাহি যায় ॥ (পৃ ২৭৮)
কপালের লেখা হায় কে খণ্ডাবে বল ।
রঘুসুত কহে হিতে বিপরীত ফল ॥ (পৃ ২৮০)
রঘুসুতে কহে তোমার বিধি হইল বাম ॥ (পৃ ৩০২)

রঘুসুতের অদৃষ্টবাদিতার বিপরীতে নয়ান চান্দ ঘোষ অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ ঃ

সভাপতির চরণ বন্দি নয়ান চান্দে কয় ।
দুর্লভ মনুষ্য জন্ম হয় বা না হয় ॥ (পৃ ২৬৪)

লীলার রূপবর্ণনা অংশে নয়ান চাঁদের জীবন-ঘনিষ্ঠতার পরিচয় আরও স্পষ্ট ঃ

সোনার যৌবনকাল কহে নয়ান চান্দে ।
রাখিলে না থাকে যৌবন যত্নে নাহি থাকে ॥ (পৃ ২৭২)

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর এই বক্তব্যে বস্তুনিষ্ঠতা এবং শারীরিক বিকাশের অনিবার্যতা পরিলক্ষিত হয় । উল্লিখিত তিনজন রচয়িতার নামই গাথায় একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে । কিন্তু শ্রীনাথ বেনিয়ার নাম উচ্চারিত হয়েছে মাত্র একবার । লীলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষার অংশটিতে তার নাম উল্লিখিত হয়েছে । যুবতী লীলা কঙ্কের বাঁশীর সুরে কিভাবে আন্দোলিত হয়ে তার প্রণয়বাসনা ব্যক্ত করেছে, তারই চমৎকার গীতময় বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এই অংশটিতে ।

শ্রীনাথ বানিয়া কয় পীরিত বড় জ্বালা ।
দন্ডেক দেখো কন্যা না হও উতলা ॥ (মৈ. গী. পৃ ২৭৪)

দামোদর দাসের ত্রিপদী ছন্দের বন্দনার মাধ্যমে গাথার কাহিনী শুরু হয়েছে । আখ্যানাংশে তিনজনের বন্দনা রয়েছে । এটিও এই গাথার একটি ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য, অন্য কোথাও তিনজনের বন্দনা লক্ষ্য করা যায় না । ত্রিপদী ছন্দের ব্যবহার এই গাথায় একাধিকবার ঘটেছে । এই ছন্দের অভ্যন্তর-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গীতময়, আবেগময় ও গতিময়তা প্রকাশের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি দ্বিপদী পয়ারের একঘেয়েমি ও বৈচিত্র্যহীনতা অতিক্রমণের প্রয়োজনেও উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে । ছন্দ ব্যবহারেরএই পরিকল্পিত বিন্যাসে বিষয়বস্তু ও ভাবগত সাযুজ্যও লক্ষণীয় । স্মর্তব্য যে এই গাথায় ধর্মসাধনা, ধর্মচর্চা, ব্রাহ্মণদের শাস্ত্র-বিতর্ক প্রভৃতির পাশাপাশি দুই কিশোর-কিশোরীর শারীরিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের হার্দ্য সম্পর্কের বিকাশের প্রতিচ্ছবিও উপস্থাপিত হয়েছে ।

রচয়িতাগণের পরিমিতিবোধের উজ্জ্বল উদাহরণ এই গাথায় স্পষ্ট । লীলার মৃত্যু ছাড়া পাঁচ-পাঁচটি মৃত্যুর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে এই গাথায় । প্রসব মৃত্যুর বর্ণনায় এক-দুই পংক্তির বেশি ব্যবহৃত হয়নি । এটি পরিমিতিবোধের স্বাক্ষর ।

ছয় না মাসের শিশু হইল যখন ।
দারুণ রোগেতে হইল মাতার মরণ ॥
... ...
চিন্তা জ্বরে গুণরাজ মৈল অবশেষে ॥ (মৈ. গী. পৃ ২৩৭)

তবে আখ্যানভাগের কোথাও কোথাও বর্ণনার বিস্তৃতি অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট । প্রসব অংশে লীলার ভাবাবেগ তাড়নাও বর্ণনায় শৈথিল্য এনেছে । দ্বাদশ পরিচ্ছেদে কঙ্ক ও লীলা সম্পর্কিত রটনায় গর্গের মনে ভ্রান্ত বিশ্বাস জাগ্রত হওয়ার পর উভয়ের প্রাণনাশের প্রয়াসে গর্গের পদক্ষেপসমূহ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে কঙ্ক ও লীলার ভূমিকা ব্যক্ত হয়েছে দেড়শ পংক্তিতে । এর পরের কয়েকটি পরিচ্ছেদে এ-ধরনের অতিশয়োক্তি লক্ষ্য করা যায় । ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে গাভীর মৃত্যু, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে গর্গের পূজা ও দৈববাণী শ্রবণ, সপ্তদশ পরিচ্ছেদে লীলার বিরহ-তপ্ত জীবনযাত্রা, এবং অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে তারই অতিরঞ্জিত বর্ধিত রূপ, উনবিংশ পরিচ্ছেদে কঙ্কের অনুসন্ধানে বিচিত্র-মাধবের পথযাত্রার বিবরণ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে লীলার মৃত্যুশয্যা এবং ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে লীলার মৃত্যুর বর্ণনা — সর্বত্র এই বাহুল্য-দোষ লক্ষ্য করা যায় । এই গাথার ঘটনাবিন্যাসে চরিত্রের প্রকৃতি-সংলগ্নতা একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে । বিপদগ্রস্ত হয়ে প্রকৃতিকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তার সহায়তাকামনা মনসুর বয়াতির গীতিকার বিভিন্ন গাথায় যেমন লক্ষ্য করা যায়, এখানেও তা দুর্লক্ষ্য নয় । কঙ্কের

Dhaka University Institutional Repository

নিরুদ্দেশ গমনের পর আশায় লীলা প্রভৃতির সহায়তা কামনা করেছে । উদাহরণ,

বল বন তুলসী রাখ আমার প্রাণ ।
দয়া করি বল তার পথের সন্ধান ॥ (মৈ.গী.পৃ ২৯৭)

এই গাথার করুণ ও বিয়োগান্তক পরিণতির জন্য বহিরারোপিত ঘটনা এবং চরিত্রসমূহের আত্মনুগ-বৈশিষ্ট্য উভয়ই দায়ী । আপাতঃদৃষ্টিতে প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণকুলের জীবনবিমুখ শাস্ত্রানুশীলনের যান্ত্রিকতা, সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা প্রভৃতিকে এই গাথার ট্রাজিক পরিণতির জন্য প্রত্যক্ষত দায়ী বলে মনে হলেও গর্গ সাধুর দ্বন্দ্বময় চরিত্র-বৈশিষ্ট্যও এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । তার চরিত্রে বৈদগ্ধ্য, পান্ডিত্য, ব্রাহ্মণ্য আচার প্রভৃতির পাশাপাশি যে সহানুভবতা, মানবীয় ঔদার্যের পরিচয় আমরা লক্ষ্য করি — সেসবই তাঁর চরিত্রকে দ্বন্দ্বময় করে তুলেছে । তাঁর চরিত্রের এই দ্বন্দ্বাত্মক বিন্যাস এই গাথার সূচনা থেকে বহু জটিলতা সৃষ্টি করেছে এবং গাথার আখ্যানভাগে গতিময়তা সঞ্চার করেছে । এই দ্বন্দ্বমূলক বৈশিষ্ট্যের কারণেই শ্মশানের চন্ডাল শিশু তার মতো ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় পেয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে তাকে জাতভুক্ত করার প্রশ্ন উঠেছে , এই দ্বন্দ্বময়তার ফলেই তার সংস্কারাচ্ছন্ন মন কঙ্ক-লীলার প্রাণনাশে হয়েছে নির্মমভাবে উদ্যত, যে-কারণে কঙ্ক হয়েছে দেশান্তরিত এবং লীলার ঘটেছে অকালমৃত্যু । গর্গ চরিত্রের আত্মনুগ-বৈশিষ্ট্যের দ্বন্দ্বময়তা যেমন গাথার ট্রাজিক পরিণতিকে করেছে ত্বরান্বিত, তেমনি ট্রাজেডির বেদনাকে ধারণ করে গর্গ চরিত্রটি সহানুভবতায় চূড়াস্পর্শী হয়ে উঠেছে । লীলার মৃত্যুর পরে তাঁর যে অনুশোচনা-বিদ্ধ মনের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে, তা তুলনাহীন ঃ

কারে লইয়া দিবসে আমি সেবের আরতি ।
কে মোর আন্ধাইর ঘরে জ্বালাইবে বাতি ॥
কে তুলিবে পূজার ফুল ভরিয়া না ডালা ।
কি করিয়া শূন্য ঘরে রহিব একেলা ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩১০)

লীলার মৃত্যুতে গর্গ সাধুর এই নিঃসঙ্গতা ও অসহায়ত্ববোধ ট্রাজেডির নায়কের মতো । ট্রাজেডির নায়কের মতো তিনি একান্তভাবেই মানুষ, ব্রাহ্মণ হয়েও তিনি এ-পর্যায়ে গৃহ দেবতা হিসেবে পূজিত শালগ্রাম শিলা বিসর্জনের কথা বলেছেন । এই গাথার ট্রাজিক পরিণতির আবেদন তাই একান্তই অনুভবগ্রাহ্য । গর্গ সাধুর অনুশোচনাবিদ্ধ হৃদয়ের সঙ্গে পাঠকচিত্ত সম্পূর্ণরূপে একাত্ম ।

দেওয়ানা মদিনা

'দেওয়ানা মদিনা'[৫২] গাথার নায়িকা-চরিত্র মদিনা । সেই বিবেচনায় দুলালকে নায়ক-চরিত্র হিসেবে বিবেচনা করতে হয় । কিন্তু এই গাথায় প্রকৃত নায়কোচিত গুণাবলী ধারণ করেছে আলাল । কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠভ্রাতা হিসেবেই নয়, তার দৃঢ়চিত্ততা, দূরদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্ব এই গাথার উজ্জ্বল উপাদান । জল্লাদের হাত থেকে প্রাণরক্ষার পর দুই ভ্রাতার চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

একদিকে আলাল প্রতিশোধস্পৃহা এবং রাজ্য পুনরুদ্ধারের সঙ্কল্প ধারণ করে যেমন দূরদর্শী ও আশাবাদী, অন্যদিকে দুলাল তেমনি পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে মেনে নেওয়ার মধ্য দিয়ে অদূরদর্শী ও নৈরাশ্যবাদী। কাজলরানার হীরাধরের বাড়ি থেকে পলায়নের মধ্যে আলালের এই সঙ্কল্পপূর্ণ মানসিকতাই ক্রিয়াশীল। পরবর্তীকালে দেওয়ান সেকেন্দারের গৃহে পারিশ্রমিকবিহীন শ্রমদানের ঘটনায়ও এই দূরদর্শী পরিকল্পনার প্রকাশ ঘটেছে। বিমাতার ষড়যন্ত্রের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং রাজ্যপুনরুদ্ধারের সঙ্কল্প বাস্তবায়নকল্পে আলাল তীক্ষ্ন বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে যে-পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তাও অত্যন্ত নিখুঁত। এক্ষেত্রে তার দক্ষ কূটনীতিক ও যোদ্ধৃ মানসিকতার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কোনো সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার চিহ্ন তার চরিত্রে পরিদৃষ্ট নয়। রাজ্যজয়ের পর কনিষ্ঠভ্রাতাকে অনুসন্ধানের মাধ্যমে উদ্ধার করে আলাল তাকে দেওয়ানীর অংশীদার করেছে। দুলালকে কৃষক জীবন থেকে উদ্ধার-প্রচেষ্টায় আলাল চরিত্রের ব্যক্তিত্বময়তা সুস্পষ্ট। তবে আলাল চরিত্রে সকল মহৎ গুণের সমাবেশ ঘটলেও চরিত্রটি নির্দ্বিধ ও নির্দ্বন্দ্ব।

দুলাল চরিত্রে দ্বন্দ্বময়তার প্রকাশ সুস্পষ্ট। যদিও দুলাল পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সহজে অভিযোজিত হয়। কিন্তু পরিবর্তনকে মেনে নেওয়ার মধ্যে কোনো বীরত্ব নেই। কৃষক জীবনের সঙ্গে তার একনিষ্ঠতার ফল হিসেবে কৃষক-কন্যার সঙ্গে দাম্পত্য জীবন গড়ে ওঠে। কৃষক জীবনে অভ্যস্ত তার এই জীবন পুরোপুরি বিস্মৃত হয় দেওয়ানী আভিজাত্যের গর্ব। সে যদি দেওয়ানী জীবনের মোহ কাটিয়ে এই জীবনেই দৃঢ়চিত্ত থাকত, তাহলে এটাই হত তার চরিত্রের গৌরবময় মহত্তর উপাদান। কিন্তু তা হয়নি। দুলাল জ্যেষ্ঠভ্রাতা আলালের দেওয়ানীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যেভাবে মুহূর্তের মধ্যে বিস্মৃত হয়েছে তার আশানুবর্ধিত প্রণয়বাসনা, দাম্পত্য জীবন ও পুত্রস্নেহকে এবং নির্মমভাবে অপমানিত করেছে তার প্রণয়িনীর একনিষ্ঠ প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে, তাতে তার চরিত্রের ব্যক্তিত্বহীনতা, ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতারই প্রকাশ ঘটেছে। বরং এক্ষেত্রে ভ্রাতৃ-আহ্বান অবহেলা করে সে হয়ে উঠতে পারত ব্যক্তিত্বময় ও মানবিক ঔদার্যে মহৎ। কিন্তু সে দেওয়ানীর মোহে ও ভ্রাতৃ-নির্দেশে বিচলিত হয়েছে। রাজ্যচ্যুত হয়ে একদিন যেমন সে নৈরাশ্যবাদীর মতো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল, দেওয়ানীর মোহেও তেমনি সে বিস্মৃত হয়েছে সততা, আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতায় বর্ধিত একটি দাম্পত্য জীবনকে। এ-পর্যায়ে সামাজিক মর্যাদাবোধে সে এমনই আচ্ছন্ন যে, স্বীয় পুত্রকে নির্দয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করতেও সে দ্বিধাহীন :

"নাই সে থাক এইখানে আর যাও ফিরিয়া ।
জন্মাবধি এইখান আছি তোমরারে লইয়া ॥
কেবল যাবে তোমরা সেই সগল সুখ ।
আর না মানিও কিয়া বান্যাচঙ্গের ঘর ॥
সেইখান থাকো তোমরার সুখে যাইব দিন ।
এইখান আস্যা তোমরারে নাইলে কর হীন ॥
জলদি চলিয়া যাও মোর পানে চাইয়া ।
আর আইবায় মোরে কানাইয়ো জানিয়া ॥" (মৈ.গী.পৃ ৩৭৮-৭৯)

দুলাল চরিত্রের অনুর্গত এই ত্রুটিই তাকে নায়কোচিত মর্যাদা থেকে হীন করেছে। তবে এই সংকীর্ণতা হীনতাই আবার তার চরিত্রের পূর্ণ পরিচয় নয়। তার চরিত্রের দ্বন্দ্বময় উপাদানই এক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

তাকে রক্ষা করেছে। পুত্রকে বিদায় দিয়েই তার মনে সৎ বিবেচনাবোধ জাগ্রত হয়েছে।

বিদায় দিয়া পরাণের পুতে চিন্তুয়ে দুলাল।
কবিরার মৌ আমার সুরুজ জামাল ॥
বিদায় লইয়া তারে কেমনে দেই ছাড়ি।
কেমনে ছাড়িবাম আমি মদিনা সুন্দরী ॥
... ...
দুঃখের কালে নিধি আমার যে জন।
তারে ছাড়্যাম আমার কেমন পরাণ ॥
তার বাপে দুঃখের দিনে আশ্রা দিল মোরে
সুখের লাগিয়া বিয়া দিছিল যে তারে ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩৮২)

এ-পর্যায়ে অনুশোচনা-দগ্ধ দুলালের মনে পত্নীপ্রেম, পুত্রস্নেহ, কৃতজ্ঞতাবোধ প্রভৃতি ক্রিয়াশীল থেকে তার পূর্বতন অপরাধ অনেকটা ম্লান করে দিয়েছে। মদিনার প্রতি তার আবাল্য-বর্ধিত প্রণয়বাসনা এবং দেওয়ানীর প্রতিপত্তি-মোহ ও মর্যাদাবোধ — এই দুয়ের দ্বন্দ্বে তার মধ্যে শেষ পর্যন্ত প্রণয়াবেগ ও কৃতজ্ঞতাবোধেরই জয় হয়েছে। দেওয়ানীর মোহ পরিত্যাগ করে যখন সে দ্বিধাহীন চিত্তে কৃষক-বধূর একনিষ্ঠ প্রণয়াকাঙ্ক্ষার মর্যাদাদান ও স্বীয় অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনার জন্য অগ্রসর হয়েছে, তখন তার উদ্ভিদ-প্রতিম মহৎ দৃঢ়চিত্ততার পরিচয়ই ব্যক্ত হয়। প্রানভিলের একটি মন্তব্য বিবেচনাযোগ্য :

দুলালের মনে একটি দ্বন্দ্বের বীজও কবি উপ্ত করেছেন। সে যুগে যদি মানস-দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ দেখাবার কোন সুযোগ থাকত দুলাল চরিত্রটি অতি উচ্চ ট্র্যাজিক গৌরবে মহিমান্বিত হতে পারত। একদিকে মদিনার মতো তার আবাল্যলালিত প্রেম, অন্যদিকে তার নবলব্ধ সামাজিক মর্যাদা। সে দেওয়ান হয়ে সামান্য চাষী-কন্যাকে কি করে স্বীকার করবে আপন পত্নী বলে? সুরুজজামালকে ফিরিয়ে দিয়েছে কিন্তু আপন হৃদয়দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারেনি। অনুকূল পত্নীকে সামাজিক পার্থক্যে সে স্বীকার করেনি। তাই যখন দেখি জীর্ণবসনের মত দেওয়ানির তকমা পদদলিত করে সে গ্রামের অভিমুখে চলেছে তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে হৃদয়ানুরাগে ক্রিয়াশীল মানস-দ্বন্দ্বই শেষ পর্যন্ত তাকে এই পথে নিয়ে গেছে।[৫৩]

মদিনা এই গাথার সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র। একনিষ্ঠ প্রণয়বাসনার আদর্শেই তার চরিত্র মহিমান্বিত। মুক্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কিংবা আত্মত্যাগের মহান আদর্শ সৃষ্টি করে ময়মনসিংহ গীতিকার নারী চরিত্রগুলি যেভাবে মহিমান্বিত হয়েছে, তার চেয়েও অতিরিক্ত কিছু গুণ মদিনা চরিত্রে দৃশ্যমান। দুলালের প্রতি মদিনার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা কৃষি ও কৃষকজীবনের গার্হস্থ্য পটভূমিতে বিধৃত। চাষাবাদ, বীজবপন, [illegible] ফসল উৎপাদনের একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় উভয়ের ঐকান্তিকভাবে জড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে বর্ণিত হয়েছে তাদের প্রণয়াবেগ :

লক্ষ্মী না আগন মাসে বাওয়ার দাওয়া সারি।
খলায় তোর আনে ধান আমি ধান নাড়ি ॥
দুইজনে বস্যা পরে ধান দেই উনা।
চাইল ভরা ধান খাই ওরি মেলা কিনা ॥

Dhaka University Institutional Repository

... ...

গোর না পাশেতে যখন আনে পাইল ক্ষেত ।
জানি না অভাগী পর দেই যত সেত খেত ॥
উক্কায় ভরিয়া পানী তামুক ভরিয়া ।
খসমের লাগ্যা থাকি পন্থপানে চাইয়া ॥

... ...

ফাগুণ মাস না মাস শীতে কাঁপায় পরাণি ।
পত্তাবর উঠ্যা খসম পাইল ক্ষেতে দেয় পানী ॥
আগুণ লইয়া আমি যাই ক্ষেতের পানে ।
পরাব লইলে আগুন তাপাই দুইজনে ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩৭৯-৮০)

রূপের আকর্ষণ কিংবা যুগজমোহ এই প্রণয়বাসনার উদ্ভব ঘটায়নি, এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে জীবনের গভীরতম প্রয়োজন ও সেই প্রয়োজনের পরিপূরকের অংশীদারিত্ব । চমৎকার জীবনঘনিষ্ঠ এই প্রণয়বাসনা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে একাত্ম । প্রণয়ের এই গভীরতর ব্যঞ্জনার কারণেই মদিনা দুলালের বিবাহবিচ্ছেদলিপির প্রতি অবিশ্বাস করেছে । বিরহতপ্ত হৃদয়ে তার মধ্যে দুলাল-সম্পর্কিত যে-স্মৃতিচারণার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, তাতে দুলালের প্রতিপত্তি-মোহের পরিণতি বৈসাদৃশ্যপূর্ণ । মদিনার অবিশ্বাসই বরং স্বাভাবিক । পতির প্রতি তার বিশ্বাস এবং ভালবাসা গভীর প্রণয়াবেগেরই ফল । কিন্তু দুলাল কর্তৃক স্বীয় পুত্রকে প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে তার আশাভঙ্গ হয়েছে । আশাভঙ্গের বেদনা তার জন্য এতই অস্বাভাবিক ও মর্মান্তিক যে এর আঘাত তার জন্য অসহনীয় হয়ে তার মৃত্যু ঘটিয়েছে । কৃষক-কন্যা হয়েও প্রণয়ে একনিষ্ঠতা, সহনশীলতা ও আত্মত্যাগের অপূর্ব মহিমায় মদিনা-চরিত্র লোক সাহিত্যের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বসাহিত্যের আলোচ্য চরিত্রে নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে । দেওয়ান সোনাফরের চরিত্রটি অপূর্ব পত্নীপ্রেম, সন্তানবাৎসল্য এবং সততা ও নিষ্ঠায় উজ্জ্বল । এর বিপরীতে উপস্থাপিত বিমাতা চরিত্রটির মধ্যে কোনো প্রশংসনীয় উপাদান নেই । ঈর্ষা, হিংসা, কুটিলতা, ষড়যন্ত্র এবং এমনকি নারী ও মাতা হয়ে সন্তানপ্রতিম পুত্রদের হত্যার উদ্যোগে যে-জিঘাংসাবৃত্তি তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, তা এই চরিত্রটিকে সকল দিক থেকে কলুষময় করে তুলেছে । এই গাথায় অঙ্কিত হয়েছে দুইটি বাস্তব চরিত্র । জল্লাদ চরিত্রটি এর অন্যতম । জল্লাদের মানসিকতাই তার আচরণে পরিস্ফুট । বিশ গুড়া জমির বিনিময়ে যখন সে দেওয়ানের দুই পুত্রকে হত্যার প্রস্তাব পায়, তখন তার উত্তর :

বিশ গুড়া জমি দিলে আনন্দ হইল মনে মনে ।
না পারি মুই এমন কাম নাই ত্রিভুবনে ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩৬৬)

আর-একটি চরিত্র ব্যবসায়ীর । জল্লাদের হাত থেকে আলাল-দুলালকে বিনা অর্থে লাভ করেও ব্যবসায়ী চরিত্রের স্বধর্ম অনুযায়ী সে গৃহস্থ হীরাধরের কাছে তাদের অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয় ।

হীরাধরের বাড়ীত সাধু যান না কিনিয়া ।
আলাল দুলালে কিম্মত দিল দাম করিয়া ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩৬৯)

Dhaka University Institutional Repository

'দেওয়ানা মদিনা' গাথার আখ্যানভাগে স্পষ্টত দুটি অংশ । এবং এই দুই অংশের দুই ধরনের পরিণতি লক্ষ্যযোগ্য । তবে দুই অংশের মধ্যে কাহিনীগত ঐক্যের অভাব নেই । দুলাল-মদিনার জীবনাবসান এবং দুলালের দ্বন্দ্বময় জীবনাচরণে মদিনার ট্রাজিক পরিণতির বিবৃতি আলাদা কাহিনী হিসাবে বিকশিত হওয়ার সক্ষমতা অর্জন করলেও এই কাহিনীটি পুরোপুরি মূল কাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন নয় । কেননা মূল কাহিনী ব্যতিরেকে দুলালের দ্বন্দ্বদীর্ণ আচরণের প্রকৃত ব্যাখ্যা করা অসম্ভব এবং মদিনার ট্রাজিক পরিণতির স্বরূপ নির্ণয়ও দুঃসাধ্য ।

বিমাতার কুটিল আচরণে পুত্রদের জীবননাশের আশংকা দেখা দেবে, এমন সাবধানবাণী দেওয়ান সোনাফরের স্ত্রী মৃত্যুকালে উচ্চারণ করে স্বামীকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করেছিলেন দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ না করার ব্যাপারে । পত্নীপ্রেম তার মধ্যে অগাধ পরিমাণেই ছিল । কিন্তু আত্মীয়স্বজন ও অমাত্যবর্গের অনুরোধে তাকে দ্বিতীয় বিয়ে করতেই হয় । তারপরেও তিনি সতর্ক ছিলেন । তবে দেওয়ান সোনাফরের চরিত্রের এই অত্যনুর-দুর্বলতাই তার জীবনে ট্রাজিক পরিণতি সৃষ্টি করে । স্বীয় সিদ্ধান্তে তিনি স্থির থাকতে পারেননি — এটাই তার চরিত্রের ত্রুটির দিক । দেওয়ান সোনাফরের বিয়োগান্তক পরিণতি পর্যন্ত একটি স্বতন্ত্র গাথা হতে পারত । কিন্তু কাহিনী আরও অগ্রসর হয় । আলাল ও দুলাল রাজ্যচ্যুত হয়, এবং দুই ভ্রাতার স্বতন্ত্র জীবনধারা গড়ে ওঠে । আলাল সুপরিকল্পিতভাবে স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয় । আলাল দুলালকে অনুসন্ধান করে তাকেও দেওয়ানীর অংশীদার করে । কিন্তু রাজ্যচ্যুত জীবন যেমন আলালের জন্য ছিল স্নেহবন্ধনমুক্ত এবং রাজ্য উদ্ধারের জন্য সঙ্কল্পময়, দুলালের জন্য তেমন ছিলনা । দুলাল মিশে গিয়েছিল কৃষক-জীবনের সঙ্গে, সেখানে তার সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে উঠেছিল । নবলব্ধ দেওয়ানীর সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে ঐ জীবনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক । এই দ্বন্দ্বে একটি নিষ্কলুষ নারীজীবনের অন্যায়-মৃত্যু সংঘটিত হয়েছিল । দুলাল-মদিনা কাহিনী এই গাথার একটি স্বতন্ত্র অংশ হিসেবে প্রতিভাত । তবে তাদের ট্রাজিক পরিণতি যথার্থভাবে বিবেচনার জন্য দুলালের দেওয়ানী মোহ এবং দেওয়ানীর অংশীদার হওয়ার আহ্বান লাভের বাস্তবতা সৃষ্টির কারণেই প্রথম অংশের সঙ্গে কাহিনীর ঐক্য উপলব্ধি করা সহজতর হবে ।

তবে গাথার আখ্যানভাগে দুইটি স্বতন্ত্র কাহিনী বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল । দুইটি কাহিনীরই পরিণতি বিয়োগান্তক । আলাল কর্তৃক রাজ্য উদ্ধারের মিলনান্তক পরিণতি-সমৃদ্ধ ঘটনা এই স্বতন্ত্র কাহিনী দু'টিকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছে । গল্প-গ্রন্থন যে এর ফলে শৈথিল্য-দুষ্ট হয়েছে, তা বলা যায় না । বরং এমন একটি পরিণতি সংঘটিত হওয়ার জন্যই যেন একটির পর একটি ঘটনা সজ্জিত হয়েছে । বরং প্রারম্ভের পরিচ্ছেদটিতে সুতরের কাহিনীটি যেন অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় উপ-কাহিনী হিসেবে সংযুক্ত । এই অধ্যায়টিতে আটানব্বই পংক্তি ব্যবহৃত হয়েছে । এর পরের পরিচ্ছেদগুলো প্রয়োজনীয়ভাবে বিস্তৃত হয়েছে । আখ্যানভাগ ঘটনা পরম্পরায় অতিমাত্রায় গতিশীল । লক্ষণীয় যে রাজ্য পুনরুদ্ধার পর্যন্ত দুলাল সম্পর্কিত একটি বাক্যও ব্যবহৃত হয়নি । কেননা রাজ্য পুনরুদ্ধারের সঙ্গে দুলালের কোনো সংযোগ নেই । আবার দুলাল দেওয়ানীর অংশীদার হওয়ার পর আলাল সম্পর্কে কোনো বাক্য নেই । কেননা তখন ঘটনার পরিণতির জন্য মদিনা-দুলাল কাহিনীই মুখ্য । আলাল অপ্রয়োজনীয় । এক্ষেত্রে ঘটনাবিন্যাসে রচয়িতার পরিমিতিবোধ ও শিল্পদক্ষতার পরিচয় সুস্পষ্ট । এই গাথার আখ্যানভাগের কিছু কিছু অংশে গীতময় সুরের স্পর্শ থাকলেও মহাকাব্যধর্মিতাই এর মুখ্য উপাদান ।

Dhaka University Institutional Repository

এই গাথার ট্র্যাজিক পরিণতি বহিরারোপিত বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে দুলাল চরিত্রের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বমূলক বৈশিষ্ট্যই এই পরিণতি সংঘটিত করেছে। দেওয়ানীর অংশীদারিত্ব লাভের ফলে সৃষ্ট সামাজিক মর্যাদাবোধ এবং প্রণয়িনীর প্রতি গভীর অনুরাগের দ্বন্দ্বই মদিনার বিয়োগান্তক পরিণতি সম্ভব করেছে। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হবে আলালের আহ্বানই হয়ত এই পরিণতির জন্য দায়ী। স্মর্তব্য যে আলালের আহ্বানে দুলালের অগ্রজ-অনুসরণ অনিবার্য ছিলনা। কিন্তু দুলালের অন্তর্গত শোণিত প্রবাহে যে দেওয়ানীর মোহ, তা অনস্বীকার্য। আলালের আহ্বান হয়ত এখানে পরিণতিতে গতিময়তা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এর মূল কারণ দুলালের মনোজগতের দ্বন্দ্বের মধ্যেই ক্রিয়াশীল। মদিনার মৃত্যুর পর দুলাল স্বীয় ত্রুটির জন্য অনুশোচনাদগ্ধ, দেওয়ানীর মোহমুক্ত সন্ন্যাস জীবনে প্রতিশ্রুতিশীল, ট্র্যাজেডির বেদনাকে সে ধারণ করেছে পুরোপুরি। এই গাথার ট্র্যাজিক রূপ অনুরাগময়ী আবেদনে তাই সার্থকতামন্ডিত।

ধোপার পাট

'ধোপার পাট'[৫৪] গাথার নায়িকা-চরিত্র কাঞ্চনমালা সক্রিয়তায় উজ্জ্বল না হলেও প্রণয়ে একনিষ্ঠতায় মহৎ ও তাৎপর্যপূর্ণ। তার চরিত্রে সামাজিক সচেতনতা, নারীসুলভ সতর্কতা বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকলেও হার্দ্য দুর্বলতা ও আবেগদীপ্ত প্রণয়বাসনার আন্তরিকতায়ই সে উদ্বেলিত। সমাজে যাতে কলঙ্ক রটনা না হয় সেজন্য সে তার প্রণয়ীর সঙ্গে দিবালোকের পরিবর্তে রাত্রির অন্ধকারে নির্জনে একত্রিত হওয়ার পরিকল্পনা করে। এ-ধরনের পরিকল্পনার মধ্যে তার নারী-সুলভ সামাজিক-সতর্কতা, সংযত-আবেগ ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় স্পষ্ট। অন্যদিকে প্রণয়ীর সঙ্গে দেশত্যাগে তার একনিষ্ঠ প্রণয়-উচ্ছ্বাস ও হার্দ্য দুর্বলতারই প্রকাশ ঘটেছে। জমিদার-কন্যা রুক্মিণীর নিকট প্রকৃত পরিচয় ব্যক্ত করার মধ্যে তার গ্রাম-জীবনের আবহে সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে লালিত সরল-বিশ্বাসী মনের স্বরূপটি পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

উচ্চতর শ্রেণীর মানুষের প্রণয়বাসনায় আন্তরিকতার অভাব, সেখানে হৃদয়জ গভীরতার পরিবর্তে ইন্দ্রিয়জ আকাঙ্ক্ষাই প্রবল — এমন উপলব্ধি থেকে কাঞ্চনমালার মনে জমিদার-পুত্রের প্রণয়াকাঙ্ক্ষার ভঙ্গুরতা নিয়ে সন্দেহ-সংশয় ক্রিয়াশীল থাকলেও সে আমৃত্যু বিশ্বস্ত থেকেছে স্বীয় প্রণয়বাসনার প্রতি। জমিদার-পুত্র কর্তৃক অন্য স্ত্রী গ্রহণ এবং তাকে বিস্মৃত হওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েও তার মনের গভীরে কোথাও যেন আশা জেগে থাকে, জমিদার-পুত্রের প্রণয়কে সে পুরোপুরি ইন্দ্রিয়জ কামনা বলে যেন বিশ্বাস করতে পারে না — নদীজলে বিসর্জনের পূর্বমুহূর্তেও তার এই মৃত্যুসংবাদ জমিদার-পুত্রকে অবহিত না করার অনুরোধের মধ্যে যে-অভিমানাহত হৃদয়ের উচ্চারণ ঘটে, তাতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে লালিত একজন যুবতীর পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব যে উচ্চ শ্রেণীর যুবক-মনে সেন্টিমেন্টের স্থান নেই। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়জ আকর্ষণই জমিদার-পুত্রের যুবতী-লালসার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কাঞ্চনমালার বিপরীতে নায়ক-চরিত্র জমিদার-পুত্র চরিত্রটি অত্যন্ত বিত্ত-সচেতন, প্রণয়বাসনায়

Dhaka University Institutional Repository

আবেগ-মুক্ত ও ইন্দ্রিয়াসক্ত। তার শ্রেণী-সচেতনতা এমনই প্রবল যে তার প্রতি সম্পূর্ণভাবে সমর্পিতা গৃহত্যাগী কোনো নারীর প্রণয়কে অপমান করার ব্যাপারেও সে দ্বিধাশূন্য। বিষয়-গৌরব, প্রতিপত্তি-মোহ, আভিজাত্য-অহম তার চরিত্রে সর্বদা ক্রিয়াশীল। যদিও ধোপা-কন্যাকে নিয়ে দেশ-ত্যাগে তার হৃদয়-দৌর্বল্যের প্রকাশ ঘটেছে, কিন্তু তা সাময়িক, অনুকূল আহ্বানে সে-দুর্বলতা অতিক্রমণে সে দ্বিধাহীন।

হৃদয় কর্তৃক হৃদয়ের অপমানের দৃষ্টান্ত ময়মনসিংহের গীতিকায় দু'একটির বেশি লক্ষ্য করা যায়না। শাসক-শক্তির অত্যাচারী লালসা-দীর্ণ মানসিকতার তুলনায় জমিদার-পুত্রের দুশ্চরিত্র বৈশিষ্ট্য অধিকতর কলঙ্কময় উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। এই গাথার আর একটি কলঙ্কময় চরিত্র জমিদার-কন্যা রুক্মিণী। তার মধ্যেও রয়েছে বিষয়-গৌরব। কাঞ্চনমালার চেয়ে সে অধিকতর সুন্দরী — এমন তথ্য গাথায় অনুপস্থিত। মূলত শ্রেণীগত উচ্চতর অবস্থান থেকেই সে জমিদার-পুত্রকে কাঞ্চনমালা-বিমুখ করতে সক্ষম হয়েছে। নারী হয়ে অন্য এক নারীর দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদ সৃষ্টির সফল প্রচেষ্টায় তার চরিত্রের সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও ক্ষুদ্রতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জমিদার-পুত্রের সাক্ষাৎ না পেয়েই তার প্রতি প্রণয়যাচঞা করেছে, কেবলমাত্র সে জমিদার-পুত্র এই তথ্যটুকু জেনে — এখানেই তার ক্ষুদ্রতার বড় প্রমাণ।

এই গাথায় জমিদারপুত্র ও কাঞ্চনমালাকে আশ্রয়দানকারী নিঃসন্তান ধোপা ও ধোপা-বধূর মধ্যে সরল, নিরীহ ও উপদ্রবমুক্ত শান্ত গৃহস্থ জীবনাকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। কাঞ্চনমালাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ভুলিয়ে ধোপা-গৃহে রেখে জমিদার-পুত্র যখন রুক্মিণীকে নিয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছে তখন এক দুশ্চরিত্রের হাতে কাঞ্চনমালাকে সমর্পণের নির্দেশ আসে ধোপার নিকট। অন্যথায় ধোপার গৃহ নিশ্চিহ্ন হবে — এই আশংকায় ধোপা আশ্রিতা যুবতীর জন্য কোনো প্রকার বিপদ মোকাবেলা করতে অসম্মত হয়। সংসারের শান্তি বজায় রাখার জন্য আশ্রিতা যুবতীকে নিরাশ্রিত করতে ধোপা ও ধোপা-বধূ কোনো রূপ দ্বিধান্বিত নয়। তবে ধোপার এহেন আচরণে তার চরিত্রের ক্ষুদ্রতার পরিবর্তে অসহায়ত্বের প্রকাশই স্পষ্ট।

তুমি থাকিলে কন্যা কন্যা মরিব পরাণে।
বাড়ী ঘর পুইড়া ছাই করিব আগুনে ॥
ধর্ম্ম রাখ সতী কন্যা যাও অন্য ঠাঁই।
আজ রাইতে বিপদে রক্ষা করকাইন গোঁসাই ॥ (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ২১)

ধোপা ও ধোপা-বধূ আশ্রিতা-কন্যাকে এক ইন্দ্রিয়লোলুপ দুশ্চরিত্রের নিকট সমর্পণ করে যে আর্থিক বা অন্যান্য সুবিধা লাভের মতো সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়নি — সেটাই তাদের চরিত্রের ইতি-বাচক উপাদান।

এই গাথার আখ্যানভাগে গল্প-গ্রন্থন অত্যন্ত নিখুঁত। কাহিনীর সুসংবদ্ধতা, ঘটনার কেন্দ্রীয় ঐক্য এবং ঘটনা পরম্পর সাজিয়ে কাহিনীকে একটি যৌক্তিক পরিণতির অভিমুখে অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ঘটনার প্রয়োজনীয় বিন্যাস প্রভৃতি এই আখ্যানাংশের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। রচয়িতার পরিমিতিবোধের ও চমৎকার প্রমাণ পাওয়া যায় এই গাথায়। জমিদার ও জমিদারের ধোপা — এই দুই শ্রেণী অবস্থানে

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্যহত নায়ক ও নায়িকার মধ্যেকার হার্দ্য সম্পর্ক যে স্থায়ী ও সুখী হতে পারে না — তা প্রমাণিত করার জন্যই আখ্যানভাগ পরিকল্পিত হয়েছে। আখ্যানাংশের সূচনাতেই এ-সম্পর্কে নায়িকার মুখ থেকে যত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে সংশয় ব্যক্ত করা হয়েছে এবং পরিণতিতে ঘটনা দ্বারা তার প্রমাণ দেখানো হয়েছে। জমিদারের ক্রোধের ফলে কাহিনীতে জটিলতা সৃষ্টি, জমিদার-পুত্রসহ কাঞ্চনমালার দেশত্যাগ, জমিদার-পুত্রের প্রতি জমিদার-কন্যা রুক্মিণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষা, জমিদারের কর্মচারীর যুবতী-লালসা, ধানের ব্যাপারী তামসা গাজীর কাহিনী সংযোজন প্রভৃতি ঘটনা সামগ্রিক পরিকল্পনারই অংশ। পরিকল্পনার বাইরে অতিরিক্ত কোনো ঘটনার সংযোজন এই গাথায় লক্ষ্য করা যায় না। তামসা গাজীর কাহিনী অপরিহার্য ছিল।

নাটকীয় উপাদানের প্রাচুর্য, কাহিনীর সুসংবদ্ধ গ্রন্থনা প্রভৃতি বিবেচনায় এই আখ্যানভাগের মতো 'মহুয়া' গাথার সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। আখ্যানাংশের অধিকাংশ স্থান জুড়ে স্বগতোক্তি বা সংলাপ উচ্চারণের নাটকীয় দৃশ্যমানতা বর্তমান, বর্ণনার অংশ অত্যন্ত কম। কাহিনী শুরুই হয়েছে কাঞ্চনমালা ও জমিদার পুত্রের প্রণয়ঘন সংলাপ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। দিবালোকের এই ঘনিষ্ঠতা লোকচক্ষুর গোচর হলে কলঙ্কের ভয় — সেই আশংকা ব্যক্ত করছে কাঞ্চনমালা, সে-কারণে জমিদার-পুত্র কাঞ্চনমালার কাছ থেকে রাত্রি-অভিসারের অঙ্গীকার আদায় করছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে কাঞ্চনমালার স্বগতোক্তি উচ্চারিত হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে জমিদারকে কোনো একজন সংবাদবাহক পুত্রের আসক্তি সম্পর্কে অবহিত করার পর জমিদার ধোপাকে ডেকে একদিনের মধ্যে কন্যার বিবাহের আয়োজন করার নির্দেশ দেন। এসব অংশের বর্ণনা এত সংক্ষিপ্ত ও বাহুল্যবর্জিত যে রচয়িতার পরিমিতবোধ লক্ষ্য করে বিস্মিত না হয়ে উপায় থাকে না। কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য রচয়িতা সব ঘটনার বিস্তৃত উপস্থাপনে মনোযোগ দেননি, পাঠকের কল্পনার ওপর অনেকখানি ছেড়ে দিয়েছেন। যেমন, চতুর্থ পরিচ্ছেদে জমিদার কর্তৃক ধোপাকে কন্যার বিবাহ-আয়োজনের নির্দেশদানের পর ধোপা মনস্থির করে যে কন্যাকে মালীর মতো বিয়ে দেবে। কিন্তু ধোপার সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার আগেই জমিদার-পুত্রসহ কাঞ্চনমালা নিরুদ্দেশ হয়। জমিদার-পুত্রের সঙ্গে কাঞ্চনমালার কিভাবে সাক্ষাৎ ঘটল, তাদের নিরুদ্দেশযাত্রায় কোনো একজনের মধ্যেও দ্বিধা ছিল কিনা — প্রভৃতি বিষয় পুরোপুরি এড়িয়ে গিয়ে একটি মাত্র বাক্যে তাদের নিরুদ্দেশ যাত্রার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে :

বাগুয়া যে আছে মালী ফলনার কাজ করে।
রাইত পোষাইলে মালি দিবান বিয়া তার সনে ॥
লাড়িতে পরিয়া ডর ধুবা তার বাড়ী যায়।
ধুবা ধুবনীর কান্দনে রজনী পোষায় ॥
কইবা গেল রাজার পুত্র কইবা কাঞ্চনমালা।
দেশেতে পড়িল জোর শানের হইল পালা ॥ (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ১১-১২)

রচয়িতা সমগ্র আখ্যানভাগেই এভাবে বাহুল্যবর্জন করে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় অংশের বিকাশ সাধন করেছেন। পঞ্চম পরিচ্ছেদে নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে নায়ক-নায়িকার সংলাপ ও স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে তাদের অনুর্বর বাস্তবতাকে চিত্রায়িত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র গাথায় বহির্বাস্তবতার চেয়ে অন্তর্বাস্তবতাই প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ভিন্ন অঞ্চলের জমিদারের ধোপার বাড়িতে তাদের আশ্রয়গ্রহণের তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে জমিদার-কন্যা রুক্মিণীর

Dhaka University Institutional Repository

কৌতূহল এবং কাঞ্চনমালার সঙ্গে সখীত্ব স্থাপন, অষ্টম পরিচ্ছেদে রুক্মিণী কর্তৃক কাঞ্চনমালা ও জমিদার-পুত্রের পরিচয় লাভ, জমিদার-পুত্রের প্রতি রুক্মিণীর অনুরাগ ব্যক্ত এবং নবম পরিচ্ছেদে জমিদার-পুত্র কাঞ্চনমালার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ, কাঞ্চনমালার বিরহ-তপ্ত হৃদয়ের হাহাকার; দশম পরিচ্ছেদে জমিদার বাড়ির কর্মচারীর লালসা-লোলুপ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ধোপা ও ধোপা-বধূ কর্তৃক কাঞ্চনমালাকে নিরাপদ আশ্রয়ের পরামর্শদান, একাদশ পরিচ্ছেদে ব্যবসায়ী ভামসা গাজীর নিকট কাঞ্চনমালার আশ্রয়লাভ, ভামসা গাজীর পরিবারের বর্ণনা, ভামসা গাজীর নিকট কাঞ্চনমালার পিতার দুঃখময় জীবনের সংবাদ শ্রবণ এবং দ্বাদশ পরিচ্ছেদে পিতার নিকট গমন, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে জমিদার-পুত্রের সঙ্গে রুক্মিণীর সুখী দাম্পত্য জীবন দর্শনের পর কাঞ্চনমালার আত্মবিসর্জন — প্রতিটি পরিচ্ছেদ যেন নাটকের এক-একটি দৃশ্য । রচয়িতা একটির পর একটি ঘটনা অত্যন্ত অনায়াসে যেন পটের চিত্রের মতো সাজিয়ে তুলেছেন । কখনও গীতিরস, কখনও সংলাপধর্মিতা, কখনও স্বগতোক্তিমূলক উচ্চারণ, কখনও নাটকীয় দৃশ্যময়তার মধ্য দিয়ে কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে । এ গাথায়ও নায়িকা কাঞ্চনমালা বিপদগ্রস্ত হয়ে আত্মবিসর্জনকালে প্রকৃতিকে জীবনের সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করেছে ।

এই গাথার বিয়োগান্তক পরিণতিও যেন আখ্যানভাগের সুসংবদ্ধ গ্রন্থনের মতো অনিবার্যতাসূচক । সমগ্র আখ্যানভাগের পরিকল্পনার সঙ্গে ট্রাজিক পরিণতিও যেন অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত । কাহিনীর প্রারম্ভে বর্ষা-রাত্রিতে নায়ক জমিদার-পুত্রের সঙ্গে অভিসার যাপনের পর নায়িকা কাঞ্চনমালা সাতিশয় আনন্দলাভের মধ্যেও তাদের প্রণয়-সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে-সংশয়াত্মক সংলাপ উচ্চারণ করে, তা পরিণামসঞ্চারী । এবং গাথার পরিণতি-পর্যায়ে কাঞ্চনমালার পিতার যে অভিজ্ঞ-উচ্চারণ : "বড়র সঙ্গে ছোটর পিরীত হয় অঘটন ।" (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ২৬) । — এর সঙ্গে কাঞ্চনমালার সংশয়ের সাযুজ্য রয়েছে । এটা প্রমাণ করার জন্যই যেন সমগ্র আখ্যানভাগের পরিকল্পনা করা হয়েছে ।

গাথার এই করুণ পরিণতি বহিরারোপিত নয় । নায়ক-নায়িকার ভিন্ন শ্রেণী অবস্থানই গাথার ট্রাজিক পরিণতির জন্য দায়ী । মনে হতে পারে, জমিদার-কন্যা রুক্মিণীর প্রস্তাবই জমিদার-পুত্রের পদস্খলন সূচিত করেছে । এ-ধরনের ব্যাখ্যা ভ্রমাত্মক । কেননা জমিদার-পুত্রের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য যদি প্রতিপত্তি-মোহ ও উচ্চশ্রেণীর অবস্থান-সচেতনতায় আচ্ছন্ন না হত, তাহলে রুক্মিণীর প্রস্তাব তাকে কাঞ্চনমালা-বিমুখ করতে সক্ষম হত না ।

কাঞ্চনমালার আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে এই ট্রাজিক পরিণতি ঘটলেও তা সমগ্র আখ্যানভাগকে আন্দোলিত করে না । নায়ক জমিদার-পুত্রের জীবন অন্য স্ত্রীর সঙ্গে সুখেই অতিবাহিত হয় । কাঞ্চন-মালার আত্মবিসর্জনে তাদের দাম্পত্য জীবনে কোনো বিপর্যয় সৃষ্টি হয় কিনা — সেরকম কোনো তথ্য যেমন গাথায় উল্লিখিত নেই, তেমনি তেমন কোনো বিপর্যয় আদৌ ঘটার আশংকা আছে কিনা তারও কোনো ইঙ্গিত এখানে স্পষ্ট নয় । সেকারণে এই আত্মবিসর্জন কাঞ্চনমালার জীবনের করুণ পরিণতিকে সম্ভব করলেও সমগ্র গাথার ট্রাজিক পরিণতি সম্ভব করতে সক্ষম হয় না । সে-বিবেচনায় এই পরিণতির সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান । এবং এর আবেদন ব্যাপ্তিলাভ করতে সক্ষম হয়নি ।

Dhaka University Institutional Repository

মইষাল বন্ধু

'মইষাল বন্ধু'[৫৫] গাথার চরিত্র-চিত্রণে রচয়িতার পরিমিতি ও সংযতমনস্কতার পরিচয় সুস্পষ্ট। চরিত্রগুলি আখ্যানভাগের ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে পরস্পরিত হয়ে বিকাশ লাভ করেছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র ডিঙ্গাধর পিতৃঋণ সম্পর্কে অনবহিত হয়েও তা পরিশোধের জন্য যে নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় দেয়, তা তার পূর্বাপর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। এই সততার কারণেই স্বীয় ত্রুটির জন্য ঋণদাতা-মহাজন বলরামের শাস্তিদন্ড সে মেনে নেয়নি এবং প্রভূত ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়েও বলরাম কন্যা সাজুতীর পূর্ব-অনুরাগ অক্ষুণ্ণ আছে কিনা, তা পরীক্ষা না করে বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপন করেনি। তার চরিত্রে সততা, নিষ্ঠা, কৃতজ্ঞতাবোধ, সংযতমনস্কতা, বন্ধুবৎসলতা প্রভৃতি নানাবিধ গুণের সমাহার ঘটেছে। তবে তার চরিত্রে আত্মনিবেদনে সক্রিয়তা যত-না স্পষ্ট, স্বীয় অবস্থাবৈগুণ্য থেকে উদ্ধারলাভের প্রয়াস তত দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য ছয় বছরের ভৃত্যবৃত্তি গ্রহণ কিংবা ঋণদাতা-মহাজন বলরামকে উদ্ধারের জন্য দস্যুদলের ঝুঁকি নিয়ে স্বীয় অপরাধ স্বীকার প্রভৃতি আচরণের মধ্যে আত্মনিবেদনের সুরই অভিব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু নদীর জলে নিমজ্জিত হওয়ার পর উদ্ধার লাভ কিংবা পরে প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হওয়ার মধ্যে তার সক্রিয়তা লক্ষ্যযোগ্য নয়। কেবলমাত্র সাজুতীর প্রতি তার অনুরাগ এবং সেই অনুরাগকে স্থায়ী রূপ-দানের লক্ষ্যে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে তার চরিত্রের সক্রিয়তা, বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্বময়তার পরিচয় সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। নায়ক-চরিত্রের উপযোগী গুণাবলীর কখনও অনতিস্পষ্ট কখনও সুপরিস্ফুট প্রকাশে তার চরিত্রটিই এই গাথায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও উজ্জ্বল।

ডিঙ্গাধরের সমান উজ্জ্বলতা কিংবা সক্রিয়তা সাজুতী চরিত্রে অনুপস্থিত হলেও সাধারণ মইষাল বন্ধুর প্রতি তার অনুরাগের গভীরতা ও একনিষ্ঠাই তাকে নায়িকা চরিত্রের মর্যাদায় উন্নীত করেছে। তার হৃদয়ের সংবেদনশীলতা, প্রবল দুঃখকষ্টের জীবনেও স্বীয় অনুরাগের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকার সহনশীলতা তাকে মহৎ করে তুলেছে।

গাথার চরিত্রগুলি বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি, তবু কয়েকটি চরিত্র তাদের স্ব স্ব বৃত্তির বৈশিষ্ট্যকে চমৎকারভাবে পরিস্ফুট করে তুলেছে। মঘুয়ার বণিক চরিত্র সুন্দরী পরস্ত্রীর প্রতি রূপলালসা চরিতার্থ করার হীন ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কুসীদজীবী চরিত্র হিসেবে আগাড়িয়া মন্ডলের চরিত্রটি সার্থকভাবে চিত্রিত হয়েছে এই গাথায়। এক্ষেত্রে রচয়িতার বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার পরিচয় সুস্পষ্ট। প্রচুর অর্থের অধিকারী এই মন্ডল সুদের বিনিময়ে প্রদত্ত ঋণের টাকা আদায়ের ব্যাপারে যত-না যত্নশীল, সতর্ক ও কঠোর, ব্যয়ের ব্যাপারে তার হাত ততোধিক সংকুচিত। বিড়াল বেঁধে রেখে অন্ন গ্রহণ, নিজের ও স্ত্রীর শরীরে আচ্ছাদন হিসেবে ছেঁড়া কাপড়, রাতে প্রদীপের পরিবর্তে পাতার মশাল জ্বালানো প্রভৃতি আচরণের মধ্যেই তার ব্যয়কুণ্ঠ কুসীদজীবীর চরিত্রটি সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে।[৫৬] এছাড়া জমিদারের অত্যাচারী মানসিকতা এবং কাঞ্চনরাজার সুন্দরী নারীলালসার চমৎকার উদাহরণ সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে এই গাথায় । 'মইষাল বন্ধু' গাথার আখ্যানভাগের অসম্পূর্ণতা ও বিশৃঙ্খলার জন্য গাথায় চিত্রিত চরিত্রগুলি পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করতে সক্ষম হয়নি ।

এই গাথার আখ্যানভাগ অসম্পূর্ণ ও বিশৃঙ্খল । একই কাহিনীর সামান্য ভিন্নতাসহ দুই প্রকার ভাষ্য পাওয়া যাচ্ছে । প্রথম ভাষ্যে সংঘটিত ডিঙাধরের পিতার কৃষকজীবনে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সেহেতু মহাজনের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ, ঋণ অপরিশোধ্য অবস্থায় তার মৃত্যু, পিতৃঋণ পরিশোধকল্পে ডিঙাধরের কর্তৃক মহাজন বনরাজের গৃহে মইষালের চাকরি গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনা দ্বিতীয় ভাষ্যে অনুপস্থিত । আবার দ্বিতীয় ভাষ্যে সংঘটিত ডিঙাধর ও সাজুতীর মধুয়ার গৃহে গমন, সেখান থেকে মধুয়া ও ডিঙাধরের বাণিজ্যযাত্রা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মধুয়ার নিরুদ্দেশ হওয়া, ডিঙাধর কর্তৃক মধুয়া-ভগিনী মধুনার পানিগ্রহণ, অবশেষে গৃহে প্রত্যাগত মধুয়া কর্তৃক কাঞ্চনরাজার নিকট বিচার প্রার্থনা, বিচারের পরিবর্তে রাজা কর্তৃক ডিঙাধরের উভয় বধূকে অপহরণ প্রভৃতি ঘটনা প্রথম ভাষ্যে অনুপস্থিত । উভয় ভাষ্যে যেসব ঘটনা সাধারণ, তার মধ্যে রয়েছে : নদীর ঘাটে কন্যাগণ-কন্যা সাজুতী জল আনতে গেলে সেখানে মইষাল বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় ও উভয়ের মধ্যে প্রণয়বাসনার অঙ্কুরোদগম (এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষ্যের পার্থক্য হল : প্রথম ভাষ্যে মইষাল ডিঙাধর বনরাজের মহিষের রাখাল, কিন্তু দ্বিতীয় ভাষ্যে সে অন্য কারও রাখাল, কার রাখাল সে, কিংবা তার কি নাম দ্বিতীয় ভাষ্যে তার উল্লেখ নেই), প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হওয়ার ফলে রাখালী-কাজে অন্যমনস্কতা এবং সেহেতু মহিষ কর্তৃক জমিদারের ফসল বিনষ্ট করার ফলে মইষালের দণ্ডভোগ (প্রথম ভাষ্যে হয়রানের মারাভোগের পর স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ কিন্তু দ্বিতীয় ভাষ্যে জমিদার কর্তৃক দেশত্যাগে বাধ্য করার কথা রয়েছে), দেশত্যাগের সময় নদী পার হতে গিয়ে নদীজলে নিমজ্জন, সুবালিয়া ব্যবসায়ী কর্তৃক উদ্ধার এবং ব্যবসায়ীর মৃত্যুর পর তার সকল ধন সম্পদের মালিক হয়ে সাজুতীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে সুখী দাম্পত্য জীবন শুরু কিন্তু বন্ধু মধুয়া সাজুতীর প্রতি লালসাগ্রস্ত হলে সুখী দাম্পত্য জীবনে বিপর্যয় (এখানেও প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষ্যের ভিন্নতা রয়েছে, প্রথম ভাষ্যে ডিঙাধর ধন-সম্পদের মালিক হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে সাজুতীকে বিয়ে করে সংসার জীবনে ব্রতী হয় এবং নদীঘাটে সাজুতীর রূপদর্শনের পর মধুয়া কৌশলে ডিঙাধরের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাকে বাণিজ্যযাত্রায় নিয়ে সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে এসে সাজুতীকে অপহরণ করে, কিন্তু দ্বিতীয় ভাষ্যে বাণিজ্যসূত্রে ডিঙাধরের সঙ্গে মধুয়ার বন্ধুত্বের এক পর্যায়ে মধুয়া ডিঙাধরকে নিয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে ডিঙাধরের বাঁশির সুরে উন্মত্ত সাজুতী ডিঙাধরের সঙ্গ নেয়, এমন অবস্থায় সাজুতীর রূপদর্শনে মধুয়া বিচলিত হয় এবং তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ষড়যন্ত্র আঁটে, কিন্তু সে ষড়যন্ত্রে নিজেরই বিপর্যয় ঘটে) প্রভৃতি ।

দুইটি ভাষ্যের উৎস একই কাহিনী, এমন অনুমানের নানা ভিত্তি রয়েছে । দুই ভাষ্যের মধ্যে ঘটনাগত যে অমিল লক্ষ্য করা যায়, বর্ণনায় তার তুলনায় মিল অনেক । নদীঘাটে প্রথম মইষাল ও সাজুতীর সাক্ষাৎ, সাজুতীর স্নানের দৃশ্য, সাজুতীর দেহসৌন্দর্য, মইষালের জন্য সাজুতীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বর্ণনায় দুইভাষ্যে যেসব পংক্তি ব্যবহৃত হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে তার হুবহু মিল লক্ষ্য করা যায় । কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ :

(১) প্রথম ভাষ্যে : হাটু জলে নাম্যা কন্যা হাটু মাজ্জন করে ।
সোনার অঙ্গে নাম্যা কন্যা সোনার মাজ্জন করে ॥ (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ৩৮)

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় ভাষ্যে : হাটু জলে নামিয়া কইন্যা হাটু মাজন করে ।
কোমর জলে নামিয়া কন্যা কোমর মাজন করে ॥ (পৃ ৬২)

(২) প্রথম ভাষ্যে : বাতাসে না শুনে কথা কন্যালো আমার কথা ধর ।
আমি আন্যা দিবাম কলসী তুমি যাও ঘর ॥ (পৃ ৩৮)

দ্বিতীয় ভাষ্যে : বাতাসে না শুনে কন্যালো আমার কথা ধর ।
আমি আইন্যা দিবাম কলসী তুমি যাও ঘর ॥ (পৃ ৬৩)

(৩) প্রথম ভাষ্যে : লাজেতে হইল কন্যার রক্তজবা মুখ ।
পরথম যৌবন কন্যার এই পরথম দুখ ॥
আনিল ধতুয়া কলসী তুলিয়া মইষালে ।
জল ভরিয়া কন্যা লইল কাঁকালে ॥ (পৃ ৩৯)

দ্বিতীয় ভাষ্যে : লাজেতে হইল কন্যার রক্তজবা মুখ
পরথম যৌবন কন্যার এই পরথম দুখ ॥
... ...
আনিল ধতুয়া কলসী তুলিয়া মইষালে ।
ভরনু কলসী কন্যা লইল কাঁকালে ॥ (পৃ ৬৪)

(৪) প্রথম ভাষ্যে : আস্ট আঙুল বাঁশের বাঁশী মধ্যে মধ্যে ছেদা
নাম ধরিয়া বাজায় বাঁশী কাঞ্চিনী রাধা ॥ (পৃ ৩৯)

দ্বিতীয় ভাষ্যে : অস্ট আঙুল বাঁশের বাঁশী মধ্যে মধ্যে ছেদা ।
আর দিন বাজিতে বাঁশী বলে রাধা রাধা ॥ (পৃ ৬৪)

(৫) প্রথম ভাষ্যে : এহি মতে সুন্দর কন্যা করয়ে ক্রন্দন ।
বাথানে মইষালের কথা শুন সভাজন ॥ (পৃ ৪২)

দ্বিতীয় ভাষ্যে : এই মতে সুন্দর কন্যা করয়ে ক্রন্দন ।
বাথানে মইষালের কথা শুন সভাজন ॥ (পৃ ৬৫)

(৬) প্রথম ভাষ্যে : আমিত অবলা নারীরে বন্ধু হইলাম অনুর পুড়া ।
কুল ভাঙিলে নদীর যেমন মধ্যে পড়ে চড়া ॥ (পৃ ৪০)

দ্বিতীয় ভাষ্যে : আমিত অবলা নারীরে বন্ধু হইলাম অনুরপুরা ।
কুল ভাঙিলে নদীর জল মধ্যে পড়ে চড়া ॥ (পৃ ৬৮)

(৭) প্রথম ভাষ্যে : সুজন চিন্যা পিরীত করা বড় বিষম লেঠা ।
ভাল ফুল তুলিতে গেলে অঙো লাগে কাটা ॥
... ...
লাজ বাসি মনের কথা কইতে নাহি পারি ।
দেখাইতাম বুকের দুঃখু বুক মোর চিরি ॥...
কইতে নাহি পারি কথা বাপ মায়ের কাছে ।
নীলারী বাতাসে মোর অনুর পুড়্যা গেছে ॥ (পৃ ৪০)

দ্বিতীয় ভাষ্যে : সুজন চিন্যা পিরীত করা বড় বিষম লেঠা ।
ভাল ফুল তুলিতে গেলে অঙো লাগে কাটা ॥...
লাজ বাসি মনের কথা কইতে নাই সে পারি ।

Dhaka University Institutional Repository

মুখেতে নাইমাতে বন্ধু দেখোই মরে তিতি ॥...
কইতে নারি মনের কথা যাও বালোর মরে ।
নিলারী বাতাসে আমার অন্তর পুইরা গেছে ॥ (পৃ ৬৯)

(৮) প্রথম কাব্যে: পক্ষী যদি হইতামরে বন্ধু উড়িয়া উড়িয়া ।
তোমার মুখ দেখতাম বন্ধু ডালেতে বসিয়া ॥ (পৃ ৪১)

দ্বিতীয় কাব্যে: পক্ষী যদি হইতাম রে বন্ধু যাইতাম উড়িয়া ।
দেখিতাম তোমার মুখ ডালেতে বসিয়া ॥ (পৃ ৭০)

(৯) প্রথম কাব্যে: এতত শীতল জলের হাওয়া আরত শীতল জানি ।
তা হইতে অধিক শীতল ডাবের মধ্যে পানি ॥...
তা হইতে অধিক শীতল যৌবনে পিরীতি ।
তা হইতে অধিক শীতল মনোবাঞ্ছার গতি ॥ (পৃ ৪২)

দ্বিতীয় কাব্যে: এতত শীতল জলের হাওয়া আরত শীতল জানি ।
তা হ'তে অধিক শীতল ডাবের মধ্যের পানি ॥...
তা হ'তে অধিক শীতল যৌবনে পীরিতি ।
তা হ'তে অধিক শীতল মনোবাঞ্ছার গতি ॥ (পৃ ৭০)

এভাবে হুবহু মিলের অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত করা সম্ভব । বর্ণনার এমন হুবহু মিল ছাড়াও দুই কাব্যের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত, উপস্থাপনাগত এবং পরিচর্যা ব্যবহারের অভিন্নতাও লক্ষণীয় । এসব কারণে উভয় কাব্যের একই কাহিনী-উৎস সম্পর্কে অনুমান করা যায় । রচনাকালের দিক থেকে দু'টি কাব্যের প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি পুরনো এমন অনুমান সংকলক-সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক উত্থাপিত হয়েছে[৫৭] এবং দুখান যুক্তিতে তার প্রমাণে গাথার অভ্যন্তরীণ কিছু সাক্ষ্যও ব্যবহার করেছেন ।[৫৮] দুখান যুক্তিতে প্রথম কাব্যের তুলনায় দ্বিতীয় কাব্যের সুপ্রাচীনতার প্রশ্নটিও উত্থাপন করেছেন । তাঁর যুক্তির একটি বিষয় হল : 'ডিঙাধর' শব্দটির অর্থ নৌকার মাঝি বা চালক । প্রথম কাব্যে শুরু থেকে মইষালের নাম ডিঙাধর, অথচ দ্বিতীয় কাব্যে মইষালের কোনো নামোল্লেখ নেই, ব্যবসা-কাজে নিযুক্তির পরই তার নামকরণ হয় ডিঙাধর — যুক্তিটি গ্রহণযোগ্য ।

দু'টি কাব্যের প্রাচীনতা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে কোনো সমাধানে পৌঁছা অসম্ভব । তবে একটি কথা প্রশ্নাতীতভাবে বলা যায় যে, দু'টি কাব্যেরই কাহিনী-উৎস এক এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন রচয়িতা কিংবা গায়েনের মাধ্যমে দু'টি ভিন্ন কাব্যের উদ্ভব ঘটেছে । দু'টি কাব্যকে সম্মিলিত করে কোনো একক কাহিনী নিখুঁত পরম্পরাসহ উপস্থাপন অসম্ভব ।[৫৯] ঘটনাবিন্যাসের ক্ষেত্রে উভয় কাব্যেরই রয়েছে স্বতন্ত্রতা । প্রথম কাব্য যেখানে যেভাবে শেষ হয়েছে অসম্পূর্ণভাবে, তাকে দ্বিতীয় কাব্যের পরবর্তী ঘটনা দ্বারা পূর্ণ করা সম্ভব নয় । তাছাড়া দ্বিতীয় কাব্য যেভাবে শুরু হয়েছে তাকে টেনে নেয়াও সম্ভব নয় প্রথম কাব্যের প্রারম্ভ অংশ পর্যন্ত । তা করতে গেলে ঘটনা-পরম্পরায় যুক্তি বিঘ্নিত হয় । আবার উভয় কাব্যই গাথা হিসেবে অসম্পূর্ণ ।

উভয় কাব্যে দীর্ঘ স্থান জুড়ে স্বগত সংলাপের মাধ্যমে নায়িকা চরিত্রের প্রণয়াকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় । অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের জন্য প্রকৃতি সহায়ক উপাদান হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

ক্রিয়াশীল। আখ্যানভাগের গল্পগ্রন্থন নিখুঁত — একথা বলা যায় না। কেননা উভয় অংশে কেন্দ্রীয় সংকট হিসেবে উত্থাপিত হয়েছে ডিঙাধর-সাজুতীর দাম্পত্য জীবনে বহিঃশত্রুর আক্রমণের কারণে বিপর্যয় সৃষ্টি। এই কেন্দ্রীয় সংকটকে পরিস্ফুটিত করার জন্য প্রথম অংশের ডিঙাধর-পিতার ঋণ-গ্রস্ততা এবং সেজন্য ডিঙাধরের রাখালের জীবন গ্রহণ, কাঙ্গালের ঋণগ্রস্ততার পরিণতি প্রভৃতি ঘটনা বাহুল্য নিশ্চয়। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অংশে কেন্দ্রীয় সংকট উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ঘটনা সংস্থাপনের যুক্তিগ্রাহ্যতা অধিকতর লক্ষণীয়। তবে প্রথম অংশে কৃষক জীবনে মহাজনী ঋণের প্রতিকূল প্রভাবের বিষয়টিকে কেন্দ্রীয় সংকট হিসেবে মনোনীত করলে ঘটনাবিন্যাসের যুক্তিগ্রাহ্যতা অনেকটা পরিদৃষ্ট হবে। কিন্তু তাহলে এর গাথাধর্মিতা থাকে না এবং মঘুয়া কর্তৃক সাজুতী হরণকে বাহুল্য বলে প্রমাণিত হবে।

আখ্যানভাগের অসম্পূর্ণতার কারণে এই গাথার কোনো অংশই একটি যুক্তিগ্রাহ্য পরিণতি লাভ করেনি। অর্থাৎ গাথার পরিণতির সঙ্গে আখ্যানভাগের ঘটনাগত ঐক্য সুসংবদ্ধ নয়। প্রথম অংশে সাজুতীকে মঘুয়া কর্তৃক অপহরণের মধ্য দিয়ে কাহিনীর শেষ। এই অপহরণ সাজুতী বা ডিঙাধরের জীবনে কীরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল তার বর্ণনা গাথায় নেই। ঘটনাটি অকস্মাৎ সংঘটিত হয়েছে। ডিঙাধরের পিতার কৃষক জীবনে বিপর্যয়, মহাজনী ঋণে আবদ্ধ হয়ে ঋণ পরিশোধ করার পূর্বেই মৃত্যু, পুত্র ডিঙাধর কর্তৃক ঋণ পরিশোধের জন্য রাখালী জীবনে রূপান্তর, মহাজনী ঋণের করাল গ্রাসে আরও একটি পরিবারের নিঃস্ব হওয়া এবং ব্যবসায়ী ধন লাভের মধ্য দিয়ে উভয় পরিবারের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসা — প্রথম অংশের এরূপ মৌল কাহিনীর মধ্যে মঘুয়ার হঠাৎ আবির্ভাব ও সাজুতীকে অপহরণ কাহিনীর কেন্দ্রীয় ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন পরিণতির সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয় অংশে মাইবাল ও সাজুতীর প্রণয়সম্পর্ক সফলতার পর্যায় থেকে মঘুয়ার রূপলালসা ক্রিয়াশীল — কাহিনীর প্রথম পর্যায়েই তা লক্ষ্য করা যায়। পরে রূপলালসা চরিতার্থ করার জন্য মঘুয়ার ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র অসার্থকতায় প্রতিপন্ন হওয়া, ডিঙাধরের সুখী দাম্পত্য জীবনের বহু কাল অতিক্রমণ, অতএব পুনরায় মঘুয়ার ষড়যন্ত্র এবং দ্বিতীয়বারের ষড়যন্ত্রে অকস্মাৎ কাঙুরাজার আবির্ভাব এবং সাজুতী ও ময়নাকে অপহরণ সমগ্র কাহিনীর ধারাবাহিকতাকে ক্ষুণ্ন করে সংঘটিত হয়। উভয় অংশের পরিণতি কাহিনীর যৌক্তিক অগ্রগতির মধ্য দিয়ে অনিবার্য হয়ে ওঠেনি। এ কারণে উভয় অংশের পরিণতি বিয়োগান্তক হওয়া সত্ত্বেও পাঠক হৃদয় যাদের জীবনে ট্রাজেডি সংঘটিত হয়েছে তাদের বেদনার প্রতি একাত্ম নয়।

ভেলুয়া

'ভেলুয়া'[৬০] গাথায় প্রচুরসংখ্যক চরিত্রের সমাবেশ ঘটানো হলেও কোনো চরিত্রই পূর্ণাঙ্গরূপে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। চরিত্রগুলো বিকাশশীল নয়, এক-একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্থিরভাবে দৃশ্যমান। গাথার কোনো একটি চরিত্রও শিশুকাল থেকে ক্রমবর্ধিষ্ণু হয়ে বিকাশ লাভ করেনি। এই প্রবণতা কেবলমাত্র অন্য সকল চরিত্রের মধ্যেই নয়, এই গাথার নায়ক-চরিত্র মদন সাধু কিংবা নায়িকা-চরিত্র ভেলুয়া উভয়ের মধ্যেও এই গতিহীনতা সমানভাবে পরিদৃষ্ট হয়। মদন সাধু

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরাধিকার সূত্রে ব্যবসায়ী জীবনে অভ্যস্ত হলেও তার চরিত্রে বণিকসুলভ লুন্ঠনবৃত্তি কিংবা সুযোগলাভের পরিবর্তে কোমল, সহানুভূতিশীল ও সংবেদনশীল মনের পরিচয় সুস্পষ্ট । প্রণয়াকাঙ্ক্ষার প্রতি একনিষ্ঠা প্রণয়বাসনা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে তার সক্রিয়তা ও উদ্যম সর্বাংশে নায়কসুলভ মহিমা নিয়ে ক্রিয়াশীল হলেও কোথায় যেন সূক্ষ্মভাবে তার চরিত্রে বীরত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয় । আবু রাজার বিরুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রামে মুখোমুখি হওয়া কিংবা বন্ধু হিরন সাধুর ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় দৃঢ়তা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে তার মধ্যে যে দুর্বলতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, তাতেই তার বীর্যহীনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । তবে স্বাধীন প্রণয়াবেগ, এবং সেই প্রণয়োপলব্ধিকে সার্থক করে তোলার ক্ষেত্রে তার কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ, সাহসিকতার পরিচয় দান, সামাজিকভাবে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বণিকসুলভ অপহরণবৃত্তিতে উদ্যোগী হওয়া এবং পিতা কর্তৃক গৃহচ্যুত হয়েও প্রণয়িনীর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে একাধিক জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ-বিপদের মুখোমুখি হয়েও উদ্যমশীল থাকা প্রভৃতি আচরণে মদন সাধুর নায়কোচিত চরিত্রটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে । ময়মনসিংহের গীতিকার আর কোনো নায়ক-চরিত্রকে প্রণয়াকাঙ্ক্ষা সফল করার জন্য তার মতো এত কষ্ট স্বীকার কিংবা বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়নি । মদন সাধুর পাশাপাশি তেলুয়া সুন্দরী চরিত্রেও প্রণয়নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, বিপদে ধৈর্যহারা না হয়ে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ, বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় প্রদান, কোনো প্রকার লোভের কাছে নতি স্বীকার না করা প্রভৃতি মহৎ গুণের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে । নায়িকাসুলভ গুণাবলীকে ধারণ করে তেলুয়াও মদন সাধু চরিত্রের সমান উজ্জ্বলতায় দীপ্তিমান ।

পালার অন্য চরিত্রগুলো এক-একপ্রকার বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে পৃথক চরিত্রের মর্যাদা লাভ করেছে । তেলুয়ার পিতা মানিক সওদাগর চাঁদ সওদাগরের বংশের উত্তরাধিকার লাভ করে আভিজাত্যবোধে গর্বিত । বণিক চরিত্রে এমন সামন্ত-আভিজাত্য সাধারণত লক্ষ্য করা যায় না । মদন সাধুর পিতা মুরাই সাধুর মনে সন্তান-বাৎসল্য প্রবল হলেও আত্মমর্যাদাবোধ বাৎসল্যকে অতিক্রম করে গেছে । মানিক সদাগর তার পুত্রের নিকট কন্যা সমর্পণে অস্বীকৃতি জানিয়ে তাকে যে-অপমান করেছে তা সে বিস্মৃত হয়নি এবং স্বীয় পুত্র যখন সেই কন্যাকে অপহরণ করে এনে গৃহবধূ করতে উদ্যোগী হয়েছে, তখন মুরাই সাধু প্রবল আত্মমর্যাদাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে একমাত্র পুত্রকে গৃহচ্যুত করতেও নির্দ্বিধ থেকেছে । এক্ষেত্রে তার চারিত্রিক দৃঢ়তা লক্ষণীয় । রমণীলালসাই আবু রাজার একমাত্র পরিচয় । হিরন সাধু ও তার পিতা ধনঞ্জয় সাধু চরম সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও ক্ষুদ্রতার পরিচয়েই সৌন্দর্যদীর্ণ । বিপদাপন্ন বন্ধু-স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ এবং বন্ধুকে হত্যা করার পরিকল্পনায় হিরন সাধুর নিকৃষ্ট মনোভঙ্গির পরিচয়ই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে । এদিক থেকে ধর্মপ্রবণ সওদাগর, হিরণ সাধুর ভগিনী মেনকা ও সন্তোষ দাসীর চরিত্র গৌরবদীপ্ত । ধর্মপ্রবণ সওদাগর বিপদাক্রান্ত দুই যুবতীকে বিপদমুক্ত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে সর্বস্বহারা হয়েছে । মেনকা স্বীয় ভ্রাতার সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে স্বীয় প্রণয়াবেগ ও অন্য যুবতীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বস্ত, শ্রদ্ধাশীল ও একনিষ্ঠ থেকেছে এবং সেজন্য নানা ধরনের বিপদ মোকাবেলা করেছে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, মেনকা চরিত্রের মহত্ত্ব তার ঔদার্যের মধ্যেও নিহিত, স্বীয় প্রণয়ীর প্রতি প্রণয়াকাঙ্ক্ষী তেলুয়ার প্রতি সে ঈর্ষাপরায়ণ নয়, বরং সমব্যথী ও শ্রদ্ধাশীল, মেনকা চরিত্রের এই ঔদার্য তুলনাহীন । সন্তোষ দাসী চরিত্র হয়েও বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতায় উজ্জ্বল । বিভিন্ন প্রকার বিপদে স্বীয় প্রভুর কাজে সহযোগিতায় তার যে দক্ষতা ও একনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা ময়মনসিংহের গীতিকার অন্য কোনো দাসী চরিত্রে দুর্লভ ।

Dhaka University Institutional Repository

তেজুয়া গাথার আখ্যানতাগ অতিশয় দীর্ঘ, সেকারণে শিথিল-গ্রন্থন ও উপকাহিনীর সমাবেশ সহজে লক্ষ্য করা যায়। গাথার কেন্দ্রীয় সংকটকে সুপরিস্ফুট করার জন্য যতগুলি উপকাহিনীর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে তার সবগুলি অনিবার্যতামূলক নয়। গাথার শুরুতেই প্রতি ক্ষেত্রে আয়োজনেই কেন্দ্রীয় সংকট হিসেবে মদন সাধু ও তেজুয়ার প্রণয়াবেগ চরিতার্থ করার পথে অনুরাগের বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে। এই কার্যকারণের ক্ষেত্রে প্রথম অন্তরায় সৃষ্টি করেছে তেজুয়ার পিতা মানিক সওদাগর, অতঃপর মদন সাধুর পিতা মুরাই সাধু। পরবর্তীকালে ভাবু মাঝার লালসা, হিরন সাধুর রূপলালসা প্রভৃতি সংকটকে ঘনীভূত করেছে এবং একাধিক উপকাহিনীর সৃষ্টি করেছে। তেজুয়া ভাবু মাঝার কবলে পতিত হয়েছে দুবার। ধার্মিক সাধুর অনুপ্রবেশও গাথায় উপকাহিনী হিসেবে সংযোজিত হয়েছে। একাধিক উপকাহিনীই আখ্যানভাগের কেন্দ্রীয় সংকটকে ঘনীভূত করার ক্ষেত্রে বাহুল্য দোষে দুষ্ট। প্রচুর ঘটনা সংঘটনের দিক থেকে এই গাথাটি ময়মনসিংহের গীতিকার মধ্যে কেবল 'মহুয়া' গাথার সঙ্গেই তুল্য। বর্ণনার মধ্যে নেই কোনো চমৎকারিত্ব কিংবা কাব্যিক উৎকর্ষ। প্রচুর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং তা সরল বর্ণনা দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে। তেজুয়ার মনে প্রণয়বাসনা অঙ্কুরোদ্গমের পর্যায়েও তার সুপ্তসংলাপের বর্ণনা তুলনামূলকভাবে শিল্পসুষমামণ্ডিত নয়। এই গাথায় 'মহুয়া' কিংবা 'কাজল রেখা' গাথার মতো শুক ও সারী পাখীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। নায়ক-নায়িকার প্রণয়াবেগের আদান-প্রদানের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে তীব্র প্রণয়াকাঙ্ক্ষার উন্মেষে কিংবা পরবর্তীকালের সংকট নিরসনকল্পে শুক ও সারী পাখীর ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিপুল ঘটনার সমাবেশে পাঠকের কৌতূহল সৃষ্টি লাভ করলেও কিংবা নাটকীয় ও দৃশ্যগ্রাহ্য বর্ণনার আধিক্য পরিলক্ষিত হলেও আখ্যানভাগের গল্পগ্রন্থনকে তা শিথিলতাদুষ্ট করেছে। বর্ণনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বারংবার। শুক-সারীকে বার্তা শিখিয়ে দেওয়া এবং একই কথা পুনর্বার শুক-সারীর মুখ থেকে উচ্চারণ, কিংবা পরিচয় প্রদানসূত্রে একই কথার পুনরাবৃত্তি সর্বদার লক্ষ্য করা যায়।

এই গাথার পরিণতি মিলনাত্মক। ময়মনসিংহের গীতিকার অধিকাংশ গাথা ট্রাজিক পরিণতি লাভ করলেও কয়েকটি মাত্র গাথা মিলনাত্মক পরিণতি লাভ করেছে। তবে এই মিলনাত্মক পরিণতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এ ধরনের পরিণতির জন্য বহিরারোপিত ঘটনা দায়ী নয়। চরিত্রসমূহ, বিশেষত নায়ক-নায়িকা চরিত্রের সক্রিয়তা, সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা, একনিষ্ঠতা প্রভৃতি গৌরবদীপ্ত আচরণই এই মিলনাত্মক পরিণতি সংঘটিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে পরিণতি বিয়োগাত্মক কি মিলনাত্মক তার চেয়ে বড় তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল ঃ ঐ পরিণতির পেছনে চরিত্রের আনুবৈশিষ্ট্যই দায়ী কিনা। তেজুয়া গাথায় সকল সংকট নিরসন হয়ে যখন মদন সাধুর তেজুয়া ও সোনাকে নিয়ে সুখী দাম্পত্য জীবনে প্রবেশের মধ্য দিয়ে গাথার পরিসমাপ্তি ঘটে, তখনও পাঠকমনে এই আনন্দের পেছনে তিনটি চরিত্রের প্রতিকূলতা মোকাবেলায় সাহসিকতাপূর্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত জীবন সংগ্রামের চিত্রই জাজ্বল্যমান থাকে। ফলে পরিণতির এই আনন্দের সঙ্গে একটি দীর্ঘ সংগ্রামী অধ্যায়ের বিষাদপূর্ণ অনুরণন একাত্ম হয়ে তা পাঠকমনেও সঞ্চারিত হয়। পাঠকমনের একাত্মতাই এই গাথার মিলনাত্মক পরিণতির ক্ষেত্রে তাৎপর্য সৃষ্টি করেছে। 'কমলা' গাথার পরিণতির সঙ্গে এই পরিণতির তুলনা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

কমলারানীর গান

'কমলারানীর গান'[৬১] গাথায় দুটি মাত্র চরিত্র : রাজা জানকীনাথ ও রানী কমলা। দীনেশচন্দ্র সেন এই দুই চরিত্রের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেছেন।[৬২] ঐতিহাসিক চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও গাথায় এই দুটি চরিত্র যেভাবে বিধৃত হয়েছে, তাতে তাদের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয়। রাজা জানকীনাথ রানী কমলা অপেক্ষা অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ, রক্ত-মাংসের মানুষ। রাজার তুলনায় রানির চরিত্রে অধিকতর আধ্যাত্মিকতার সুর ধ্বনিত হয়েছে। স্বপ্নদর্শনের পর ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রানীর আত্মবিসর্জন, আত্মবিসর্জনের পর মানবীরূপে মর্ত্যে এসে পুত্রকে দুগ্ধদান প্রভৃতির মধ্যে অলৌকিকতার সুর স্পষ্ট। অথচ রাজা খননকৃত পুকুরে জলাগমন না ঘটায় ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তিত হলেও রানীর আত্মবিসর্জনে সম্মত নয়। রানীর প্রতি তার প্রণয়সম্পর্ক অত্যন্ত মানবীয় — যা ধর্মীয় আবেগমুক্ত সম্পূর্ণরূপে, অন্যদিকে রাজার প্রতি রানীর প্রণয়-আগ্রহ থাকলেও তা ধর্মাচ্ছন্নতার ফলে পরিস্ফুটিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। রানীর আত্মবিসর্জনে রাজার বিচ্ছেদকাতর হৃদয়ের অসহায়ত্ব দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে দুশ্চিন্তা, অতঃপর মৃত রানীকে জীবিতাবস্থায় পাওয়ার শিশুসুলভ আকুলতা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রাজা-চরিত্রের একান্ত মানবীয় গুণাবলীই পরিস্ফুট হয়েছে। রানী কমলা চরিত্রের অতি-মানবীয় ধর্মাচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের আধিক্যের বিপরীতে একান্ত মানুষোচিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন করে রাজা-চরিত্রটি অঙ্কনের ফলে রাজা জানকীনাথ মানবীয় চরিত্র হিসেবে উজ্জ্বলতর হয়েছে।

এই গাথার আখ্যানভাগে অলৌকিক ও ঐতিহাসিক উপাদান সমন্বিত হওয়ায় গাথা-ধর্মী আবেদন অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কাহিনী সারল্যে মুগ্ধ। রানীর অমরত্ব লাভের ইচ্ছাপূরণের জন্য রাজা কর্তৃক পুকুর খনন, কিন্তু সেই পুকুরে জলাগমন না ঘটায় ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রাজার দুশ্চিন্তা, স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে রানী আত্মবিসর্জন করলে অলৌকিকভাবে জলাগমন, রানীর মৃত্যুতে রাজার অতিশয় বিচ্ছেদকাতরতা, দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্য দুশ্চিন্তা, অলৌকিক উপায়ে প্রয়াত রানীর মানবীরূপে এসে প্রতি রাত্রে শিশুকে দুগ্ধদান, মৃতা রানীকে জীবিতাবস্থায় পাওয়ার জন্য রাজার আকুলতা প্রভৃতি কয়েকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে আখ্যানভাগ অতি দ্রুত সমাপ্ত হয়েছে। রানীর অমরত্ব লাভের ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে রানীকে হারানোর মধ্যে প্লটের কোনো পর্যায়ক্রম-শৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায় না। কমলা দীঘির অস্তিত্ব ঐতিহাসিকভাবে সত্য। রাজা রানীর ইচ্ছাপূরণের জন্য ঐ দীঘি খনন করেছিলেন — তারও ঐতিহাসিক সত্যতা রয়েছে। কিন্তু স্বপ্ন দর্শন, আত্মবিসর্জন ও আত্মবিসর্জন-উত্তর মানবীরূপে প্রত্যাগমন করে দুগ্ধদানের অলৌকিক উপাদানসমূহ রং হিসেবে প্রচলিত লোকমানসে আখ্যানভাগে সংযুক্ত হয়েছে। আখ্যানভাগে উপকাহিনীর সমাবেশ ঘটেনি কিংবা কাহিনী বাহুল্য দোষে দুষ্ট হয়নি। তাছাড়া এসব অলৌকিক উপাদান সত্ত্বেও একটি প্রত্যয়ের বর্ণনায় রচয়িতার চমৎকার দক্ষতাগুণ পরিদৃষ্ট হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এই পালার আখ্যানভাগের মতো সাযুজ্য রেখে এর পরবর্তী অংশ হিসেবে আর-একটি পালা ভিন্ন নামে পূর্ববঙ্গ-গীতিকার চতুর্থ খন্ডে সংকলিত হয়েছে। 'রাজা রঘুর পালা' শীর্ষক সেই পালা সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে। ঐ পালার আখ্যানভাগ শুরু হয়েছে রানীর আত্মবিসর্জনের পর থেকে। 'রাজা রঘুর পালা'য় 'কাজল রানীর গান'-এর অংশবিশেষ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। তবে বর্ণনায় সাযুজ্য না থাকায় সহজেই উপলব্ধি করা যায়, একই ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে রচয়িতাগণ ভিন্ন ভিন্ন পালা রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন।

অলৌকিকতায় আচ্ছন্ন হওয়ায় কাজলরানীর আত্মবিসর্জনের মহিমায় পাঠকের একাত্মতা নেই। তবে রাজা জানকীনাথের মানবীয় হৃদয়ানুভূতির প্রতি পাঠকের সহমর্মিতা রয়েছে। তাই পালার রসনিষ্পত্তি আবেদন-বাহী নয়।

মানিকতারা বা ডাকাইতের পালা

'মানিকতারা বা ডাকাইতের পালা'[৬৩] পালার কেন্দ্রীয়-চরিত্র বাসু সংসর্গদোষে ডাকাতিবৃত্তি গ্রহণ করেছে। পিতা ও চার ভ্রাতাকে হারিয়ে মাতৃআদরে লালিত বাসু মাতুলপুত্র মধুর সংসর্গে দুষ্কর্মবৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়েছে। তবে ডাকাতসুলভ হিংস্রতা কিংবা নির্মমতা তার চরিত্রে পরিদৃষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণহত্যার পর লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি নিয়ে মায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করলে বাসুর ধর্মপ্রাণা মা পুত্র কর্তৃক ব্রাহ্মণহত্যার সংবাদ শ্রবণে হৃদয়ে যে আঘাত অনুভব করেন, তার ফল হয় মৃত্যু। কেবল এক্ষেত্রেই বাসু চরিত্রের ডাকাত-সুলভ কঠোরতা লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ মৃত মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বাসুর অনিচ্ছা কিংবা মায়ের মৃত্যুর পরও ডাকাতিবৃত্তি অব্যাহত রাখার মধ্যেই তার কঠিন মনোবৃত্তির পরিচয় স্পষ্ট। নায়িকা-চরিত্র মানিকতারার মধ্যে নারীসুলভ কোমলতা অতিক্রম করে পৌরুষের বীর্যবত্তা পালার শেষাংশে স্পষ্ট হয়ে ওঠায়, তা তার চরিত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। মানিকতারা অব্যর্থ তীর ছুঁড়তে পারতো -- এই পরিচয়টি ব্যক্ত করার যুক্তি হিসেবে কিভাবে সে এই পারদর্শিতা অর্জন করেছে তার একটি বর্ণনা আছে। কিন্তু তবুও পাঠকমনে মানিকতারার সঙ্গে বাসুর প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা দ্বারা যে-চিত্র অঙ্কিত হয় তাতে তার নারীসুলভ কোমলতার প্রকাশই প্রধান। ফলে পাখী শিকারের দক্ষতার সঙ্গে এই কোমলতার সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। কিংবা পরবর্তীকালে কানাইকে উদ্ধারের জন্য সে তার শত্রু ভগ্নিকে নিয়ে যে কৌশল ও বুদ্ধিপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করে, তার সঙ্গে পাঠকমনে তার সম্পর্কে যে প্রাথমিক ধারণা জন্ম নেয় তার কোনো সামঞ্জস্য নেই। মানিকতারা চরিত্র নির্মাণে রচয়িতার এই ব্যর্থতা সুস্পষ্ট। শেষ দৃশ্যে মানিকতারাকে যেভাবে ডাকাত-স্বামীর উপযুক্ত সহযোগী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, প্রথম দৃশ্যে সেরকমই ইঙ্গিতবহ কোনো আচরণের মাধ্যমে তাকে পরিস্ফুট করা প্রয়োজন ছিল। অথচ প্রথম দৃশ্যে সে তিন ভাই ও পাঁচ বোনের সংসারে সবচেয়ে ছোট ও অপূর্ব সুন্দরী বোন হিসেবে আদরে লালিত কোমলমতি যুবতী হিসেবে চিত্রিত হয়, যার সঙ্গে শেষ দৃশ্যের উপস্থাপিত বুদ্ধিমতি, প্রত্যুৎপন্ন , দুর্ধর্ষ এবং হিংস্র ডাকাতের মতো লড়াই করতে প্রস্তুত এক রণরঙ্গিনী রূপী নারীদের সামঞ্জস্যহীনতা সহজেই দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়। কানাই ও তার

Dhaka University Institutional Repository

মায়ের চরিত্রটি বিলাংশিত। কানাই জামাতরূপে নিজের জীবনকে যেভাবে গড়ে তুলেছে তাতে তার মায়ের মনে কোনো দ্বন্দ্ব-ক্ষোভ নেই।

এই গাথার আখ্যানভাগ আয়তনে দীর্ঘ, তবে তাৎপর্যহীন। কাহিনী কোনো কেন্দ্রীয় ঐক্যে সংস্থাপিত কিংবা আবর্তিত নয়। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী অঞ্চলে ডাকাতের উপদ্রব সম্পর্কে গাথায় একটি প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার পর বিধুশীলের সংসারে একে একে চারপুত্রসহ বিধুশীলের মৃত্যুর ঘটনা বিবৃত হয়েছে। অতঃপর বিধুশীলের একমাত্র পুত্র বাসু কিভাবে সংসর্গদোষে ডাকাতিবৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে এবং বিবাহ-উত্তরকালে তার স্ত্রীও এই বৃত্তিতে সহযোগী হয়েছে, তারই কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে এই গাথায়। গাথা-সংগ্রাহকের বক্তব্য অনুযায়ী, আখ্যানভাগের তিনটি অংশের এটি প্রথম অংশমাত্র[৬৩], অর্থাৎ কাহিনী অসম্পূর্ণ। বোধ করি তিনটি অংশই সংগৃহীত হলে আখ্যানভাগ সম্পূর্ণ হত। এবং গাথার কেন্দ্রীয় সংকট কি এবং সেই সংকটকে কেন্দ্র করে কাহিনীর আবর্তিত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হত। বর্তমান আখ্যানে বাসুর মায়ের মৃত্যুতে কিংবা বাসুর বিয়ের ফলে কাহিনী সংকটময় হওয়ার যে-সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা বাসুর অবিচলতা ও মানিকতারার সহযোগিতাপূর্ণ মনোভঙ্গির কারণে অগ্রসর হতে পারেনি। গাথার একেবারে শেষ অংশে কানাইয়ের বন্দীত্ব নিয়ে কাহিনী যে সংকটময় হয়েছে তাও মানিকতারা ও তার সঙ্গীদের কৌশলময় অভিযানে হঠাৎ দ্রুত নিঃশেষিত হয়েছে। কাহিনীর অকস্মাৎ পরিসমাপ্তি ঘটায় সংকট নিরসন প্রলম্বিত হল কি দ্রুত হল, সে সম্পর্কে জানা যায় না। কেন্দ্রীয় সংকটের অনুপস্থিতিতে গাথার আখ্যানভাগ তাৎপর্য হারিয়েছে। ঘটনাবিন্যাসে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চমৎকারিত্ব লক্ষণীয়। যেমন মানিকতারার রূপ বর্ণনা অংশ বাসুর দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে। এই বর্ণনায় প্রাকৃত সৌন্দর্য ও ছন্দসুষমা লক্ষ্য করা যায়। জামাতা বাসুকে সাধুশীলের পরিবারে যে-অতিথি-সেবা করা হয়, তার বর্ণনাটিও চমৎকার এবং বস্তুনিষ্ঠ। নতুন অতিথির আগমনে ঘরের বধূদের নানারূপ রন্ধনের ঘটা, তিনপুত্রবধূ ও শাশুড়ির রন্ধন নিয়ে ব্যস্ততা এবং গৃহস্থ বাড়ির অন্দরে এই ব্যস্ততার জন্য পাড়ার মেয়েদের আগমন, সেজন্য বাড়ির পুরুষদের মনে ক্রোধ সঞ্চার প্রভৃতি নিয়ে গ্রামের একটি গৃহস্থ পরিবারের প্রাত্যহিক জীবনচিত্র অঙ্কনে রচয়িতার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। শেষ দৃশ্যে যেখানে মানিকতারা তার সঙ্গীদের নিয়ে কানাইয়ের উদ্ধারাভিযানে প্রবৃত্ত হচ্ছে, সে-দৃশ্যটির পরিকল্পনা, বর্ণনার চমৎকারিত্ব ও উপস্থাপনকৌশল প্রভৃতিতে রচয়িতার শিল্পসফলতা তাৎপর্যময়।

গাথার অসম্পূর্ণতার কারণে এর পরিসমাপ্তি নিয়ে আলোচনা অসম্ভব। গাথার শেষাংশে সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠেছে এবং সংকটের নিরসনের বাস্তব সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে গাথার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। গাথার এরূপ পরিণতি তাৎপর্যহীন এবং আখ্যানভাগের সামগ্রিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিংবা অনিবার্যমূলক নয়।

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ান ইশা খাঁ মসনদালি

'দেওয়ান ইশা খাঁ মসনদালি'[৬৫] গাথায় অনেকগুলি চরিত্র অঙ্কিত হলেও কেবলমাত্র ইশা খাঁর চরিত্রটিই বিকশিত হওয়ার অবকাশ লাভ করেছে। নায়ক ও কেন্দ্রীয় এই চরিত্রটিকে উপস্থাপিত করার প্রয়োজনেই অন্য চরিত্রগুলোকে অঙ্কিত করা হয়েছে। এসব চরিত্রের মধ্যে ইশা খাঁর পিতামাতা কালিদাস (পরে সোলেমান) ও মমিনা, ভ্রাতা দাউদ খাঁ, স্ত্রী সুভদ্রা (পরে নিয়ামতজান), পুত্র আদম খাঁ মসনদ আলী ও বিরাম দেওয়ান, পূর্বপুরুষ ভগবত সিং, ভগিরথ, গয়াসউদ্দিন মিয়া, জৈনউদ্দিন, বাহাদুর শাহ, জোলালউদ্দিন, শত্রু দিল্লির বাদশাহ আকবর, আকবরের সেনাধ্যক্ষ শাহবাজ খাঁ ও মানসিংহ, শ্রীপুরের রাজা কেদার রায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

ইশা খাঁ ঐতিহাসিক চরিত্র। বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বাধীন শাসক হিসেবে তাঁর শৌর্য-বীর্যের কথা কিংবদন্তী আকারে বিবৃত আছে। ঐতিহাসিক চরিত্রটির অনুসরণেই এই গাথায় ইশা খাঁ চরিত্রটিকে অঙ্কনের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে ইতিহাসের ঘটনার হুবহু অনুসরণ করা হয়নি। অন্য চরিত্রসমূহ সম্পর্কে একই বক্তব্য প্রযোজ্য। অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিবরণকে বিকৃত করা হয়েছে।[৬৬] ইতিহাসের কোন কোন অংশের বিকৃতি সাধন করা হয়েছে, তা চিহ্নিত করার পরিবর্তে গাথায় চরিত্রগুলোকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য সন্ধানেই আমরা আমাদের প্রয়াস সীমাবদ্ধ রাখব। ইশা খাঁ চরিত্রে বীরত্বব্যঞ্জকতা, সাহসিকতা, কূটনৈতিক বুদ্ধিমত্তা, ধূর্ততা, প্রজাবৎসলতা, স্বাধীনপ্রিয়তা, মহানুভবতা প্রভৃতি গুণাবলীর সমন্বয় ঘটেছে। তার মা মমিনা খাতুনের চরিত্রে প্রণয়াকাঙ্ক্ষা, প্রণয়ে একনিষ্ঠা এবং প্রত্যাখ্যানে হতাশাগ্রস্ত না হয়ে যেকোনো উপায়ে প্রণয়বাসনা সফল করার দৃঢ়চিত্ততার প্রকাশ ঘটেছে। মমিনা খাতুনের সমান আয়তনের চরিত্র সুভদ্রা। প্রণয়াকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য সেও কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে এবং তার প্রণয়ে একনিষ্ঠতাও অসাধারণ। উভয় চরিত্র বিপরীত ধর্মবিশ্বাসের পুরুষের রূপে মুগ্ধ হয়ে নিজেরাই প্রণয়নিবেদনে সক্রিয়তা দেখিয়েছে। ময়মনসিংহের গীতিকার অন্য কোথাও নারী চরিত্রের দ্বারা উপযাচক হয়ে প্রণয়যাচ্ঞার উদাহরণ নেই, সেদিক থেকে এ দুটি চরিত্র অনন্য। মানসিংহ চরিত্রে যোদ্ধাসুলভ বীরত্ব যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি আকবর চরিত্রে রাজসুলভ দূরদর্শিতা ও ঔদার্যের প্রকাশও লক্ষণীয়। প্রতিহিংসাপরায়ণতার দিক থেকে কেদার রায় চরিত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গাথার চরিত্র অঙ্কনে রচয়িতার উল্লেখযোগ্য দক্ষতা কিংবা শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় নেই।

ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত হওয়ায় এর আখ্যানভাগ চমৎকারিত্ব হারিয়েছে। আখ্যানভাগে দুটি প্রণয়সম্পর্ক সফল হওয়ার ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হয়েছে। এছাড়া অধিকাংশ স্থান ব্যয় হয়েছে ইশা খাঁর উত্তরাধিকার নির্ণয়, দিল্লির বাদশাহ্-র বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহজাত যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং কেদার রায়ের প্রতিহিংসা চরিতার্থতা, এবং তজ্জাত যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনায়। এসব বর্ণনা

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত সাদামাটা, অলঙ্কারবিবর্জিত ও বিশেষত্বহীন । সখিনা খাতুন ও মুক্তার রূপ বর্ণনার অংশ দুটি অলঙ্কার ব্যবহারের দিক থেকে উজ্জ্বলতম অংশ, কিন্তু তা এতই সংক্ষিপ্ত যে সমগ্র আখ্যানভাগের অনুজ্জ্বলতায় জায়গামত্য থাকতে পারেনি । এই গাথার ঘটনাবিন্যাস কেন্দ্রীয় ঐক্যে সুগ্রথিত নয় । কেন্দ্রীয় সংকট হিসেবে যদি আমরা দেওয়ান ঈশা খাঁর স্বাধীন শাসক হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের সংগ্রামকে চিহ্নিত করি, তাহলে অনায়াসেই প্রত্যক্ষ করব যে, গাথার প্রথমাংশ ও শেষাংশ কেন্দ্রীয় সংকটের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতির ক্ষেত্রে অপরিহার্য তো নয়ই, সম্পূর্ণরূপে বাহুল্য । প্রথমাংশে দীর্ঘ অনুচ্ছেদব্যাপী ঈশা খাঁর পূর্বপুরুষদিগের পরিচয় এবং তার পিতামাতার প্রণয়সম্পর্কের ঘটনা বিবৃত করা হয়েছে, অন্যদিকে শেষাংশে বিবৃত হয়েছে ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর তারই একটি দুর্বৃত্তমূলক আচরণের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য কেদার রায় কর্তৃক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ, পিতৃহীন দুই পুত্রকে কারারুদ্ধ করা এবং ঈশা খাঁর বাহিনী কর্তৃক তাদের উদ্ধারের বিস্তৃত ঘটনা । ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করে এই গাথা রচনার মধ্যে যেমন শৈল্পিক উৎকর্ষের কোনো পরিচয় পাওয়া যায়না , তেমনি গাথা হিসেবেও এর ঘটনাবিন্যাস শিল্পসফল নয় ।

এই গাথার আখ্যানভাগ কেন্দ্রীয় ঐক্যে সুসমন্বিত না হওয়ায়, গাথা হিসেবে এর ঘটনাবিন্যাসের সার্থকতা না ঘটায় এর রসনিষ্পত্তিও বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত । সেকারণে আলোচনাযোগ্য নয় ।

ফিরোজ খাঁ দেওয়ান

'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান'[৬৭] গাথার নায়ক-নায়িকা — উভয় চরিত্র পারস্পরিক প্রণয়াকাঙ্খায়, তা চরিতার্থতায়, প্রণয়ে একনিষ্ঠতায় উদাহরণীয় বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে । গাথার নায়ক ফিরোজ খাঁ দেওয়ান এর কেন্দ্রীয় চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও নায়িকা সখিনা পতিভক্তি ও বীর্যবত্তায় তাকে অতিক্রম করে গেছে । ফিরোজ খাঁ দেওয়ান শাসক হিসেবে যত-না সফল কিংবা দৃঢ়চিত্ত তার চেয়ে অধিক যত্নবান প্রণয়াকাঙ্খা চরিতার্থকল্পে । কাহিনীর শুরুতে দিল্লির শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠার ব্যাপারে তার মুখ থেকে অঙ্গীকার উচ্চারিত হলেও সখিনার প্রতিকৃতি দর্শনের পর তার মনে এমন প্রণয়বাসনা জাগ্রত হয় যে সহজেই সে সেই প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয় । তবে প্রণয়াকাঙ্খা চরিতার্থতার জন্যে সে যে একনিষ্ঠতা, সক্রিয়তা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছে, তা-ই তার চরিত্রকে মহত্তর বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করেছে । শাসকসুলভ শৌর্য-বীর্য, রণনৈপুণ্য এবং সাহসিকতার ক্ষেত্রে তার দুর্বলতার প্রকাশ লক্ষণীয় । সখিনাকে উদ্ধারের জন্য, সখিনার পিতা উমর খাঁর অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রথমে সে যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে, তাতে তার জয় হয়েছে অনায়াসে । কিন্তু দিল্লির সৈন্যসহ উমর খাঁ যখন তার বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত হেনেছে তখন সে তার প্রত্যুত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে বন্দী হয়েছে । যুদ্ধে জয়-পরাজয় চারিত্রিক মহত্ত্ব কিংবা ত্রুটির পরিচয় নয় । তার চরিত্রে ত্রুটির প্রকাশ ঘটেছে অন্যত্র । বন্দী অবস্থায় শত্রুর সঙ্গে আপস-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে সে কেবল তার শাসকসুলভ অঙ্গীকারই ভঙ্গ করেনি, একটি হৃদয়ের কাছে প্রদত্ত তার হৃদয়ের প্রতিশ্রুতির প্রতিও হয়েছে বিশ্বাসঘাতক । প্রতিশ্রুতিভঙ্গের এই ভঙ্গুরচিত্ততাই গাথার ট্রাজিক পরিণতি সম্ভব করেছে এবং তার চরিত্রকে সখিনা থেকে করেছে হীন ।

Dhaka University Institutional Repository

সখিনা চরিত্রটি কেবল এই গাথারই উৎকৃষ্ট চরিত্র নয়, সমগ্র ময়মনসিংহের গীতিকায়ও তার মতো বীর্যবতী নারী দ্বিতীয়টির সন্ধান পাওয়া যাবে না। প্রথম দর্শনেই সে ফিরোজ খাঁ দেওয়ানের প্রতি অনুরাগ অনুভব করেছে, পরবর্তীকালে দেওয়ানের প্রণয়বাসনার কথা অবহিত হয়ে তার মধ্যেও প্রণয়াকাঙ্ক্ষার স্ফুরণ ঘটেছে। অপমানের প্রতিশোধগ্রহণকল্পে ফিরোজ খাঁ-র সৈন্যবাহিনী যখন তার পিতৃগৃহ আক্রমণ করেছে, তখনও যেমন সে পিতার পক্ষাবলম্বী না হয়ে হৃদয়ের প্রণয়াবেগের প্রতি আনুগত্য থেকে স্বীয় প্রণয়ীর সঙ্গে হয়েছে গৃহত্যাগী, তেমনি পিতা যখন তার স্বামীকে বন্দী করেছে তখনও নারী হয়ে পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ গমনে, পিতৃগৃহে অগ্নিসংযোগে সে সম্পূর্ণরূপে দ্বিধাহীন ও প্রণয়ে-একনিষ্ঠ। পতির বন্দীত্ব মোচনের জন্য যুদ্ধযাত্রা, তিনদিন অশ্বপৃষ্ঠে আসীন থেকে যুদ্ধচালনা, তা-ও পিতৃবাহিনীর বিরুদ্ধে, — এমন পতিভক্তি, বীর্যবত্তা ও সাহসিকতার উদাহরণ ময়মনসিংহের গীতিকার আর কোনো নারীচরিত্রে পরিলক্ষিত হয় না। স্বাধীন প্রণয়বাসনা ময়মনসিংহের গীতিকার নারী চরিত্রসমূহের অন্তরের মধ্যেই লক্ষ্য করা যাবে, কিন্তু সেই প্রণয়াকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার জন্য পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত হওয়ার ঘটনা একটিও ঘটেনি, 'কমলার বারমাসী' গাথায় কমলা পিতার অসম্মতিকে উপেক্ষা করে প্রণয়ীর গৃহে গমন করেছে, কিন্তু সরাসরি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার উদাহরণ এই গাথায়ই লক্ষণীয়। সখিনার বীর্যবত্তা ও সাহসিকতার সঙ্গে কোমলতার সুসমন্বয় ঘটে তার চরিত্রটিকে উচ্চ মহিমায় দীপ্ত করেছে। তার মনের কোমলতা এমনই যে দুঃখের আঘাতেও যেন তার মৃত্যু ঘটে। পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কঠোর হৃদয় যার, তার হৃদয়েই কোমলতা এমন যে স্বামীর চিরবিচ্ছেদলিপি পাঠ করে যুদ্ধসজ্জায় অশ্বপৃষ্ঠে আসীন অবস্থায়ই আঘাতের আকস্মিকতায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে সে।

> তালাক নামা পড়ে বিবি ঘোড়ার উপরে
> সাপেতে দংশিল যেমন শিবির যে শিরে।
> ঘোড়ার পিষ্ঠ হইতে বিবি ঢলিয়া পড়িল
> সিপাই লস্করে যত চৌদিকে ঘিরিল ॥ (পূ. গী. দ্বি. খ. দ্বি. স. পৃ ৪৭৫)

অথচ এই সখিনা চরিত্রটিই স্বামীর বন্দিত্বের সংবাদ শুনে যে-বীরত্বসূচক উক্তি করেছে, তা অপূর্ব :

> আমার স্বামী বন্দী করে শরীলের কত জোর
> সাজাও দেখি রণের ঘোড়া দেখি কতদূর ॥ (পৃ ৪৭২)
>
> কিংবা, আমার স্বামী বন্দী করে কেমন বুকের পাটা
> রঙ্গেতে বুঝিবাম তারে কেমন বাপের বেটা ॥ (পৃ ৪৭৩)

বাপুজীর নিষেধ অমান্য করে সে যুদ্ধে গিয়ে পুরুষ বেশে তিনদিন যুদ্ধ করে বাদশাহের বাহিনীর পরাজয় সূচিত করতে সক্ষম হয় :

> আড়াই দিন হইল রণ কেউ না জিতে হারে
> আগুন লাগাইল বিবি কেল্লাতাজপুর শহরে ॥
> বড় বড় ঘর দরজা পুইড়া হইল ছাই
> রণে হারে বাদশার ফৌজ সকলের সীমা নাই ॥ (পূ. গী. দ্বি. খ. দ্বি. স. পৃ ৪৭৪)

Dhaka University Institutional Repository

সখিনার পিতা উমর খাঁর চরিত্রটি শত্রুর প্রতি ঘৃণায় কঠোর হলেও তার চরিত্রে বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। শত্রুর প্রতি প্রত্যাঘাতের জন্য তাকে দিল্লির বাদশাহ-র কৃপাভিক্ষা করতে হয়। তবে শত্রুর প্রতি ঘৃণার চেয়ে তার কাছে বাৎসল্যের মূল্য অধিক। গাথার শেষ মুহূর্তে সখিনার মৃত্যুর পর যখন সে ফিরোজ খাঁর প্রতি সখিনার প্রণয়বাসনার কথা জানতে পারে, তখনই তার চরিত্রের এই মহৎ বৈশিষ্ট্যটির প্রকাশ ঘটে।

আগে যদি জানতাম মাগো হইব এমন
বাচ্যা দিতাম সাদি তোমার সুখের কারণ। (পূ.গী দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ৪৭৬)

শত্রুর প্রতি ঘৃণার চেয়ে সন্তানের জীবন অধিকতর মূল্যবান-এই উন্নততর বোধের অধিকারী উমর খাঁর বীরত্বহীনতা এক্ষেত্রে ম্লান হয়ে তার মহত্ত্বকেই পরিস্ফুট করে তুলেছে।

এই গাথার আখ্যানভাগে ঐতিহাসিক চরিত্রের সমাবেশ ঘটলেও এর গল্পগ্রন্থন সম্পূর্ণরূপে গাথাধর্মী। একটি কেন্দ্রীয় সংকটের সৃষ্টি, তাকে জটিলতর করা এবং পরিণতি প্রদানের ক্ষেত্রে ঘটনার বিন্যাস ঘটেছে ত্রুটিহীনভাবে। অপ্রয়োজনীয় ঘটনা পরিহার করে কেন্দ্রীয় সংকটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনাবলীর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে। গাথার সূচনাপর্বে ফিরোজ খাঁ দেওয়ান কর্তৃক চিরকুমার থাকা এবং দিল্লির বাদশাহকে খাজনা না দিয়ে তার সঙ্গে সংগ্রাম করে টিকে থাকার সংকল্প ব্যক্ত করা, অথচ পরবর্তী পরিচ্ছেদেই সখিনার প্রতিকৃতি দর্শনে মনে অনুরাগ সঞ্চার এবং সেজন্য প্রতিপালনের মহান ব্রত পরিত্যাগ করে সখিনা-সন্ধানে গমন গাথার কেন্দ্রীয় সংকটের সঙ্গে যুক্তি-পরম্পরায় সংশ্লিষ্ট। এক্ষেত্রে আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধিতা পরিলক্ষিত হলেও অন্তর্নিহিত ঐক্যের দিকটি দুর্লক্ষ্য নয়। দিল্লির বাদশাহ-র বিরুদ্ধে ফিরোজ খাঁর বিদ্রোহের বিষয়টি প্রথমে উল্লিখিত না হলে তার বিরুদ্ধে বাদশাহ-র ফৌজ প্রেরণের ঘটনাটি যে যুক্তিযুক্ত হত না — সহজেই তা অনুমেয়। তাছাড়া সখিনা কর্তৃক স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাত্রার ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য ইতঃপূর্বে সখিনা কর্তৃক পিতার রাজ্য আক্রমণকারী পিতৃশত্রুর সঙ্গে গৃহত্যাগী হওয়ার ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে। ঘটনাবিন্যাসে এরূপ নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

আখ্যানভাগের সুবদ্ধ গল্পগ্রন্থন ও ঘটনার সুনিপুণ ঐক্যের কারণে এই গাথার রসনিষ্পত্তিও হয়েছে সার্থকতর। সখিনার মৃত্যু তথা বিয়োগান্তক পরিণতি, যেজন্য দায়ী তার পিতা ও স্বামী তাদের উভয়ের তীব্র অনুশোচনার মধ্য দিয়ে গাথার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এই পরিণতি বহিরারোপিত নয়, সম্পূর্ণরূপে অনুরাগধর্মী আবেদনবাহী। সখিনার পিতা উমর খাঁ কর্তৃক কন্যার মতামত না জেনে শত্রুর প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা এবং পতি ফিরোজ খাঁ কর্তৃক ক্ষমাহীন বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণের ফলে সখিনার মৃত্যু ঘটেছে। গাথার আখ্যানভাগে ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে এমনভাবে যে এই মৃত্যু হয়ে উঠেছে অনিবার্য। উমর খাঁ ও ফিরোজ খাঁ — এই দুই চরিত্রের অন্তর্গত ত্রুটিই এই বিয়োগান্তক পরিণতি যেমন সংঘটিত করেছে, তেমনি ট্রাজিক বেদনাকে ধারণও করেছে এই দুই চরিত্রই। সখিনার মৃত্যুর পর তাদের তীব্র অনুশোচনাবোধের মধ্যে এই বেদনার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আশ্যা দেখে সোনার চাঁদ কেমনে লুঠায়
তারে দেখ্যা উমর খাঁ করে হায় হায় ।। (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ৪৭৫)

কিংবা, উমর খাঁর নয়নেতে নদী নালা ভাসে
আসমান হইতে যেমুন্ চান্দ যেমন খসে ।। (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ৪৭৬)

ফিরোজ খাঁর অনুশোচনা আরও তীব্র ঃ

ফিরোজ খাঁ দেওয়ান সনে কন্যা গেলো লইয়া
আমারে ছাড়িয়া গেলে কোন দোষ পাইয়া ।
... ...
দেওয়ানগিতে কাজ নাই ফকীর হইব
তোমার গান গাইয়া আমি ভিক্ষা মাগ্যা খাইব ।। (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ৪৭৬)

সার্থক ট্রাজিক রস সৃষ্টিতে এই গাথা রচয়িতা অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ।

মাঞ্জুর মা

'মাঞ্জুর মা'[৬৮] গাথার কেন্দ্রীয় চরিত্র মনির ওঝার ওঝা-জীবনের অপূর্ব সাফল্যের বর্ণনার মাধ্যমে যেমন এই গাথার সূচনা তেমনি নিঃসঙ্গ শূন্যতাময় বৃদ্ধ জীবনে নদীজলে আত্মবিসর্জনের ট্রাজিক পরিণতির মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি । মনির ওঝার জীবন স্বাভাবিকভাবে বিকশিত নয় । ওঝা-জীবনে তার সাফল্য চূড়া-স্পর্শী হলেও সংসার-ধর্ম পালন থেকে বিরত মনির ওঝার নিঃসঙ্গ জীবনের বাস সমাজের বাইরে নির্জন নদীতীরে । নারী জাতির প্রতি অপরিসীম ঘৃণার কারণে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়নি । নারীদেরকে সে 'নষ্টা', 'অবিশ্বাসী' বলে জেনেছে । সফল ওঝা হয়েও কারো কাছ থেকে পারিশ্রমিক না নিয়ে এক আদর্শ জীবনের উদাহরণ সৃষ্টি করেছে মনির ওঝা । কিন্তু তার সফলতার চূড়ায় এসে দেখা দিল ব্যর্থতা এবং সেই ব্যর্থতা থেকে শুরু হল তার জীবনের পদস্খলন এবং পরিণামে মৃত্যু । মনির ওঝা সর্প-দংশিত সকল লোককে যে-কোন অবস্থায় ভাল করতে সক্ষম হলেও আমানদি নামক এক ব্যক্তিকে বাঁচাতে অক্ষম হয় । আমানদির অক্ষমতার এই যন্ত্রণা নিয়ে পিতৃমাতৃহীন শিশুকন্যার দুঃখে কাতর হয় মনির । সঙ্গে করে তাকে নিয়ে এসে আদর যত্নে লালন করে । শিশু কন্যা ক্রমে শৈশবাবস্থা থেকে কৈশোর এবং কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পন করে । আজীবন যে-মনির নারী জাতিকে 'অবিশ্বাসী', 'নষ্টা' বলে ঘৃণা করেছে, তারই ঘরে তারই স্নেহধন্য হয়ে বিকশিত হচ্ছে সুন্দরী যুবতী । মাঞ্জুর মার আদর যত্নে আজীবন নারী সোহাগ-বঞ্চিত বৃদ্ধ মনির ওঝার জীবন নতুনভাবে স্পন্দিত হয় । মাঞ্জুর মা-র প্রতি তার ইন্দ্রিয়জ লালসা নেই, আছে কল্যাণ-কামনা । বিবাহ-বয়সে মাঞ্জুর মা-কে অন্যের হাতে সমর্পণ করার ব্যাপারে মনির ওঝার অনীহার মূল কারণ ঃ প্রিয় আদরপুষ্ট বৃদ্ধ জীবনে শূন্যতার আশংকা, অন্যদিকে স্বার্থবিবর্জিত এক কল্যাণ-চিন্তা ।

তাহার মনে ছিল, "এই রমনী একান্ত নিষ্কলঙ্ক, ইহাকে কোন দুরাত্মার হস্তে আমি সমর্পণ করিব না । যাহাকে চোখে চোখে রাখিয়া সতর্কতার সহিত বন্ধনীর মধ্যে লালনপালন করিয়াছি,

Dhaka University Institutional Repository

সেই আদরপালিত অনাঘ্রাত কুসুমটিকে তাহার ক্রূর হস্তে প্রদান করিল।" এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া সে অবশেষে স্থির করিল যে সে নিজেই ইহাকে বিবাহ করিবে। তাহার এই সঙ্কল্পের মধ্যে কোন ইন্দ্রিয়জনিত লালসা ছিল না। সে বালিকার একান্ত হিত কামনার দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিল। তাহার স্বার্থের মধ্যে এইটুকুমাত্র ছিল, বার্দ্ধক্যে মানুষের একটু সেবাশুশ্রূষা পাইবার স্বাভাবিক কামনা থাকে, তাহার হাত সে এড়াইতে পারে নাই।[৬৯]

কিন্তু তার এই স্বার্থচিন্তা ও বাস্তববিমুখ হিতকামনার ফলে সে যে একটি জীবনকে ধ্বংস করতে উদ্যত — সেই সচেতনতা তার ছিল না। তার বৃদ্ধজীবন যে একটি তরুণীর সাংসারিক বাসনাকে চরিতার্থ করতে অক্ষম, সেই উপলব্ধি-বোধ থেকেও ছিল সে বঞ্চিত। তার এই অজ্ঞানতাই পরবর্তী বিপর্যয়ের কারণ। মাল্লুর মা-র মনে আবাল্য সাথী হালেনের সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার বাসনাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু পালক-অভিভাবক যখন তাতে বাধ সাধল, তখন তার অচরিতার্থতার বেদনা পাঠকহৃদয়ে সহানুভূতির উদ্রেক করে। কিন্তু পালক-জনের প্রতি বিদ্রোহ অকৃতজ্ঞতার সমান — এই বোধ থেকে সে প্রাথমিকভাবে নিরস্ত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে বৃদ্ধ মনিরের অবর্তমানে যখন হালেনের সঙ্গে একত্র-বাসের সুযোগ আসে, তখন তার যৌবন-ধর্ম সতর্ক হয়ে ওঠে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দুজনে পলায়নপর হয়। প্রত্যাবর্তনের পর শূন্য গৃহ দর্শনে বৃদ্ধ মনিরের মনে যে অপরিসীম শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তার প্রতি পাঠকহৃদয় সমব্যথী। কিন্তু সেজন্য মাল্লুর মা-র প্রতি কোনোরূপ ঘৃণা বা ক্ষোভ কারো মনে উদ্রেক করে না। এই গাথা রচয়িতার সার্থকতা এখানেই যে বৃদ্ধ মনির ও মাল্লুর মা উভয়ের কর্মসাধনকে তিনি পাঠকমনে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছেন। যে-মনির নারীজাতির প্রতি অবিশ্বাসের কারণে সংসার-ধর্ম পালন থেকে বিরত থেকেছে, মাল্লুর মা-র গৃহত্যাগের পরও সে তার প্রতি অবিশ্বাসী নয়। মাল্লুর মা-র প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও তার হিতকামনায় বৃদ্ধ মনিরের মনের যে-আচ্ছন্নতা তা মহত্ত্বের লক্ষণাক্রান্ত। মাল্লুর মা-র অবর্তমানে মনিরের মনে যে-অসীম শূন্যতার সৃষ্টি হয়, নদীজলে আত্ম-বিসর্জনের মধ্য দিয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই গাথায় মাল্লুর মা চরিত্র ততখানি বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। বৃদ্ধ মনিরের প্রতি তার সেবা-যত্ন, গৃহমুখী সংসার কর্মে নিষ্ঠা, হালেনের পরিবর্তে বৃদ্ধ ওঝার সঙ্গে পরিণয়ের ফলে অতৃপ্ত যৌবনের হাহাকার এবং অবশেষে হালেনের সঙ্গে পলায়নের একটি সাহসী সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়েই এই চরিত্রের বিকাশ সম্পন্ন হয়েছে। বৃদ্ধ মনিরের আত্মবিসর্জনের ঘটনা তাকে আন্দোলিত করেছে কিনা — সে তথ্য এ-গাথায় নেই। তবে যতটুকু তথ্য আমরা তার সম্পর্কে পাই তাতে তাকে অকৃতজ্ঞ বা বিশ্বাসঘাতিনী বলা যুক্তিযুক্ত নয়। স্বাভাবিক যৌবন-ধর্মে সে তাড়িত হয়েছে। প্রণয়াস্পদকে লাভ করার জন্য তার সাহসী সিদ্ধান্ত বীরত্বব্যঞ্জক। পালক-জনের প্রতি কর্তব্যেও তার অবহেলা নেই। এমনকি বৃদ্ধ ওঝা কর্তৃক পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার ঘটনায় সে কৃতজ্ঞতাবশতঃই হয়ত বিদ্রোহী হয়নি, অতৃপ্তির বেদনায় সে দগ্ধ হয়েছে, কিন্তু কৃতজ্ঞতার কারণেই সরব প্রতিবাদে মুখর হয়নি। মুক্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত এই নারী চরিত্রটি সাহসিকতায়, কৃতজ্ঞতায়, নারীধর্ম পালনে সবদিক থেকে মহত্ত্বের অধিকারিণী। বরং তুলনামূলকভাবে তার প্রণয়ী হালেন চরিত্রটি দুর্বল। অচরিতার্থতার সামান্য আঘাতে সে নদীজলে যে আত্মবিসর্জনে উদ্যত হয় — তার মধ্যেই এই দুর্বলতা, দৃঢ়ত্ব ও বীরত্বের অভাব সুপরিস্ফুট।

Dhaka University Institutional Repository

এই গাথার কাহিনী সরলরৈখিক এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র মনির ওমার জীবনের ট্রাজেডিকে ঘিরে আবর্তিত। আখ্যানভাগ সুগ্রথিত, কেন্দ্রশক্তি-নিয়ন্ত্রিত, বাহুল্য ঘটনার দ্বারা দুষ্ট নয়। লেখকের পরিমিতিবোধ একটিমাত্র স্থানে ক্ষুণ্ণ হলেও পূর্বাপর প্রশংসনীয় রূপে বিদ্যমান। সকল চরিত্রের প্রতি তার সমান পক্ষপাত। কেবলমাত্র মান্নুর মা-র সঙ্গে বৃদ্ধ মনিরের পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় ঘটনায় রচয়িতার মুখ থেকে সংযম-শিথিল প্রতিবাদী দুই পংক্তি উচ্চারণ ছাড়া অন্যত্র দ্রষ্টানুগত নিরাসক্তি বিদ্যমান:

লাল পরী নিলন যেমন রে
আরে ভালা পিশাচের সনে।
পউদের কলি উজল করনরে
আরে ভালা গোবরের ভুবনে ॥ (পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি.স.পৃ ২১)

এই গাথার পরিণতি ট্রাজিক। বৃদ্ধ মনিরের নিঃসঙ্গ-শূন্য জীবনের পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়েই গাথার ট্রাজেডি সংঘটিত হয়েছে। এই ট্রাজেডির চরিত্র বহিরাশ্রিত নয়, অন্তঃস্পর্শী। বৃদ্ধ মনিরের ভুল সিদ্ধান্তই ট্রাজেডির কারণ হয়েছে। কিন্তু সেই ভুল সচেতনতাপ্রসূত নয়। এজন্য পাঠকের সংবেদনশীল মন মনিরের প্রতি সহানুভূতিশীল। তার সমগ্র জীবন প্যাটার্ণেই এই ট্রাজেডির অন্তর্গত কারণ লুক্কায়িত রয়েছে। নারী-জীবন-বিমুখ নিঃসঙ্গ নির্জন জীবনে বৃদ্ধাবস্থায় নারীর আগমন স্বাভাবিক পরিণতি সৃষ্টি করতে পারে না। গাথার ট্রাজিক পরিণতির মূলে মনির ওমার সমগ্র জীবন প্যাটার্ণই দায়ী। যে-ভুলের জন্য অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থায় তরুণীর পাণিগ্রহণের জন্য এই ট্রাজেডি সংঘটিত হল তার পেছনেও সক্রিয় এই জীবন-প্যাটার্ণ। স্বাভাবিক উপযুক্ত বয়সে বিবাহিত হলে বৃদ্ধ বয়সের এই মতিভ্রম হয়ত এড়ানো যেত। এই গাথার ট্রাজিক রসের আবেদন তাই চরিত্রকেন্দ্রিক, অন্তর্ময় ও তাৎপর্যমন্ডিত।

আয়না বিবি

অন্যান্য গাথায় অধিকাংশ পুরুষ চরিত্র যেমন নিষ্ক্রিয় 'আয়না বিবি'তে[৭০] তা নয়। উজ্জ্বল সদাগর সংসার ধর্ম পালনে যেমন সক্রিয়, তেমনি প্রণয়িনীকে জীবনসঙ্গিনী করার দৃঢ়চিত্ততায় তার চরিত্রের গতিময়তাও লক্ষণীয়। সে চাষাবাদ করে যেমন সংসারের দারিদ্র্য মোচনে উদ্যোগী, তেমনি আর্থিক অবস্থার আরও উন্নতিকল্পে বাণিজ্য যাত্রার দুর্গম পথ অতিক্রমণের কঠোর ও ঝুঁকিপূর্ণ জীবনসাধনায় ব্রতী। সে তার প্রণয়িনীকে উদ্ধারের জন্য ভিখারীবেশে নিরুদ্দেশ যাত্রায় যেমন নিঃশঙ্ক, তেমনি সফল উদ্ধারাভিযানের পর বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে সুখী দাম্পত্য জীবনেও সার্থক। সামাজিক দন্ডের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করেনি সত্য, কিন্তু তার চরিত্র অত্যন্ত নির্দ্বিধ। পরম ভালবাসার জনকে উদ্ধারের জন্য যে সীমাহীন কষ্ট-লাঞ্ছনা স্বীকার করেছে তাকে নির্বাসন দিতে, পুনর্বার পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সংসার জীবন অব্যাহত রাখতেও তার দ্বিধাহীন মন একরৈখিক, জটিলতা-উর্দ্ধ। স্ত্রীকে নির্বাসন দিয়ে পুনর্বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখী দাম্পত্য জীবনযাপনের মধ্যেও আয়না বিবির মৃত্যুসংবাদ তাকে দারুণভাবে বিচলিত, আলোড়িত, এমনকি উন্মত্তবৎ করে তোলে। এমনকি স্ত্রী ও সন্তান ত্যাগ করে হয়েছে সে নিরুদ্দেশগামী। উজ্জ্বল সদাগরের চারিত্রিক

Dhaka University Institutional Repository

দৃঢ়তা, কর্তব্যপালনে দৃঢ়চিত্ততা, পবিত্রতা প্রভৃতি প্রশংসনীয় উপাদান। তার অনুরাগ এমন প্রবল যে সংস্কার-ধর্ম-প্রতিপত্তি সবকিছুকে তা তুচ্ছজ্ঞান করতে সক্ষম। কিন্তু এই অনুরাগের প্রাবল্যও সামাজিক দন্ডের কাছে একসময় পরাভূত হয়। যদিও তাতে তার চারিত্রিক মহত্ত্ব ম্লান হয় না। শেষ-মেষে আয়না বিবির মৃত্যুসংবাদে তার গৃহত্যাগের ঘটনায় তার প্রতি পাঠকের পূর্ব-অভিযোগ খণ্ডিত হয়ে যায়। উজ্জ্বল সদাগরের চরিত্রে বিষয়ভাবনা বা বৈষয়িক সচেতনতার পাশাপাশি অনুরাগ-ভালোবাসা এবং সেজন্য প্রতিপত্তি ত্যাগের সুমহান আদর্শের সমন্বয় ঘটেছে।

উজ্জ্বল সদাগরের চরিত্রের দুর্বলতার দিকটি আয়না বিবি চরিত্রে অনুপস্থিত। প্রথম দর্শনে উজ্জ্বল সদাগরের প্রতি আয়না বিবি-র মনে যে অনুরাগের সৃষ্টি হয়েছে, আমৃত্যু তা ক্রিয়াশীল। পিতার মৃত্যুর পর সে নিরুপায় হয়ে দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের আশ্রয়ে সমর্পিত হলেও উজ্জ্বল সদাগরের সঙ্গে গৃহত্যাগে সে দ্বিধাহীন। বিবাহিত জীবনকে সর্বাংশে সুখময় ও সার্থক করে তোলার ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা আন্তরিক ও প্রশংসনীয়। প্রণয়িনী ও স্ত্রী উভয় চরিত্রের ভূমিকায় তার সমান দক্ষতা ও আন্তরিকতা লক্ষ্য করা যায়। উজ্জ্বল সদাগরের বিদেশ যাত্রায় তার বিরহতাপিত স্ত্রী-মন যেমন বেদনা-বিধুর তেমনি স্বামীর মৃত্যুসংবাদেও সে সংসারচ্যুত, উন্মাদ-প্রায়। মহুয়া চরিত্রের সঙ্গে আয়না বিবির যথেষ্ট সাযুজ্য বিদ্যমান। আয়নাবিবিও তার প্রবল আন্তরিকতা ও ভালবাসা দ্বারা স্বামীকে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচিয়ে তোলে। উভয়ে সানন্দে গৃহাভিমুখী হয়। কিন্তু পশ্চাদপদ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ তাদের সুখী দাম্পত্যজীবনে অন্তরায় সৃষ্টি করে। অসতীর আখ্যা লাভ করে নির্বাসনের দন্ড ভোগ করতে হয় আয়নাবিবিকে। স্বয়ং উজ্জ্বল সদাগরই এই দন্ড কার্যকর করে, তবু আয়না বিবির অনুরাগ, প্রণয়ীর প্রতি বিশ্বস্ততা এতই প্রবল যে স্বামী কর্তৃক নির্বাসন দন্ড লাভ করার পরও তার প্রতি কোনো অনুযোগ উচ্চারিত হয় না। বরং কুরুন্ডিয়া দলের সঙ্গে দীর্ঘ তিন বছর জলে দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করেও সে প্রণয়ীকামনায় মনকে সজীব রাখে। বহু অন্বেষণের পর সে স্বামীর সন্ধান পায়। কিন্তু স্বামী কর্তৃক পুনর্বিবাহ ও সন্তান লাভের চিত্র তার সজীব মনকে অতিকীর্ণ বেদনায় জর্জর করে তোলে। আত্মবিসর্জনে উদ্যোগী হয় আয়নাবিবি। পিতৃ-মাতৃহীনা দরিদ্র পরিবারের কন্যা আয়নাবিবির জীবনে সুখভোগ অত্যল্প ক্ষণিকের। তার চরিত্র পূর্বাপর অনুরাগেই উজ্জ্বল। তবে গৃহকর্মেও সে নিপুণা। প্রণয়িনী ও স্ত্রী-উভয় গুণের সুসমন্বয়ে আয়নাবিবির চরিত্র উজ্জ্বল। সংসার জীবনে স্বামী-শাশুড়ী ও ননদীর প্রতি যত্ন-আন্তরিকতায়-ভালোবাসায়ও সে গুণবতী, প্রশংসাধন্য। তিন বছর পরে গৃহ প্রত্যাবর্তনের পরেও অন্ধ শাশুড়ী তার প্রতি যে-ভালবাসা ব্যক্ত করে ,তাতেই এই পরিচয় সুপরিস্ফুট ঃ

আয়না যদি অইয়া থাক্ছলো কন্যা, কন্যা আলো নাই সে যাও ফিরিয়া।
ভিক্ষা মাগিয়া খাইবাম তোমারে না লইয়া রে ॥
আয়না যদি অইয়া থাক্ছলো কন্যা আরে আলা ঘরে ফিইরা আয়।
পান-পাক্কাইত হারবাম তোর না লাগিয়া রে ॥ (পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি.স.পৃ ২১৩)

আয়না-র অনুপস্থিতি শাশুড়ির অন্ধ-জীবনে মারাত্মক শূন্যতার সৃষ্টি করেছে, আয়নাকে পেলে সমাজকে পরিত্যাগ করতেও তিনি প্রস্তুত। কিন্তু স্বামীর পুনর্বিবাহই আয়নার মনকে করে তুলেছে বিরাগ। তার নিবেদিত মনে এই আঘাতই আত্মবিসর্জন ছাড়া তার সামনে অন্য কোনো পথ খোলা রাখেনি।

Dhaka University Institutional Repository

এই গাথায় পশ্চাদপদ সমাজের সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা 'মহুয়া' এবং 'কঙ্ক ও লীলা' গাথার মতো ক্রিয়াশীল । আলাদা কোনো ব্যক্তি-চরিত্র হিসেবে এদের সক্রিয়তা স্পষ্ট নয় । পশ্চাদপদ সমাজদন্ড একটি চরিত্র হিসেবেই সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ ।

'আয়না বিবি' গাথার আখ্যানভাগ বাহুল্যহীন, পরিণতিমুখী, একমৈথিক । দুটি চরিত্রের প্রেম-সম্বন্ধে-আনুরক্তিতায় উজ্জ্বল সদার সদাগরের বিধবা মা তার নাবালক পুত্রের কর্মক্ষমতায় উপযুক্ত হয়ে ওঠার জন্য অপেক্ষমান — এমন বর্ণনার মধ্য দিয়ে গাথা শুরু হয়েছে । কর্মক্ষম হয়ে উজ্জ্বল সদাগর চাষাবাদের মাধ্যমে সংসারের দারিদ্র ঘুচিয়েছে, আরও প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষায় সে হয়েছে দুর্গম পথে বাণিজ্যযাত্রী । বাণিজ্য যাত্রাপথে ঘটনাচক্রে পিতৃবন্ধুর সাথে পরিচয় এবং তার সুন্দরী কন্যার প্রতি অনুরাগের ঘটনা থেকে উজ্জ্বল সদাগরের জীবনে যেমন, তেমনি এই গাথারও কাহিনী নতুন মাত্রা অর্জন করেছে । প্রত্যাবর্তনের পথে তার অনুরাগ-আপ্লুত মন ধাবিত হয়েছে আয়নাবিবির গৃহাভিমুখে । কিন্তু সেখানে ইতঃপূর্বে সংঘটিত হয়েছে বিপর্যয় । পিতৃবন্ধুর মৃত্যুর পর আয়না বিবির অবস্থান কোথায় -- সে সম্পর্কে প্রতিবেশীগণ অজ্ঞ । কিন্তু উজ্জ্বল সদাগর সম্পত্তি লাভের জন্য যেমন বাণিজ্য ব্যপদেশে দুর্গম পথযাত্রায় অক্লান্ত, তেমনি অনুরাগের প্রবলতায় প্রণয়িনীকে উদ্ধার-মানসে নিরুদ্দেশ যাত্রায়ও সমান আন্তরিক । সফল হয়েছে তার ফকির বেশে আয়নাবিবিকে উদ্ধারের প্রয়াস । পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সুখী দাম্পত্য জীবন উজ্জ্বল সদাগরের প্রতিপত্তিমুখী মানসিকতার কারণেই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি । পুনরায় সে বাণিজ্য যাত্রায় হয়েছে উদ্যোগী । প্রথম বাণিজ্য যাত্রার উল্টো ফল ফলেছে দ্বিতীয় যাত্রায় । সংসার জীবনে ঘটেছে বিপর্যয় । দ্বিতীয়বারের বাণিজ্য যাত্রায় নৌকাডুবি হয়েছে । সহযাত্রীরা এসে উজ্জ্বল সদাগরের মৃত্যুসংবাদ দিলে আয়নাবিবির মন হয়েছে বিচলিত । ফলে গোপনে সে স্বামী-সন্ধানে হয়েছে গৃহত্যাগী । তার বাসনা সফল হলেও, **সুখী দাম্পত্য জীবনের আশায়** জীবিত স্বামীকে নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনে সক্ষম হলেও সমাজের অধিপতিগণ তাতে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে । আয়না বিবিকে অসতী হিসাবে আখ্যায়িত করে নির্বাসন দন্ড দিয়েছে তার । নির্বাসন দিয়ে উজ্জ্বল পুনর্বিবাহ করে সংসার ধর্মে ব্রতী হয়েছে । আয়না বিবি নির্বাসন জীবনে বেদে-বেদিয়া দলের সহচরী হিসাবে স্বামীকে লাভ করার প্রত্যাশা নিয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে শেষ পর্যন্ত স্বামী-গৃহে প্রত্যাবর্তনে সক্ষম হলেও তার আশা পূরণ হয়নি । আশাহত, অনুরাগে আন্তরিক ও বিশ্বাসী শরে বিদ্ধ হরিণীর ন্যায় শেষ পর্যন্ত জীবন বিসর্জন দিয়েছে আয়নাবিবি ।

আখ্যানভাগ জটিলতামুক্ত । প্রধান দুই চরিত্রের বিকাশসাধন, গাথায় বিধৃত জীবন-দর্শনের পরিস্ফুটন তথা দুই নর-নারীর আত্যন্তিক অনুরাগ এবং সেই অনুরাগের পথে প্রকৃতি ও সামাজিক কুসংস্কার-পশ্চাদপদতার অন্তরায় প্রভৃতি মূর্ত করার জন্য কাহিনী প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যথার্থভাবে আবর্তিত হয়েছে । অপ্রয়োজনীয় বা বাহুল্য কোনো ঘটনার আগমন আখ্যানভাগকে অযথা ভারাক্রান্ত করে তোলেনি । আখ্যানভাগে প্রয়োজনীয় গতিময়তারও কোনো অভাব দুর্লক্ষ্য ।

আয়না বিবি গাথার পরিসমাপ্তি ট্রাজিক । তবে এই পরিণতির কারণ চরিত্রসমূহের অন্তর্গত ক্রিয়ায় পরিলক্ষিত নয় । পরিণতির এই চরিত্র একান্তভাবেই বহিরারোপিত । সমাজের শাসন দন্ডই গাথার ট্রাজিক

Dhaka University Institutional Repository

ট্রাজিক পরিণতি সৃষ্টি করেছে। সমাজ যদি আয়না বিবিকে অসতী আখ্যায়িত করে নির্বাসন দন্ড না দিত, তাহলে আয়না বিবির জীবনে অকাল মৃত্যু বা অশেষ দুঃখ-ক্লেশের ঘটনা সংঘটিত হত না। গাথায় আয়নাবিবিই সকল দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে শোকগর্বন্ধু আত্ম-বিসর্জন করলেও ট্রাজিক বেদনাকে ধারণ করেছে উজ্জল সদাগর। আয়না বিবির মৃত্যু-সংবাদ তার সকল প্রত্যাশাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে তাকে সংসারচ্যুত করেছে।

যারে দেখে কইনা সাধু জিজ্ঞাসা সে করে রে।
ফকির হইয়া সাধু তলা দেশে দেশে ফিরে ।।
আয়নার তল্লাসে সাধু দাওয়ালেতে ঘুরে রে।
আয়নার তল্লাশে সাধু বনে বনে ঘুরে রে ।।

হায় তারা হইল ঝিকিমিকিরে তারা ফুল হইল বাসি।
জন্মো লাইগ্যা মায়ের পুত্র হইল বৈদেশীরে।
গেল সাধু মামুদ উজ্জ্যালরে ।। (পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি.স.পৃ ২১৫-১৬)

তবে শুধুমাত্র বহিরাঙ্গিক একটিকেই গাথার ট্রাজিক পরিণতির কারণ হিসেবে নির্দেশ করলে যথার্থ বিশ্লেষণের ফল পাওয়া যাবে না। সমাজ-অধিপতিদের চাপে মামুদ উজ্জ্যাল স্বীয় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেও অন্য স্ত্রী গ্রহণ তার জন্য অনিবার্য ছিলনা কিংবা সে নিজেও হতে পারত আয়না বিবির সহগামী। এবং তেমন কিছু ঘটলে আয়না বিবির বিয়োগান্তক জীবন-পরিণতি অপরিহার্য হয়ে উঠত না। তাই মামুদ উজ্জ্যাল চরিত্রের ভঙ্গুর বৈশিষ্ট্যকেও গাথার করুণ-পরিণতির জন্য দায়ী করা চলে। বহির্নির্দেশিত সামাজিক অনুরায়ের সঙ্গে চারিত্রের অন্তর্গত ত্রুটির সমন্বয়েই এই গাথার ট্রাজিক পরিণতি অনিবার্য হয়ে উঠেছে। ফলে এর আবেদনও তাৎপর্যহীন নয়।

শ্যাম রায়

'শ্যাম রায়'[৭১] গাথার কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্যাম রায় আদ্যন্ত সক্রিয়। প্রণয়নিবেদনে, ডোম্নী নারীর মনে প্রণয়াসক্তি সৃষ্টিতে, প্রণয়াকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতাকল্পে দেশত্যাগী হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং ডোম্নী নারীকে অপহরণ করার জন্য সাবের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আয়োজনে — সর্বত্রই তার সক্রিয়তা, সাহসিকতা, বীরত্ব, আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা লক্ষণীয়। মাতা-পিতা-ভগ্নী, পরিবার-আত্মীয়স্বজন-সমাজ সবকিছুর উর্ধ্বে যে প্রণয়াকাঙ্ক্ষার স্থান — একথা সে জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছে।

কাঞ্চনমালা ও মহুয়ার মতই ডোম্নী নারীর মনে আশংকা ছিল যে, ধনীর ভালবাসা হয়ত ক্ষণিকের, আবার তা নীচকুলোদ্ভবা ডোম্নী নারীর প্রতি। কিন্তু শ্যাম রায় তার সমগ্র জীবনাচরণ দিয়ে এমনকি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে-আশংকা মিথ্যা প্রমাণ করেছে। তার বিশ্বস্ততা, বিশেষত অনুরাগের প্রতি বিশ্বস্ততা তুলনাহীন। ডোম্নী নারী তাকে তার অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়ার পরও শ্যাম রায় তার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা থেকে একটুকু বিচ্যুত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

আমি ত তোমের নারীরে বন্ধুরে হাত দিও না গায়
ছোটর সঙ্গে বড়র পিরীত বড়র জাতি যায় রে বন্ধু ।
... ...
রাজার ছাওয়াল তুমি রে বন্ধু আমি তোমের নারী
সমুদ্র সায়র থুইয়া বন্ধু ঘুনায় বাইও তরী রে বন্ধু ।
(পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি.স.পৃ ২৭৭-৭৮)

ময়মনসিংহের গীতিকার অন্য কোনো গাথায় পুরুষ চরিত্রের এমন সার্বিক সক্রিয়তা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয় । শ্যাম রায় চরিত্রের আরও বড় বৈশিষ্ট্য হল : অন্য গাথাগুলোতে সর্বত্রই নারী চরিত্রের উজ্জ্বলতা অপেক্ষা পুরুষ চরিত্র ম্লান । এমনকি 'আয়না বিবি' গাথায় মামুদ উজ্জ্যাল চরিত্রের সক্রিয়তা উল্লেখযোগ্য হলেও আয়না বিবি-র তুলনায় তার চরিত্র উজ্জ্বল নয় । কিন্তু শ্যাম রায় চরিত্র সক্রিয়তায়, সাহসিকতায়, বীরত্বে, বুদ্ধিমত্তায়, বিশ্বস্ততায়, আন্তরিকতায় অনুরাগের দীপ্ততায়, আত্মত্যাগে — সবদিক থেকেই ডোম্নী নারীকে অতিক্রম করে গেছে ।

এই একটি মাত্র গাথায় নায়িকা চরিত্র নায়ক চরিত্র অপেক্ষা অনুজ্জ্বল । ডোম্নী নারীর প্রণয়াসক্তিতে বিপত্তি আছে, কিন্তু তা শ্যামরায়ের সমতুল্য নয় । সেটা তার মুখ দিয়েই রচয়িতা উচ্চারণ করিয়েছেন : 'ছোটর সঙ্গে বড়র পীরিত বড়র জাতি যায়' — এটা যথার্থ উক্তি । ডোম্নী বিবাহিতা, স্বামী ও শাশুড়ীকে গোপন করে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তাকে শ্যামরায়ের প্রণয়নিবেদনে সাড়া দিতে হয়েছে । তবে এটুকু বুদ্ধিমত্তা সকল নারীরই স্বভাবধর্ম । স্বামীর অবর্তমানে শাশুড়ীকে ঘুমিয়ে প্রেমাস্পদকে ঘরে এনে রাত্রিযাপনে ডোম্নী নারীর সাহসিকতার পরিচয় সুস্পষ্ট । তবে এটা কেবল ডোম্নী নারী হওয়ার ফলেই হয়ত সম্ভব হয়েছে । স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামীগৃহেই প্রণয়ীর সঙ্গে রাত্রিযাপন ডোম-গৃহ ছাড়া অন্যত্র চিত্রিত হতে দেখা যায় না । পাবর রাজার ঘরেও সে বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে । বুদ্ধি দিয়ে পাবর রাজাকে বশ করে সে প্রণয়ীর কন্ঠ থেকে মুক্ত করিয়েছে এবং তার প্রতি পাবর রাজার যৌনলালসা চরিতার্থ করার উদ্যোগকে নিরাবৃত করেছে, অন্যদিকে সাহসিকতার সঙ্গে পলায়নে হয়েছে উদ্যত । নীচ কুলে জন্ম বলেই এবং স্বীয় অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতার ফলেই শ্যামরায়কে প্রণয়বাসনা থেকে নিবৃত্ত করতে সে প্রয়াসী হয় । এর কারণ, তার মধ্যে স্বাভাবিক আশংকা ছিল যে ধনীর বা উচ্চ শ্রেণীর প্রণয় হয়ত ক্ষণিকের রূপজ মোহেই সীমাবদ্ধ । কিন্তু শ্যাম রায়ের আচরণে সে আশংকা দূরীভূত হলে পরবর্তীকালে দেশত্যাগ থেকে শ্যাম রায়কে নিবৃত্ত করার ক্ষেত্রে তার প্রণয়ীর প্রতি কল্যাণকামনাই প্রধান হয়ে ওঠে । ভালবাসায়, অনুরাগে, কল্যাণকামনায় ডোম্নী নারী তার নীচু কুলের অমর্যাদাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে এখানে সক্ষম হয়েছে । ডোম্নী নারী হয়েও চারিত্রিক মহত্ত্বে, মর্যাদায় সে গৌরবদীপ্ত । তার মধ্যে কোনো নীচতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না । এখানের সামাজিক অবস্থান-সম্পন্না নারীর মধ্যে সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, লোভ-লালসা স্বাভাবিকভাবে লক্ষণীয়, কিন্তু এই নারী ভালবাসায় এমনই মহৎ যে উল্লিখিত ধরনের কোনো নীচু বৈশিষ্ট্যই তার চরিত্রকে কলুষিত করতে পারেনি । পাবর রাজার কন্ঠকে সে স্বাভাবিকভাবে মাল্যভূষিত করতে পারত কিংবা সুন্দরী নারী হিসাবে যৌবন সম্ভোগের স্বাভাবিক স্পৃহায় সে নিরত প্রণয়ীর সহগামী না-ও হতে পারত । কিন্তু এর কোনোটাই সে করেনি । প্রকৃতই নিষ্কলুষ, সকল সংকীর্ণতা-উর্ধ্ব, মহৎ চরিত্রের মর্যাদা অর্জনে ধন্য হয়েছে ডোম্নী নারী । সে তার স্বামীর অবর্তমানে যে প্রণয়াস্পদের সঙ্গে রাত্রিযাপন করেছে, তার মধ্যেও

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাসঘাতকতার পরিবর্তে প্রণয়ধর্মে বিশ্বস্ততার পরিচয়ই পরিস্ফুট হয়েছে ।

এই গাথার আখ্যানভাগে পারম্পর্যহীনতার ত্রুটি লক্ষণীয় । তবে কল্পনা-নির্ভর হলে এই পারম্পর্য-হীনতাকে পূর্ণ করে কাহিনীর একটি সম্পূর্ণ কাঠামো নির্মাণ সম্ভব । এই গাথায় ঘটনার পরিবর্তে বর্ণনার আধিক্য রয়েছে । নাট্যিক পরিচর্যাও উন্নত ।

> এই গাথার আখ্যানভাগের ত্রুটি সংকলয়িতার কাছেও স্পষ্ট ঃ
> ... পালাটি যে সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হইয়াছে একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না । মাঝে মাঝে ছাড় পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় । খুব অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে পালাটির বিষয় ও পরিণতি চক্ষে ধরা পড়ে । কিন্তু আমার মনে হয় যে হয়ত কবিহৃদয়ে ঘটনাগুলি এতই স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল যে তিনি শুধু কবিত্বময় অংশগুলি রাখিয়া অপেক্ষাকৃত নীরস ঘটনার অংশ বাদ দিয়া গিয়াছেন । 'মহুয়া' ও 'ধোপার পাটে' যে গূঢ় নাট্যকৌশল লক্ষিত হয়, এই পালাটিতেও কতক পরিমাণে তাহাই বিদ্যমান । কবি বাছিয়া বাছিয়া এবং অনেকটা বাদ দিয়া কাহিনীটি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন । প্রথমবার পড়িয়া মনে হইয়াছিল ঘটনাগুলির পৌর্ব্বাপর্য ঠিক রক্ষিত হয় নাই । এবং অনেক স্থান অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই রহিয়াছে । কিন্তু দ্বিতীয়বার পড়িয়া দেখা গেল যে, কবি তাঁহার পাঠককে সমস্যা পূরণের জন্য যথেষ্ট অবসর দিয়াছেন । একটু কল্পনাশীল হইলেই পাঠক তাঁহার বুদ্ধির সাহায্যে রিপূরণ করিয়া পালাটিকে ঠিক দাঁড় করাইতে পারেন ।[৭২]

'শ্যাম রায়' গাথার আখ্যানভাগে স্পষ্টতঃই দুটি ভাগ । প্রথম ভাগে ডোম্নী নারীর প্রতি শ্যাম রায়ের প্রণয় নিবেদন, বিবাহিতা ডোম্নী নারীর মনে প্রণয়াসক্তি জন্ম নিলেও উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে নীচ শ্রেণীর এ-জাতীয় সম্পর্কের অসম্ভাব্যতা সম্ভাবনাহেতু শ্যামরায়কে নিবৃত্ত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় । কিন্তু শ্যাম রায়ের সুগভীর একনিষ্ঠ প্রণয়বাসনায় শেষ পর্যন্ত ডোম্নী নারীকে সাড়া দিতেই হয়েছে । এমনকি স্বামীর অবর্তমানে প্রণয়াস্পদকে নিয়ে নিজগৃহে শাশুড়ির চোখকে ফাঁকি দিয়ে রাত্রি যাপন করার দুঃসাহসী অভিযানেও ব্রতী হয়েছে ডোম্নী নারী । শ্যামরায়ের মাতা-ভগ্নী এধরনের সম্পর্কের অস্থায়িত্বের আশংকাহেতু তাকে নিবৃত্ত করার প্রয়াস পেয়েছে, শ্যামরায়ের পিতার মনে জন্ম নিয়েছে ক্রোধের বহ্নি এবং সেই আগুনে জেলের সংসার ছিন্নভিন্ন হয়েছে । অন্যদিকে ডোম্নী নারীকে নিয়ে শ্যাম রায় হয়েছে নিরুদ্দেশযাত্রী ।

দ্বিতীয় পর্বে শ্যামরায় তার প্রণয়িনীকে নিয়ে বর্বর গাবর গোষ্ঠীর দেশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে । জমিদার-নন্দন স্বীয় শ্রমের উপার্জন দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে । শ্রমে অনভ্যস্ত শ্যামরায়ের জীবন শারীরিক দিক থেকে কষ্টকর হলেও এ-সময়ে প্রণয়িনীসহ তার জীবন অত্যন্ত সুখকর । এই সুখের অন্তরায় হয়েছে গাবর রাজা । গোপন সংবাদ পেয়ে সুন্দরী ডোম্নী নারীকে রূপলালসাবশত অপহরণ করেছে সে, শ্যাম রায়ের বিরুদ্ধে ঘোষিত হয়েছে মৃত্যুদন্ডের আদেশ । যদিও ডোম্নী নারীর বুদ্ধিমত্তায়

Dhaka University Institutional Repository

শ্যাম রায় মুক্তি পেয়েছে এবং নিজেও থেকে গেছে অক্ষত। কিন্তু দেশে ফিরে শ্যামরায় যে যুদ্ধ আয়োজন করেছে তাতে গাবর রাজপুত্রের পতন ঘটলেও সে নিজে বিষাক্ত তীরের আঘাতে হয়েছে নিহত। ডোম্নী নারীর প্রণয়ীর সঙ্গে সহমরণে উদ্যোগী হওয়ার মধ্য দিয়ে গাথার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

ঘটনার চেয়ে বর্ণনাপ্রধান এই গাথার কাহিনীর গতি সরলরৈখিক, পরিণতিমুখী, বাহুল্য দোষেদুষ্ট নয়। কাব্যময়তাই এর প্রধান ও প্রশংসনীয় উপাদান। আর-একটি গৌন উপাদান গাথার করুণ বিলাপাত্মক সুর। ভালবাসার উচ্চ মহিমায় উচ্চকিত দুই মহৎ চরিত্রের প্রণয়বাসনা কাব্যিক সৌকর্যে উজ্জ্বল। রচয়িতার উন্নত কাব্যবোধ, উপমা ও রূপক ব্যবহার, চরিত্রের মনোময় জগতের ভাবোপযোগী করে সার্থক অলঙ্কার ব্যবহার, পারিপার্শ্বিক সমাজ ও নিসর্গ থেকে উপমা ও চিত্রকল্প সংগ্রহে দক্ষতা প্রভৃতি এই গাথার আখ্যানভাগকে গীতময় ও শিল্পসুষমামণ্ডিত করে তুলেছে। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য:

(ক) ভূমিজ পুষ্পের ন্যায় ভূমিকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার কবিত্ব উৎপন্ন হইয়াছিল। বঙ্গদেশের পাড়াগাঁয়ের এমন ফুলটি নাই, এমন লতাপাতা নাই, যাহা তিনি প্রেমের চক্ষে না দেখিয়াছেন। তাহার অজস্র উপমা বাঙ্গালাদেশের শত শত খুঁটিনাটি জিনিস অবলম্বন করিয়া বিকশিত হইয়াছে।[৭৩]

(খ) ... The folk-poet ... creates whole chains of similes and metaphores, strictly in the spirit of folk-poetry, taking their materials from his surroundings and nature, and seems to follow, as his only artistic aim, the description of the lovers' psychology which none of his fellow-poets is able to express with such plasticity and poetical imagery.[৭৪]

এই গাথার পরিণতি ট্রাজিক। শ্যামরায়ের মৃত্যু এবং তার প্রণয়িনী ডোম্নী নারীর সহমরণের মধ্য দিয়ে এই পরিণতি সাধিত হয়েছে। এই ট্রাজিক পরিণতির পেছনে বহিরাঙ্গিক কারণই সক্রিয়। গাবর রাজা কর্তৃক ডোম্নী-নারীকে অপহরণ এর বহিরাঙ্গিক দিক। অন্যদিকে শ্যামরায় ও ডোম্নী নারীর প্রণয়াসক্তির ক্ষেত্রে যে সামাজিক অন্তরায় রয়েছে তাও বহিরাঙ্গিক। উভয় চরিত্রের অন্তর্গত কোনো আচরণ, কোনো প্রবণতা, কোনো ত্রুটি ট্রাজিক পরিণতির সৃষ্টি করেনি। তবে পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ততায়, প্রণয়ে একনিষ্ঠতায় তারা যে মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছে, তাতে বহিরারোপিত ঘটনা তাদের জীবনের করুণ পরিণতির কারণ হলেও তাদের প্রতি পাঠকহৃদয় সহানুভূতিশীল, একাত্ম। এদিক থেকে গাথার ট্রাজিক পরিণতি আবেদনবাহী।

Dhaka University Institutional Repository

বারতীর্থের গান

'বারতীর্থের গান'[৭৫] শীর্ষক গাথার কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজা ভগদত্তের মাতৃআজ্ঞা পালনে যে-কর্তব্যনিষ্ঠা, তা — কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠসুলভ আচরণে কিংবা প্রজার হিতকামনায় — সর্বত্রই উজ্জ্বল। বৃদ্ধা মাতার সন্তুষ্টিবিধান বা তার শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য তিনি যেমন দুস্তর পথ অতিক্রম করার শারীরিক কষ্ট-ভোগ থেকে নিবৃত্ত হননি, তেমনি অমাত্যবর্গের বিষয়চিন্তাকেও প্রশ্রয় দেননি। জন্মদাত্রীর জন্য সর্বস্ব নিবেদনে তার মানসিক প্রস্তুতি বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। তার চরিত্রের এই উদার মানবিক বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করে কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রও চারিত্রিক মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই উভয় চরিত্রের মহত্ত্ব একান্তই মানবিক ও জাগতিক এবং কোনোভাবেই ধর্মীয় উপলব্ধি উৎসারিত নয়।

গাথাটি আয়তনের দিক থেকে বিস্তৃত নয়। এর আখ্যানভাগে জটিলতা অনুপ্রবেশ করেনি। তবে তার সুযোগ ছিল। রাজা ভগদত্তের প্রবাসকালে কাহিনীর মধ্যে কোনো নতুন জটিলতার আগমন ঘটতে পারত। যেটুকু ঘটেছে, তা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। রামচন্দ্রের শাসনকাল নিয়ে পরবর্তীসময়ে প্রজারা যে মিথ্যাচারের সৃষ্টি করেছে, তা কাহিনীকে তেমন জটিল করে তুলতে পারেনি। ইচ্ছা করলে রচয়িতা প্রজাদিগের মিথ্যাচারকে কেন্দ্র করে জটিলতা সৃষ্টি করে কাহিনীকে একটি চমৎকার পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হতেন। কিন্তু তা হয়নি। আখ্যানভাগে একারণে সরলরৈখিকতা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং মনে হয়, কাহিনীকে পরিণতিমুখী করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহকে পরিপক্ক করে তোলা হয়নি।

রাজমাতা বৃদ্ধা। মৃত্যু তার সন্নিকট। এমতাবস্থায় তার মনে বারতীর্থ দর্শনের মাধ্যমে পুণ্যলাভের বাসনা জাগ্রত হয়েছে। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থা এমন নাজুক যে দুর্গম পথ অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। তাই রাজা তার মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য বারতীর্থের পবিত্র জল নিজেই সংগ্রহ করে এনে দীঘি খনন করে সেই জলে মাতার পুণ্যস্নানের ব্যবস্থা করেছেন। বাসনা অনুযায়ী রাজমাতা সোনা-রূপা-গরু-বস্ত্র-কড়ি দান করে পুণ্য স্নান সমাপন করলেন। তার মনে পুনরায় বাসনা জাগল যে একনড়া সুতার সমান দীর্ঘ দীঘি খনন করতে হবে। রাজ্যক্ষয়ের আশংকা সত্ত্বেও রাজা মাতার শেষ বাসনাও পূর্ণ করলেন। সুতানড়ার দীঘি কালে কালে মাতৃবাসনা পূরণের মহিমা কীর্তন করেছে। আখ্যানভাগের এই সরলরৈখিক অগ্রগতির মধ্যে একটি উপ-ঘটনা যুক্ত হয়েছে। রাজা ভগদত্তের প্রবাসকালে কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র জ্যেষ্ঠের পরামর্শ অনুযায়ী প্রজাদিগের হিতকামনায় নিজেকে উৎসর্গ করলেও পরবর্তীকালে প্রজারা তার সম্পর্কে অপবাদ দিয়ে চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে। ফলে রামচন্দ্রের বেদনার্ত মন থেকে প্রজাদিগের প্রতি যে-অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে, তাতে আখ্যানভাগের শেষে প্রজাদের সুখের দিন অবসানের তথ্য আছে। ফলে শেষোক্ত ঘটনাটিতে রূপকথা-ধর্মিতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

Dhaka University Institutional Repository

এটি একমাত্র গাথা যেখানে রচনাকাল ও রচয়িতার নাম উল্লেখিত হয়েছে :

বারভীখোর কবিতা তাই সাঙ্গ হইল এইখানে ।
এই কবিতার জন্য হইল বারশ আশী সোনে ॥
বাবুইরগার সন্তুবয়াতি ধুয়া বাইন্ধা যে গান করে ।
রহম কর দুনিয়ার মালিক আল্লা তারে ॥ (পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি.স.পৃ ৫২৬)

এই গাথার আখ্যানভাগ দুর্বল এবং গাথাধর্মিতা থেকে বিচ্যুত । আখ্যানভাগের পরিসমাপ্তির মধ্যে কোনো পরিণতি দৃষ্ট নয় । এর কারণ, এই গাথায় কোনো অনুভূতির সংকট উপস্থাপিত হয়নি । গাথার রসনিষ্পত্তি নিয়ে আলোচনা তাই অর্থহীন ।

শীলা দেবী

'শীলা দেবী'[৭৬] গাথার কেন্দ্রীয় চরিত্র শীলা দেবী সুন্দরী, প্রণয়বাসনায় স্বতঃস্ফূর্ত, প্রণয়ী-নির্বাচনে স্বাধীনমনস্ক, কিন্তু প্রণয়াকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে তার সক্রিয়তা বা বুদ্ধিমত্তা তাৎপর্যপূর্ণ নয় । বরং বিষয়কেন্দ্রিক স্বার্থচিন্তা, রাজ্যলোভ, পিতার আভিজাত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রণয়ীর দুর্বলতাকে ব্যবহার প্রভৃতি তার চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । তার মধ্যে প্রণয়বাসনা যে নেই, তা নয়, তবে এর সঙ্গে বৈষয়িক স্বার্থচিন্তাও যুক্ত হয়েছে । তার চরিত্রের মহত্ত্ব পিতৃঅপমানের প্রতিশোধগ্রহণে এবং আত্মবিসর্জনেই পরিস্ফুটিত হয়েছে ।

এই গাথায় সবচেয়ে সক্রিয় চরিত্র মুন্সা । তার চরিত্রে বিনয় ও দুর্বিনয়, কৃতজ্ঞতা-ভালবাসা ও অপমানের প্রতিশোধগ্রহণে ক্রুর জিঘাংসাপরায়ণতার সুসমন্বয় ঘটেছে । সে যখন দরিদ্র অবস্থায় রাজদরবারে গিয়ে কার্যসন্ধান করে, তখন তার চরিত্রের বিনয়, ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা সবকিছু মহৎ চরিত্রের অনুরূপ হয়ে স্ফুটমান । অথচ রাজকন্যার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে তার মধ্যে জন্ম নিয়েছে চরম প্রতিশোধস্পৃহা, সে বিস্মৃত হয়েছে আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনের মহানুভবতা । চরম আঘাতে সে জর্জরিত করেছে রাজশক্তিকে । এবং স্বীয় শক্তি নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত সে সংগ্রামরত থেকেছে । প্রকৃত নায়ক চরিত্রের বীরত্ব, দৃঢ়তা, সাহসিকতা তার মধ্যে বর্তমান । কিন্তু অশিক্ষিত, বর্বর শ্রেণীর অনুর্ভুক্ত হওয়ায় তার প্রতি রাজার অনুগ্রহ আছে, কিন্তু কন্যাদান করে গৌরবান্বিত করার সাহস নেই । গাথা রচয়িতা যেমন তার প্রতি সদয় নন, তেমনি সমালোচকেরাও :

> মুন্সার চরিত্রটি যথাযথভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে । অন্য কথায় একটা লৌহবক্ষ বৃষস্কন্ধ মহাতেজস্বী অসভ্য বীরের আকৃতিটি আমাদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে । তাহার স্পর্দ্ধা, তেজ এবং চক্রশনু করার শক্তি একটা ভীষণ বন্য শার্দুলেরই অনুরূপ ।[৭৭]

এ-গাথায় রাজপুত্রের চরিত্রও উজ্জ্বল মহিমায় ভাস্বর । তার মহত্ত্বের একটি বিশেষ দিক হলো : স্বীয় প্রণয়বাসনা চরিতার্থ করার জন্য সে যুদ্ধ-আয়োজনেও উদ্যত, এবং সর্বাংশে সক্রিয় । এই সক্রিয়তাহেতু তাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে । শীলা দেবীর পিতা, যার সিদ্ধান্তের ফলে কাহিনীর

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিমাতা বৃদ্ধি পেয়েছে, পলায়নপরতায় সফলতা ছাড়া অন্য কোনো সক্রিয়তা তার চরিত্রে পরিদৃষ্ট নয়।

'শীলা দেবী' গাথার আখ্যানভাগ তেমন জটিলতায় আচ্ছন্ন নয়। তবে এই গাথা সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা থাকার কারণে এর আখ্যানভাগ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।[৭৮] এই নামের একই কাহিনীর একটি গাথার সারাংশ স্থানীয় আরতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এমন তথ্য দীনেশচন্দ্র সেনই সরবরাহ করেছেন। ঐ গাথার মূল পান্ডুলিপিটি দুষ্প্রাপ্য। প্রকাশিত সারাংশের সঙ্গে, বর্তমান গাথার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যাবে যে, দু'কাহিনীর মধ্যে প্রথম ভাগের সাযুজ্য থাকলেও শেষ ভাগে অমিল রয়েছে। বর্তমান গাথাটির শেষাংশে আখ্যানভাগে পারম্পর্য নেই। এসব বিবেচনা করে দীনেশচন্দ্র সেন বর্তমান গাথার পরিবর্তে হৃত গাথাকেই প্রামাণ্য ধরেছেন:

> 'আরতি'তে যে পালাটির সারাংশ সঙ্কলিত হয় সে পালাটি হারাইয়া গিয়াছে, এখন আর তাহা পাইবার উপায় নাই। কিন্তু উহার সারাংশ দ্বারা আমরা যতটা বুঝিতে পারি তাহাতে অনুমিত হয় যে সেই পালাটিই খাঁটি ছিল এবং বর্তমান পালাটিতে রচয়িতা ইচ্ছাপূর্ব্বক কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন।[৭৯]

মুন্ডাদস্যুর ব্রাহ্মণ রাজার দরবারে চাকরি প্রার্থনা, কয়েক বছর বিনা পারিশ্রমিকে চাকরির পর পারিশ্রমিকের পরিবর্তে রাজকন্যার পাণিপ্রার্থনা, প্রত্যাখ্যাত ও কারাদন্ড ভোগ, কারাগার থেকে পলায়ন এবং পরে মুন্ডাদের একত্রিত করে নিয়ে এসে রাজার প্রাসাদ আক্রমণ, লুন্ঠন, কন্যাসহ রাজার পলায়ন — এপর্যন্ত উভয় গাথার কাহিনী এক। ব্রাহ্মণ রাজা কন্যাসহ পালিয়ে অন্য এক হিন্দু রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেখানে রাজপুত্র আশ্রিতা রাজকন্যার প্রণয়যাচক্কা করলে কন্যা তার প্রতি হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের শর্ত আরোপ করে। রাজপুত্র যুদ্ধযাত্রা করে এবং মুন্ডা দস্যুকে হত্যা করতে সক্ষম না হলেও বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়ে প্রত্যাবর্তন করে। আশ্রিত রাজা কন্যাসহ স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে বিবাহ আয়োজনে উদ্যোগী হয়। বিয়ের দিন মুন্ডাদস্যু হামলা চালিয়ে রাজপুত্রকে নিহত করে। রাজকন্যা সহমরণে উদ্যোগী হয়। পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মণ-রাজা ত্রিপুরার-রাজার শরণাপন্ন হয়ে মুন্ডাদের হামলা থেকে রক্ষা পান। বর্তমান গাথার কাহিনী এরকম। কিন্তু 'আরতি' পত্রিকার সারাংশে আছে: ব্রাহ্মণ-রাজা কন্যাসহ পালিয়ে গাজীদের শরণাপন্ন হন। গাজীরা তার প্রতি আতিথ্য প্রদর্শন করেও গাজীর এক যুবকপুত্র শীলাদেবীর রূপমুগ্ধ হয়ে পাণিপ্রার্থনা করে। ব্রাহ্মণ-রাজা পালিয়ে মুসলমানের আত্মীয়তার আশংকা থেকে নিজেকে রক্ষা করেন। এবং তিনি ত্রিপুরার রাজার আশ্রয় গ্রহণ করলে সেখানে যুবরাজ শীলাদেবীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পাণিপ্রার্থী হন। ব্রাহ্মণ-রাজা বহু বিপদে বিচলিত। তাই এ-প্রস্তাব উপেক্ষা করেননি। অন্যদিকে শীলাদেবীও রাজপুত্রের প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। ত্রিপুরার রাজপুত্র অসংখ্য সৈন্যসহ মুন্ডা-দমনের অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণ-রাজার দেশে অগ্রসর হলে মুন্ডারা নদী পারাপারের বাঁধ ভেঙে দেয়। শ্রাবণে নদী ছিল উন্মত্ত। ফলে রাজপুত্র যুদ্ধে সফল হতে পারেননি। সৈন্যসহ নদীজলে নিমজ্জিত হন। এই যুদ্ধে শীলাদেবীও অংশ নেন। যদিও পরবর্তীসময়ে ত্রিপুরা-রাজ কর্তৃক মুন্ডাদের পরাজিত করতে তেমন বেগ পেতে হয়নি।

বর্তমান গাথাটির আখ্যানভাগ অসম্পূর্ণ হওয়ায় দীনেশচন্দ্র সেনের যুক্তিকে সত্য বলে মনে হয়। আরতির সারাংশে যেখানে ত্রিপুরা রাজ মুন্ডাদের পরাজিত ও তোপের মুখে নিহত করেন সেই স্থানটির নাম

Dhaka University Institutional Repository

'কাঁকড়ার চর'। ঐ স্থান নিয়ে অনেক গল্প এখনও প্রচলিত আছে। এসব কারণেও শ্রীযুক্ত সেনের যুক্তি সত্য বলে মনে হয়।

এই গাথার কিছু অস্বাভাবিকত্বও এর প্রামাণিকতার বিরোধী। যেমন ব্রাহ্মণ রাজা কিংবা হিন্দু রাজা ও রাজপুত্র কারও নাম গাথায় উল্লিখিত নয়। অন্য কোনো গাথায় এরূপ লক্ষ্য করা যায় না। মধ্যযুগে ময়মনসিংহ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মুসলমান গাজীদের অবস্থান ছিল—এই ঐতিহাসিক প্রমাণের সঙ্গে হৃত গাথাটির সাযুজ্য লক্ষ্য করে দীনেশ চন্দ্র সেন বলেছেন:

> ...আমার বিশ্বাস ব্রাহ্মণ-রাজা গাজীদের নিকটই সাহায্য প্রার্থনার জন্য প্রথম গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের আতিশয্যে দ্বিতীয় পালা-লেখক মুসলমান-সংশ্লিষ্ট ঘটনাটা গোপন করিয়াছেন এবং তৎস্থলে একটি অজ্ঞাতকুলশীল অনামা হিন্দু রাজাকে আনিয়া সে স্থান পূরণ করিয়াছেন। এই পরিবর্তন স্বেচ্ছাকৃত।[৮০]

এই-গাথার পরিণতি ট্র্যাজিক। প্রণয়বাসনা চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে যুদ্ধোদ্যোগী গাথার নায়ক রাজপুত্র বীরের মতো প্রাণত্যাগ করে। এই পরিণতির জন্য বাহ্যিক কারণ দায়ী হলেও রাজপুত্রের মৃত্যু পাঠক হৃদয়কে সহানুভূতিতে আর্দ্র করে। তবে রাজপুত্রের সঙ্গে শীলাদেবী সহমরণে উদ্যোগী হলেও শীলা দেবীর প্রতি পাঠকহৃদয় তত সহানুভূতিশীল নয়। সার্বিক বিচারে এই গাথার রসনিষ্পত্তি শিল্পসফল নয়।

রাজা রঘুর পালা

'রাজা রঘুর পালা'[৮১] গাথার কোনো চরিত্রই পূর্ণাঙ্গরূপে বিকশিত নয়। পাঁচ বছরের শিশু রাজপুত্র গাথার নায়ক। তাকে কেন্দ্র করে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু বয়সের কারণে তার ভূমিকা নিষ্ক্রিয়। ধার্মিক রাজার চরিত্র স্ত্রী-দুঃখকাতরতা ও বিরহ-সন্তাপেই নিঃশেষিত। ঈশা খাঁ ধার্মিক রাজার শত্রু ছিলেন। রাজার মৃত্যু সংবাদে তিনি পূর্ব-শত্রুতা, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে সুসং আক্রমণ করে রাজপুত্রকে যে অপহরণ করেন তাতে ঈশা খাঁ চরিত্রের বীরত্ব-মহিমা ম্লান হয়েছে। গারো উপজাতীয়দের সম্মিলিত প্রয়াসই তাদের গোষ্ঠীগত চারিত্রিক দৃঢ়তাকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে।

এই গাথার আখ্যানভাগ স্বল্পপরিসরবিশিষ্ট হলেও এর রয়েছে দুটি পর্ব। প্রথম পর্বে ধার্মিক রাজা তার স্ত্রী বিয়োগের ফলে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে অসহায় ও দুঃখকাতর। এই পর্বে রাজা কর্তৃক প্রয়াত রানী কমলাকে স্বপ্ন দর্শন, শিশু পুত্রকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য রানীর পরামর্শ দান এবং সে অনুযায়ী প্রতি রাত্রে মৃত রানী কর্তৃক পুত্রকে দুগ্ধদানের ঘটনাগুলি লোকাতীত, অপ্রাকৃত। অলৌকিকতার চূড়ান্ত দৃশ্য: একদিন রাত্রে পুত্রকে দুগ্ধদানশেষে রানীর অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের সময় রাজা তার শাড়ির আঁচল টেনে ধরেন। মৃত রানীর বিরহে কাতর রাজা এমনই জ্ঞানহারা যে তিনি মৃতাকে স্থায়িভাবে কাছে ধরে রাখতে চান। কিন্তু রাজার সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ না হওয়ায় দুঃখে পরিতাপে দগ্ধ হয়ে তার প্রাণবিয়োগ ঘটে। আখ্যানভাগের সতের পৃষ্ঠার মধ্যে এগার পৃষ্ঠাব্যাপী এই অপ্রাকৃত কাহিনী।

এরপরে দ্বিতীয় অংশ। পিতার মৃত্যুর পর শিশুপুত্র রঘুনাথকে অমাত্যবর্গ রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। অন্যদিকে ঈশা খাঁ তাঁর চিরশত্রু ধার্মিক রাজার মৃত্যু-সংবাদ শ্রুত হয়ে সুযোগ পেয়ে রঘুনাথের

Dhaka University Institutional Repository

রাজ্য আক্রমণ করে। সম্পদ লুটপাট সহ শিধু রাজাকে করে অপহরণ। রাজা সে শিশু কিংবা বৃদ্ধ হোক, প্রজার কাছে রাজাই। রাজ-অপহরণ সংবাদ প্রজাগণের মধ্যে সঞ্চার করেছে অপরিসীম বেদনা ও অপমানবোধ। পাহাড়স্থিত গারো উপজাতীয় জনগণ রাজা উদ্ধারে যে দৃঢ়সংকল্প আচরণের পরিচয় দিয়েছে, তা অপূর্ব। তারা ধেয়ে গেছে জঙ্গলবাড়ি অভিমুখে। বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে খাল খনন করে ধনেখালি নদীর সঙ্গে জঙ্গলবাড়ির পরিখার সংযোগ সাধন করেছে। শিধুরাজাকে অপহরণের আনন্দে তখন জঙ্গলবাড়ি মাতোয়ারা, সেই সুযোগে বন্দীদের অজ্ঞাতসারে তারা শিধুপুত্রকে উদ্ধার করে ইশা খাঁর নৌকাতে করেই দ্রুত চলে এসেছে সুসং-এ। প্রজাগণের রাজ-উদ্ধারের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটেছে কাহিনীর।

এই কাহিনীর একটি প্রারম্ভ কাহিনী নিয়ে রচিত 'কমলা রানীর গান' শীর্ষক ভিন্ন একটি গাথা সম্পর্কে ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ঐ গাথার রচয়িতা ও সংগ্রাহক ভিন্ন বিধায় কাহিনী বিন্যাস ও বর্ণনার সঙ্গে এই গাথার কোনো সাযুজ্য নেই। সহজেই বোধগম্য যে ভিন্ন ভিন্ন গায়ক একই ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করে গাথা রচনা করেছেন। কিন্তু কবিকল্পনা ভিন্ন হওয়ার কারণেই একইরূপ বিন্যাস ও বর্ণনা পরিত্যজ্য হয়েছে। তবে ঘটনা একই। দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন,

> দ্বিতীয় খন্ডে আমরা রানী কমলার গানটি প্রকাশ করিয়াছি। এই পালাটিও সেই গানেরই শেষাংশ।[৮২]

এই গাথার কাহিনীর সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যের শুধু সাযুজ্যই নেই, অসামঞ্জস্যও আছে। এই গাথায় গারো উপজাতীয় জনগণের পরম রাজভক্তির প্রসঙ্গটি চমৎকার শৈল্পিক নৈপুণ্যের সঙ্গে উপস্থাপিত হলেও চেক গবেষক দুশান জবিতেল ঐতিহাসিক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে রঘুনাথ রাজার বিরুদ্ধে গারো জনগণ বিদ্রোহ করেছিল এবং সেই বিদ্রোহ দমনের জন্য এমনকি রাজাকে দিল্লির বাদশাহের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল:

> ... the famous chronicle Ain-i-Akbari informs us that king Raghunath Singh paid a year's tribute to the Mughal Sultans in Delhi as a recompense for the military help he got when suppressing the revolt of his unloyal subjects from the Garo Hills.[৮৩]

ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে গাথা-কাহিনীর এই বৈপরীত্য নিশ্চয়ই গাথার দুর্বলতার প্রকাশ বহন করে না। বরং কবিকল্পনার ব্যাপ্তিকেই চিহ্নিত করে। কবি যদি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করতে গিয়ে শিল্পের প্রয়োজনে কাহিনীবিন্যাসে চমৎকারিত্ব ও সুষমা দানের জন্য তথ্যের বিকৃতি সাধন করে থাকেন এবং তার ফলে শিল্পকর্মটি যদি শৈল্পিক উৎকর্ষ লাভ করে সেটা সফলতারই প্রকাশ। গাথাটিতে এছাড়াও দু'একটি অসঙ্গতি লক্ষণীয়। শিধু-রঘুনাথকে ইশা খাঁ বন্দী করে বাইশ মন পাথর চাপা দিয়েছিল কিংবা ইশা খাঁ দিল্লির সম্রাটকে পিটতুল্য গণ্য করত প্রভৃতি উক্তির মধ্যে প্রাচীন সংস্কার কিংবা অজ্ঞতারই প্রকাশ সুস্পষ্ট। তবে রচয়িতা এর কাহিনী বিন্যাসে, ঐতিহাসিক তথ্যকে গাথা-উপযোগী করার ক্ষেত্রে বর্ণনার চমৎকারিত্বে, যুদ্ধযাত্রার বর্ণনায় দ্রুত ছন্দের ব্যবহারে নিঃসন্দেহে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'রাজা রঘুর পালা' গাথাটিতে দুই পর্বে দুই প্রকার পরিণতি লক্ষ্য করা যায় । এই পরিণতির চরিত্রও ভিন্ন । স্ত্রী-বিরহে কাতর ধার্মিক রাজার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রথম অংশের সমাপ্তি ঘটেছে । এই ট্রাজিক পরিণতির মূলে রয়েছেঃ রাজার অতি মাত্রায় অনুরাগ ও সংবেদনশীলতা এবং হার্দ্য আঘাতকে প্রতিহত করার অত্যন্তুর-ক্ষমতা । এক্ষেত্রে ট্রাজেডি বহিরারোপিত নয় । তবে রাজার নিষ্ক্রিয়তার ফলে তার প্রতি পাঠক-চিত্ত সংবেদনশীলও নয় । গাথার শেষ অংশের পরিণতি মিলনাত্মক । কিন্তু এই পরিণতি একান্তভাবেই বহিরারোপিত । এই অংশের নায়ক শিশু, ফলে তার সক্রিয়তার প্রশ্ন অর্থহীন । ইশা খাঁ কর্তৃক অপহরণ কিংবা গারো উপজাতীয় জনগণ কর্তৃক উদ্ধারে রাজকুমারের কোনো ভূমিকা নেই । একারণে গাথার উভয় প্রকার রূপনিষ্পত্তি শৈল্পিক মানদন্ডে উত্তীর্ণ নয় । যদিও পরিসমাপ্তি পর্যায়ে গারো আদিবাসী জনগণের রাজা উদ্ধার-অভিযানের সঙ্গে পাঠক-হৃদয় কতক পরিমাণে একাত্ম তবু এ-প্রকার পরিণতি তাৎপর্যহীন ।

মুকুট রায়

'মুকুট রায়'[৮৪] গাথায় মুকুট রায়ের সক্রিয়তা তাৎপর্যপূর্ণ । স্ত্রীয় পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেমন তাঁর স্বতন্ত্র মতামত রয়েছে, তেমনি স্বপ্নে-দেখা নারীকে অনুসন্ধানের জন্য দুর্গম পথ অতিক্রমণেও তিনি ক্লান্তিহীন । বনবিহারিণী, স্বপ্নে-দেখা প্রণয়িনীকে তিনি উদ্ধার করেছেন, নিজ রাজ্যে নিয়েও এসেছেন এবং একত্রে সুখে দিন যাপনও করেছেন, কিন্তু মৃত্যু তার অগোচরে এসেছে, এখানে তার নিষ্ক্রিয়তা দূষণীয় নয় । মৃত্যুর পরে পুনঃ জীবনপ্রাপ্তির পরও তিনি আকাঙ্ক্ষিত জনকে লাভ করার জন্য সচেষ্ট ।

মুকুট রায়ের চরিত্র সর্বাংশে নিষ্কলুষ, সকল প্রকার সংকীর্ণতা-উর্ধ্ব । প্রণয়বাসনায় নিবেদিত, তার জীবনভাবনা মানবিক মহত্ত্বে উজ্জ্বল ।

তবে এই গাথায় মুকুট রায় অপেক্ষা তার প্রণয়িনী বনবিহারিণীর সক্রিয়তা অধিক । তার আত্মত্যাগও তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত । গভীর বনে মুকুট রায়কে প্রথম দর্শন করেই তার মধ্যে প্রণয়-বাসনা অঙ্কুরিত হয়েছে । তার জীবনযাপন সমাজবিচ্ছিন্ন হলেও তার বুদ্ধিমত্তা বিষয়-বিচ্ছিন্ন আবেগা-চ্ছন্ন নয় । প্রেমের অঙ্কুরোদগমের সাথেই দুরন্ত অভিভাবকমন্ডলীর ক্রোধবহ্নি থেকে তার প্রণয়ীকে রক্ষা করার উপায় নিয়ে তাকে চিন্তা করতে হয়েছে । রাজপুত্রকে রক্ষা করা এবং সুযোগ অনুযায়ী তার সঙ্গে পলায়নের মধ্যে বনবিহারিণী রাজকন্যার অপূর্ব বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, আত্মপ্রত্যয় ও প্রণয়ীর প্রতি অপরিসীম বিশ্বাসেরই পরিচয় সুস্পষ্ট । পরবর্তীকালে স্বামীগৃহে দাম্পত্যজীবনকে সুখময় করে তোলার ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা সক্রিয় ও প্রশংসনীয় । মৃত স্বামীর পুনঃজীবনপ্রাপ্তির জন্য সাধনায় তার একনিষ্ঠা, সহনশীলতা ও ভাবাবেগবর্জিত একাগ্র আত্মপ্রত্যয়ের যে-পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে, তা তাৎপর্যপূর্ণ । স্বামীর পুনঃজীবনপ্রাপ্তির পর তাকে লাভ করার জন্য তার মধ্যে যে মানসিক চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়, তাতেও মানবিক জীবনবোধেরই উজ্জ্বলতা প্রকাশিত হয়েছে ।

এই দুই চরিত্রের বাইরে উল্লেখযোগ্য কোনো চরিত্র এই গাথায় বিকশিত নয় । শিশুই রাজার

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে বাৎসল্য অতিমাত্রায় দৃষ্ট হলেও স্বেচ্ছাচারিতা, সংকীর্ণতা অন্যের প্রতি অবিশ্বাস, সভাসদজনের পরামর্শ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার মতো ব্যক্তিত্বহীনতা এই চরিত্রটিকে বিবর্ণ করে তুলেছে। নেয়াজার রাজা কিংবা মুরশিদ চরিত্র ব্যক্তিত্বহীন, অতিলৌকিক উপাদানে আচ্ছন্ন।

এই গাথার আখ্যানভাগ পুরোপুরি জটিলতামুক্ত নয়, তবে রূপকথাধর্মী বিভিন্ন উপাদানের অনুপ্রবেশে অনেকস্থানে এর গাথাধর্মিতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। যেমন রাজপুত্র মুকুট রায় কর্তৃক তার স্বপ্নেদৃষ্ট রাজকুমারীর বনান্তঃপুরে সন্ধানলাভ, অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির শরাঘাতে মুকুট রায়ের মৃত্যু, রাজকুমারী মুকুট রায়ের সঙ্গে একত্রে সিন্দুকবদ্ধ হয়ে নদীজলে নিমজ্জিত হয়েও জীবিত অবস্থায় উদ্ধারলাভ প্রভৃতি ঘটনা যেমন ব্যাখ্যা-অযোগ্য তেমনি বনমধ্যে রাজকুমারীর অক্লান্ত সাধনায় স্রষ্টার কৃপালাভ, মুকুট রায়ের জীবনপ্রাপ্তি, সুফী সাধকের অনুপ্রবেশ প্রভৃতি অতিলৌকিক ঘটনার সমাবেশে আখ্যানভাগ ধারাবাহিকতা হারিয়েছে।

আখ্যানভাগের শেষাংশে হঠাৎ সুফী সাধকের আবির্ভাব ও অলৌকিক ঘটনার সমাবেশে ধর্মে দীক্ষার বিনিময়ে আকাঙ্ক্ষা পূরণ প্রভৃতি ঘটনার অনুপ্রবেশে স্পষ্ট যে, গাথাটি রচনার পরবর্তীকালে কোনো মুসলমান রচয়িতার হাতে পরে এমন বিসদৃশ পরিণতি লাভ করেছে।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-আচ্ছন্ন না হলেও এই গাথার পরিসমাপ্তিতে ইসলাম ধর্মের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। সমগ্র গাথার কাহিনী বিশ্লেষণ করলে এই পরিণামকে যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নেওয়া কঠিন। সুস্পষ্টভাবেই লক্ষণীয় যে গাথার কাহিনীর প্রারম্ভ-অংশের সঙ্গে পরিণামের সামঞ্জস্য নেই।

> যে আকারে মুকুট রায়ের গানটি প্রথম বিরচিত হইয়াছিল সে আকারটি পাইবার উপায় নাই। ইহার প্রথমভাগ ঠিক রাখিয়া মুসলমান লেখক একটা হিন্দু কাহিনীকে শেষভাগে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কোন চিহ্ন নাই, কিন্তু মুসলমান ধর্মের মহিমা ঘোষণা করার চেষ্টা আছে।[৮৫]

ভিন্ন রচয়িতার হাতে পড়ে এই গাথা যৌক্তিক পরিণতি অর্জন না করায় এর রসনিষ্পত্তিও তাৎপর্য-হীন হয়ে উঠেছে। স্মর্তব্য যে ধর্মীয় আখ্যানগুলির পরিণাম সর্বদা মিলনান্তক। কেননা সকল ধর্মেই পারলৌকিক বিশ্বাসের উপাদান বিদ্যমান — যেখানে সকল লোক পুনর্জীবনপ্রাপ্ত হবে। সেক্ষেত্রে পুনর্জীবন-প্রাপ্তির নিশ্চয়তা-চিন্তা অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় ইহলোকের মৃত্যু পাঠক হৃদয়কে ট্র্যাজেডির হাহাকারে দগ্ধ করেনা। এ-গাথায়ও তাই হয়েছে। অনুমিত হয় যে এই গাথার মূল আখ্যানভাগের পরিণতি ছিল বিয়োগান্তক। কিন্তু পরবর্তী মুসলিম রচয়িতা এর আখ্যানভাগকে মিলনান্তক পরিণতি দান করেছেন। ফলে বর্তমান গাথার পরিণতি বিয়োগান্তক ব্যথায় জর্জরিত হলেও মিলনান্তক। তবে পরিণতি যাই হোক, কোনো ক্ষেত্রেই তা চরিত্রসমূহের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কিংবা কর্মকান্ড উৎসারিত নয়। রাজপুত্রের মৃত্যু কিংবা পুনর্জীবনপ্রাপ্তি এবং সবশেষে উভয়ের পুনর্মিলন কোনোক্ষেত্রেই রাজপুত্র কিংবা রাজকন্যার সক্রিয়তা দৃষ্ট নয় বরং সর্বত্রই বাহ্যিক উপাদান অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এসে এসব পরিণাম সংঘটিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

ডারইয়া রাজার কাহিনী

'ডারাইয়া রাজার কাহিনী'তে[৮৬] ডারাইয়া রাজা সামাজিক কুলমর্যাদায় ক্ষত্রিয় রাজা বীরসিংহের তুলনায় হীন হলেও চারিত্রিক দৃঢ়তায় উন্নত। তার সক্রিয়তাও তাৎপর্যপূর্ণ। বনজঙ্গলকে আবাদী জমিতে রূপান্তর সাধন, শত্রুর হামলাকে প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া, শত্রুর পরাজয় নিশ্চিত করার জন্য তন্ত্রমন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ, শত্রুকে সামনাসামনি যুদ্ধ করে পরাজয় নিশ্চিত করার পরও সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নকল্পে শত্রুর সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কূটনৈতিক প্রয়াস, পরবর্তী সময়েও শত্রুর হামলাকে প্রতিহত করার সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে ডারাইয়া রাজার চরিত্রের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় সুস্পষ্ট। অপরদিকে ক্ষত্রিয় রাজা বীরসিংহের সক্রিয়তা দ্বিতীয় পর্যায়ের। বীরসিংহ কোনো কাজেই প্রথম-উদ্যোগী নয়। শত্রুর উদ্যোগকে নস্যাৎ করার জন্যই তার সক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়। ডারাইয়া রাজার বিরুদ্ধে প্রথম হামলার ঘটনায় যেমন সে প্রথম উদ্যোগী হয়ে আক্রমণ করেনি, তেমনি পরবর্তী আক্রমণের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অপমানের প্রতিশোধ চরিতার্থ করার জন্য সে পরবর্তীকালে আক্রমণ করেছে। শত্রুর তন্ত্রমন্ত্রের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য সে তন্ত্র-মন্ত্র শেখার উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়া বীরসিংহ চরিত্রে যে সংকীর্ণতার প্রকাশ ঘটেছে, তা ডারাইয়া রাজার চরিত্রে দৃষ্টিগোচর হয় না। ডারাইয়া রাজাকে পরাজিত করার পর বীরসিংহ পরাজিত শত্রুর স্ত্রীর প্রতি যে-আচরণ করেছে তার মধ্যে বীরত্বের বা উদার্যের কোনো পরিচয় নেই।

এদিক থেকে ডারাইয়া রাজার কন্যা চম্পাবতী চরিত্রটিই সার্বিক বিবেচনায় মহত্ত্বের অধিকারিণী। রাজায়-রাজায় শত্রুতা বা পররাজ্য আক্রমণের সংকীর্ণ কুটিল মনোভঙ্গী, যা বীরসিংহ চরিত্রকে কলুষিত করেছে, তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত চম্পাবতী। তার নারীধর্মের চিরন্তন মানবিক ঔদার্য ও সহানুভূতি এমন উন্নত মাত্রায় এই গাথায় পরিস্ফুটিত হয়েছে যে, তা তাকে এই গাথার সকল বিভেদ-সংঘাত-জিঘাংসার ঊর্ধ্বে এক শাশ্বত ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর করেছে। বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও শত্রুতা সাধনের প্রয়াসে নিয়োজিত হয়ে বীরসিংহ-পুত্র যখন ডারাইয়া রাজার কারাগারে বন্দী, সেসময় রাজকন্যা চম্পাবতী পিতৃদত্ত প্রতিশ্রুতি শিরোধার্য করে যাকে স্বামী বলে গ্রহণ করেছে, তার প্রতি শত্রুতাসাধন সত্ত্বেও যে মানবিক আচরণের পরিচয় দেয় তাতেই তার চরিত্রের মহিমা প্রস্ফুটিত হয়েছে।

> এই পালাগানটির চিত্রে নানাপ্রকার বিভীষিকাপূর্ণ তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ইহার ভীষণতা আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু অন্ধকার রাতে একবারটি যদি বিদ্যুৎ চমকাইয়া জগতের প্রসন্ন রূপ উদঘাটন করিয়া দেখায়, তবে তাহা যেরূপ স্মরণীয় হইয়া থাকে — এই বিপদসঙ্কুল জটিল অবস্থাচক্রে বিঘূর্ণিত প্রণয়-কাহিনীতে কুমার ও রাজকন্যার মিলনের দৃশ্যটা তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি মনোহর।[৮৭]

চম্পাবতীর সদিচ্ছা, প্রণয়ী-মমতা ও আগ্রহের কারণেই এরকম দৃশ্যের অবতারণা সম্ভবপর হয়েছে। রাজ্যগ্রাস, সংঘর্ষ, পবিত্র প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ প্রভৃতির নিষ্ঠুরতা থেকে যৌবনধর্মী মুক্ত বাসনা —

Dhaka University Institutional Repository

সেটাই স্বাভাবিকভাবে আসে। চম্পাবতী চরিত্র সেই স্বাভাবিক প্রবণতারই ফসল। কিন্তু বীরসিংহ-পুত্র মালক-মামুদ রাজার কূটনীতির ফাঁদে স্বীয় যৌবনধর্ম জলাঞ্জলি দিয়েছে। এখানেই বীরসিংহ-পুত্রের চরিত্র অনুজ্জ্বল, মলিন। এই মলিনতায় আরও ক্ষুদ্র স্পর্শ লেগেছে যখন সে পিতৃপ্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ছাড়াও নিজের প্রতিশ্রুতিও ভঙ্গ করেছে। তার প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের ক্ষুদ্রতা তার পিতার চেয়েও তার চরিত্রকে অধিকতর বিবর্ণ করেছে। কেননা তার পিতার প্রতিশ্রুতি ছিল কূটনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, কিন্তু তার প্রতিশ্রুতি ছিল একটি হার্দ্য অনুভূতির কাছে। বীরসিংহ-পুত্রের চরিত্রটি এদিক বিবেচনায় এই গাথার মধ্যে সবচেয়ে অনুজ্জ্বল, সবচেয়ে বিবর্ণ, সবচেয়ে মলিন, সবচেয়ে ক্ষুদ্রতা-দীর্ণ, সংকীর্ণতা-আচ্ছন্ন।

এই গাথার আখ্যানভাগ চরিত্রসমূহের পারস্পরিক সংঘাতে, প্রতিহিংসাপরায়ণতায় জটিল ও বহুমাত্রিক। অতিলৌকিক উপাদানই এই গাথার ঘটনাবলীকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নিয়ামক ভূমিকা পালন করলেও চরিত্রসমূহের সক্রিয়তার ক্ষেত্রে বাস্তব উপাদান, ঐতিহাসিক বাস্তবতার সম্ভাবনাও দুর্লক্ষ্য নয়। উপজাতীয় রাজা ভারাইয়া কর্তৃক অন্য রাজ্যভুক্ত একটি বনকে আবাদী জমিতে রূপান্তর করার মধ্য দিয়ে কাহিনীর শুরু হয়েছে। পার্শ্ববর্তী ক্ষত্রিয় রাজা বীরসিংহ ভারাইয়া রাজার অন্যায় আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্যোগী হলে আখ্যানভাগে জটিলতা সৃষ্টি হয়। ভারাইয়া রাজাও যুদ্ধে কম আগ্রহী নয়। কিন্তু শত্রুর পরাজয় নিশ্চিত করার জন্য ভারাইয়া রাজা তন্ত্রমন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। আখ্যানভাগে এই রূপকথাধর্মিতা প্রবেশ করার পরেও বন্দী রাজার সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্য দিয়ে সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নের যে কূটনৈতিক মানসিকতার প্রকাশ ঘটায় ভারাইয়া রাজা, তাতে বাস্তবতার ছোঁয়া স্পষ্ট। বন্দীত্ব মোচনের জন্য রাজা বীরসিংহ স্বীয় পুত্রের জন্য ভারাইয়া রাজার কন্যাকে গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি প্রদানে সম্মত হলেও তা যে নিতান্ত কূটনৈতিক কৌশল তার প্রমাণ পাওয়া যায় অচিরেই, যখন প্রতিশোধ চরিতার্থ করার জন্য পুনরায় যুদ্ধোদ্যোগী হয় বীরসিংহ-পুত্র। তবে এবারেও তন্ত্র-মন্ত্রের কাছে বীরসিংহ-পুত্রের পরাজয় ঘটে। রাজপুত্রের এবারকার বন্দীদশার মোচন হয় ভারাইয়া রাজকন্যার স্বাভাবিক নারী-ধর্মের হার্দ্য অনুভূতিজাত দুর্বলতা-পূর্ণ আচরণে। পিতৃদত্ত প্রতিশ্রুতিকে স্বীয় জীবনধারায় রূপায়িত করার স্বপ্নে উল্লসিত রাজকন্যা হৃদয়ে যাকে স্বামী হিসেবে বরণ করেছে তার কষ্টে আন্দোলিত হবে — সেটাই স্বাভাবিক। পিতৃ-বিবাদ সেখানে প্রধান নয়। রাজকন্যার এই উদার মনোভঙ্গির ফলে বীরসিংহ-পুত্রের বন্দীত্বের অবসান ঘটে। অন্যদিকে বীরসিংহও তন্ত্র-মন্ত্র শিখে পুনরায় যুদ্ধগামী হলে ভারাইয়া রাজার পরাজয় সূচিত হয়। মন্ত্রবলে বীরসিংহ তাকে পাষাণে পরিবর্তিত করে রাজ্য দখল করে। ভারাইয়া রাজার স্ত্রী ও কন্যা রাজ্যচ্যুত হয়ে পথবাসী হয়। বীরসিংহকে তার পূর্ব-প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভারাইয়া রাজার গৃহিণী যেভাবে অপমানিত হয়, তাতে তার মৃত্যু হয়ে ওঠে অবধারিত। পিতৃমাতৃহীন অভিভাবকহীন রাজকন্যাও মৃত্যুকে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়।

এই গাথার আখ্যানভাগে রূপকথাধর্মিতার অনুপ্রবেশে এর বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হলেও স্বীকার্য যে রূপকথাধর্মিতা বা অতিলৌকিকতার প্রভাব অনেকটা বহিরারোপিত। তাছাড়া সমস্ত গাথা জুড়ে বাস্তবতার উপাদান বর্তমান থাকলেও পরিণতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তন্ত্র-মন্ত্রই মূল ভূমিকা পালন করেছে। তবে তন্ত্র-মন্ত্রের প্রভাবটুকু গাথার নিতান্ত ক্ষুদ্র অংশ জুড়ে বিদ্যমান — যা সহজেই পরিত্যাজ্য হতে পারে এবং তা-হলে গাথাটির আবেদন একটুও ক্ষুণ্ণ হয় না, বরং সর্বাংশে বাস্তবতামণ্ডিত হয়। কিন্তু তন্ত্র-মন্ত্রের

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাবে গাথার আখ্যানভাগ তাৎপর্য হারিয়েছে ।

এই গাথার পরিণতি বিয়োগান্তক, করুণ রসোদ্দীপক । পাঠক এই গাথায় চম্পাবতী চরিত্রটির সঙ্গে যে সামান্য পরিচয় লাভ করেন, তাতেই তার মহত্ত্ব পরিস্ফুট । গাথার সকল চরিত্রকে অতিক্রম করে তার মানবিকতা চূড়ান্তস্পর্শী হয়েছে । ফলে তার প্রণয়বাসনা যখন প্রণয়ীর নিষ্ঠুর অমানবিক আচরণে অবমানিত হল, তখন পাঠক হৃদয় তার সঙ্গে সহানুভূতিতে সম্পূর্ণরূপে একাত্ম । তার আত্মবিসর্জনে সহানুভূতির মাত্রা আরও প্রবল হয় । তবে এক্ষেত্রে তার মায়ের মৃত্যু কোনো সহানুভূতি উদ্রেক করে না । কন্যার মঙ্গলের জন্য সে বীরসিংহের কাছে করুণাপ্রার্থী হয়ে প্রত্যাখ্যাত হলে চরমভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে । এই হতাশা থেকে উত্তরণের জন্য সক্রিয় না হয়ে সে সহজ মৃত্যুর পথ অবলম্বন করে । এই মৃত্যুতে কোনো বীরত্ব নেই, আছে পলায়নপরতার সুস্পষ্ট পরিচয় ।

গাথার এই ট্রাজেডির কারণ বহির্জাগতিক নয় । চরিত্রসমূহের অন্তর্গূঢ়-চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যই বিয়োগান্তক পরিণতির সূচনা করেছে । বীরসিংহ ও তার পুত্রের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং নির্মম বংশগৌরববোধই এই ট্রাজেডির কারণ বলে প্রত্যক্ষদৃষ্ট । তবে এর গভীরতর কারণ অনুসন্ধান করলে তারাইয়া রাজার অদূরদর্শিতা, বংশগৌরব বৃদ্ধির সানু-অভিলাষকেও দায়ী করতে হয় । তাছাড়া চম্পাবতীর হৃদয়গত সংবেদনশীলতা, বিষয়বুদ্ধিবর্জিত যৌবনধর্মের স্বাধীন স্বেচ্ছাগামিতা প্রভৃতি অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যও গাথার ট্রাজিক পরিণতিকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল থেকেছে । চরিত্রসমূহের অন্তর্জাগতিক বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক হয়ে এই গাথার ট্রাজিক পরিণতি তাৎপর্যপূর্ণ ।

আন্ধা বন্ধু

'আন্ধা বন্ধু'[৮৮] গাথার চরিত্রগুলোর কোনোটিই বিকশিত নয় । পথভিখারী সহায়সম্বলহীন অন্ধ বংশীবাদকের পূর্বপরিচয় অজ্ঞাত । সে মনোমোহিনী সুরে বাঁশী বাজাতে পারে, কিংবা ভালোবাসার মর্যাদা দিতে জানে, তৃষিতজনের প্রতি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সে, কিংবা নিজের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, যে-সচেতনতা থেকে সে যথার্থভাবে উপলব্ধি করে যে তার সঙ্গে রাজকন্যার পরিণয় অসম্ভব — এরকম দুই চারটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উন্মোচন ছাড়া তার চরিত্রটি বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি । আকাঙ্ক্ষিতজনের কল্যাণকামনায় তার ব্রাত্য হৃদয় এমনই উৎসর্গিত যে আত্মবিসর্জনেও সে নির্দ্বিধ । এই আত্মত্যাগ তার চরিত্রকে আরও মহিমান্বিত করেছে । তার চরিত্রের ঔদার্য, নিঃস্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতামুক্ত প্রসারতা, নিষ্কলুষতা এপ্রকার বোহেমিয়ান-সুলভ ঔদাসীন্য প্রভৃতি তাকে মহত্তর করেছে । ময়মনসিংহের গীতিকার রচয়িতাগণ চরিত্র নির্বাচনে টাইপ চরিত্রের পরিবর্তে যে গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জীবনরসাশ্রিত, নানা গুণে গুণান্বিত বিভিন্ন প্রকার চরিত্রের শরণাপন্ন হয়েছেন, তার প্রমাণ এই গাথায়ও সুস্পষ্ট । অন্ধ বংশীবাদক চরিত্রটি ময়মনসিংহের গীতিকার চরিত্রের মধ্যে অভিনবত্বে উজ্জ্বল ।

যে-রাজকন্যা তার বাঁশীর সুরে মুগ্ধ তার পিতার চরিত্রের ঔদার্যের প্রকাশ লক্ষণীয় । অন্ধের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

তিনি অনেক কিছু করতে সম্মত ছিলেন । রাজকন্যার স্বামীর চরিত্রটি এখানে মোটেই বিকশিত নয় । রাজকন্যার প্রতি তার অনুরাগ প্রবল এবং সেই অনুরাগবশত সে রাজকন্যার জন্য রাজ্য পর্যন্ত উৎসর্গ করতে সম্মত । এমনকি প্রতিশ্রুতি কার্যকর করতে গিয়ে তাকে স্ত্রী বিসর্জন দিতে হয়েছে । এক্ষেত্রে তার কোনো সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায় না । স্ত্রী বিসর্জনে তার মনোভাব প্রকাশ না পাওয়ায় তার চরিত্রের মহত্ত্ব কিংবা দুর্বলতার পরিমাপ করা দুঃসাধ্য ।

এই গাথার সবচেয়ে উজ্জ্বল ও সক্রিয়তার পরিমাপে তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্র রাজকন্যার । সে কৈশোরেই বাঁশীর সুরে মুগ্ধ । পরে বংশীবাদক অন্ধের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে তার মধ্যে প্রণয়বাসনা অঙ্কুরিত হয়েছে । রাজকুমারীর যৌবন প্রাপ্তির সঙ্গে সমানুপাত গতিতে বিকাশলাভ করেছে এই প্রণয়াকাঙ্ক্ষা । সে তার এই হৃদয়বৃত্তিকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়েছে । প্রণয়যাচঞা করেছে বংশীবাদক অন্ধ বন্ধুর । কিন্তু অন্ধ বন্ধু এই হার্দ্য দুর্বলতাকে স্বীয় অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতার কারণে প্রশ্রয় দিতে পারেনি । কিন্তু রাজকুমারী আশাহত হলেও আশাত্যাগ করেনি । পিতৃদত্ত বিবাহে সম্মত হয়ে ভিন্ন দেশী রাজার সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে যুক্ত হলেও রাজকন্যার মনে যে অন্ধ বন্ধুর প্রতি অনুরাগ সুপ্ত ছিল তার প্রমাণ পরবর্তী সময়ে স্পষ্ট হয় । পিতৃদত্ত বিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করলেও রাজকুমারীর বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশ অন্যত্র লক্ষণীয় । ভিন দেশী রাজার সঙ্গে দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করার সময় সে-দেশে বংশীবাদকের মন মাতানো সুর ধ্বনিত হলে সে স্বামীর অন্ধ অনুরাগের সুযোগে বংশীবাদকের কাছে স্ত্রী উৎসর্গের আবদার তুলেছে । এক্ষেত্রে রাজকুমারীর দুঃসাহসী মনের পরিচয় স্পষ্ট । স্বামীর সংসার সে সতীত্বের গর্বেই পরিত্যাগ করে বংশী বাদকের অনুগামী হয়েছে । সুরের উন্মত্ততা তার মধ্যে এমন চরমভাবে ক্রিয়াশীল যে সমাজ-সংসার-ঐশ্বর্য-প্রতিপত্তি-স্বামী-পিতা-মাতা-পরিবার-পরিজন ত্যাগ করেই সে নিশ্চেষ্ট হয়নি, শেষ পর্যন্ত আত্মবিসর্জনও দিয়েছে । চরম ভাবাবেগতাড়নাই এই চরিত্রটির প্রধান বৈশিষ্ট্য । রাজকুমারীর সঙ্গে তুলনায় অন্ধ বংশীবাদকের চরিত্রটি বহুগুণে বাস্তবানুগ ।

এই গাথার আখ্যানভাগ সুস্পষ্টভাবে দুই অংশে বিভক্ত । প্রথম অংশে অন্ধ বংশীবাদকের সঙ্গে রাজকন্যার পরিচয়, ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের মধ্য দিয়ে মনে অনুরাগের জন্ম, প্রণয়যাচঞা, প্রত্যাখ্যাত এবং ভিনদেশী রাজকুমারের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে । দ্বিতীয় অংশে ভিন দেশী রাজকুমারের দেশে বংশীবাদকের আগমনে রাজকন্যার মনে অনিয়ন্ত্রিত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি, স্বামী ত্যাগ, গৃহত্যাগ ও পরে বংশীবাদকের সঙ্গে আত্মবিসর্জন প্রভৃতি ঘটনাগুলি বিধৃত হয়েছে ।

এই গাথার আখ্যানভাগে নাটকীয় গুণ সর্বাংশে বিদ্যমান । আখ্যানভাগে জটিলতা উন্মেষের সুযোগ থাকলেও রচয়িতা তা পরিহার করেছেন । পিতৃদত্ত বিবাহে রাজকন্যার অসম্মতি প্রকাশ পেলে কিংবা বংশীবাদকের অনুগামী হওয়ার সময় রাজপুত্র স্বীয় স্ত্রীকে বাধা প্রদান করলে কাহিনী জটিলরূপ নিতে পারত এবং সেটাই ছিল স্বাভাবিক । কিন্তু রচয়িতা যেন ইচ্ছাকৃতভাবে ঐসব জটিলতা পরিহার করে সহজে গাথার পরিণতি সাধনে তৎপর হয়েছেন ।

এই গাথার অনুরূপ একটি গাথা পার্বত্য হাজংদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে । দীনেশচন্দ্র সেন-এর

Dhaka University Institutional Repository

ভাষ্য অনুযায়ী, "সেই গানটি হয়ত মূল গান, কিন্তু সনাতন ভূঁইয়া এবং ও বাঙালীরা উক্ত গানটি অনেকটা নিজেদের ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া ইহাকে বর্তমান আকারে পরিণত করিয়াছে।" [৮৯] এই অনুমান হয়ত যথার্থ। বংশীবাদকের সংসারবিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রা এবং তার প্রতি রাজকন্যার অন্ধ অনুরাগের মধ্যে, স্বামীর কাছে রাজকুমারীর দুঃসাহসিক প্রস্তাবে উপজাতীয় ও পার্বত্য জীবনের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

এই গাথার পরিণতি বিয়োগান্তক। বহিরারোপিত কোনো দ্বন্দ্ব কিংবা শক্তি এই পরিণতির জন্য দায়ী নয় — একথা সর্বাংশে সঠিক নয়। অন্ধ বংশীবাদক ও রাজকন্যার সামাজিক অবস্থানগত বৈষম্য তাদের স্থায়ী সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরোক্ষ অন্তরায় হিসেবে ক্রিয়াশীল থেকেছে। তবে প্রত্যক্ষত প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুই পুরুষ-নারীর চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্যবৈশিষ্ট্যই এমন পরিণতির সৃষ্টি করেছে। বাঁশির সুরে অন্ধভাবে বিমোহিত রাজকন্যার চরম ভাবাবেগতাড়না এবং অন্ধ বংশীবাদকের স্বীয় অবস্থান সম্পর্কে সচেতন বাস্তবানুগ উপলব্ধিই এই ট্র্যাজেডির মূল কারণ। পাঠকহৃদয় উভয়ের আত্মবিসর্জনের সঙ্গে একাত্ম, সহানুভূতিতে আর্দ্র। দুই চরিত্র বিশ্ব পরিমণ্ডলের যেকোনো শাশ্বত প্রণয় মহিমাযোগ্য উদাহরণ সৃষ্টি করায় উভয়ের প্রতি পাঠকের প্রবল সহানুভূতি রয়েছে। এমনিভাবে অনুরাগধর্মী আবেদনবাহী এই গাথার পরিণতি সার্থকতামণ্ডিত।

বগুলার বারমাসী

'বগুলার বারমাসী'[৯০] গাথার কেন্দ্রীয় চরিত্র বগুলার মধ্যে বিভিন্ন উন্নত বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছে। স্বাধীনমনস্ক চিত্তবৃত্তি, সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দৃঢ় মনোবল, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা, প্রণয়ীজনের নিকট বিশ্বস্ততা, তার মঙ্গলকামনা, প্রভৃতি বগুলা-চরিত্রের মহত্তম বৈশিষ্ট্য। পিতার ইচ্ছা ছিল রাজকুমারকে কন্যা সম্প্রদান করে সমাজে সুনাম বৃদ্ধি করবে। কিন্তু বগুলা নিজেই পতি নির্বাচন করে পিতৃইচ্ছার বিরোধিতা করেছে। বণিক বন্ধুকে পতি হিসাবে বরণ করে বগুলার স্বাধীন চিত্তবৃত্তির জয় হলেও সে সুখী হতে পারেনি। স্বামী তার বাণিজ্য ব্যপদেশে হয়েছে প্রবাসী। এসময়ে প্রণয়ীর প্রতি বগুলার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা বিশেষ উজ্জ্বলতায় ভাস্বর। স্বামীর প্রবাসকালে বগুলার পরিণয়-বঞ্চিত রাজপুত্র বগুলার কাছে প্রণয়নিবেদন করে। এক্ষেত্রে বগুলার প্রত্যুৎপন্নতা, চিত্তসংযম, পতির মঙ্গলচিন্তা এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়। স্বামীর বিপদাশঙ্কা করে বগুলা রাজপুত্রকে সরাসরি উপেক্ষা করেনি, সে কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। রাজপুত্রকে মিথ্যা অনুরাগের নাম করে বণিক-পতির প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত নিবৃত্ত রাখার চেষ্টা করেছে। রাজপুত্রের সঙ্গে পত্র বিনিময়ে বিশ্বাসহন্ত্রী হওয়ার আশংকা জেনেও দৃঢ় মনোবল এবং নিজের ওপর প্রবল আস্থার কারণেই সে এপথে অগ্রসর হতে পেরেছে। তাছাড়া এর কোনো বিকল্পও সে খুঁজে পায়নি। এর বিকল্প ছিল সরাসরি প্রত্যাখ্যান, কিন্তু তাহলে তার প্রণয়ী-পতির বিপদের আশংকা ছিল প্রচুর। এক্ষেত্রে তার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসাই করতে হয়। নিজের প্রতি, নিজের প্রণয়াকাঙ্ক্ষার প্রতি তার প্রবল আস্থার বিষয়টি পরবর্তীকালেও পরিদৃষ্ট হয়েছে। রাজপুত্রের প্রতি সর্বশেষ কৌশলপূর্ণ চিঠিটি ননদের হাতে পড়লে ঠিক ঐসময়ে

Dhaka University Institutional Repository

গৃহে প্রত্যাগমনকারী বণিক-পতিও তা পড়তে পারে । পরপুরুষে আত্মনিবেদনের উপযুক্ত প্রমাণ পেয়ে বণিক-পতি তাকে নির্বাসন দেয় । এই নির্বাসনের বিরুদ্ধে বগুলাকে বিদ্রোহী হতে দেখা যায় না । বরং তাকে অনেকটা শান্ত এবং পরিণাম সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত ও মীমাংসিত বলে মনে হয় । স্বীয় প্রণয়বাসনার প্রতি আন্তরিকতা, সতীত্বের প্রতি, নিজের বুদ্ধির প্রতি আস্থা ও দৃঢ় মনোবল প্রভৃতির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় এই পর্যায়ে । নির্বাসন-জীবনে বগুলা অন্য এক রাজপুত্রের নজরে পড়ে, তারও প্রণয়যাচঞার সম্মুখীন হয় । এক্ষেত্রেও সে পতির আশা থেকে বিচ্যুত নয় । রাজপুত্রের সঙ্গে প্রতারণার কৌশল নেয় বগুলা । শেষ পর্যন্ত সফলতা লাভ করে সে । বুদ্ধিমত্তা, স্বীয় প্রণয়বাসনার প্রতি পরম আন্তরিকতা, দৃঢ় মনোবল প্রভৃতিই বগুলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করেছে । এই চরিত্রটির উন্মোচনে রচয়িতা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পরিবর্তে তার সক্রিয়তার ওপর নির্ভর করেছেন । আচার-আচরণ-উচ্চারণের মধ্য দিয়েই বগুলার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে ।

এই গাথায় বগুলা চরিত্রের সমকক্ষ কোনো চরিত্র নেই । বগুলার স্বামী বগুলাকে পরপুরুষগামী ভেবে তাকে নির্বাসন দিতে যত-না সক্রিয়, অন্য ক্ষেত্রে তেমন সক্রিয় নয় । এই গাথায় বগুলার সক্রিয়তাই বিশেষভাবে লক্ষণীয় । স্বীয় পতি নির্বাচনে, পতির প্রবাসজীবনকালে পরপুরুষের লুব্ধ প্রস্তাব থেকে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে, কিংবা নির্বাসনজীবনে আশ্রয়দাতা রাজপুত্রের রূপমোহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে পতি লাভের প্রচেষ্টায় — সর্বত্রই তার সক্রিয়তা প্রশংসনীয় । বগুলার সক্রিয়তার কাছে দুই রাজপুত্রের রূপমোহ চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে সক্রিয়তাও তুল্য নয় । দুই রাজপুত্র ও বণিক-স্বামী তিনজনেই চরিত্র হিসাবে বগুলার নিকট ম্লান ।

এই গাথার আখ্যানভাগ বিভিন্ন বিবেচনায় বৈচিত্র্যময় । এর আখ্যানভাগে মহাকাব্যিক, গীতিময় ও নাটকীয় — এই তিন উপাদানেরই সুসমন্বয় লক্ষ্য করা যায় ।[৯১] রচয়িতার পরিমিতিবোধও প্রশংসনীয় । সমগ্র কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে বগুলার দৃষ্টিকোণ থেকে । রচয়িতার দৃষ্টি সমগ্র গাথা জুড়ে কেবল বগুলার ওপরই নিবদ্ধ থেকেছে, অন্য কোনো চরিত্রের ওপর পতিত হয়নি ।

নামকরণের দিক থেকে এই গাথা একটি বারমাসী । মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে বারমাসী একটি বহুবর্ণিল বৈচিত্র্যময় সাহিত্য-উপাদান । গাথার চারশ তেইশ ছত্রের মধ্যে অর্ধেকেরও কম অর্থাৎ একশ পচাশি ছত্র বারমাসী বর্ণনায় ব্যয়িত হলেও বারমাসী বর্ণনাই এই গাথার মৌল আকর্ষণীয় বিষয় । বারমাসীর পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণের জন্য এবং তার উপসংহার টানার জন্য প্রারম্ভ ও সমাপ্তি পর্বে কাহিনীর যে-বৃদ্ধি ঘটেছে, তা অপ্রয়োজনীয় নয় বরং সামগ্রিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে তাৎপর্যময় । উভয় অংশের বর্ণনায় মহাকাব্যিক উপাদানের পরিচয় সুস্পষ্ট । ঘটনাবলীর প্রতি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ এবং সূচনা থেকে উপসংহার পর্যন্ত পাঠকদের মনোযোগ অব্যাহতভাবে অক্ষুণ্ণ রাখতে ক্রম বর্ণনার গাঁথুনির মধ্যে এই উপাদান লক্ষ্যযোগ্য ।

এই গাথার প্রতিটি পর্ব বিভাগ নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগের মতো বিন্যস্ত। রচয়িতা নাটকীয় উপস্থাপনার মতোই ঘটনার মধ্যে ছেদ টেনেছেন — যা পাঠককে কল্পনা করে পূর্ণ করে নিতে হয় । এক্ষেত্রে রচয়িতার পরিমিতিবোধ অসাধারণ ।

Dhaka University Institutional Repository

... কবি তাহার রচনা কোনাইয়া দীর্ঘ করেন নাই, বরং তাঁহার লেখা কিছু অতিরিক্ত পরিমাণে সংক্ষিপ্ত। অনেক ঘটনা কবি ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছেন গান-ভাগের জন্য যেটুকু দরকার সেইটুকু রাখিয়া তিনি অপরাংশ ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন — ...৯২

এই গাথার রচনাভঙ্গি থেকে অনুমান করা যায়, এর রচয়িতা নৃত্যোপযোগী বা অভিনয়োপযোগী করে গাথাটি রচনা করেছেন। — যেখানে সাধুত্য কথার পরিবর্তে অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতাকে ঘটনা সম্পর্কে অধিকাংশ ধারণা দেওয়ার প্রচেষ্টা চলে। 'শ্যাম রায়', 'নইযার বন্ধু', 'ধোপার পাট' প্রভৃতি গাথায় এধরনের রচনাভঙ্গি পরিদৃষ্ট হয়।

সূচনাতে বণিক-কন্যার সঙ্গে তার তরুণ বন্ধুর প্রণয়বাসনা প্রকাশের সংলাপধর্মী দৃশ্য বর্ণনার পরে রচয়িতা অনেক ঘটনা বাদ দিয়েছেন। বণিক-কুমারী এখানে বলেছেন, তার পিতা তাকে রাজমহিষী করার প্রলোভনে মুগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু রাজকুমারকে তিনি ঘৃণা করেন এবং তাকে কোনোভাবেই বিয়ে করতে ইচ্ছুক নন, তিনি তার তরুণ বন্ধুর সঙ্গেই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে প্রত্যাশী। এরপরে দেখা গেল, কন্যার প্রবল আপত্তি-হেতু বণিক পিতা রাজপুত্রের পরিবর্তে তার বণিক-বন্ধুর সঙ্গে বিয়ে দিলেন, দাম্পত্য জীবনের প্রথম অধ্যায়ে উভয়ের মিলন-মধুর বহু দিন অতিবাহিত হল — কিন্তু রচয়িতা এর কোনো বর্ণনা না দিয়ে সরাসরি পরবর্তী যে-দৃশ্যে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিলেন সেটি একটি বিদায়দৃশ্য — সেখানে বণিক-কন্যার পতি বাণিজ্য-গমনোদ্যত, সে কারণে বণিক-কন্যার মধ্যে উৎকণ্ঠা এবং পতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাহেতু উদ্বেগময় পরামর্শ প্রদানের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় বা দৃশ্যের মধ্যবর্তী ঘটনাগুলির ইঙ্গিত থাকে, কিন্তু বিবৃতি নেই, পাঠককে কল্পনাদ্বারা তা পূরণ করতে হচ্ছে। তবে এতে ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা কোনোভাবে ব্যাহত হয়নি।

এরকম নাটকীয় উপাদান এই গাথার সর্বত্র লক্ষণীয়। বহুকাল পতির প্রতীক্ষায় কাটিয়ে বগুলা যখন নিরাশার যন্ত্রণায় দগ্ধ, রাজপুত্রকে কৌশলে নিবৃত্ত করার আর কোনো সুযোগ নেই, পতির মঙ্গলকামনাহেতু নিজে আত্মবিসর্জনের জন্য প্রস্তুত, ঠিক সেই মুহূর্তে রাজপুত্রের প্রতি চিঠি বিনিময়ের ঘটনা ফাঁস হল, বণিক-পতির অকস্মাৎ প্রত্যাবর্তন ঘটল, ঘটনা অপ্রত্যাশিতভাবে নতুন বাঁক নিল — প্রভৃতি উপাদানগুলিও সর্বাংশে নাটকীয়তায় আচ্ছন্ন।

পতির বাণিজ্যযাত্রার পরে বগুলার প্রোষিতভর্তৃকা নারীর বিরহকাতর জীবনের দুঃখবর্ণনার মধ্যে বগুলার পরিণয়-প্রত্যাশী রাজপুত্রের নিকট থেকে প্রণয়যাচঞার পত্র এসে উপস্থিত। শুরু হল বগুলার বারমাসী দুঃখের বর্ণনা। এই বর্ণনায় বাংলার প্রাকৃতিক ঋতু-বৈচিত্র, ধর্মীয় উৎসব, পর্ব প্রভৃতির সঙ্গে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে একজন বিরহ-তপ্ত নারীর হৃদয়বেদনা ও পরপুরুষের লুব্ধ-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষার জন্য প্রতারণাছলে আত্মসন্দীপ্ত মনের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। প্রতিটি মাসের আলাদা আলাদা ঋতু বৈচিত্র বর্ণনায় গীতময় পরিচর্যা ব্যবহৃত হয়েছেঃ

আষাঢ় মাসেত গাঙারে বহিছে উজানী।
শুকনা নদীতে নাইমা জোয়ারের পানি॥
দেয়ায় ডাকে ঘন ঘন মেঘে শীতল পানি।
পিয়ালে ডাকিয়া বলি অবলা দুক্ষিনী॥

Dhaka University Institutional Repository

এই মেঘে নাইরে পানি আমার লাগিয়া ।
অ খথির পাতা চইল্যা পড়ে আসমান চাহিয়া ॥
বিধি নিদারুণ হইল তাই যত দুঃখু যায় ।
আষাঢ়ের ভরা নদী এমুনে শুকায় ॥
শুন শুন বিধুর দেওয়ারে তাকে কাঁপে মাটি ।
দিনে যৈবন গঙ্গা ধরিলেক ভাঁটি ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ২২৪)

গাথা-রচয়িতা তার বর্ণনায় এত সংক্ষিপ্ত পরিসর ব্যবহার করেছেন যে আশ্চর্য দক্ষ শিল্পীর মতোই এক্ষেত্রে তার ভূমিকা । লেখকের পরিমিতিবোধেরও চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায় যখন আমরা লক্ষ্য করি যে, বগুলার দেহসৌন্দর্য উপভোগের জন্য দু দু জন রাজপুত্র বিভোর হলেও এই দেহসৌন্দর্য বর্ণনায় তিনি একটি পংক্তিও ব্যবহার করেননি ।

এই গাথার পরিণতি মিলনাত্মক । ময়মনসিংহের গীতিকার অধিকাংশ গাথার পরিণতি বিয়োগাত্মক । লোকসাহিত্যে বিয়োগাত্মক পরিণতিই যেন স্বাভাবিক । সেই দিক থেকে এই পরিণতি ব্যতিক্রমধর্মী । কিন্তু তা আরোপিত কিংবা যুক্তি-পরম্পরা বিচ্ছিন্ন নয় । এ ধরনের পরিণতিতে গাথার শিল্পসৌন্দর্য ব্যাহত হয়নি । এই পরিণতির চারিত্র্য বৈশিষ্ট্যও বহিরারোপিত নয় । চরিত্রসমূহের যথাযথ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই যুক্তিসঙ্গতভাবে এ-ধরনের পরিণতি সংঘটিত করেছে । দীনেশচন্দ্র সেনের উক্তিটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য :

> যদিও পালাগানটিতে নানারূপ কষ্টের ও দুঃখের চিত্র অবতারিত হইয়াছে, তথাপি ইহার পরিণাম শুভ । পল্লীকবিরা সংস্কৃত কাব্যের নিয়মগুলি একেবারেই আমলে আনিতেন না । এইজন্য প্রাচীন পালাগানের অনেকগুলি বিয়োগাত্মক । এই গানটি পল্লী নিয়মের ব্যতিক্রম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ।[৯৩]

সন্নমালা

'সন্নমালা'[৯৪] গাথাটি অসম্পূর্ণ ও রূপকধর্মী হওয়ার কারণে এখানে কোনো চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়না ।[৯৫] সন্নমালা এই গাথার কেন্দ্রীয় চরিত্র । তাকে কেন্দ্র করেই কাহিনী অগ্রসর হয়েছে রাজা ও রানীর বহু সাধনার ফলে জন্ম হওয়ার স্বাভাবিকভাবে কন্যার প্রতি পিতা-মাতার স্নেহপ্রাবল্য লক্ষণীয় । কন্যা বিবাহযোগ্যা হলে পিতামাতা যখন তা-নিয়ে চিন্তিত, তখন গণকের গণনায় আবিষ্কৃত হল যে এই কন্যার দ্বারা পিতা-মাতার অনিষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে । অতএব নির্বাসন জীবনই তার প্রাপ্য । কন্যা সন্নমালা পিতা-মাতার নির্দয় আচরণকে অদৃষ্টলিপির বিধান হিসেবে গণ্য করে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়নি । তার বনবাসজীবনের কঠোরতাও এই গাথায় উল্লিখিত নয় । সাধুর সঙ্গে অজানার উদ্দেশে যাত্রায়ও তার যাওয়া-না-যাওয়ার বিষয়ে মতামত প্রবল নয় । সাধু পুত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় তার মনে যে প্রণয়াকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছে, তা নারীধর্মের স্বাভাবিক আচরণ হিসেবে গণ্য । তবে তার পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার প্রতিশ্রুতিতে সক্রিয়তা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় সুস্পষ্ট । এবং পরবর্তী সময়ে প্রতিশ্রুতি পালনে তার দৃঢ়তা ও হার্দ্য আকাঙ্ক্ষার প্রতি আনুরক্তিতা তার চরিত্রকে মহত্তর করেছে ।

Dhaka University Institutional Repository

সন্নমালার পরেই এই গাথার উল্লেখযোগ্য চরিত্র সওদাগরপুত্র। স্বেচ্ছাচারী রাজার অন্যায় আচরণের শিকার হয়ে তাকে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে। যৌবনধর্মের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী, সন্নমালার রূপে মুগ্ধ সাধুপুত্র তার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে তা রক্ষা করার পূর্বেই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। পিতার প্রৌঢ় জীবন রাজার স্বেচ্ছাচারী আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে অক্ষম — এই প্রকার সচেতনতার জন্যই সন্নমালার প্রতি প্রবল অনুরাগ সত্ত্বেও বিদেশযাত্রার সিদ্ধান্ত তার চরিত্রের মহত্ত্বকে ভিন্ন মাত্রায় উজ্জ্বল করেছে। তার সক্রিয়তা, দায়িত্বসচেতনতা, ব্যক্তিত্ব এবং সবশেষে রাজার চরম স্বেচ্ছাচারের শিকার হয়ে আত্মবিসর্জন প্রভৃতি পাঠকহৃদয়কে তার প্রতি সহানুভূতিশীল করে।

অন্যদিকে সন্নমালার পিতা-মাতার কুসংস্কারের প্রতি আত্মসমর্পণ, রাজদোত, সাধুর প্রতি রাজার স্বেচ্ছাচারী অন্যায় আচরণ, অত্যাচার-নির্যাতন, রাজপুত্রের কামজটিলতা, কুটিল ষড়যন্ত্রকারীর প্রতিনয় প্রভৃতি সংকীর্ণতা এই গাথার ঐ সব চরিত্রকে ম্লান করেছে। সন্নমালা গাথার কাহিনী অসম্পূর্ণ।[৯৬] রূপকথাধর্মিতা অতিলৌকিক উপাদানসমূহের উপস্থিতি প্রভৃতি এই গাথার গীতিকাধর্মকে অনেকটা ম্লান করেছে। রাজা ও রানীর নিঃসন্তান-অবস্থা নিরসনের জন্য উভয়ের সাধনার ফলে এক কন্যা সন্তানের জন্মলাভ, দৈবজ্ঞ কর্তৃক তার অদৃষ্টলিপিতে রাজার অনিষ্ট হওয়ার বিধান গণকের গণনায় আবিষ্কৃত হওয়া, ফলে কুসংস্কারবশত রাজা কর্তৃক কন্যার নির্বাসনদণ্ড দান প্রভৃতি ঘটনায় সংস্কারাচ্ছন্ন উপাদান যেমন রয়েছে, তেমনি সাধুর সপ্ত ডিঙা চড়ায় আটকে পড়া এবং ভাসমান হওয়ার মধ্যে অতিলৌকিক উপাদানের উপস্থিতি লক্ষণীয়।

আখ্যানভাগ সন্নমালার নির্বাসনদণ্ডের মধ্য দিয়ে যে-জটিলতামুখী হয় তা সাধু কর্তৃক উদ্ধারের পর সরলগতি লাভ করে। কিন্তু এই সরলগতি ব্যাহত হয় সন্নমালাকে ভিনদেশের রাজকন্যা কর্তৃক সখীত্ব বরণের আমন্ত্রণে। সেখানকার রাজপুত্র সন্নমালার প্রতি কামজমোহে পতিত হয়। কিন্তু রাজকন্যা সন্নমালার কাছ থেকে সাধুপুত্রের প্রতি অনুরাগের কথা জানতে পারে। রাজপুত্র সন্নমালাকে লাভের ভিন্নউপায় অনুসন্ধান করে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। রাজপুত্রের কুটিল ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সাধুপুত্রের জীবনহানি ঘটে, কিন্তু সন্নমালাকে রাজপুত্র করায়ত্ত করতে সক্ষম হয়না। মৃত প্রণয়ীর সহগামী হয় সন্নমালা।

কাহিনী অসম্পূর্ণ হলেও এখানে একটি পর্বের সম্পূর্ণতা লক্ষণীয়। সন্নমালার মধ্যে বেহুলার চরিত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট।[৯৭]

এই গাথায় রচয়িতার শৈল্পিক সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষমতা লক্ষণীয়। নির্বাসিতা জীবনে সন্নমালা যে-বনে আশ্রয় লাভ করে, সেই বনের যথাযথ সৌন্দর্য বর্ণনায় রচয়িতা যেমন নিপুণ তেমনি সওদাগরের দেশে রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে রাজকন্যার সঙ্গে সন্নমালার মিলনের দৃশ্যটিও কবিত্বগুণে সম্পূর্ণ।

আকর বাকর চম্পা নাহি হয় বাসি।
ফুট্যা রইছে সমুদ্রায় সোনালী অতসী॥
দুই সইয়ে লোনাবুনি বনেত বেড়ায়।
মধুমাসে ডালে বইস্যা কুইলাতে গায়॥
পরথম যৈবন দোঁহে রূপে ত উজালা।
পুষ্প তুলিয়া দোঁহে গাঁথে বনমালা॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ২৮৫)

Dhaka University Institutional Repository

দীনেশচন্দ্র সেন এই গাথার বিশেষত্ব হিসেবে এর গ্রাম্য সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্যটিকে চিহ্নিত করেছেন।[১৮] এই গাথার আখ্যানভাগের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো : এখানে পূর্ণ গাথাটি পদ্যে রচিত নয়। মাঝে মাঝে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে গদ্যে। 'কাঞ্চনরেখা'য় এধরনের বর্ণনার পরিচয় মেলে। গাথাগুলো যে অভিনীত হত এবং মাঝে মাঝে অভিনয়ের একঘেয়েমি পরিহার করে বৈচিত্র আনয়নের জন্য গদ্যবর্ণনা যুক্ত হয়েছে, — তার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই গাথা। এই গাথায় হাতে কলম তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রণয় নিবেদনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী গাথা মহুলার বারমাসীতেও অনুরূপ ঘটনা দৃষ্ট হয়। সেখানেও প্রণয়নিবেদনের কৌশল হিসেবে হাতে কলম তুলে দেওয়ার ঘটনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

গাথাটি অসম্পূর্ণ হলেও এর একটি পরিণতি আছে। সে পরিণতি ট্র্যাজিক। সাধু পুত্রের মৃত্যু এবং মনুমালার মৃত প্রণয়ীর অনুগামী হওয়ার মধ্য দিয়ে এই ট্র্যাজিক পরিণতি বিধৃত হয়েছে। এই পরিণতির জন্য মনুমালা কিংবা সাধুপুত্রের কারো চরিত্রের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য দায়ী নয়। মূলত এই পরিণতির কারণ বহিরারোপিত। রাজার চরম স্বেচ্ছাচারী মনোবৃত্তি, রাজপুত্রের কামজ মোহ ও কুটিল ষড়যন্ত্রই সাধুপুত্রের মৃত্যুর কারণ হয়েছে।

বীরনারায়নের পালা

'বীরনারায়ণের পালা'র[১৯] কেন্দ্রীয় চরিত্র বীরনারায়ণ। গাথাটি সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হতে পারেনি, ফলে এই চরিত্রটিও সম্পূর্ণ বিকশিত রূপে পরিদৃষ্ট নয়। তবু অসম্পূর্ণ অবিকশিত অবস্থায়ও এই চরিত্রটির বীরত্ব, সাহসিকতা, মানবিকতা, প্রণয়ে একনিষ্ঠতা প্রভৃতির পরিচয় অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে স্ফুটমান। জমিদার-পুত্রের মন সাধারণত প্রজাসাধারণের প্রতি বা দরিদ্র-দুঃখীর প্রতি উদাসীন হবে — সেটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু বীরনারায়ণ জমিদার-পুত্র হলেও সোনা নাম্নী দরিদ্র প্রজা-কন্যা যখন দুরন্ত ব্যবসায়ী কর্তৃক অপহৃত হওয়ার সময় উদ্ধার পাওয়ার জন্য চিৎকার করে নির্জন নদীতীরকে দুঃখে ভারী করে তোলে, তখন তার মন উদ্বেল হয়ে ওঠে। অপহৃতা, অত্যাচারিতা অসহায় রমণীকে উদ্ধার মানসে তখন জীবনের ঝুঁকি নিতে সে কুণ্ঠিত হয়নি। বণিকের কবল থেকে সোনাকে উদ্ধার করতে জমিদার-পুত্র যে কৌশল, সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে, তা অভিনব, অপূর্ব। এই চরিত্রটি অঙ্কনে রচয়িতার অপূর্ব শিল্প-দক্ষতার সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতা। সুন্দরী-কুমারী সোনার সঙ্গে একত্রে নির্জনে নৌকারোহনে প্রত্যাবর্তন পথে জমিদার-পুত্রের মনে যে প্রণয়বাসনার সৃষ্টি হয়েছে, তা স্বাভাবিক যৌবনধর্মের লক্ষণ। প্রত্যাবর্তনের পর মহৎ কর্মের প্রশংসার পরিবর্তে সমাজের যে রুষ্ট অভিনন্দন উভয়ে লাভ করেছে, তাতেও বীরনারায়ণ দমিত নয়। তার সক্রিয়তা, বীরত্ব ও দৃঢ়চিত্ততা এতই মহৎ, এতই উচ্চকিত যে সতী ধর্মের প্রতি কলুষতা আরোপের পর কুমারী নারীর মনে যে অসহায়ত্ববোধ চরম আকার ধারণ করে — তাকে সে ঘুচিয়ে দিয়েছে সেই লাঞ্ছনার অংশীদার হয়ে। সোনার প্রতি অনুরাগবশত সে যে এই কর্মে ব্রতী হয়েছে তাই নয়, এর পেছনে তার মমত্ববোধ, লাঞ্ছিতার জীবনের অসহায়ত্ব মোচনের কর্তব্যবোধ প্রভৃতিও ক্রিয়াশীল। বীরনারায়ণের চরিত্র

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীসময়েও একইরূপ কর্তব্যপ্রেরণা, প্রণয়ের প্রতি একনিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বারা উচ্চকিত। পরিবার ও সমাজ কর্তৃক অন্যায়-অপবাদে লাঞ্ছিতা সোনাকে বীরনারায়ণ জীবনসঙ্গিনী করে জমিদারীর সুখ-ঐশ্বর্যের জীবনকে করেছে তুচ্ছ। বনবাসী হয়ে অনভ্যস্ত কষ্টকর জীবন যাপনে ব্রতী হওয়ার মধ্যে প্রণয়িনীর প্রতি তার পরম আস্থা ও একনিষ্ঠার যে পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তা অতুলনীয়। বীরনারায়ণ চরিত্রটি পূর্বাপর ত্রুটিহীন, সকল প্রকার মহৎ গুণকে ধারণ করে এই পালার কাহিনীকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

বীরনারায়ণ চরিত্রের সমানুপাতে উজ্জ্বল অন্য কোনো চরিত্র এই পালায় অনুপস্থিত। সোনা চরিত্রটি কৈশোরক চপলতা কিংবা প্রত্যাশিত জনের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন ছাড়া ভিন্ন কোনো সক্রিয়তা কিংবা বুদ্ধিমত্তায় উজ্জ্বল নয়।

এই পালার অন্য চরিত্র সোনার পিতা কিংবা বীরনারায়ণের পিতা — এমনই আদর্শবান টাইপ চরিত্রের পরিচয় দিয়েছে যে তারা গীতিকার চরিত্র হিসেবে উজ্জ্বল হতে পারেনি। সমাজধর্ম পালন করতে গিয়ে অন্যায়ভাবে সন্তান-শাসনে বীরত্ব প্রকাশিত হয় না — এই উভয় চরিত্রের মধ্যে সেই ত্রুটি বর্তমান।

এই পালার আখ্যানভাগ সম্পূর্ণ নয়।[১০০] কোন একটা সরলরৈখিক গতিতে অগ্রসরমান না হলেও এই পালার কাহিনীতে কোনো বাহুল্য অংশ যুক্তিহীনভাবে সংকলিত হয়নি। যুবক জমিদার-নন্দন বীরনারায়ণের চঞ্চলমতিত্বের সঙ্গে প্রজা-কন্যা কুমারী সোনার চপলতা মিশে পালার আখ্যানভাগ চমৎকার রোমান্সধর্মিতার মধ্য দিয়ে শুরু হলেও তা অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী হয়। সন্ধ্যাকালে নির্জন নদীতীরে সুন্দরী কুমারী কন্যাকে দুরন্ত ব্যবসায়ী কর্তৃক অপহরণের মধ্য দিয়ে আখ্যানভাগে জটিলতা আসে। তবে কাহিনীতে দ্রুতগতি সঞ্চারিত হওয়াও এই অংশের উজ্জ্বলতা বৈশিষ্ট্য। পাঠক হৃদয় সোনার অপহরণ থেকে উদ্ধারলাভ পর্যন্ত আখ্যানভাগের ঘটনাবলীর প্রতি সবচেয়ে বেশি মনোযোগী। ব্যবসায়ীর অপহরণে নাটকীয়তা আছে। অপহৃত সোনাকে বীরনারায়ণ কর্তৃক উদ্ধারের ঘটনায় নাটকীয় উপাদান প্রবলভাবে বর্তমান।

বীরনারায়ণ কর্তৃক সোনাকে উদ্ধারের ঘটনায় মানবিকতাই একমাত্র উপাদান হলেও সমাজের গোঁড়া মানসিকতা ও যুবধর্মের প্রতি স্বাভাবিক অবিশ্বাসের প্রবণতায় সোনা ও বীরনারায়ণ উভয়ে চারিত্রিক কলুষতায় কলঙ্কিত হয়। সোনা সমাজচ্যুত ও পরিবারচ্যুত হয়। অন্যায়ভাবে কলঙ্কিত অসহায় সোনাকে বীরনারায়ণ জীবনসঙ্গিনী করে বনবাসী হয়। সুখে-দুঃখে অনির্বচনীয় আনন্দের আস্বাদনে বিভোর হয়ে জীবন অতিবাহিত হয় বনবাসী যুবক-যুবতীর। কিন্তু তা বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। জমিদারের অনুচরবর্গ কর্তৃক ধৃত হয়ে বীরনারায়ণ সোনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কাহিনী এখানেই সমাপ্ত।

অসম্পূর্ণ হলেও এই আখ্যানভাগ নাটকীয় গীতময় উপাদানে এমনই সমৃদ্ধ ও সুসংবদ্ধ যে, তা কেবলমাত্র 'মহুয়া' পালার সঙ্গেই তুল্য হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

আখ্যানভাগের অসম্পূর্ণতাহেতু এর পরিণতি নির্দেশও দুরুহ। আখ্যানভাগ যেখানে পরিসমাপ্ত, সেখানে প্রণয়িনী সোনার বিরহতপ্ত হৃদয়ের হাহাকার ব্যক্ত হয়। তার প্রণয়ী বীরনারায়ণ পিতার অনুচরদের হাতে বন্দী হয়ে বিচারের যে সম্মুখীন হয় তা সোনার নিকট অনবহিত। এই অবস্থায় কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটলে সোনা ও বীরনারায়ণের জীবনে পরবর্তীকালে কী ঘটল তা জানা যায় না। বিচার কি হবে তাও স্পষ্ট নয়। তবে ধারণা করা যায় তা সোনা বা বীরনারায়ণ কারও জন্য কল্যাণকর কিছু হবে না। এধরনের ট্র্যাজেডি-প্রতিম পরিণতির জন্য সোনা বা বীরনারায়ণ দুজনের কেউই দায়ী নয়। একটি আকস্মিক ঘটনা এবং তাকে কেন্দ্র করে সমাজের অজ্ঞতা, নৃশংসতা, অসহিষ্ণুতা, অন্যায় প্রৌঢ়-মানসিকতা, যুক্তিহীন অবিচার, জমিদারের অত্যাচার-উৎপীড়ন প্রভৃতি দুজনের প্রণয়বাসনা চরিতার্থ হওয়ার পেছনে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে, দুই যুবক-যুবতীর সম্ভাবনাময় জীবনকে করেছে অসুখী ও নৈরাশ্যদগ্ধ।

রতন ঠাকুরের পালা

'রতন ঠাকুরের পালা'[১০১] শীর্ষক পালাটির কেন্দ্রীয় চরিত্র রতন ঠাকুর। একনিষ্ঠ প্রেম, স্বাধীন প্রণয়বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য রাজ্যমোহত্যাগ প্রভৃতি তার চরিত্রকে মহৎ ও বীরত্বব্যঞ্জকতায় উদ্ভাসিত করেছে। প্রণয়ে একনিষ্ঠাই তার মুখ্য গুণ নয়, এক্ষেত্রে তার সক্রিয়তা, স্বীয় আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার জন্য কঠিন জীবনকে বরণ করে নেওয়ার দৃঢ়চিত্ততা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতিও প্রশংসনীয় উপাদান। রাজপুত্র রতন ঠাকুর বাগানের মালাকরের কন্যার গুণমুগ্ধ হয়ে তার প্রণয়যাচঞা করে। এই প্রণয়যাচঞা থেকে শুরু করে স্বীয় প্রণয়িনীর আত্মবিসর্জনের তথ্য অবহিত হয়ে চিরসন্ন্যাস ব্রত গ্রহণের প্রত্যেকটি ঘটনায়ই তার সক্রিয়তা সুস্পষ্ট। গীতিকাসমূহের অন্যত্র প্রায় সর্বক্ষেত্রে নায়কের রূপমুগ্ধতার পরিচয়ই পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে ব্যতিক্রম। গুণমুগ্ধ রতন ঠাকুরেরই একান্ত প্রচেষ্টায় মালি-কন্যা প্রণয়নিবেদনে সাড়া দিতে বাধ্য হয়। উভয়ে যে রাজ্যত্যাগ করে পালিয়েও রতন ঠাকুরের ইচ্ছার প্রাবল্য ও প্রচেষ্টাই মুখ্য। পার্শ্ববর্তী রাজ্যে উভয়ের দাম্পত্য জীবন আনন্দেই অতিবাহিত হয়। এই দাম্পত্য জীবনকে স্বচ্ছন্দ ও সুখময় করে তোলার ক্ষেত্রেও তার ভূমিকাই প্রধান। আবার পিতা কর্তৃক প্রেরিত গণিকার সংস্পর্শজনিত ভ্রান্তিবিলাসে তার আত্মবিস্মৃত হওয়ার মধ্যেও তার সক্রিয়তাই স্পষ্ট, মালিকন্যার নয়।

রতন ঠাকুরের অনুপস্থিতিতে আত্মবিসর্জনের ঘটনা ছাড়া আর কোথাও মালিকন্যার সক্রিয়তা তত স্পষ্ট নয়। তবে রতন ঠাকুরের প্রণয়নিবেদনে সাড়া দিয়ে তার সঙ্গে পুষ্পবনে সাক্ষাৎ কিংবা পরবর্তী সময়ে রাত্রিকালে কদলীবনে প্রতিমার বাহনে তার সক্রিয়তা স্মরণীয়।

আত্মবিস্মৃতাবস্থা দ্রুত অতিক্রম করে রতন ঠাকুর যখন প্রত্যাবর্তন করে মালি-কন্যার নিকট, তখন সে আর জীবিত নেই। স্বীয় ত্রুটির জন্য এই চরম অনিষ্ট সাধন হল, কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়, যাকে অবলম্বন করে সে জীবিত, হৃদয়ের আত্মা ছিল-সে, তার প্রয়াণ রতন ঠাকুরকে অনুশোচনা ও

Dhaka University Institutional Repository

সোনায় দগ্ধ করে বিশুদ্ধভাবে । পুনরায় সংসার জীবনে ফিরে আসা অসম্ভব হ তার পক্ষে । একনিষ্ঠ প্রেমের এক গৌরবোজ্জ্বল উদাহরণ সৃষ্টি করে রতন ঠাকুর । এক্ষেত্রে তার আন্তরিকতা ও দৃঢ়চিত্ততার পরিচয়ই সুস্পষ্ট ।

রতন ঠাকুরের সমান আয়তনের আর কোনো উজ্জ্বল চরিত্র এ-গাথায় পরিদৃষ্ট নয় । মালি-কন্যার চরিত্রটি যতখানি আত্মনিবেদনে উজ্জ্বল, ততখানি সক্রিয়তায় নয় । এক্ষেত্রে দুই রাজা ও গণিকা চরিত্রের সক্রিয়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । রতন ঠাকুরের পিতা পুত্রের মন থেকে মালি-কন্যার প্রতি অনুরাগ বিদূরিত করার অভিপ্রায়ে গণিকা নিযুক্ত করতে দ্বিধাহীন । এক্ষেত্রে তার সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয়ই পরিস্ফুটিত হয়েছে । অন্যদিকে যে-রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে রতন ঠাকুর, সেখানকার রাজাতো গণিকার সঙ্গে রাত্রিযাপনে এবং তাকে সুগ্রথিত মাল্য উপহার দানেই ধন্য । তার অন্তঃপুরে যে বিবাহ-সম্পর্কের বাইরে কেবলমাত্র ভোগ্য সামগ্রী হিসেবে ব্যবহারের জন্য বহু রাণী-রত্নের অবস্থিতি বিদ্যমান, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মালি-কন্যাকেও অন্তঃপুর বাসিনী করার নির্দেশদানে । মধ্যযুগে শাসনকর্তাদের দুশ্চরিত্র জীবনযাপনের এক উজ্জ্বল নিদর্শন এটি । গণিকা চরিত্র অঙ্কনে গাথা-রচয়িতার দক্ষতা পরিদৃষ্ট হয় । গণিকা চরিত্রে যে-অতিলৌকিক উপাদানের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে, তা মূলত সমাজে প্রচলিত কিংবদন্তী থেকে । প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনকাল থেকে উচ্চতর সমাজে গণিকাদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। গনিকাদের কাছে উচ্চবিত্ত মানুষগুলির সহজাত স্বাধীন যৌন আকাঙ্ক্ষা যতখানি নিবৃত্ত হয়, দাম্পত্য জীবনে তা হয় না । গণিকাদের প্রতি উচ্চবিত্ত মানুষগুলির প্রবল আকর্ষণের ফলে তাদের জীবনে গণিকাদের প্রভাবও মারাত্মক । দুর্বল চরিত্রের বহু উচ্চবিত্ত মানুষ গণিকাদের কাছে এতই বশীভূত ছিল যে এরফলে গণিকারা বশীভূতকরণের অতিলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে লোকসমাজে প্রচার ঘটে । এ-গাথায়ও গণিকার ক্ষমতা সম্পর্কে যে বক্তব্য রয়েছে তার কারণ ঐধরনের প্রচার বলে অনুমিত হয় । এই চরিত্রটি অঙ্কনে রচয়িতা বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিলেও রতন ঠাকুরকে নিয়ে একরাত্রির মধ্যে পলায়নের ঘটনায় বস্তুনিষ্ঠতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে ।

এই গাথার আখ্যানভাগে নাটকীয় ও গীতময় উপাদান প্রাধান্য বিস্তার করে আছে । রাজপুত্র রতন ঠাকুর কর্তৃক মালির হাতে সুগ্রথিত মাল্য দর্শনে মাল্য-প্রস্তুতকারিণীর প্রতি যে-কৌতূহল এলো, তার সূত্র ধরেই মালি-কন্যার সঙ্গে পরিচয় ও প্রণয় নিবেদনের প্রসঙ্গ আসে । সূচনা পর্বের এই নাটকীয় উপাদান পরবর্তী অনেক ঘটনায়ই পরিদৃষ্ট হয় । মালি-কন্যার মনে প্রণয়বাসনা উদ্রিক্ত হলেও স্বীয় অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতার ফলেই তার মনে গভীরতর বিশ্বাস জন্মেছে যে রাজপুত্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থায়ী হওয়া অসম্ভব । এক্ষেত্রে রাজপুত্রের প্রবল ইচ্ছা ও সক্রিয়তার ফলেই মালি-কন্যা তার প্রণয়নিবেদনে সাড়া দেয় । পরবর্তীকালে পুষ্পবনে উভয়ের সাক্ষাৎ কিংবা নদীতীরে উভয়ের অভিসারযাপনের ঘটনাগুলোতে গীতময় পরিচর্যা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে । একটি উদাহরণ ঃ

থরথরিয়া কাঁপে অন্তরে বন্ধু মুখে দিল রে ঘাম ।
পাতার মুস্তমন্ ঢোকে বন্ধু টোইব বদনারে ॥
পরান আগো বন্ধুরে —
পরথমে যখনি বন্ধুরে গলায় হাত দিল ।
বন্ধুরে অবশা অঙ্গ কাঁপ্যা না উঠিল রে ॥

Dhaka University Institutional Repository

পরান পাগেলা বন্ধুরে —
পরথমে যখন বন্ধুরে মুখে দিনু মুখ ।
দেহেরে পবখা অঙ্গ আমার কাঁপ্যা উঠে বুকে ॥
পরান পাগেলা বন্ধুরে —
(পূ.গী.টি.খ.দ্বি.স. পৃ ৩২৮ – ২৯)

এধরনের অভিসারের ঘটনা আর একটি মাত্র গাথায় পরিদৃস্ট হয় । সেখানে প্রণয়িনী বিবাহিতা । 'শ্যাম রায়' শীর্ষক গাথায় জোস্না নারী শ্যাম রায়ের প্রণয়নিবেদনে সাড়া দিয়ে স্বামীর প্রবাসজীবনে রাত্রিকালে তাকে গৃহে আমন্ত্রণ জানায় । এই গাথায় গৃহের বাইরে সেদীবনে উভয়ের মিলনে যে স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছে, তাতে রচয়িতার দক্ষ লৌকিক দৃস্টিভঙ্গীর পরিচয়ই সুস্পস্ট । এসব রাত্রি মিলনেও পারস্পরিক অনুরাগে উদ্দীপ্ত দুই নরনারীর জীবন তৃপ্ত নয় । কিন্তু স্থায়ী সম্পর্কের পথে বাধা সমাজ, পরিবার, পিতা-মাতা-আত্মীয়-স্বজন । ফলে রতন ঠাকুরকে পলায়নের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে হয় । পলাতক জীবনে তারা ভিন্ন রাজ্যে অতি সুখে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করে । এদিকে রতন ঠাকুরের পিতা খবর পেয়ে পুত্র-উদ্ধারকল্পে গণিকা নিযুক্ত করে । মজিনুর দেশে গণিকার উপস্থিতিতে নাটকীয় উপাদান লক্ষণীয় । দ্রুতগতিতে এখানকার ঘটনাগুলি সংঘটিত হওয়ার ভেতরেও নাটকীয়তার প্রভাব পরিদৃস্ট হয় । গণিকা রঙিলা ঢোল পিটিয়ে তার উপস্থিতির কথা প্রচার করে । রাজার কাছে খবর পৌঁছলে তিনিই প্রথম গ্রাহক হয়ে উপস্থিত হন রঙিলার গৃহে । রাজা যে মাল্য দ্বারা গণিকাকে সন্তুস্ট করেন, সেই মাল্য প্রস্তুনকারীকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার আগ্রহ ব্যক্ত করে রঙিলা । পরদিনই মালি-রূপী রতন ঠাকুরের পদার্পণ ঘটে সেখানে । একদিনের মধ্যেই রতন ঠাকুরকে রঙিলা উধাও হয়ে যায় মজিনুর দেশ থেকে । গণিকার পলায়নে রাজার রোষ পড়ে মালির ওপর । তিনি মালির ঘরে অগ্নিসংযোগের নির্দেশ দেন, তার ঘরে সুন্দরী বধূ আছে শুনে তাকেও রাজগৃহে আনয়নের নির্দেশ দেন । রতন ঠাকুরের অবর্তমানে রাজার অন্তঃপুরবাসিনী হওয়ার আশঙ্কায় মালি-কন্যা আত্মবিসর্জনে উদ্যোগী হয় ।

গণিকা রঙিলার মজিনুর দেশে আগমন থেকে মালি-কন্যার আত্মবিসর্জন পর্যন্ত ঘটনাগুলি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয় । মাত্র তিনদিনে একটি সুখী দাম্পত্য জীবন পুড়ে নিঃশেষিত হওয়ার ঘটনায় আখ্যানভাগের দ্রুতগতিময়তা ও নাটকীয়তা লক্ষণীয় । এখানে রচয়িতার সুনিপুণ ঘটনা-বর্ণনার পরিচয়ও স্পস্ট । রতন ঠাকুর রঙিলার রূপে মুগ্ধ হয়ে ক্ষণকালের জন্য হলেও বিস্মৃত হয়েছে মালি-কন্যাকে — সেই ত্রুটিজনিত অনুশোচনায় এবং মালি-কন্যার আত্মবিসর্জনের সংবাদে তার হৃদয় দগ্ধ হয় । সে সংসার জীবনে প্রত্যাবর্তনে মনস্তাত্ত্বিকভাবে অপারগ হয়ে চির-সন্ন্যাস জীবনে আত্মনিয়োগ করে । আখ্যানভাগের এই ধরনের পরিণতি মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ও ধর্মীয় পটভূমিতে একান্তই স্বাভাবিক ও বস্তুনিস্ঠতার পরিচায়ক ।

এই গাথার পরিণতি ট্রাজিক । এই ট্রাজেডি সংঘটিত হওয়ার পেছনে বহিরারোপিত ঘটনার পাশাপাশি যাদের জীবনে ট্রাজেডি সংঘটিত হয়েছে, তাদের চরিত্রের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাজনিত বৈশিস্ট্যও দায়ী । রতন ঠাকুরের পিতা পুত্র উদ্ধারের জন্য গণিকা রঙিলাকে নিযুক্ত করায় গাথার ট্রাজিক পরিণতি

Dhaka University Institutional Repository

ত্বরান্বিত হয়েছে । অন্যদিকে রাঙিলার সঙ্গে রতন ঠাকুরের পলায়নের বিষয়টি ট্রাজিক পরিণতির জন্য প্রত্যক্ষত দায়ী । প্রথম ঘটনাটি বহিরারোপিত, দ্বিতীয়টি অন্তর্গত । প্রথম ঘটনাটি না ঘটলে দ্বিতীয়টি সংঘটিত হতে পারত না, সেজন্য প্রধানত দায়ী বহিরারোপিত ঘটনা । তবে প্রথম ঘটনার জন্য দ্বিতীয় ঘটনা সংঘটিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল না । রতন ঠাকুর রাঙিলার রূপে মুগ্ধ, কথায় মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে পলায়নপর না হলে মালি-কন্যার আত্মবিসর্জনের ঘটনা ঘটত না । সেকারণে বহিরারোপিত ঘটনার দায় প্রধান হলেও একমাত্র নয় । মালি-কন্যা নির্দোষ চরিত্র, তার আত্মবিসর্জনও সঠিক, কিন্তু তার আত্মবিসর্জন পাঠকচিত্তকে যত-না আর্দ্র করে তার চেয়ে বেশি দ্রবীভূত করে রতন ঠাকুরের অনুশোচনাবিদ্ধ হৃদয়ের আর্তিতে । রতন ঠাকুরের চরিত্র নির্দোষ নয় । তার চারিত্রিক ত্রুটি মালি-কন্যার আত্মবিসর্জনের কারণ । তবু সে যখন স্বীয় ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়, তখন পাঠকহৃদয় তার সঙ্গে একাত্ম । এর আর একটি বড় কারণ : এই গাথায় মালি-কন্যার চরিত্র রতন ঠাকুর অপেক্ষা সক্রিয়তায় অনুজ্জ্বল । রতন ঠাকুর পূর্বাপর প্রণয়ে একনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত ও আন্তরিক । শেষ পর্যায়ে তার যে চারিত্রিক ত্রুটি লক্ষণীয়, তা ত্রুটি স্বীকারে অনুশোচনায় স্খালন হয়ে যায় । এই গাথার ট্রাজেডির বেদনাকে ধারণ করেছে রতন ঠাকুর । এ কারণেও পাঠকচিত্ত তার প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল ।

পীর বাতাসী

'পীর বাতাসী'[১০২] গাথায় বিনাথ নায়ক চরিত্র হলেও সক্রিয়তা, প্রণয়নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি বিবেচনায় নায়িকা চরিত্র বাতাসী অপেক্ষা অনুজ্জ্বল । মাতৃপিতৃহীন বিনাথ চরিত্র হিসেবে গুণবান, প্রণয়বাসনার প্রতি সৎ ও নিষ্ঠাবান, কৃতজ্ঞ, কিন্তু নায়ক চরিত্র হিসাবে তার যে-পর্যায়ের সক্রিয়তার প্রয়োজন ছিল তার অনুপস্থিতিও দুর্লক্ষ্য নয় । তার জীবনের প্রথম সংকট যেখানে সে জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সমুপস্থিত সেখানেও নিজের সক্রিয়তায় সে জীবন ফিরে পায়নি, পেয়েছে নায়িকা বাতাসীর দুরিৎকর্মা সিদ্ধান্ত ও সচেষ্টতায় । পরবর্তী সময়ে যে-গুরাই ওঝার কারণে সে জীবন ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে সেই ওঝা যখন ঈর্ষাবশত তার প্রাণবিনাশের জন্য উদ্যত তখনও তার মধ্যে পলায়নপরতা ছাড়া অন্য কোনো সক্রিয়তা লক্ষণীয় নয় । প্রাণদায়ী দীক্ষাগুরুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা লড়াই করা অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক — তার পলায়নপরতার বিপক্ষে এমন একটি পক্ষ-যুক্তি হয়ত প্রদর্শন করা সম্ভব, কিন্তু তাতে তার নিষ্ক্রিয়তার দায়মুক্তি ঘটেনা । গাথার শেষ পর্যায়ে যখন সে অস্ত্র হারিয়ে পরাজিত সৈনিকের ন্যায় নিষ্প্রভ, মহিমাহীন, জনপ্রিয়তার পরিবর্তে জনরোষের শিকার, যখন তার স্ত্রী সুকনুীও পরপুরুষগামী, তখনও বিদ্যমান প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে টিকে থাকা কিংবা স্ত্রীর পর-পুরুষগামিতার বিরুদ্ধে পতির দৃঢ়তা নিয়ে লড়াই করার সচেষ্টতা তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না । পরিবেশ দ্বারা এমনভাবে শাসিত সে যে, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো দৃঢ়তা, সাহসিকতা তার মধ্যে অনুপস্থিত । এই প্রতিকূলতা থেকেও সে পুনরায় পলায়নপর হয় । এ-পর্যায়ে বাতাসীগামী হওয়ার মধ্যে তার প্রবল অনুরাগ এবং প্রণয়বাসনা চরিতার্থ করার জন্য সচেষ্টতার পরিবর্তে পলায়নপর মনোবৃত্তিই অধিকতর ক্রিয়াশীল কেননা তার অস্ত্রমহিমা যদি নিষ্প্রভ না হত, স্ত্রী সুকনুী যদি পরপুরুষগামী না হয়ে তার প্রতি একনিষ্ঠ থাকত, তাহলে নিশ্চিত করে এ-কথা বলা যায় যে কখনওই সে

Dhaka University Institutional Repository

বাতাসীগামী হতো না । বাতাসীকে দ্বিতীয়বার লাভ কিংবা তার নিজের মৃত্যু সর্বত্রই তার নিষ্ক্রিয়তা সমানভাবে সুস্পষ্ট ।

অথচ বাতাসীর ক্ষেত্রে ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন । এই গাথায় বাতাসী চরিত্রটির আবির্ভাবই ঘটেছে তার সক্রিয়তা ও গতিময়তার মধ্য দিয়ে, আবার গাথার সমাপ্তি পর্যায়ে তার আত্মবিসর্জনের ঘটনায়ও তার সক্রিয়তা সমানভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য । নদীতে ভাসমান মৃতপ্রায় বিনাথকে দর্শন করে বাতাসী তাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হয় । পিতৃহীন একমাত্র অভিভাবক মুনাই ওঝার সাহায্যে সে অপরিচিত যুবককে প্রাণপন প্রচেষ্টায় বাঁচিয়ে তুলতে সক্ষম হয় । বিনাথের সুন্দর সুপৌরুষ তনুমূর্তিই বাতাসীর আকর্ষণের কারণ । তবে ইন্দ্রিয়জ আকর্ষণ নয়, বাতাসী চরিত্রে এ পর্যায়ে মানবিকতাই মুখ্য উপাদান । ক্রমশ তার মধ্যে অনুরাগ জন্মে । হৃদয়ের প্রবল অনুরাগের কথা সে বিনাথের কাছে ব্যক্ত করে । স্বীয় অনুরাগের শক্তি দ্বারা সে বিনাথের মনেও জাগিয়ে তোলে প্রণয়বাসনা । মুনাই ওঝা যে ঈর্ষাকাতর হয়ে বিনাথের প্রাণহরণে উদ্যত, সেসম্পর্কে বাতাসীই সতর্ক করে বিনাথকে । বাতাসী তার প্রণয়ীকে স্থায়ীভাবে জীবনঘনিষ্ঠ করে রাখতে চায়, কিন্তু তার জীবনাশংকার কথা ভেবে তাকে বিদায় দিতেও হয়, তার সঙ্গে পলায়নের বিষয়ে দোদুল্যমান অবস্থায় বিনাথের বিদায় দৃশ্যের অবতারণা ঘটে । এখানে রচয়িতা নির্জন নদীতীরে প্রিয়জন হারানোর বেদনায় কাতর যুবতী বাতাসীর যে করুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন তা অনন্য ।

সাঞ্জ্যা গুঞ্জরিয়া যায় আন্ধার হইল বন ।
শূন্য ঘরে যাইতে কন্যার নাইসে চলে মন ॥
নিজ দেশে গেছে বিনাথ নিজ মন লইয়া ।
খাড়াইয়া রহিল কন্যা অন্ধকারে চাহিয়া ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৩৫২)

বাতাসীকে বিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু স্বামীগৃহে সে সম্পূর্ণভাবে স্বামীবিমুখ এবং বিনাথের চিন্তায় বিভোর । তার চিন্তার ফল না হলেও বিনাথের সাক্ষাৎ সে পায় । বিনাথ-বাতাসীর পারস্পরনৈকট্যহীনতার সময়ে উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয় । কিন্তু কারোই দাম্পত্য জীবন সুখময় নয় । তবে এই সুখহীনতার পার্থক্যও দুর্লক্ষ্য নয় । বিনাথ কিন্তু দাম্পত্য জীবনে বাতাসীর কথা স্মরণ করে স্ত্রী-বিমুখ নয়, বরং তার স্ত্রী সুন্দরীই পরপুরুষগামী । অথচ বাতাসী একমুহূর্তের জন্যও বিনাথকে বিস্মৃত হয়নি । বিনাথের কথা ভেবে তাকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষায়ই সে পতিবিমুখ । বিনাথ ও বাতাসীর ভিন্ন ভিন্ন দাম্পত্য জীবনের কর্মকান্ডে বাতাসী মহত্ত্বের দাবি রাখে । বাতাসী কর্তৃক বিনাথকে লাভ করার পর তাদের উভয়ের জীবনে যে-অনির্বচনীয় আনন্দ প্রবাহিত হয় তার কৃতিত্ব বাতাসীরই প্রাপ্য । এই আনন্দ স্থায়ী হয়নি। মুনাই ওঝার ঈর্ষাদগ্ধ অন্যায় আচরণে বিনাথের প্রাণ যায় । বিনাথের মৃত্যুতে বাতাসীর মধ্যে যে প্রিয়জন হারানোর হাহাকার ও ক্রন্দন ওঠে, তাতে মুনাই ওঝার নির্মম পাষাণসম হৃদয়ও আর্দ্র হয়, কিন্তু সে বিনাথকে জীবনদানের ব্যর্থ চেষ্টা করে । বিনাথের মৃতদেহের সঙ্গে বাতাসী নদীস্রোতে যে আত্মবিসর্জন করে, তা বেহুলার আত্মত্যাগের সঙ্গেই কেবল তুল্য, অনেকাংশে সেই আত্মত্যাগের চেয়েও যেন মহৎ ।

এই গাথার আর একটি নারীচরিত্র সুন্দরী । এই চরিত্রটি উপরোল্লিখিত দুই চরিত্র থেকে নিষ্প্রভ । সেও পতিপ্রাণা নয়, অন্যাসক্ত । স্বীয় পতিকে নিষ্প্রভ ও মহিমাদীর্ণ করে তোলার ষড়যন্ত্রে সক্রিয়ভাবে সাহায্য প্রদান ছাড়া অন্য কোনো সক্রিয়তা তার চরিত্রে দৃষ্টিগ্রাহ্য নয় ।

Dhaka University Institutional Repository

দীনেশচন্দ্র সেন সুজনী ও বাতাসী চরিত্রকে খলনায়িকার চরিত্র হিসেবে যে-বিবেচনা করেছেন তা যথার্থ নয়। তাঁর ভাষায়, "গাথার নায়িকা দুইটি — সুজনী ও বাতাসী। উভয়েই ভ্রষ্টা, স্বামীর প্রতি বিদ্রোহী,..."[১০৩] প্রকৃত বিচারে সুজনী নায়িকা চরিত্র কিনা তা বিচারসাপেক্ষ। সুজনীর মধ্যে নায়িকাসুলভ কোনো গুণাবলী পরিস্ফুটিত নয়। দ্বিতীয়ত, 'উভয়ে ভ্রষ্টা, স্বামীর প্রতি বিদ্রোহী' — এই উক্তিও আংশিক সত্য বলে মনে হয়। সুজনীর পরপুরুষআসক্তির যে-পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে গাথায়, তাতে তাকে ভ্রষ্টা হয়ত বলা যায়, কিন্তু বাতাসীকে ভ্রষ্টা বলা কতটুকু ন্যায়সঙ্গত — তা বিচার্য। বাতাসী পতিবিমুখ, সে তার প্রণয়ীর প্রতিই একনিষ্ঠ। বরং সে যদি বিনাথকে বিস্মৃত হয়ে পতিপ্রাণা হয়ে উঠত, তাহলেই তাকে হয়ত ভ্রষ্টা বলা সমীচিন হত। তাছাড়া দুজনের কেউই বিদ্রোহী নয়। তাদের পতিবিমুখতাকে বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করা হলে বিদ্রোহ শব্দের অর্থ নিয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে।

এই গাথার আর-একটি চরিত্র সুনাই ওঝা। সাপ নিয়েই তার সকল কর্মতৎপরতা। তার চরিত্রে সাপের একটি গুণ যেন অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। সর্পচরিত্রের প্রতিহিংসাপরায়ণ বৈশিষ্ট্যটি তার চরিত্রেরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক। তার ক্রুরতা, জিঘাংসাবৃত্তি সর্পসুলভ নির্মম, যন্ত্রণাদায়ক। তার মধ্যে যে শুধু ক্রুরতাই আছে, স্নেহ মমতা নেই — তা নয়। বাতাসীকে সে কন্যাসুলভ মমতা দ্বারা লালন করেছে, মৃতপ্রায় বিনাথকে বাঁচিয়ে তোলা কিংবা তাকে সর্প-মন্ত্র শিক্ষাদানের পেছনেও তার পিতৃসুলভ স্নেহপরায়ণ মানসিকতাই পরিস্ফুটিত হয়। কিন্তু এই গাথায় তার ঈর্ষাকাতর প্রতিহিংসাপরায়ণতার চিত্রই অধিকতর উজ্জ্বল। যদিও বিনাথ তাকে আঘাত করেনি, সর্পমন্ত্র শিখে তা সুদক্ষভাবে প্রয়োগের মধ্য দিয়েই সে এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে — যা দিকপাল সুনাই ওঝার জন্য ঈর্ষার কারণ। কিন্তু সুনাই ওঝার প্রত্যাঘাত অত্যন্ত মর্মান্তিক। ঈর্ষায় এতই দগ্ধ সে যে পলাতক বিনাথকে খুঁজে বের করে সেখানে স্বীয় স্ত্রীর মাধ্যমে বিনাথের সর্পমহিমা নিষ্প্রভ করতেও পরিশ্রান্ত হয়নি সে। তার সচেষ্টতার এখানেই শেষ নয়। বাতাসীর সঙ্গে তার অসামাজিক সম্পর্ক অনুমান করে সে তার প্রাণহরণে হয়েছে উদ্যত। সুনাই ওঝার চরিত্রটি অনেকটা কুমরা বেদের মতো ভূন্য। কুমরা বেদের অনুশোচনার কিছু অংশও সুনাই ওঝার মধ্যে লক্ষণীয়। তবে কুমরা বেদের চেয়েও সুনাই ওঝার সংকীর্ণতা মারাত্মক। মহুয়া-নদের চাঁদের মিলনে বাধা দেওয়ার পেছনে কুমরা বেদের ব্যবসায়িক লাভালাভের প্রশ্ন জড়িত ছিল, কিন্তু সুনাই ওঝার ক্ষেত্রে সেসব বৈষয়িক কোনো বিষয় নয়, কেবলমাত্র মানসিক সংকীর্ণতাই তার চরিত্রকে নিকৃষ্ট করে তুলেছে।

এই গাথার আখ্যানভাগ সুগ্রথিত হলেও কোথাও কোথাও কৈফিয়তিক শৃঙ্খলায় সুসংবদ্ধ নয়। বিনাথের জন্মকালীন দুর্দৈব, শৈশবাবস্থায় পিতৃহারা হওয়ায় মাতার দুঃখযন্ত্রণা, অবশেষে মাত্র সাত বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে গাথার সূচনাপর্ব করুণরসে আর্দ্র। পিতৃমাতৃহীন বালক বিনাথ গ্রামের ধনাঢ্য ব্যক্তি চাঁদ মোড়লের বাড়িতে গরুর রাখালী করে তার শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করার পর আখ্যানভাগ জটিলতামুখী এবং শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করে। গাথার আখ্যানভাগ বিনাথের বয়োবৃদ্ধির ক্রমোন্নতির ধারায় অগ্রসরমান। সমগ্র আখ্যান জুড়ে রচয়িতার দৃষ্টি কেবলমাত্র বিনাথের প্রতিই নিবদ্ধ থেকে কাহিনী অগ্রসর হয়েছে। রাখাল যুবক বিনাথ অনেক সময় বাঁশী বাজাতে শিখেছে। তার সেই বাঁশির সুরে তাবৎ রমণীকুলের মন উতলা হওয়ার তথ্য পরিবেশনের

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি চোখেতে সুন্দরী কন্যা সুভদ্রার বার বছর বয়স অতিক্রমের তথ্য পরিবেশন শিল্প বিচারে তাৎপর্যপূর্ণ । রচয়িতা কোথাও বলেননি যে বাঁশির সুরে কন্যার মনে কোনোরূপ প্রণয়বাসনা সঞ্চারিত হয়েছে । কিংবা পূর্ণ কিশোরী কন্যার রূপাভিব্যক্তি বিনাথের মনকে বাঁশির সুরে নিবদ্ধ করেছে । কিন্তু দুইটি ঘটনার পাশাপাশি বর্ণনা উপস্থাপনের মধ্য দিয়েই রচয়িতার অনেক বক্তব্য স্পষ্ট ব্যক্ত হয়ে পড়ে :

কাটিয়া নলান বাঁশ বিনাথ বাঁশী বানাইল ।
দেখিতে শুনিতে তার [illegible] বছর হইল ।।
ওস্তাদ ধরিয়া বিনাথ বাঁশীর গান শিখে ।
চান্দের জননীরে বিনাথ মা বলিয়া ডাকে ।।
সুভদ্রা তালের কন্যা চান্দের সমান ।
এইমত সুন্দরী কন্যা নাইকো ত্রিভুবন ।।
পুষ্প যেমন ফোটা পড়ে পবনার বায় ।
হাসিয়া নাচিয়া কন্যার বার বছর যায় ।। (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৩৪৩)

গাথার সূচনাপর্বেই সূত্রকথায় অনেকগুলো তথ্য প্রকাশ করে রচয়িতা আখ্যানভাগের সুপ্রসূনার পরিচয় ব্যক্ত করেছেন । এরপরে চাঁদ সোদাগর বাণিজ্য যাত্রার আয়োজন করে সঙ্গে নিলেন বিনাথকে রচয়িতা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আখ্যানভাগকে অটিতো-মুখী করার অভিপ্রায়ে বিনাথ-সুভদ্রার মধ্যে প্রণয়বাসনা জাগ্রত করার একটি চমৎকার সম্ভাবনা এড়িয়ে পাঠকদের কৌতূহলকে নিবৃত্ত না করে ঘটনাধারাকে ভিন্নগামী করলেন । এক্ষেত্রে যে নাটকীয় উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায় তা অপূর্ব । বাণিজ্য যাত্রায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটল । বিনাথ মৃতপ্রায় কংস নদীর জলে ভাসমান । এ-পর্বও সংক্ষিপ্ত ।

শুরু হল মুসাই ওঝার কাহিনী । কংস নদীর তীরবর্তী গভীর জঙ্গলমধ্যে তাঁর বাস । সঙ্গে পালিতা কন্যা বাতাসী । সর্প-ওঝা হিসেবে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় মুসাই ওঝাকে তার পালিতা কন্যা বাতাসী এসে নদী-জলে ভাসমান সুন্দর যুবার বিনাথের খবর জানিয়ে তাঁকে জীবনদানে সচেষ্ট হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করল । প্রথম দর্শনেই বাতাসীর মনে পূর্বরাগ সৃষ্টির তথ্য জানা যায় । এখানকার বর্ণনাটিও চমৎকার । কয়েকটিমাত্র পংক্তিতে বাতাসীর বিনাথকে দর্শন, ওঝার নিকট সংবাদদান, ওঝাকে নিয়ে বিনাথকে উদ্ধারের জন্য নদী তীরে গমন, বিনাথের প্রতি তার পূর্বরাগ প্রভৃতির পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে ।

বাপের আগে কয়ত খবর ঘন ঘন শ্বাস ।
সুন্দর কুমারের নাই সে জীবনের আশ ।।
চান্দ যেমুন ভাস্যা যায় কংস নদীর পারে ।
কাহার কোলের যাদু পড়িল বিপাকে ।।
উড়ু হইয়া আউল কেশ মাটিত লুটায় ।
ওঝার পিছনে কন্যা পাগলিনী প্রায় ।। (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৩৪৬)

মুসাই ওঝা ও বাতাসীর যত্নশীল প্রচেষ্টায় বিনাথ জীবনপ্রাপ্ত হন । বাতাসীর প্রণয়বাসনার

Dhaka University Institutional Repository

গীতময় বিনাথও আলোকিত হন। গভীর অরণ্যে উভয়ের বনবাসী জীবনে অনির্বচনীয় আনন্দের আস্বাদনের যে-চিত্র রচয়িতা অঙ্কন করেছেন, তা অনন্য। অতিশয় স্নেহবশত সুনাই ওঝা বিনাথকে শিখিয়েছে তার সকল মন্ত্র। মন্ত্র প্রয়োগে বিনাথ হয়ে উঠেছে এমনই দক্ষ যে শিক্ষাদাতার জনপ্রিয়তাকে সে অতিক্রম করে গেছে। ঈর্ষাপরতন্ত্র সুনাই ওঝার নিকট শিষ্য বিনাথের প্রবল জনপ্রিয়তা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। সুনাই ওঝা বিনাথকে হত্যার উদ্যোগ নিলে বাতাসীর মাধ্যমে তা বিনাথের কর্ণগোচর হয়। জীবন নিয়ে সে বন থেকে পলায়ন করে। বিনাথের জীবনে এই শাখায় বিধৃত বন-পর্বটি দীর্ঘ। তার জীবননাশ প্রচেষ্টায় সুনাই ওঝা ও বাতাসীর আজ্যন্তিক আনুকূল্য, বনমধ্যে বাতাসী ও বিনাথের প্রণয়বাসিত জীবনভোগ, বিনাথের মন্ত্রশিক্ষা বিস্তৃত আয়তনে বর্ণিত হয়েছে।

এরপরে বিনাথ নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে এবং সর্পওঝা হিসেবে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করায় চাঁদ সোনার তার কন্যা মুকুন্দীকে বিয়ে দেয়। কিন্তু এই দাম্পত্য জীবন তার সুখের নিবাস স্থায়ী হতে পারেনি। মুকুন্দী পরপুরুষগামী। তাছাড়া সুনাই ওঝা ষড়যন্ত্র করে মুকুন্দীর মাধ্যমে বিনাথের মন্ত্রমহিমা বিলুপ্ত করে। বিনাথ জনপ্রিয়তা হারায়। সে স্বগ্রাম ছেড়ে বাতাসীর সন্ধানে যাত্রা করে। এই অংশটিও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বর্ণনায় বাহুল্য নেই।

এদিকে বাতাসীর বিয়ে দিয়েছে সুনাই ওঝা। সেখানে বাতাসী স্বামী নিয়ে সুখী নয়। প্রতিমুহূর্ত তার ব্যয় হয় বিনাথের ভাবনায়। প্রিয় বিরহে কাতর বাতাসীর যন্ত্রণাদগ্ধ মনের প্রকাশ এই অংশকে উজ্জ্বল করেছে। এই অংশের বর্ণনা তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ পরিসরে বিবৃত হয়েছে। এই অংশের বর্ণনায় করুণ রসের প্রাধান্যের পাশাপাশি গীতময়তার সুরও ধ্বনিত হয়েছে।

বাতাসীর বিরহতপ্ত হৃদয়ের অতিমাত্রায় চাঞ্চল্যের পরিসমাপ্তি ঘটে বিনাথের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাতে। এখানে বাতাসীর সঙ্গে বিনাথের সাক্ষাতের ঘটনাটি নৈয়ায়িক শৃঙ্খলায় সুসংবদ্ধ নয়। কিভাবে তাদের পুনর্বার সাক্ষাৎ হল — সে সম্পর্কে পাঠকমনে জিজ্ঞাসা থেকে যায়। বাতাসী-বিনাথ পুনরাবিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের প্রণয়াকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে। দুজনের বনবাসী জীবনে পরম আনন্দের আস্বাদন ঘটে। কিন্তু এই আনন্দে অন্তরায় সৃষ্টি করে সুনাই ওঝা। বাতাসীর অনুধ্যান-সংবাদে সে অনুমান করে এটা বিনাথের কাজ। বিনাথের উদ্দেশে সে সর্প চালনা করে। সেই সর্পের দংশনে বিনাথের মৃত্যু ঘটে। ঘটনাটিতে অতিলৌকিক উপাদানের স্পর্শ আছে। কিন্তু তার চেয়েও অবিশ্বাস্য ঘটনা সর্পে দংশিত বিনাথকে নিয়ে বাতাসী যখন বিলাপরতা, সেখানে সুনাই ওঝার উপস্থিতি। এখানেও আখ্যানভাগ নৈয়ায়িক শৃঙ্খলায় সুসংবদ্ধ নয়। বাতাসীর কান্নায় বিনাথে সুনাই ওঝার মন আর্দ্র হয়। বিনাথকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেও সে ব্যর্থ হয়। বিনাথের মৃত্যুসহ বাতাসীর নদীজলে আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে শাখার পরিসমাপ্তি ঘটে।

নাটকীয় ও গীতময় উপাদানের প্রাচুর্যে, গভীর বনপ্রান্তে যুবক-যুবতীর প্রণয়বাসিত জীবন, নির্জন নদীতীরে বিরহতপ্ত প্রেমিকার নীরব আর্তনাদ প্রভৃতি রোমান্স-উপাদানে এই শাখার আখ্যানভাগ সমৃদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

এই গাথার পরিণতি বিয়োগান্তক। যাদের জীবনে এই ট্রাজেডি সংঘটিত হয়েছে তাদের জীবনবৈশিষ্ট্যের কোনো ত্রুটিময়তা এই পরিণতির জন্য দায়ী নয়। চরিত্রগত দিক থেকে এই ট্রাজেডি বহিরারোপিত। নায়ক-নায়িকার জীবনকে নিরানন্দ বিচ্ছেদকাতর এবং শেষপর্যন্ত বিয়োগান্তক পরিণতিমুখী করার জন্য যে-চরিত্রটি মুখ্যত দায়ী, তার মনে সামান্য অনুশোচনাবোধ জাগ্রত হলেও তা ট্রাজেডির বেদনাকে ধারণ করার পর্যায়ভুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে কাঞ্চনমালার মুমাই ওঝার যন্ত্রণার কারণ স্ত্রীর ত্রুটির জন্য অনুশোচনাজাত নয় বরং পালিতা কন্যা কাজলীর বিনাশের প্রতি করুণাবশত। তবে গাথার এই পরিণতির জন্য পাঠকহৃদয় মুমাই ওঝার প্রতি রুষ্ট হলেও তা এই বাৎসল্য দ্বারা অনেকটা দূর হয়। বিনোদ ও কাজলীর মধ্যে পাঠকহৃদয় কাজলীর প্রতিই অধিকতর সহানুভূতিশীল। তার কারণ, কাজলীর সক্রিয়তা, তার আত্মত্যাগের মহিমা।

মলয়ার বারমাসী

'মলয়ার বারমাসী'[১০৪] গাথাটিতে কোনো চরিত্রই সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয়নি। রাজপুত্র বন্ধু মলয়াকে হাল্যা ডাকাতের কবল থেকে উদ্ধার করে তার পিতামাতার নিকট পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে যেরকম সক্রিয়, সমাজদন্ড যখন মলয়াকে অন্যায়ভাবে নির্বাসিত করছে তখন সেই অন্যায়ের প্রতিবাদে সেরকম সক্রিয় নয়। পরবর্তীকালে যদিও পুনরায় নির্বাসন জীবনে হাল্যা ডাকাতের কবলে পতিত মলয়াকে সে উদ্ধার করেছে — এমন তথ্য গাথায় পাওয়া যায়, কিন্তু তার চিত্র গাথায় বর্ণিত হয়নি। অন্যদিকে মলয়া পিতৃসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্বাধীন প্রণয়বাসনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বন্ধুর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে। তার চরিত্রের এই সক্রিয়তা বিদ্রোহাত্মক এবং বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বনমধ্যে হাল্যা ডাকাতের আশ্রয় থেকে মলয়া নিজেই বেরিয়ে এসেছে। এবং এভাবে বেরিয়ে না এলে তার পিতা-মাতা দর্শন হয়ত সম্ভবও ছিল না। এক্ষেত্রেও তার সক্রিয়তা লক্ষণীয়।

এই গাথায় মলয়ার পিতা মিতিমাধব সওদাগরের চরিত্রটির বিকাশও অসম্পূর্ণ। কন্যা বিয়ের উপযুক্ত হলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পিতা কর্তৃক উপযুক্ত বরের অনুসন্ধানে বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণের ঘটনায় তার সক্রিয়তা যেমন স্পষ্ট, তেমনি কন্যার বর নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার সূক্ষ্ম বিবেচনাবোধের পরিচয়ও তাৎপর্যপূর্ণ। যে-কারো হাতে কন্যা সম্প্রদান করতে সে প্রস্তুত নয়। সে-কারণে বন্ধুকে বর হিসেবে সে প্রত্যাখ্যান করার মতো ব্যক্তিত্বও প্রদর্শন করেছে। তবে প্রত্যাখ্যানের কারণটি মহৎ নয় — এটি এই গাথার একটি শিল্পবোধগত ত্রুটি।

এই গাথায় হাল্যা ডাকাতের ডাকাতসুলভ সক্রিয়তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সে যে হিংস্র তার তথ্য গাথায় আছে, কিন্তু এমন কোনো চিত্র গাথায় বিবৃত নয়।

এই গাথায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্র তুলা রাজা। তিনি তার পুত্রের প্রণয়বাসনাকে মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু পুত্রের বিয়ে উপলক্ষে নিমন্ত্রিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যখন মলয়ার সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে তার সতীত্বের পরীক্ষাদানের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে, তখন তিনি তা না মেনে পারেননি। পরিণাম

Dhaka University Institutional Repository

বনাই রাজা যে এক্ষেত্রে শত্রুতা সাধন করেছে, তা উপলব্ধি করেও সমাজদন্ডকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। শাণিত সত্যবোধ ও প্রচলিত সামাজিক সংস্কারের দ্বন্দ্ব তার চরিত্রটিকে বিশেষভাবে মহিমা-মন্ডিত করেছে।

'মলয়ার বারমাসী' গাথাটির আখ্যানভাগ অসম্পূর্ণ[১০০]। এই অসম্পূর্ণতা কেবলমাত্র গাথাটির পরিণতির ক্ষেত্রেই দৃষ্টিগ্রাহ্য, কিন্তু বিভিন্ন পর্বে কাহিনীর পারম্পর্যতায় যে-ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়, তা লেখকের পরিমিতিবোধেরই স্বাক্ষরবহ। গাথাটিতে বন্দনা অংশ বিস্তৃত না হলেও তাতে সাম্প্রদায়িকতা-ঊর্ধ্ব মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সভা কইরা বইছ ভাইরে হিন্দু মুসলমান।
তোমার জনাবে আমি অধমের ছেলাম ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স. ৪০৬)

বন্দনার মাধ্যমে আখ্যানভাগ অত্যন্ত গতানুগতিকভাবে শুরু হয়। প্রথমেই নয় বছর বয়সী কন্যার বিয়ে নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নবরঙ্গপুরের সিতিমাধব সওদাগরের উপযুক্ত বর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে ছয় বছর অতিক্রান্ত করার তথ্যটি অবাস্তব মনে হয়। সওদাগরের অনুপস্থিতিতে হান্ন্যা ডাকাত কন্যা মলয়াকে হরণ করে নিয়ে বনমধ্যে আটকে রাখে। হান্ন্যার অনুপস্থিতিতে একদিন মলয়া ঘরের বাহির হলে বনে শিকার-উদ্দেশে আগত ভুমা রাজার পুত্র বসন্তের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। বসন্তের প্রশ্নোত্তরে মলয়া সকল তথ্য তাকে অবহিত করে। অন্য গাথায় এরূপ অকপট পরিচয় প্রদানের চিত্র লক্ষ্য করা যায়না। এই ব্যতিক্রমধর্মিতা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্য দিয়ে মলয়া চরিত্রটির সরল মুক্তিপ্রয়াসী একনিষ্ঠ জীবনবোধেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

মলয়ার প্রতি বসন্তের প্রণয়াকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। সে তাকে বনমধ্য থেকে উদ্ধার করে। ছয় বছর পরে মলয়া পুনরায় পিতামাতার নৈকট্য লাভ করে। এখানে কাহিনী বর্ণনায় উল্লম্ফনধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। বনমধ্যে বসন্ত মলয়াকে পিতামাতার সন্নিধানে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছে। পরবর্তী পংক্তিতেই দেখা যায়, মলয়ার জন্য উন্মাদ-প্রায় বসন্তের পিতা ভুমা রাজা পুত্রের প্রণয়বাসনার প্রতি মর্যাদাশীল হয়ে সওদাগরের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। মলয়াকে নিয়ে বসন্ত যে তার পিতা-মাতার নিকট উপস্থিত করছে তার কোনো বর্ণনা গাথায় নেই। ছয় বছর পর কন্যাকে পেয়ে পিতা-মাতা-আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হল তার বর্ণনা থেকে পাঠক বঞ্চিত হলেও এতে লেখকের চমৎকার পরিমিতিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনা বর্ণনায় রচয়িতার সংক্ষিপ্তিবোধ, পাঠকের কল্পনার ওপর ছেড়ে দিয়ে অনেক ঘটনার বর্ণনা পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া, প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য তাৎপর্যপূর্ণ।

ভুমা রাজার প্রস্তাব সওদাগর কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর রাজা কর্তৃক সওদাগরের ওপর অত্যাচারের ইঙ্গিত আছে। অত্যাচারের পর্বটি বিস্তৃত নয়, কোটাল কর্তৃক সওদাগরকে বেঁধে আনার তথ্য প্রদানেই সীমাবদ্ধ। এক্ষেত্রে সওদাগরের কী হল সে বিষয়ে রচয়িতার মতো সওদাগর কন্যা মলয়াও সমান উদাসীন। কিন্তু মলয়া উদাসীন নয় বসন্তের প্রতি। বসন্ত মলয়ার জন্য উন্মাদ এ-তথ্য পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, এখানে মলয়া তাকে বাঁচানোর জন্য এক রাত্রিতে তার কাছে চলে আসার তথ্য পাওয়া যায়। মলয়ার চলে আসার পর ভুমা রাজা বিয়ের উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত হন। বড় রাজা

Dhaka University Institutional Repository

নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন, তার মধ্যে ষড়যন্ত্রকারী কানাই রাজাও আছেন । তিনি মলুয়ার বনবাসকালীন সতীত্ব পরীক্ষার ব্যবস্থাপত্র দেন । কিন্তু এই ব্যবস্থাপত্র এমনই উদ্দেশ্যপূর্ণ যে সে-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া দুঃসাধ্য । এ-অংশের বর্ণনা অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ । অন্য গাথায় এ-অবস্থায় অতিলৌকিকতার স্পর্শ লক্ষ্য করা যেত । কিন্তু এখানে ষড়যন্ত্রকারীদের বিষয়টি এমনই স্পষ্ট যে দুঃসাধ্য ব্যবস্থাপত্রে মলুয়া সতীত্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয় না । কিন্তু তাতে মলুয়া অসতী হিসেবে পাঠকের নিকট প্রতীয়মান হওয়ার পরিবর্তে কানাই রাজার ষড়যন্ত্র-কারকের বিষয়টিই স্পষ্ট হয় । এ-অংশের বর্ণনায় রচয়িতার দক্ষ সুখ্যাত হস্তের ছাপ রয়েছে ।

অন্যায় দণ্ডে মলুয়ার নির্বাসন হয় । পুনর্বার-বনবাসী মলুয়ার নিঃসঙ্গ বিরহ কাতর জীবনের দুঃসহতা বিস্তৃতভাবেই বিধৃত হয়েছে । এক্ষেত্রেও রচয়িতার পরিমিতিবোধের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট । হাল্যা ডাকাতের আশ্রয়ে মলুয়ার ছয় বছরের ঘটনা বর্ণনার জন্য যেখানে মাত্র আঠারটি পংক্তি ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে মলুয়ার নির্বাসিত জীবনের মাত্র একটি বছরের দুঃখকাহিনী বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে একশত আটান্ন পংক্তি । রাজপুত্র বসন্তের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে হাল্যার আশ্রয়ে ছয় বছরের জীবন এ সময়ের মতো এত নিঃসঙ্গ, নিরানন্দময় ছিল না, সুতরাং বর্ণনাও সেজন্য সংক্ষিপ্ত । আর এ-পর্যায়ে প্রিয় বিরহে কাতরা মলুয়ার দুঃখের দিন যেন ফুরোতে চায় না । আনন্দময় জীবন দ্রুত নিঃশেষিত হয়, দুঃখকাতর জীবন অতিক্রান্ত হতে চায় না — এটি প্রচলিত ব্যঞ্জনাময় ধারণা, বর্ণনা ও চরিত্রের মানসিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত হয়েছে । এদিক থেকে এই গাথার নামকরণও সার্থক । বারমাসী বর্ণনায় গীতময়তার সুর স্পষ্ট । এই গাথায় নাটকীয় উপাদানেরও প্রাচুর্য লক্ষণীয়। গীতময়তার উদাহরণ ঃ

আইল আইল শাওন মাসের ঘন বরিষণ ।
দেওয়ার গর্জ্জন শুন্যা কাঁপে নারীর মন ।।
ডাকিয়া কিল্কি ঠাডা আসমান ভাইঙ্গা পড়ে ।
চমকাইয়া বেহুলা নারী আপন স্বামী ধরে ।।
গলায় সাজ্ঞার মালা আর শীতল পাটি ।
জাগত বিছায়া শয্যা রঙ্গি পরিপাটি ।।
বিজোগা বন্ধুরে লইয়া সুখে থাকেতন ।
এই মতে মলুয়ার দুঃখ বিবরণ ।। (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৪২০-২১)

এই অংশের বর্ণনায় বিদ্যাপতির বিখ্যাত পদের উক্তিগুলি স্মরণ হয় ঃ "ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া। / কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘনে খর শর হন্তিয়া ।। / কুলিশ শত শত পাত মোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া । / মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া ।। " এখানে রচয়িতা লোকজ জীবনের উপাদান দিয়ে নায়িকার অঙ্গ সুষমা যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, তা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ । 'গলায় সাজ্ঞার মালা ' — এই উক্তিতে আমাদের চোখের সামনে নায়িকার যে-চিত্রটি ফুটে ওঠে, তা গ্রাম জীবনের প্রেক্ষাপটে অপূর্ব সৌন্দর্যে মহিমায় দীপ্ত ।

মলুয়ার বারমাসী অংশটি নির্বাসন জীবনের বর্ণনার পরে পুনরায় হাল্যা ডাকাতের দেখাযুক্ত হওয়ার তথ্য প্রদানের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত । এ-অংশে আরও দুয়টি পংক্তি আছে, যেখানে হাল্যা ডাকাতকে

Dhaka University Institutional Repository

ধরার জন্য রাজপুত্র কানুর লোকজনসহ অভিযানের একটি চমৎকার চিত্র আছে। সেখানে হাড্যা ডাকাতের ধরা পড়ার তথ্যও রয়েছে।

তবুও গাথাটি অসম্পূর্ণ। এবং অসম্পূর্ণতার কারণে এর রসনিষ্পত্তি সম্পর্কেও মন্তব্য করা কঠিন। ধারণা করা যায়, হাড্যা ডাকাতের ধরা পড়ার মধ্য দিয়ে মধু-মনুয়ার জীবন মিলনাত্মক পরিণতি লাভ করেছে। এটি অনুমানমাত্র। কাহিনী এরপরে অগ্রসর হয় কিনা কিংবা মিলনাত্মক জীবনে অন্য কোনো জটিলতা উপস্থিত হয় কিনা — সে-সম্পর্কে অনুমান করা কঠিন। গাথায় বিধৃত কাহিনীতে মনুয়ার বারমাসী দুঃখের বর্ণনাই পাঠকের হৃদয়কে বেদনাচ্ছন্ন করে রাখে। কিন্তু এটাইযে গাথার পরিণতি নয় — তাতো স্পষ্ট। সুতরাং দুঃখজনক পরিণতিকে রসনিষ্পত্তি বিচারের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা অসম্ভব।

জীরালনী

রাজা চক্রধরের কন্যা মেঘমতী বা জীরালনীর চরিত্রটিই 'জীরালনী'[১০৬] গাথায় সবচেয়ে সক্রিয় ও উজ্জ্বল। বিমাতার চক্রান্ত সম্পর্কে সে অবহিত। বিমাতার চক্রান্তে পিতা কর্তৃক নিজ মাকে বনে নির্বাসন দান এবং বিমাতা ও বিমাতা-পুত্রের মনে তাকে বধূ করার অভিলাষ প্রভৃতি সম্পর্কে সে পুরোপুরি সচেতন। বিমাতা-পুত্রের বধূ হতে সে কোনোভাবেই সম্মত নয়। এক্ষেত্রে চক্রান্ত, নির্মমতা ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদী-বিদ্রোহী মানসিকতার পরিচয়ই স্পষ্ট। পিতা চক্রধর শিকারে গিয়ে প্রাপ্ত স্বর্ণরঙা হরিণটি কন্যা মেঘমতীর তত্ত্বাবধানে দিলে মেঘমতী অন্য এক জগতের সন্ধান লাভ করে। তার বিদ্রোহ-প্রতিবাদ সফল হওয়ার বস্তুগত ভিত্তি যেন সে খুঁজে পায়। বিমাতার চক্রান্তের শিকার দন্তপতির রাজপুত্র মন্ত্রবৈগুণ্যে হরিণ হয়ে আছে। উভয়ের বেদনা অভিন্ন। হরিণ-রূপী দন্তপতির রাজপুত্র উভয়ের দুঃখ নিবারণের প্রত্যয় ব্যক্ত করে। উভয়ে উভয়ের বেদনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গোপনে পরস্পর পরস্পরের প্রতি সমর্পিত হয়। জীরালনী চরিত্রের দৃঢ়তা, সক্রিয়তার প্রকাশ ঘটে যখন বিমাতা ও বিমাতা-পুত্র তাকে বধূরূপে গ্রহণ করার চক্রান্ত সফল করে। তখন জীরালনীর সামনে আত্ম-বিসর্জন ছাড়া বিকল্প থাকেনা। এই চক্রান্ত থেকে সে উদ্ধার লাভ করে। কিন্তু তার আত্মবিসর্জিত দেহের সন্ধান পায় এক জেলে। জেলের কাছ থেকে এক ধনী সওদাগর তাকে কিনে নেয়। এখানেও জীরালনী চরিত্রের একনিষ্ঠতা ও দৃঢ়তার পরিচয় স্পষ্ট। দন্তপতির রাজপুত্র — যার প্রতি সে আত্মনিবেদিত — তাকে অনুসন্ধানের উপায় উদ্ভাবন করে সে। সওদাগরের মাধ্যমে হরিণরূপী রাজকুমারকে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়ার মধ্যে মেঘমতী চরিত্রের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে। কিন্তু গাথাটি অসম্পূর্ণ হওয়ায় তার চরিত্রের পরবর্তী বিকাশ সুস্পষ্ট নয়। প্রতিবাদী, বিদ্রোহী, প্রণয়ে একনিষ্ঠ, বিনীত মনের যে-পরিচয় এখানে ব্যক্ত হয়েছে, তা তার চরিত্রকে মহৎ করে তুলেছে।

দন্তপতি-রাজপুত্রও সক্রিয় ও সবল চরিত্র। বিমাতার চক্রান্তের শিকার এই চরিত্রটির মধ্যেও প্রতিবাদী মনের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। বিমাতার চক্রান্ত থেকে সে নিজেকে ও চক্রধরের রাজকন্যা

Dhaka University Institutional Repository

মেঘমতীকে উদ্ধার করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। প্রণয়নিবেদনের ক্ষেত্রেও তার সক্রিয়তা লক্ষণীয়। তার সক্রিয়তার ফলেই উভয়ের গান্ধর্ব মতে বিয়ে হয়:

হরিণ হইয়া থাকি কন্যা তোমার মন্দিরে।
পরথম যৌবন কন্যা বিয়া কর মোরে॥
দেখিয়া তোমার রূপ মজিয়াছে আঁখি।
এমুন সুন্দর রূপ কভু নাই সে দেখি॥ (পূ.গী.চ.খ দ্বি.স.পৃ ৪৩৩)

দন্তপতি-রাজপুত্রের বিপরীতে চক্রধর-রাজপুত্রের চরিত্রটি স্থাপন করলে দিনরাত্রির ব্যবধান দৃষ্ট হবে। আলোর পিঠে যেন অন্ধকার। বিমাতা-কন্যাকে নিয়ে তার মানসিকতার মধ্যে চরম সংকীর্ণতা ও বিকৃত-রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। তদুপরি সেই বিকৃত রুচি চরিতার্থ করার জন্য সে যে কুটিল পথ অবলম্বন করে, তাতে তার সংকীর্ণতার আরও নীচ রূপই পরিদৃষ্ট হয়।

এই গাথায় জেলে ও জেলেনীর চরিত্রে গ্রামজীবনের নির্লোভ মানসিকতা ও দারিদ্র্যের মধ্যেও মহৎ উপাদানের পরিচয় স্পষ্ট। দারিদ্র্য ক্লিষ্ট জীবনে তারা বিপুল ধনরত্নের বিনিময়েও যে কুড়িয়ে পাওয়া কন্যাটিকে বিক্রি করতে সম্মত হয়না এতেই তাদের মহত্ত্বের পরিচয় বিধৃত হয়েছে।

সওদাগরের চরিত্রটি উন্নত বৈশিষ্ট্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। মেঘমতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সে হস্তগত করে। কিন্তু সওদাগরমনস্ক তার মনে সে মেঘমতীর ইচ্ছার বাইরে তাকে কলুষিত করার জন্য চেষ্টিত নয়। এবং মেঘমতীর ইচ্ছাপূরণ মানসে বাণিজ্যযাত্রা করতে গিয়ে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে তাকে জীবন দিতে হয়।

'জীরামনী' গাথার আখ্যানভাগ অসম্পূর্ণ।[১০৭] তাছাড়া এর আখ্যানভাগ রূপকথা ও বাস্তবতার সংমিশ্রণে গঠিত। রূপকথাটি নিম্নরূপ: দন্তপুরের রাজা দন্তপতির দুই স্ত্রী। এক স্ত্রী সতীন পুত্রের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে বন থেকে ঔষধ আনিয়ে কবজ তৈরি করে তা দিয়ে তাকে হরিণ বানিয়ে ফেলে। দন্তপতির রাজপুত্র হরিণ হয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। বাঘ ভালুকসহ হিংস্র বন্যপ্রাণীর কবল থেকে প্রতিকূলে তাকে জীবন ধারণ করতে হয়। পদ্মের রাজা চক্রধর শিকারে গিয়ে স্বর্ণরঙা হরিণের সাক্ষাৎ পায়। জীবিতাবস্থায় সেই হরিণকে ধরে নিয়ে এসে রাজা স্বীয় কন্যার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করে। একদিন সেই হরিণের শিরোদেশে একটি কবজ দেখে কৌতূহলবশত রাজকন্যা সেই কবজ খুলে ফেলে। অমনি সামনে সে হরিণের পরিবর্তে রূপবান রাজকুমারকে দেখতে পায়। মেঘমতী রাজকুমারকে নিজের পরিচয় প্রদান করে। পরিচয়সূত্রে মেঘমতী বিমাতার চক্রান্তে স্বীয় মাতার নির্বাসন জীবন, বিমাতা-পুত্র কর্তৃক তাকে বিয়ে করার চক্রান্ত প্রভৃতি তথ্য অবহিত করে। রাজকুমারও জানায় তার এই অবস্থার জন্য দায়ী বিমাতা। বিমাতার চক্রান্তে উভয়ের জীবন যে বেদনাময়, সে জীবনকে সুখময় করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে রাজকুমার। উভয়ে উভয়ের প্রণয়াসক্ত হয়। রাজকুমারের প্রবল আগ্রহে লোকচক্ষুর অন্তরালে উভয়ের গান্ধর্ব বিবাহ সম্পন্ন হয়। দিনে হরিণ, রাতে রাজকুমার — মেঘমতীর সান্নিধ্যে কাটে সুখময় জীবন। কিন্তু একদিন বিপর্যয় ঘটে। রাজকুমারের শিরোদেশের কবজ হারিয়ে ফেলে মেঘমতী। ফলে রাজকুমারকে পালিয়ে যেতে হয় গোপনে। দুঃখভারাক্রান্ত

Dhaka University Institutional Repository

এখানেই ঘটে অবসান। বস্তুনিষ্ঠ কাহিনী বর্ণনা শুরু এখান থেকে। তবে মূলকথাবস্তু বর্ণনাংশেও বিমাতার চক্রান্তমূলক মানসিকতার যে-পরিচয় বিধৃত হয়েছে, তা বস্তুনিষ্ঠতার অপূর্ব।

স্বর্ণরঙা হরিণ হারিয়ে গেল অথচ তা নিয়ে রাজ পরিবারে কোনো উচ্চবাচ্য নেই – এতে বস্তুনিষ্ঠতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ায় আখ্যানভাগের দুর্বলতার প্রকাশ ঘটেছে। মেঘবতীর বিমাতা-পুত্র দুলাই তাকে বিয়ে করার ষড়যন্ত্র করে। এই ষড়যন্ত্রে তার মা সহায়তাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। রাজা রানীর প্রতি যে অতিশয় দুর্বল তার প্রমাণ এখানে স্পষ্ট। রাজানুচরবর্গ রাজার প্রসাদ পেয়ে যেহেতু সবসময় সন্তুষ্ট থাকে, সেহেতু তারা মত অন্যায় হলেও রাজার বিরুদ্ধে যাওয়ায় অনভ্যস্ত। সর্বদেশে সর্বযুগে রাজার পার্শ্বচরদের 'জ্বী হুযুর' নীতির এমন চমৎকার উদাহরণ আর হয়না। ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে কোনোভাবেই সম্ভব নয় — অথচ রাজা যখন অনুচরবর্গের মতামত চায়, তখন তারা পক্ষেই মত প্রকাশ করে। রাজানুচরবর্গের অনুগতকারীর ভূমিকাটি যেন শাশ্বত। কিন্তু সকলের মত পাওয়া গেলেও মেঘবতীর মনে বিমাতা ও তার পুত্রের প্রতি যে-ঘৃণা তার নিরসন হয়না। আত্মবিসর্জনের পথ বেছে নেয় সে। নদীজলে নিমজ্জিত মেঘবতীর দেহ জেলের জালে ধরা পড়ে। জনৈক সওদাগর এসে মেঘবতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে কিনে নেয় জেলে পরিবারের নিকট থেকে। দরিদ্র হলেও জেলে-জেলেনী প্রথমে মেঘবতীকে বিক্রি করতে চায়নি। এ-পর্যায়ে জেলে-জেলেনীর মুখ থেকে মেঘবতীর গুণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অনেকখানি অনাবশ্যক বর্ণনা আখ্যানভাগকে অহেতুক ভারী করেছে। মেঘবতী অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবেই সওদাগরের অনুগামী হয়। একেত্রে তার মনে জেলে পরিবারের দারিদ্র জীবনের প্রতি কোনোরূপ বিতৃষ্ণা ক্রিয়াশীল নয়, বরং সওদাগরের সঙ্গে বের হলে সে এবং হরিণরূপী রাজকুমারের অনুসন্ধান সহজতর হবে এমন উপলব্ধিই যে সক্রিয় ছিল, তা পরবর্তী ঘটনাবলী থেকেই সুস্পষ্ট হয়। রাজকুমারের অনুসন্ধানে বেরিয়ে সওদাগরের মৃত্যু ঘটে। আখ্যানভাগও অসম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যায়। এধরনের অসম্পূর্ণতার ফলে গাথার রসনিষ্পত্তি আলোচনা নিরর্থক হয়ে উঠেছে।

সোনারায়ের জন্ম

'সোনা রায়ের জন্ম'[১০৮] গাথাটির আখ্যানভাগ অসম্পূর্ণ। তাছাড়া এর আখ্যানভাগের পর্বগ্রন্থনও সুসংবদ্ধ নয়। ফলে কতকগুলো বিশৃঙ্খল চিত্র ছাড়া এর আখ্যানভাগ থেকে কোনো একটি সুগ্রথিত কাহিনী স্পষ্ট হয় না। আখ্যানভাগের বিশৃঙ্খলার মধ্যে জনৈক পীরের অতিলৌকিক ক্রিয়াকান্ড গাথার অনেকখানি স্থান জুড়ে বিবৃত হওয়ায় এর গাথাধর্মিতাও অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

দীনেশচন্দ্র সেন গাথা-সংগ্রাহক চন্দ্র কুমার দে-র মাধ্যমে প্রাপ্ত এই গাথা রচনার ঐতিহাসিক যে-প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন তার সঙ্গেও গাথার বিষয়বস্তুর তেমন সাযুজ্য নেই। কেবলমাত্র চরিত্রের নামের সঙ্গে অভিন্নতা ছাড়া আখ্যানভাগের অন্য কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি নিম্নরূপ : চাঁদ রায়ের পিতা কৃষ্ণ চৌধুরী নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর প্রিয় কর্মচারী ছিলেন। তার পূর্ব উপাধি ছিল ভাণ্ডারী। নবাবের বহু দুরূহ কাজ কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি কানুনগোর পদে উন্নীত হয়েছিলেন । এসময়ে ময়মনসিংহের দত্ত ও নন্দী বংশীয় জমিদারদের দেয় রাজস্ব পথিমধ্যে দস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হলে নবাব তা অবিশ্বাস করেন এবং কৃষ্ণ তলাপাত্রকে চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত করে ময়মনসিংহের জমিদারী প্রদান করেন ।

কৃষ্ণ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র চাঁদরায় আলিবর্দি খাঁর সময়ে রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারী ছিলেন । ঐতিহাসিক প্রবাদ এইরূপ : ঘোড়াঘাট চাকলার কোনো মুসলমান জমিদার বিদ্রোহী হলে বিদ্রোহ দমনের জন্য নবাব কৃষ্ণ চৌধুরীকে প্রেরণ করেন । কৃষ্ণ চৌধুরী সংঘর্ষ এড়িয়ে কৌশলে কার্য সাধনের জন্য সুবৃহৎ ও সুদৃশ্য কতকগুলি অশ্ব নিয়ে অশ্বব্যবসায়ীর ছদ্মবেশ ধারণ করে জমিদারের এলাকায় অবস্থান নেন । কৃষ্ণ চৌধুরী অত্যন্ত রূপবান পুরুষ ছিলেন । তার রূপের কথা প্রথমে শ্রবণ এবং পরে দর্শন করে জমিদার-পত্নী মুগ্ধ ও এমনই বশীভূত হন যে তারই সাহায্যে কৃষ্ণ চৌধুরী নিদ্রিত অবস্থায় জমিদারকে হত্যা করে তার ছিন্নমুণ্ড নবাবের সামনে নিয়ে যেতে সক্ষম হন । এসময়ে সোনারায়ের জন্ম । এই জমিদার-পত্নী বহুদিন যাবৎ কৃষ্ণ চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে বসবাস করলেও ক্রমে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত ঘটে এবং কৃষ্ণ চৌধুরী তার রূপযৌবনের ভার গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন । জমিদার-পত্নীর গর্ভজাত কন্যা সোনারায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় । সোনা রায় বেশির ভাগ সময় জমিদার-পত্নীর কাছেই থাকতেন । একদা জমিদার-পত্নী সোনারায়ের আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বন্দী করেন । সোনারায়ের বন্দীত্ব মোচন সম্পর্কিত দুই ধরনের প্রবাদ আছে । এক, সোনারায় প্রহরীকে বহুমূল্যের রত্নাঙ্গুরী উৎকোচ দিয়ে মুক্তি লাভ করেন । অন্য কাহিনীতে, জমিদার-পত্নীর কন্যা মাতার এই ব্যবহারে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বারবার তার প্রণয়ীর মুক্তিদানের অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও জমিদার-পত্নী তাতে স্বীকৃত না হওয়ায় কন্যা প্রায় উন্মাদ অবস্থায় একদিন গভীর রাতে বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে ভূষিত হয়ে একাকিনী বন্দীশালায় গমন করে প্রহরীকে অলঙ্কার দ্বারা তুষ্ট করে সোনারায়কে মুক্ত করেন । মুক্তির শর্ত ছিল যে মুক্ত হয়ে সোনারায় তাকে বিয়ে করবে । কিন্তু মুক্তির পর সোনারায় প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ করলে কন্যার কোমল হৃদয় নিদারুণ মর্মপীড়ায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ে । অতঃপর তার পুরোপুরি উন্মাদগ্রস্ত হওয়া কিংবা আত্মহত্যা করারও নানাপ্রকার কাহিনী পাওয়া যায় ।[১০৯]

ঐতিহাসিক এই প্রেক্ষাপটের সঙ্গে পালায় বিধৃত কাহিনীর সাযুজ্য নেই । কিংবা বলা যায়, পালার কাহিনীতে এই ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত স্পষ্টভাবে প্রতিভাত নয় । কোথা থেকে পীরের অতিলৌকিক কর্মকাণ্ড এসে পালার কাহিনীর মধ্যে স্থান জুড়েছে ।

এই পালায় বিধৃত কাহিনীর মধ্যেও বহু বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হয় । পালায় সোনা রায়ের জন্মের কথা বলা হয়েছে । কিন্তু দেখা যায়, জন্মের তথ্য দেওয়ার পর ঘটনা দ্রুততর অগ্রসর হয়েছে, এবং তার পর পুনরায় জন্মকালীন খুঁটিনাটি বিবরণ দেওয়া হচ্ছে । একস্থানে স্পষ্টতঃই উল্লেখ করা হয়েছে যে কী এক সমস্যা উপস্থিত হওয়ায় সোনা রায়ের বিয়ে পার হল না ।

সাজে সাজে হইল বাদে সোনারায় বিয়া । (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৩৭১)

কয়েক পংক্তি পরেই ঐ ঘটনার উল্লেখ করে বলা হচ্ছে, সোনারায় বিয়ে করে বাড়ি যাচ্ছে ।

বিয়া কইর‍্যা সোনারায় বাড়ীতে চল্যা যায় । (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৪৭২)

Dhaka University Institutional Repository

এখানে ঘটনা ধারাও বিশৃঙ্খল । নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিই তার সাক্ষ্য ঃ

চাঁদ রায় চাঁদ রায় কি কর বসিয়া ।
তোমার পুত্র সোনা রায় রইল বন্দী হইয়া ॥
পাড়াপড়শী জড় হয় ওলো পাড়ার ঝি ।
সোনা রায় বিয়া করে ব্যাপার খানা কি ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৪৭২)

এই উদ্ধৃতির অব্যবহিত পূর্ব বাক্যেই বলা হল লজ্জে লজ্জে সোনা রায়ের বিয়ে তার হল না এবং চাঁদ রায়কে বলা হচ্ছে পুত্র সোনা রায় তার বন্দী হল, অথচ পরবর্তী বাক্যেই বলা হল ঃ সোনা রায় বিয়ে করেছে, তার দুই তিন পংক্তি পরেই খবর দেওয়া হল সোনা রায় বিয়ে করে বাড়ি চলে যায় । এরকম তথ্য বিভ্রমের উদাহরণ গাথার সারা শরীর জুড়ে বর্তমান ।

এই গাথার আখ্যানভাগের অসম্পূর্ণতা, অন্তর্বুরীণ বিশৃঙ্খলা প্রভৃতির জন্য এর ঘটনাবিন্যাস, চরিত্র চিত্রণ ও রসনিষ্পত্তি বিচার অর্থহীন হয়ে উঠেছে ।

সোনাই বিবি

'সোনাই বিবি'[১১০] গাথায় কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় চরিত্র ছাড়া অন্য কোনো চরিত্র উপস্থাপনে রচয়িতার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় না । কেন্দ্রীয় চরিত্র সোনাই-য়ের মধ্যে ময়মনসিংহের গীতিকার নায়িকাদের প্রধান প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রত্যক্ষ করা যায় । আবাল্যবর্ধিত প্রণয়ের প্রতি শ্রদ্ধার কারণে পিতৃ-আয়োজিত বিয়েতে সে সম্মত হয়নি । নিজের অভিরুচিকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সে বাল্যপ্রণয়ী ছৈইদ বিরামকে উদ্বুদ্ধ করেছে তাকে উদ্ধারের জন্য । ছৈইদ বিরামের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রতিপক্ষ যখন তাকে অপহরণে উদ্যত হয়েছে, তখন তার দূরদর্শিতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় । অদূরদর্শিতার কারণে তার স্বামী ছৈইদ বিরাম সঙ্গে অস্ত্র নিতে বারণ করলেও লুকিয়ে সে কয়েকখানি অস্ত্র নিয়েছিল । আর নিয়েছিল শেষ অস্ত্র বিষবড়ি । ব্যক্তি-অভীপ্সার অচরিতার্থতাকে সে আত্মবিসর্জন দ্বারা পূর্ণ করেছে কিন্তু রুচি-বিরুদ্ধ কোনো সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি । এক্ষেত্রে তার ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতা প্রশংসনীয় । পিতা-আয়োজিত বিয়ের ব্যাপারে মা যখন তার সম্মতি চাইছে, তখন সুস্পষ্ট ও দ্বিধাহীনভাবে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের মধ্যেও তার ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট ঃ

বিয়ার কবুল দিয়া গো ফলছি
ও মাইয়া ছৈইদ বিরামের সংগে রে
আর দিতাম না কবুল গো মাইয়া
আমার জীবন থাকিতে রে ॥
এস্কুলে না পড়বার কালে গো মাইয়া
কবুল দিছি আমি
জনমের লাইগ্যা ছৈইদ বিরাম হইয়া গেছে
আমার আপন স্বামী রে ॥ (মো.গী.পৃ ৮৫)[১১১]

Dhaka University Institutional Repository

ছৈইদ বিরাম চরিত্রে বীরত্ব, বাগাড়ম্বরতা, সাহসিকতা, কাপুরুষতা, প্রণয়ে একনিষ্ঠা ও অদূরদর্শিতা প্রভৃতির সমাহার ঘটেছে। প্রণয়ে একনিষ্ঠার কারণেই সে সোনাই বিবির পত্র পেয়ে দ্রুত তাকে উদ্ধারের জন্য সক্রিয় হয়। নবাব সুজা-নুরার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তার বীরত্ব ও সাহসিকতার যেমন প্রমাণ মেলে, তেমনি এক্ষেত্রে তার চরিত্রের অদূরদর্শিতা, বাগাড়ম্বরতা ও কাপুরুষতারও প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। নিরস্ত্র হাতে সুজা-নুরার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাওয়ার মধ্যে, গমনকালীন আস্ফালনের মধ্যে, অবশেষে নিরস্ত্র হাতে লড়াইয়ে অধিকসময় টিকতে না পেরে প্রণয়িনী-স্ত্রীকে শত্রুর মুখে ফেলে পলায়নের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে। বাগাড়ম্বরতার উদাহরণ,

কেয়ছা শক্তি হইছে আইজেই
গোলামের জাত সুজায় রে
আমার বউ কাইড়া রাখব বুলে
কাব্বুল্লার ময়দানে রে ॥ (মো. গী. পৃ ১১১)

এ ধরনের আস্ফালন চরিত্রকে বাস্তববিবর্জিত করে তুলেছে। তুলনামূলকভাবে সোনাই চরিত্রের বস্তুনিষ্ঠতা আকর্ষণীয়।

নবাব সুজা-নুরার চরিত্রে অর্থগৌরব ও কাপুরুষতাই প্রধান উপাদান। শত্রুর ভয়ে পলায়নের মধ্যে দুই ভ্রাতার কাপুরুষতা অধিকতরভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুজা চরিত্রটি অলস, নিষ্ক্রিয় ও ব্যক্তিত্বহীন। শিকারে গমন, সেখানে পানির অভাব মোকাবেলা, সোনাই-য়ের দেহসৌন্দর্যের কথা অবহিত হয়ে তাকে স্ত্রী হিসেবে লাভের কামনা, সোনাইকে অপহরণের জন্য লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া প্রভৃতি সকল ঘটনায় তার সিদ্ধান্তই ব্যক্ত হয়েছে কিন্তু তা বাস্তবায়নে তার চরিত্রের সক্রিয়তা দৃষ্ট হয় না। সক্রিয়তার পরিবর্তে বিপদে হাহাকার করা কিংবা আদেশদানের মধ্যেই দায়িত্বকর্ম সম্পাদনের স্পৃহা তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে যুদ্ধ না করে তন্ত্র-মন্ত্রের আশ্রয়ে জয়ের প্রয়াসের মধ্যে তার চরিত্রের ব্যক্তিত্বহীনতা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়। সুজার তুলনায় নুরা চরিত্র অধিক সক্রিয়। শিকার-যাত্রায় জলাভাব দূর করার জন্য ঘোড়সওয়ার হয়ে বহুদেশ ভ্রমণ করে। পরে জালাল শহর থেকে পানি নিয়ে সে সংকট সমাধানে সক্ষম হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুজার সঙ্গে সোনাই-য়ের বিয়ে সংঘটিত করার ব্যাপারে তার সক্রিয়তাই সর্বাধিক। কিন্তু তার চরিত্রের এসব গুণ একটি ঘটনায় ম্লান হয়ে গেছে। সোনাইয়ের দাসী তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে দাসীকে সে মাতৃ-সম্বোধন করে। এতে তার কাপুরুষতারই প্রকাশ ঘটেছে।

এই গাথার আখ্যানভাগে গল্প-গ্রন্থন শিথিলতাদুষ্ট, কাহিনী কেন্দ্রীয় ঐক্যে সুগ্রথিত নয়। বানিয়াচঙ্গের নবাব সুজা কর্তৃক সোনাইকে স্ত্রী হিসেবে লাভের আগ্রহ এবং সোনাই কর্তৃক সুজাকে পতি হিসেবে গ্রহণে অসম্মতি ও বাল্যপ্রণয়ী ছৈইদ বিরামের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়া — এই দুই ঘটনার দ্বন্দ্বই এই গাথার মূল বিষয়। কিন্তু গাথার এই মূল সংকটকে উপস্থাপন করার জন্য প্রারম্ভ পর্যায়ের শিকার-যাত্রার দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা অপ্রয়োজনীয়। যুক্তি উত্থাপিত হতে পারে যে শিকারযাত্রায় গিয়ে জলাভাবে পতিত হয়ে জল-অন্বেষণে জালাল শহরে গিয়ে নুরা সোনাইয়ের দর্শন পেয়েছে, সুতরাং শিকারযাত্রার সঙ্গে মূল কাহিনীর সংযোগ আছে। কিন্তু অন্যভাবেও সোনাইয়ের সঙ্গে নুরার সাক্ষাৎ হতে পারত।

Dhaka University Institutional Repository

শিকারগমনের এবং সেখানে জলাভাবের দীর্ঘ বর্ণনার প্রয়োজন ছিলনা ।

গাথার আখ্যানভাগের অধিকাংশ অনুকূল পাঠকদের মনে অবিশ্বাস উদ্রেক করে । বর্ণনার অতিরঞ্জন, ফেরেশ্‌তার আবির্ভাব ও তন্ত্র-মন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ প্রভৃতির মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে । যেমন, বানিয়াচঙ্গের নবাব ভ্রাতৃদ্বয় সুজা ও নুরার শিকারগমনে সহযাত্রীর সংখ্যা নয় লক্ষ । শিকারকালের খাদ্যসামগ্রী হিসেবে সঙ্গে নেওয়া হয় চার সহস্র ছাগল, তের লক্ষ ঘোড়া । দুইশ হাতী তাদের বাহক । সোনাই ও নুরার সাক্ষাতের পেছনে স্বয়ং ঈশ্বর ও তার দূত ফেরেশ্‌তা জিবরাইলের ভূমিকাই প্রধান । ঈশ্বর জিবরাইলের মাধ্যমে সোনাইয়ের শরীরে এমন উষ্ণতার সঞ্চার করে যে চৌদ্দ বছর বয়সে সে প্রথম ঘরের বাহির হয়ে পুকুরে স্নান করতে যেতে বাধ্য হয় । এসময়ে জিবরাইল পুকুরের অন্য তীরে নিদ্রিত নুরার নিদ্রাভঙ্গ করলে সোনাইকে সে দেখতে পায় ।

এন কালে আল্লায় গো বলে জবরীল
কেনে রইলা চাইয়া
ঘুমে আছে ঘুমেরগো নুরা
ও নুরা সোনাইর বদন চাওয়াও (মো.গী.পৃ ৬৪)

নুরা কর্তৃক সংগৃহীত মাত্র এক ঝারি জল দিয়ে নয় লক্ষ মানুষ ও তের লক্ষ ঘোড়ার পিপাসা মেটানোর পরও জল নিঃশেষিত হয় না ।

এক ঝারির পানি দিয়া ভাইরে
ও ভাই সকলি করিল
তবু তনা ঝারির পানি আর ও
ঝরিতেই রহিলরে ॥ (মো.গী.পৃ ৭০ - ৭১)

কিংবা, নব লইক্ষ লোকে গো ভাইরে
এই পানি না খাইল রে
তের লইক্ষ ঘোড়া গো ভাইরে
এই পানি খাইল রে ॥ (পৃ ৭১)

এবং ঝারির সেই খানিক জল পানিশূন্য দীঘিতে ফেলামাত্র দীঘি জলে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে । এ রকম অলৌকিকতার উপাদান গাথার শেষ পর্যায় পর্যন্ত পাওয়া যায় । সুজা-নুরা সোনাইকে অপহরণ করার জন্য বাহুল্লার ময়দানে নয় লক্ষ সহচর নিয়ে উপস্থিত । ছৈইদ বিরাম একা এই বিপুল সংখ্যক লোকের সঙ্গে লড়াই করছে । তাকে নিরস্ত্র করার জন্য সুজা যাদুমন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে বারবার তার অস্ত্রের কার্যকারিতা বিনষ্ট করছে । অন্যদিকে একা বিরাম কর্তৃক অর্ধ ঘন্টার মধ্যে লক্ষ লোকের প্রাণনাশের বর্ণনায়ও অতিরঞ্জন স্পষ্ট ।

আধ ঘন্টার মাইঝে গো বিরাম
লইক্ষ মানুষ তাওয়াই কইরা ফালু (মো.গী.পৃ ১১৭)

এই গাথার আখ্যানভাগে ইসলাম ধর্মের যে-প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তা রচনার পরবর্তীকালে অন্য কোনো রচয়িতা কর্তৃক প্রলিপ্ত হয়েছে বলে অনুমিত হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনার অতিরঞ্জন, অলৌকিকতার সমাবেশ, যাদুমন্ত্রের প্রয়োগ, অদৃষ্টের অমোঘতা সম্পর্কে নিশ্চিতবাণী প্রচার প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এই গাথার কাহিনী যেমন বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে, তেমনি গাথার করুণ পরিণতিও সর্বাংশে তাৎপর্যময় হয়ে উঠতে পারেনি। তবে সোনাই-য়ের ব্যক্তিত্ব-অভীপ্সা কার্যকর করার ব্যাপারে দৃঢ়চিত্ততা, ব্যক্তিত্বময় আচরণ, স্বীয় জীবন বিসর্জন দিয়েও প্রণয়ীর কল্যাণকামনা, ব্যক্তিত্ব-অভিরুচিকেই সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিয়ে মহৎ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটানো প্রভৃতি আখ্যানভাগের অতি-রঞ্জন-অলৌকিকতাকে অনেকটা ম্লান করে দিয়ে পাঠকমনে ট্রাজিক রসের আবেদন সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছে।

চিলাই রানী

'চিলাই রাণী'[১১২] গাথার কোনো চরিত্রই পূর্ণরূপে বিকশিত নয়। তবে এই গাথার চরিত্র-অঙ্কনে রচয়িতার বস্তুনিষ্ঠতা উল্লেখযোগ্য। শৈশবাবস্থায় বিবাহিত চিলাই রানীর মধ্যে স্বামীসঙ্গের আবে-দনহীনতা এবং পরবর্তীকালে বয়সবৃদ্ধির সাথে সাথে পতিপ্রণয়ে উন্মুখ হওয়া — এই দুটি বস্তুনিষ্ঠ বৈশিষ্ট্যের অনতিস্পষ্ট প্রকাশের মধ্য দিয়ে চিলাই রানী চরিত্রটি পরিস্ফুটিত হয়েছে। চিলাই রানীর বণিক স্বামী শিশুস্ত্রীর আবেগশূন্য মানসিকতার কারণে তাকে পরিত্যাগ করে অন্যস্ত্রী গ্রহণ করে সুখী দাম্পত্য জীবনে ব্রতী হয়। বণিক স্বামীর চরিত্র-অঙ্কনেও বস্তুনিষ্ঠতা রয়েছে। বণিক স্বামীর অন্যস্ত্রী গ্রহণে ইন্দ্রিয়জ আবেগই প্রধান হলেও এই চরিত্রটি যে ইন্দ্রিয়-উর্ধ্ব স্নেহ-প্রণয়েও মহৎ বৈশিষ্ট্যের অধি-কারী — তা যুবতী চিলাই রানীর পত্রপাঠমাত্র তার সঙ্গকামনার ঘটনায় স্পষ্ট হয়। লীলা চরিত্রটি একান্তভাবে পতিপ্রাণা। স্বামীর সঙ্গসুখ থেকে এক মুহূর্তের জন্য সে বঞ্চিত হতে অপারগ। এক্ষেত্রে তার শারীরিক আবেগই যে মুখ্য, তা পুরোপুরিভাবে বলা যায়না। স্বামী তাকে সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দিয়েও সাময়িক পরিত্যাগে সম্মত করাতে সক্ষম হতে পারেনি। সম্পত্তির উষ্ণ পরশও যে পতিবিরহের যন্ত্রণা লাঘবে অক্ষম — তা তার আচরণ থেকে স্পষ্ট হয়। তিনটি চরিত্রই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

এই গাথার আখ্যানভাগে গল্পগ্রন্থন নিখুঁত। অতি অল্প পরিসরের মধ্যে ত্রিভুজাকৃতির একটি প্রণয়সম্পর্কের সংকটকে উপস্থাপন করা হয়েছে। শিশুস্ত্রীর মনে 'স্বামী'র আবেদন অনুপস্থিত। কিন্তু স্বামী যদি হয় পরিণত-বয়সী, তাহলে তার পক্ষে এই আবেগহীনতা অসহনীয় হবে — সেটাই স্বাভাবিক। এবং সেকার-ণেই এই গাথার বণিক স্বামী দূরদেশে গিয়ে অন্যস্ত্রী গ্রহণ করে। নায়িকা চিলাই রানীর বয়স বৃদ্ধি পেলে স্বামীর অনুপস্থিতি তাকে বিদ্ধ করে। স্বীয় শরীরের রক্ত দিয়ে লিখিত পত্র সে কাকের মাধ্যমে স্বামীর নিকট প্রেরণ করে। পত্রপাঠমাত্র স্বামী চিলাই রানীর উদ্দেশে যাত্রা করতে প্রস্তুত হলেও দ্বিতীয় স্ত্রী লীলা সেক্ষেত্রে অনুরায় হয়ে দাঁড়ায়। চিলাই রানীকে পরিত্যাগ করার সময় সে যেমন মুক্ত ছিল লীলাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণের ব্যাপারে, আজ তেমন সে নয়। দ্বিতীয় স্ত্রী ও পুত্র দ্বারা অন্য সংসারে আজ সে শৃঙ্খলিত। স্ব-আরোপিত এই বন্ধনের অনিবার্যতাকে লঙ্ঘন করা আজ অসম্ভব।

আখ্যানভাগের সমগ্র কাহিনীতে যেমন অনিবার্যতা রয়েছে, গল্পগ্রন্থনও হয়ে উঠেছে তার অনুষঙ্গী।

আখ্যানভাগের আর-একটি বৈশিষ্ট্য নাটকীয় উপাদান। গাথার সূচনাতেই এই নাটকীয়তা বিদ্যমান ।

গাথাটি সংক্ষিপ্ত । এবং যেখানে এর কাহিনী শেষ হয়েছে সেখানেই তার সমাপ্তি যুক্তিযুক্ত কিনা -- তা প্রশ্নসাপেক্ষ । তবে এমন সমাপ্তিও-যে সম্পূর্ণ যুক্তিহীন, তা নয় । গাথাটি পতিবিরহে কাতর এক নারীর হার্দ্য যন্ত্রণা এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে সংসার-বন্ধনে জড়িত স্বামীর প্রথমস্ত্রীর জন্য আবেগদীপ্ত তীব্র কামনার অসফলতা পরিস্ফুটনের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে । একদা পরস্পর পরস্পরকে উপেক্ষা করেছিল । চিলাই রানীর উপেক্ষার মধ্যে ছিল অপরিণত বয়সের অসচেতনতা, অন্যদিকে বণিক স্বামীর মধ্যে ছিল অদূরদর্শিতা ও অসহনশীলতা । শিশুকন্যাকে বিয়ে করা বা বিয়ে দেওয়ার একটি ভুল সিদ্ধান্তই গাথার সংকট সৃষ্টির জন্য দায়ী । উভয়ের হার্দ্য সংকটের সঙ্গে পাঠক-চিত্ত একাত্ম ও সহানুভূতিশীল । কিন্তু এই গাথার পরিণতি পরিপক্কতা লাভ না করায় প্রশ্ন থেকে যায়, সংকটের সমাধান হল কীভাবে । দেখতে গেলে, সংকট সৃষ্টি করেই কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে । ফলে এই গাথার রসনিষ্পত্তি কোনো পূর্ণায়ত আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি ।

মনোয়ার খাঁ দেওয়ান

'মনোয়ার খাঁ দেওয়ান'[১১৩] গাথার কেন্দ্রীয় চরিত্র মনোয়ার খাঁ ছাড়া অন্য কোনো চরিত্র বিকশিত নয় । মনোয়ার খাঁর আচরণেও পারম্পর্য রক্ষা পায়নি । ঢাকার দেওয়ান হয়েও সে অন্য এক দেওয়ান কন্যা চান বিবিকে স্ত্রী হিসেবে লাভের জন্য যেসব কৌশলের আশ্রয় নেয়, তা দেওয়ান-চরিত্রের জন্য বেমানান । নারীবেশে সে চান বিবির অন্দরমহলে প্রবেশ করে তাকে নাচ দেখিয়ে তুষ্ট করে তার সঙ্গে সখীত্ব গড়ে তোলে এবং এভাবে বিয়ের প্রতিশ্রুতি আদায়ে তাকে বাধ্য করে । মনোয়ার খাঁ দেওয়ান হওয়া সত্ত্বেও সে যে নিচ কুলের সন্তান তা চান বিবির বক্তব্য থেকে জানা যায় । মনোয়ার খাঁর প্রণয়নিবেদনের প্রত্যুত্তরে চান বিবির প্রতিক্রিয়া :

সেও ত মাটিয়ার দেওয়ান আর ও
মাটির বাসনে খায়, কিরে ।।
বাঘের লেঞ্জুরের দিগে দেওয়ান
হাত বাড়াইতে চায়রে
... ...
আর সেও ত ঢেহুঁরানীর পুতে
তাঁড়াইত চায় আমারে রে (মো.গী.পৃ ১৫১ - ৫২)

তার হীন আচরণের সঙ্গে এই জন্ম-পরিচয় সামঞ্জস্যপূর্ণ । কিন্তু পরবর্তীকালে তার আচরণে যে বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তার সঙ্গে এই আচরণের পারম্পর্য থাকে না । চান বিবিকে স্ত্রী হিসেবে লাভের পথে প্রধান অনুরায় দিল্লির বাদশাহ সুজা । আজব খাঁ দেওয়ান কন্যা চান বিবিকে সুজা বাদশাহ-র নিকট বিয়ে দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল । সুজা বাদশাহ তাই চান বিবির জন্য মনোয়ার

Dhaka University Institutional Repository

খাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠান । দিল্লির সৈন্য মনোয়ার খাঁর হাতে পরাজিত হয় । সুজা বাদশাহ মনোয়ার খাঁর বীরত্ব স্বীকার করে সম্মুখ-যুদ্ধের পরিবর্তে কৌশলে তাকে পরাজয়ের কথা চিন্তা করে । এই কৌশল আশ্রয়ের ঘটনায় সুজা বাদশাহ-র চরিত্রের হীনতা প্রকাশ পেয়েছে । আর মনোয়ার খাঁ হয়ে উঠেছে মহত্তর । সুজা বাদশাহ প্রথম কৌশল হিসেবে হাতির খেলা প্রদর্শনের কথা বলে সকল জমিদারকে আহ্বান জানালে সেখানে মনোয়ার খাঁ তার কৌশলের বিষয়টি অনুধাবন করেই যায়নি । এতে তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় । তার অন্যতম বন্ধু কৌশল উপলব্ধি না করে গিয়ে বন্দী হলে তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে মনোয়ার খাঁ বীরত্বের পরিচয় দেয় । সুজা বাদশাহ-র দ্বিতীয় কৌশল উপলব্ধি করেও মনোয়ার খাঁ চট্টগ্রামে নবনির্মিত মসজিদে ঈদের জামাতে ইমামতি করতে যায় এবং মসজিদের অভ্যন্তরে প্রায় আড়াই মাস বন্দী থাকে । এ-পর্বে জানা যায় যে মনোয়ার খাঁ অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ । দ্বিতীয় কৌশলের ঘটনায় সুজা বাদশাহ-র চরম হীন মনোবৃত্তি প্রকাশ পায় । প্রায় আড়াই মাসের অনাহারের পরেও মনোয়ার খাঁর শারীরিকভাবে অপরিবর্তিত থাকার মধ্যে সর্বাংশে অলৌকিকতার স্পর্শ পাওয়া যায় । সুজা বাদশাহ চরিত্রের মহত্ত্ব শেষ সিদ্ধান্তে প্রকাশ পেয়েছে । মনোয়ার খাঁর বীরত্ব ও ধর্মনিষ্ঠার কাছে পরাজিত হয়ে চান বিবিকে তার হস্তে অর্পণের ঘটনায় এই মহত্ত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ।

আজব খাঁ চরিত্রটি ব্যক্তিত্বহীন এবং চান বিবি মনোয়ার খাঁর প্রতি ঘৃণায় হীনতার প্রকাশ ঘটিয়েছে ।

এই গাথার আখ্যানভাগ শিথিল বিন্যাসে দুষ্ট । বর্ণনা শ্লথগতিসম্পন্ন, চমৎকারিত্বহীন । ভাষা ব্যঞ্জনাহীন এবং গ্রাম্যতাদুষ্ট । যেমন,

গরম পাতিল-ডার মাইঝে যেমুন
তেল ডাইল্যা দিলরে (মো.গী.পৃ ১৫১)

এই গাথায় ঐতিহাসিক চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের কোনো ঘটনার সাযুজ্য নেই । চরিত্র-নির্মাণে কিংবা ঘটনা উপস্থাপনে — কোথাও রচয়িতার শিল্পদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় না । ঘটনাগুলি সংকটের কেন্দ্রে আবর্তিত নয় । কেন্দ্রীয় সংকটকে উন্মোচিত করা এবং তার একটি মীমাংসাকে উপলক্ষ করেই যদিও ঘটনাগুলি সংঘটিত হয়, তবুও তা পরস্পর অনিবার্য-সম্পর্কে গ্রথিত হয়নি ।

একারণে গাথার পরিণতি মিলনাত্মক হলেও এধরনের পরিণতিতে কোনো তাৎপর্য নেই । মনোয়ার খাঁ চান বিবির বাঞ্ছিত নয়, বরং সে তাকে ঘৃণাই করে । বলপূর্বক তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করলেও মনোয়ার খাঁর প্রতি তার ঘৃণার অবসান ঘটেছে কিনা — তা জানা যায় না । সুজা বাদশাহ-র প্রতি চান বিবি অনুরক্ত কিনা- তারও কোনো প্রমাণ গাথায় নেই । সুতরাং নায়ক-নায়িকার পরস্পরের আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে গাথার মিলনাত্মক পরিণতি সংঘটিত না হওয়ায় তা আবেদন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে । ধর্মীয় প্রেরণাই এখানে অধিক মূল্য পেয়েছে বলে মনে হয় । চরিত্রগুলোর ধর্মনিষ্ঠাই গাথার পরিণতিকে তাৎপর্যহীন করে তুলেছে ।

Dhaka University Institutional Repository

তোতা মিয়া

'তোতা মিয়া'[১১৪] গাথায় তোতা মিয়া চরিত্রটিই প্রধান এবং সক্রিয়তায় উজ্জ্বল । কিন্তু তার চরিত্রেও রচয়িতা এত অধিকসংখ্যক অবিশ্বাস্য উপাদানের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, যার ফলে চরিত্রটি বস্তুনিষ্ঠতা হারিয়েছে । চরিত্রচিত্রণে রচয়িতার শিল্প-দক্ষতার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না । তোতা মিয়ার শারীরিক শক্তি ও তার খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ সম্পর্কে যেসব বর্ণনা গাথায় পাওয়া যায়, তা কোনোভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয় । তোতা মিয়ার পেয়াদা নাছির মামুদের একদিনের প্রাতঃরাশের বর্ণনা উল্লেখ করলেই এই অবিশ্বাসের কারণ উপলব্ধি করা যাবে ।

আর, বারমণ চিড়া খাইয়া রে নাছির
আরও মুইট্টাইয়া মুইট্টাইয়া
তের ছড়ি কলা খাইল আরও
আঙ্গুলে ছিলিয়ারে ।
আর, তিন মণ লবন খাইল গো
আর সাত টিইল্লা পানি
... ...
আর, বিয়াল্লি বিড়া পান খাইল রে
আর তের কুড়ি গুয়া (মো.গী.পৃ ২৫৬)

এমন অবিশ্বাস্য উপাদান তোতা মিয়া চরিত্রে প্রচুর লক্ষ্য করা যাবে । তার এক চপেটাঘাতে দারোগাসহ তিনজনের মৃত্যু, শত শত সশস্ত্র সিপাই-র ভয়ে পলায়ন, শারীরিক শক্তি দিয়ে বাঘ বন্দী করে ঢাকা থেকে কলিকাতা ও সেখান থেকে লন্ডন গমন প্রভৃতি বহু অলীক উপাদান সহযোগে চরিত্রটিকে বিশ্বাসহীন করে তোলা হয়েছে ।

সে-তুলনায় তার পিতৃব্য দুধ মিয়া পারিবারিক কলহজাত প্রতিশোধ চরিতার্থ করার জন্য স্বোপার্জিত অর্থ ব্যয় করে শত্রুতাসাধনের যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে, তা তার চরিত্রটিকে গ্রামীণ পটভূমিতে বস্তু-নিষ্ঠ করে তুলেছে । তোতা মিয়ার ভ্রাতা লাল মিয়ার চরিত্রটিও বিশ্বাসযোগ্য । জজ, জেল দারোগা প্রভৃতি চরিত্র অঙ্কনে রচয়িতার অনভিজ্ঞতাজাত ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় ।

এই গাথার আখ্যানভাগের বর্ণনা অতিরঞ্জন-দোষে দুষ্ট । চরিত্র-অঙ্কনের ক্ষেত্রেই তার পরিচয় পাওয়া গেছে । তাছাড়া এর কাহিনী গীতিকাধর্মী নয় । ব্রিটিশ শাসনামলে কোনো জমিদারের পারিবারিক কলহকে কেন্দ্র করে সংঘটিত কোনো ঘটনা অবলম্বনে গ্রাম্যকবি কর্তৃক গাঢ় রংয়ের প্রলেপ দিয়ে রচিত মফস্বলীয় কাহিনী-কবিতার ঢংটি এতে সুস্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে । কোনো হার্দ্য অনুভূতিজাত স্বপ্ন ও

Dhaka University Institutional Repository

অচরিতার্থতার সংকট নিয়ে এটি রচিত নয়, সংকটের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি পারিবারিক কলহ। এবং তা থেকে কাহিনী অতিরঞ্জিত হয়ে নানা শাখায় পল্লবিত হয়েছে। এই কাহিনীর রচয়িতা কল্পনায় যত আকাশচারী, গীতিকার রচয়িতাগণ তত মৃত্তিকাসংলগ্ন। ফলে চরিত্রগত এই ব্যবধানটি সহজেই পরিদৃষ্ট হয়। এ কারণে এর রসনিষ্পত্তি আলোচনাও নিরর্থক।

মাধব মালঞ্চি কইন্যা

'মাধব মালঞ্চি কইন্যা'[১১৫] গাথার নায়ক-নায়িকা মাধব ও মালঞ্চি উভয় চরিত্র উপস্থাপনে রচয়িতার বস্তুনিষ্ঠতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। উভয় চরিত্রে বিশ্বাসযোগ্যত নয় এমন বহু উপাদানের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। এই গাথায় বিধৃত চরিত্র-সংখ্যা তুলনামূলকভাবে প্রচুর। মাধবের পিতা 'মিছির' শহরের দুলভ রাজা, তার মাধবসহ সাত পুত্র ও ছয় পুত্রবধূ, জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ চন্দ্রবন, বলা রাজা, তার কন্যা মালঞ্চি, রাজা উজীর ও উজীর-পত্নী, রাজগৃহের শিক্ষক, গাইট্যাল রাজা (যার সঙ্গে মালঞ্চির বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল), বুইট্যাল রাজা, তার কন্যা ফুলমতী, তার উজীর, রাক্ষস, দানব-দানবী, আয়রা দেশের আয়রা বাদশাহর কন্যা — এমনি বহু চরিত্রের সঙ্গে ভিন্ন একটি ভাষ্যের চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে কুজন্ট নগরের রাজা গঙ্গাধর, রাজকন্যা মালেঙ্কা, কোতোয়ালপুত্র মাধব, কৈটা রাজা (যার সঙ্গে মালেঙ্কার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়), মন্টু চোরা প্রমুখ। কোনো চরিত্রই বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। চরিত্রের এক একটি দিক উন্মোচিত হয়েছে মাত্র।

মাধব ও মালঞ্চি উভয়ে পরস্পরের প্রতি প্রণয়ভাবনায় একনিষ্ঠ এবং পরস্পরকে হারিয়ে পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়াসী। স্বীয় প্রণয়াকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য উভয়কে কঠিন সাধনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। প্রণয়ে একনিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতির মাধ্যমে উভয় চরিত্র মহৎ হয়ে উঠেছে। গাথার আর-একটি চরিত্র এদের অনুরূপ মহত্ত্ব প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছে। চন্দ্রবন কইন্যা শ্বশুরের মৃত্যুকালীন অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে নাবালক মাধবের প্রতি স্নেহ, ভালবাসা ও মাতৃত্ব প্রদর্শন করেছে। তাতেই তার এই মহত্ত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাজার মৃত্যুর পর রাজ্য নিয়ে ছয়পুত্রের মধ্যে সৃষ্ট কলহকে কেন্দ্র করে এই গাথার সংকট শুরু হলেও তা একটি হার্দ্য অনুভূতি তথা প্রণয়সংকটে গতি পরিবর্তন করে। সিংহাসন লাভের বৈষয়িক সংকট বিষয়হীন হার্দ্য সংকটে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে আখ্যানভাগের গল্পগ্রন্থনে পরিবর্তন সূচিত হয়। মাধব-মালঞ্চির প্রণয় ও তা চরিতার্থ করার কাহিনী নিয়ে উপস্থাপিত গাথার মৌল সংকটকে বিন্যাস করা হয়েছে বহু উপকাহিনী বা শাখাকাহিনীর পটভূমিতে। ফলে এ-পর্যায়ে গল্পগ্রন্থন হয়েছে শৈথিল্যদুষ্ট। বর্ণনায়ও অতিরঞ্জন, শ্লথগতি, ঋজুহীনতা ও বাহুল্যদোষ আদ্যন্ত বিদ্যমান। তদুপরি চন্দ্রবনের গলার হার রূপ অলঙ্কারের অলৌকিক ক্ষমতা, মন পবনের নৌকা ও সিদ্ধির ঝোলার অলৌকিকত্ব, রাক্ষস ও দানব-দানবীর সমাবেশ প্রভৃতির মাধ্যমে গাথাটির গীতিকাধর্ম দারুণভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। রূপকথাধর্মিতা হয়ে উঠেছে এর মৌলসত্য। ফলে এর রসনিষ্পত্তি আলোচনাও হয়ে উঠেছে নিরর্থক। এর অধিকাংশ

Dhaka University Institutional Repository

স্হান জুড়ে গদ্যবর্ণনার উল্লেখ গাথার আখ্যানভাগের আর-একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য । তবে এই অভিনবত্ব তাৎপর্যহীন । বর্ণনার শিল্পোৎকর্ষ বৃদ্ধিতে গদ্যরূপ কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি ।

এই গাথার মূল ভাষ্যের শেষে একটি সংক্ষিপ্তাকারের ভিন্ন ভাষ্য পাওয়া যায় । এই ভাষ্যের সঙ্গে মূল ভাষ্যের কাহিনীর একটি মাত্র মিল রয়েছে । কুজন্ট নগরের রাজা গঙ্গাধর বহু সাধনার পর এক কন্যার পিতা হতে সক্ষম হয় । কন্যার নাম মালেঙ্কা । ঐ কন্যার যেদিন জন্ম হয় সেই রাত্রেই কোতোয়ালের গৃহে এক পুত্র সন্তান জন্মে । নাম তার মাধব । মালেঙ্কার সঙ্গে কৈটা রাজার বিয়ের সম্বন্ধ স্হির হয়, কিন্তু মালেঙ্কা মাধবের সঙ্গে পলায়নের যুক্তি করে । আড়াল থেকে 'মন্টু চোরা' এই যুক্তি শুনে ফেলে । বিয়ের দিন মাধবের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে মালেঙ্কার অজ্ঞাতেই মন্টু চোরা মালেঙ্কাকে নিয়ে পলায়নপর হয় । মূল ভাষ্যে রয়েছে : বিয়ের রাত্রে মাধবের অন্যমনস্কতার ফলে মালঞ্চি যার সঙ্গে ভুল করে পলায়ন করে সে এক খেয়ামাঝি ।

দুটি ভাষ্য থেকে অনুমান করা যায়, পিতৃআয়োজিত বিয়ে মাধব-মালঞ্চির প্রণয়ে যে সংকট সৃষ্টি করে তা থেকে পলায়নই হয়ে ওঠে তাদের একমাত্র উপায় । কিন্তু পলায়নের রাত্রে নায়কের ভুলের জন্য উভয়কে পরে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয় । তবে শেষ পর্যন্ত মিলনান্তক পরিণতি লাভ করে । — এমন একটি কাহিনীকে ভিত্তি করে একাধিক রচয়িতা তার একাধিক রূপ দিয়েছেন । দ্বিতীয় ভাষ্যটি অসম্পূর্ণ । তবে গল্পগ্রন্থনের দিক থেকে এই ভাষ্যটি তুলনামূলকভাবে শিল্পসফলতা লাভ করেছে ।

গকুল চান ও আইধর চান

'গকুল চান ও আইধর চান'[১১৬] গাথায় চরিত্র-সংখ্যা স্বল্প হলেও নবাব চরিত্র ছাড়া অন্য কোনো চরিত্র অঙ্কনে রচয়িতার বস্তুনিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায় না । গকুল চান ও আইধর চান — দু'ভাইয়েরই বীরত্ব বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে । গকুল চানের স্ত্রী-যে-দুধ রানীকে দেখে নবাব নারীলালসায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, সে মনুষ্য নয়, পরী । তাদের পাঁচ বোনের ছোট বোন গুলিস্তা পরীকে বিয়ে করেছে আইধর চান । এসব চরিত্রে অলৌকিকত্ব আরোপের ফলে চরিত্রগুলি মনুষ্যধর্মে বিশিষ্ট হতে পারেনি ।

একথা আখ্যানভাগ সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য । গকুল চানের সুন্দরী স্ত্রীকে দেখে নবাব তাকে লাভ করার জন্য প্রয়াসী হবে এবং স্বীয় স্ত্রীকে রক্ষার জন্য গকুল চান হবে যুদ্ধে ব্রতী — এতে কোনো অস্বাভাবিকত্ব নেই । কিন্তু দুধ রানীর দেহসৌন্দর্যের প্রভায় পুকুরের জলের অগ্নিবর্ণ ধারণ কিংবা গকুল চান কর্তৃক যুদ্ধে নয় শত হাজার সৈন্যকে নিহত করা কিংবা মৃত গকুল চানের পুনর্জীবন লাভ প্রভৃতি ঘটনায় কাহিনী বস্তুনিষ্ঠতা হারিয়ে রূপকথাধর্মী হয়ে উঠেছে । পরীর রাজ্যের বিবরণ ও পরীর আগমন প্রভৃতিও রূপকথারই উপাদান । রূপকথাধর্মিতার প্রাবল্যে বস্তুনিষ্ঠতা ম্লান হয়ে যাওয়ায় কাহিনী তাৎপর্য হারিয়েছে । ফলে এর মিলনান্তক পরিণতিও অলৌকিকতা-আশ্রয়ে হয়ে উঠেছে গুরুত্বহীন ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. অধিকাংশ গীতিসমূহই এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষণীয় । বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য : মহুয়া, পৃ ১১১-১২। নিরাসক্তির চরম প্রকাশ 'কঙ্ক ও লীলা'য়, যেখানে পাঁচটি মৃত্যুর কথা উচ্চারিত হয়েছে একটি কিংবা দুইটি পংক্তিতে এবং কোথাও এতটুকু দুঃখ, কিংবা ক্ষোভ ব্যক্ত হয়নি, দ্রষ্টব্য : 'কঙ্ক ও লীলা' পৃ ১৪৪

২. এই বৈশিষ্ট্যটিও একাধিক গীতিকায় লক্ষ্য করা যাবে । তবে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য : মহুয়া, পৃ ১০৯; মহুয়া, পৃ ১১৮ ; কমলা, পৃ ১২৮ ; বগুলার বারমাসী, পৃ ১৮৯

৩. দ্রষ্টব্য : বগুলার বারমাসী, পৃ ১৯১

৪. 'মহুয়া' গাথায় এর পরিচয় পাওয়া যায় ।

৫. 'রাজা রঘুর পালা'য় উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মুখ থেকে সংলাপ উচ্চারণের ঘটনা বিধৃত হয়েছে ।

৬. বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য : কমলা, পৃ ১৩১ ; বগুলার বারমাসী, পৃ ১৮৯ ; পীর বাতাসী, পৃ ২০০

৭. বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য : মহুয়া, পৃ ১১৯-২০; ভেলুয়া, পৃ ১৬০

৮. দ্রষ্টব্য : বগুলার বারমাসী, পৃ ১৮৯-৯০; মলয়ার বারমাসী, পৃ ২০৪

৯. সত্য উন্মোচনের কৌশল হিসেবে পবিত্র ও শক্তিশালী বস্তু-উপাদান ও ব্যক্তিদের সাক্ষী করার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে 'কমলা' গাথায় । এছাড়া 'কমলা' গাথায় নাটকীয়তা সৃষ্টির প্রয়াসও লক্ষণীয় । দ্রষ্টব্য : পৃ ১৩১

১০. এর একটি অন্যতম উদাহরণ, কথায় কথায় 'মাথা খাও' বাক্যখন্ডের ব্যবহার । অধিকাংশ গাথায় এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় । কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ :

পানি যদি হয়ে ভুবায়ে বন্ধু আমার মাথা খাও । (মহুয়া)
দেখা করতে যাইও বন্ধু খাওরে আমার মাথা । (মহুয়া)
এই দেশেতে না থাক্য ভাইরে আমার মাথার কিরা । (মহুয়া)
আজি রাতে মানা দেও খাঁও মোর মাথা । (মহুয়া)
আমার মাথা খাও কন্যা আমার মাথা খাও । (মহুয়া)
পরিচয়-কথা কও মোর মাথা খাও ॥ (কমলা)
ধুন ধুন দেওয়ান ভাবনা আমার মাথার কিরা । (দেওয়ান ভাবনা)
মায়ের আগে খবর কইও আমার মাথা খাও ॥ (রূপবতী)
কথা যদি নাহি কর মোর মাথা খাও । (কঙ্ক ও লীলা)
যদি নাহি যাওরে কোকিল আমার মাথা খাও । (কঙ্ক ও লীলা)
রাখ মোর কথা পিয়া খায়ে মোর মাথা খাও ।(দেওয়ানা মদিনা)
আমারে ভুলিয়া যাইও আমার মাথা খাও ॥ (পীর বাতাসী)

১১. অনেক গাথায়ই এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষণীয় । তবে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য : মহুয়া, পৃ ১১৩-১৪ ; দেওয়ান ভাবনা, পৃ ১৩৫ ; কঙ্ক ও লীলা, পৃ ১৪৪-৪৫ ; ধোপার পাট, পৃ ১৫৩

১২. প্রাচীন কাব্য: সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন, ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থ-নিলয়, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৬, দ্রষ্টব্য : পৃ ১৫৫-৫৮

১৩. বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য : মহুয়া, পৃ ১১৪-১৫ ; চন্দ্রাবতী, পৃ ১২৫-২৬ ; দেওয়ান ভাবনা, পৃ ১৩৫-৩৬; দেওয়ানা মদিনা, পৃ ১৪০ ; ফিরোজ খান দেওয়ান, পৃ ১৬৭-৬৮; আন্ধা বন্ধু, পৃ ১৮৮

১৪. বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য : কমলা, পৃ ১৩১-৩২ ; ভেলুয়া, পৃ ১৬০

Dhaka University Institutional Repository

১৫. এক্ষেত্রে চর্যাপদের বিখ্যাত পংক্তিটি স্মরণযোগ্য : 'অপনা মাঁসে হরিণা বৈরী'।

১৬. 'মহুয়া', সংগ্রাহক : চন্দ্রকুমার দে, সংগ্রহকাল : ১৯২০-২১ সাল, নেত্রকোনার মসকা গ্রামের সেক আসক আলী ও উমেশচন্দ্র দে এবং গোয়ালী গ্রামের নসুসেকের নিকট থেকে সংগৃহীত, রচয়িতা : দ্বিজ কানাই, রচনাকাল : আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দী, পংক্তি-সংখ্যা : ৭৫৫, <u>মৈমনসিংহ-গীতিকা</u> (পূর্ববঙ্গ গীতিকা, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা), শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন, রায় বাহাদুর, বি.এ.ডি.লিট. কর্তৃক সঙ্কলিত, চতুর্থ সংস্করণ, প্রকাশকাল : ১৯৭৩, প্রকাশক : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ ৩ - ৪২

১৭. "মহুয়া চরিত্রধর্মে গীতিকার প্রেমময়ী নারীদেরই সগোত্র, কিন্তু ব্যক্তিত্ব বিকাশ তার চরিত্রে অনেকটা স্পষ্ট। তার সক্রিয়তা ও বুদ্ধিবৃত্তি গীতিকার সব চরিত্রে মেলে না। তার রূপের উচ্ছ্বসিত মাদকতার সঙ্গে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বিপদে অবিচল ধৈর্যের সহজ সম্মিলন ঘটেছে।" <u>প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন</u>, প্রাগুক্ত পৃ ১৬৯

১৮. "The central pair, Mahua and Naderchand, are, of course positive in every respect and with no reservation; but still, Natherchand represents the weaker element, more passive and attracting the listener's sympathies in a lesser degree." <u>BENGALI FOLK BALLADS FROM MYMENSINGH AND THE PROBLEM OF THEIR AUTHETICITY</u>, BY DR. DUSAN ZBAVITEL, UNIVERSITY OF CALCUTTA, 1963, P.35

১৯. <u>বাংলার লোক-সাহিত্য</u> (প্রথম খন্ড : আলোচনা), ডক্টর শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ : ১৯৬২, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা (প্রথম সংস্করণ : ১৯৫৪), পৃ ৪০৫

২০. "মহুয়া কাব্যকাহিনীর নাট্যরস স্বভাবতঃই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কাব্যটি যেন অভিনয়োপযোগী করেই রচিত। বেশির ভাগই — চরিত্র এবং ঘটনার অগ্রগতি — সংলাপে অভিব্যক্ত। এবং স্থানকাল বিভাগের দৃশ্য পরিকল্পনার চিহ্ন মেলে।
মহুয়া কাব্যের আঙিকের নিপুণ-নিটোল গঠনে নাট্যরসের বাড়তি আস্বাদের সহযোগ উল্লেখযোগ্য।" <u>প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন</u>, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৮

২১. "He never criticizes them, he does not condemn them, he neither appraises nor blames. His pose is that of an unconcerned narrator of other people's doing and adventures..." <u>BENGALI FOLK BALLADS FROM MYMENSINGH AND THE PROBLEM OF THEIR AUTHENTICITY</u>, Ibid, P. 35-36.

২২. <u>বাংলার লোক-সাহিত্য</u>, প্রাগুক্ত, পৃ ৪০১

২৩. <u>প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন</u>, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৮

২৪. এ-বিষয়ে 'ময়মনসিংহের গীতিকায় প্রকৃতি ব্যবহার' শীর্ষক পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

২৫. <u>প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন</u>, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৭

২৬. "... কিংমার্কের মতই পিতা সুনাই মেয়ের হৃদয় ভেঙে করে কোন করে নির্গত হচ্ছে অনুতাপের অশ্রু।" <u>লোক-সাহিত্য</u> (দ্বিতীয় খন্ড), ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, মুক্তধারা, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০ (প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৬৩), পৃ ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

২৭. 'মহুয়া', সংগ্রাহক : চন্দ্রকুমার দে, সংগ্রহকাল : ১৯২১ সাল, কিশোরগঞ্জের কপাথী গ্রামের শাবানী বেওয়া, দুখিয়া নাম, রাজীবপুরের সেখ নসু, মজলিসিদ্দি নিদান ফকির, খুরশীমলীর সাধু খুপী, পাটদগাড়ার আমালদিসেক এবং দুলাইলনিবাসী মধুর রাজের নিকট থেকে সংগৃহীত, রচয়িতা : চন্দ্রাবতী, পংক্তিসংখ্যা : ১২৩৭, মৈমনসিংহগীতিকা, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫ - ১০০

২৮. "মহুয়া পালাটির নায়িকা চরিত্রের মধ্যে একটি তেজোদীপ্ত প্রখর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে..." বাংলার লোক-সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ ৪০৮
অন্যত্র,
"সমগ্র পালাটি জুড়িয়া একটিমাত্র চরিত্রেরই যেন সদর্প পদধ্বনি শুনিতেছি — তাহা মহুয়ার। জলের ঘাটে চাঁদ বিনোদের ঘুমন্তরূপে তাহার সম্মুখে জাগিয়া উঠা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ দৃশ্যে ভগ্ন তরী নিমজ্জিত করিয়া নদীর জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করা অবধি সে যেন উর্ধ্বশ্বাসে কাহিনীর মধ্য দিয়া ছুটিয়া অগ্রসর হইয়াছে।" প্রাগুক্ত, পৃ ৪১০

২৯. BENGALI FOLK BALLADS FROM MYMENSINGH AND THEIR AUTHENTICITY, Ibid, P. 49

৩০. বাংলার লোক-সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১০-১১

৩১. প্রাচীন কাব্য:সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৫

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৬

৩৩. বাংলার লোক-সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১০

৩৪. "মহুয়ার মৃত্যু আত্মহত্যা, মহুয়ার মৃত্যু আত্মত্যাগ।" বাংলার লোক-সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১০

৩৫. বাংলার লোক-সাহিত্য, প্রাগুক্ত।

৩৬. 'চন্দ্রাবতী', সংগ্রাহক : চন্দ্রকুমার দে, সংগ্রহকাল ও সংগ্রহস্থান অনুল্লেখিত, রচয়িতা : নয়ানচাঁদ ঘোষ, রচনাকাল : সপ্তদশ শতাব্দী, পংক্তিসংখ্যা : ৩৫৪, মৈমনসিংহ-গীতিকা, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৩ - ১১৮

৩৭. বাংলার লোক-সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১২

৩৮. "চন্দ্রাবতী গাথাটির আখ্যান-গ্রন্থন নিখুঁত। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে কেবলমাত্র প্রতি প্রয়োজনীয় ঘটনাগুলিকে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত করে কাহিনীটিকে সম্পূর্ণ করা হয়েছে। গীতিকাটির নাটকীয় গুণধর্ম অনস্বীকার্য চমৎকারিত্বে কাহিনীকে মন্ডিত করেছে।" প্রাচীন কাব্য:সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৮

৩৯. 'কমলা', সংগ্রাহক : চন্দ্রকুমার দে, সংগ্রহকাল : ১৯২১ সাল, কেন্দুয়ার (নেত্রকোনা) নিকটবর্তী কোনো এক গ্রামের তিন-চারজন মহিলার নিকট থেকে সংগৃহীত, রচয়িতা : দ্বিজ ঈশান, রচনাকাল : অনুল্লেখিত, পংক্তি-সংখ্যা : ১৩২০, মৈমনসিংহ-গীতিকা, প্রাগুক্ত, পৃ ১২১ - ৭০

৪০. প্রাচীন কাব্য:সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৫

৪১. প্রাচীন কাব্য:সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৫

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭২ দ্রষ্টব্য।

৪৩. প্রাগুক্ত।

৪৪. 'দেওয়ান ভাবনা', সংগ্রাহক : চন্দ্রকুমার দে, সংগ্রহকাল : ১৯২২ সাল, কেন্দুয়ার (নেত্রকোনা) নিকটবর্তী কোনো স্থানের মাঝিদের নিকট থেকে সংগৃহীত, রচনাকাল : সপ্তদশ শতাব্দী, রচয়িতার

Dhaka University Institutional Repository

নাম অনুল্লেখিত, পংক্তি-সংখ্যা : ৩৭৪, মৈমনসিংহ-গীতিকা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৩-১৯৯

৪৫. প্রাচীন কাব্য: সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৫

৪৬. প্রাচীন কাব্য: সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৬

৪৭. 'রূপবতী', সংগ্রাহক : চন্দ্রকুমার দে, সংগ্রহকাল : ১৯২২ সাল, সংগ্রহস্থান, রচনাকাল বা রচয়িতার নাম অনুল্লেখিত, পংক্তি-সংখ্যা : ৪৯৩, মৈমনসিংহ-গীতিকা, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৯ - ৬০

৪৭ক. আমাদের এই বিশ্লেষণ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'-র অন্তর্ভুক্ত 'রূপবতী' গাথা সম্পর্কে। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' দ্বিতীয় খন্ডে 'রাজকন্যা রূপবতী' শীর্ষক গাথাটি কাহিনীর দিক থেকে এর অনুরূপ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে আখ্যানাংশের একটি যুক্তিশৃঙ্খলিত পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া যায়।

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনায় এই গাথার পংক্তি-সংখ্যা ৬৩৩। 'রূপবতী' গাথার ২৯৯ পংক্তি এখানে পাওয়া যাবে। এই গাথায় নতুন পংক্তি-সংখ্যা ৩৩৪। এই গাথার কাহিনীতে আছে : রাজা জয়চন্দ্র নবাবের আদেশ পালন না করে বরং কন্যাকে হত্যা করতে চেয়েছে। কিন্তু রানী গোপনে চাকর মদনকুমারের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিয়ে তাদের বনবাসে প্রেরণ করেছে। নবাবের পক্ষ থেকে দেওয়ানের সিপাই এসে রূপবতীকে না পেয়ে রাজাকে বন্দী করেছে এবং রাজপুরী করেছে নিশ্চিহ্ন। রানী এসময় আত্মবিসর্জন করেছে। কিছুদিন পরে চাকর মদনকুমার নিজ পিতামাতার অনুসন্ধানে এসে দেওয়ান কর্তৃক বন্দী হয়েছে। খবর পেয়ে রূপবতী বিচলিত হয়ে ধর্মপিতামাতাকে স্বামী-উদ্ধারের অনুরোধ জানালে তারা সাধারণ প্রজাদের একত্রিত করে দেওয়ানের বিরুদ্ধে লড়াই করে। দেওয়ান পরাজিত হয়। মদনকুমারকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে রাজপদে আসীন করা হয়। কাঙালিয়া-জাঙালিয়া-পুনাই — সকলে যুদ্ধে নিহত হয়।

৪৮. প্রাচীন কাব্য: সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭০

৪৯. 'কঙ্ক ও লীলা', সংগ্রাহক : চন্দ্রকুমার দে, নেত্রকোনা থেকে সংগৃহীত, সংগ্রহকাল অনুল্লেখিত, রচয়িতা : দামোদর, রঘুসুত, নয়ান চাঁদ ঘোষ ও শ্রীনাথ বেনিয়া, রচনাকাল : আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দী, পংক্তি-সংখ্যা ১০১৪, মৈমনসিংহ-গীতিকা, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৩ - ৩১২

৫০. বাংলার লোক-সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২৫

৫১. আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য : BENGALI FOLK BALLADS FROM MYMENSINGH, Ibid, P.65.

৫২. 'দেওয়ানা মদিনা', সংগ্রাহক : চন্দ্রকুমার দে, সংগ্রহকাল : ১৯২১ সাল, সংগ্রহস্থান ও রচনাকাল অনুল্লেখিত, রচয়িতা : মনসুর বয়াতি, পংক্তি সংখ্যা ৮২২, মৈমনসিংহ-গীতিকা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫১ - ৮৭

৫৩. প্রাচীন কাব্য: সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৩

৫৪. 'ধোপার পাট', সংগ্রাহক : চন্দ্রকুমার দে, ময়মনসিংহের আড়ুয়াইবট্টা গ্রামের মনীন্দ্র ভদ্র এবং চরশম্ভুগঞ্জের দীন ঘোষ ও কীর্তনখোলার 'মধুর বাপ' নামে পরিচিত এক ব্যক্তির নিকট থেকে সংগৃহীত, সংগ্রহকাল : ১৯২৪ সাল, রচনাকাল : আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দী, রচয়িতার নাম অনুল্লেখিত, পংক্তি-সংখ্যা : ৪৬৯, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, রায় বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি.এ., ডি.লিট., কর্তৃক সঙ্কলিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯২৬, পৃ ৩ - ২৮

Dhaka University Institutional Repository

৫৫. 'মহুয়াল বন্ধু', সংগ্রাহক : চন্দ্রকুমার দে, প্রথম অংশটি সুত্রকোণা গ্রামের চন্দ্রকুমার সরকার, রামের বাজারের সুরু মাঝাল ও লোহাগী গ্রামের নিধু ব্যাপারীর নিকট থেকে এবং দ্বিতীয় অংশটি উচিগ্রামের গয়া ও পটমরা গ্রামের গাছুনি শেখের নিকট থেকে সংগৃহীত, সংগ্রহকাল : ১৯২৩ সাল, রচনাকালঃ আনুমানিক ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দশ শতাব্দী, রচয়িতার নাম অনুল্লেখিত, পঙক্তিসংখ্যা : ৪৯৭ + ৩৩৩, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯ - ৭৮

৫৬. 'ময়মনসিংহের গীতিকায় জীবনচর্যা' শীর্ষক অধ্যায়ে এ-সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে ।

৫৭. প্রাগুক্ত, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য ।

৫৮. দ্রষ্টব্য, BENGALI FOLK BALLADS FROM MYMENSINGH, Ibid, P. 83

৫৯. ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র চতুর্থ খন্ডে 'মহুয়াল বন্ধু-সাঁচুতী কন্যার পালা' শীর্ষক গাথার কাহিনী 'মহুয়াল বন্ধু' গাথার অনুরূপ । এই গাথার পংক্তি-সংখ্যা ৮০৬ । এর ৫৮০ পংক্তি দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মহুয়াল বন্ধু' গাথায় পাওয়া যায় । ২০৬টি পংক্তি নতুন । এই গাথার কাহিনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত গাথার দুটি অংশকে একটি একক রূপ দানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে । তবে এই প্রয়াসকে যুক্তিশৃঙ্খলিত বলা যায় না ।'মহুয়াল বন্ধু' গাথার দ্বিতীয় অংশের সঙ্গেই এর মিল অধিক ।

এই গাথার শুরুতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নিঃস্ব সুজন কৃষকের মহাজনী ঋণ গ্রহণ ও তা শোধ না করে মৃত্যুর কথা আছে । পরে উজাধর সাধুর অর্থে ধনী হয়ে শিক্ষাখালির তীরে বাড়ি তৈরি করে এবং বাড়িতে বসে বাঁশী বাজালে তা শুনে সাঁচুতী বিচলিত হয় । 'মহুয়াল বন্ধু' গাথায় এ-সময়ে বলরাম লোকান্তরিত । কিন্তু এখানে বলরাম জীবিত । বলরাম উদ্যোগী হয়ে উজাধরের কাছে কন্যা সম্প্রদানের ব্যবস্থা করে । কিন্তু এসময়ে মধুয়া আসে উজাধরের বাড়ি । বিয়ে না করেই (বিষয়টি অবিশ্বাস্য) উজাধর মধুয়ার সঙ্গে অধিক মুনাফার লোভে বাণিজ্য-যাত্রা করে । পাঁচ বছর পরে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে যখন সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, ততদিনে বলরামের মৃত্যু হয়েছে, মহাজনী ঋণের কারণে গ্রামে সাঁচুতীর পরিবার নিঃস্ব । সাঁচুতীর সঙ্গে বিয়ে হল উজাধরের । এবং দ্বিতীয়বার মধুয়া যখন এল, সাঁচুতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে লাভ করার জন্য উজাধরকে হত্যা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে নিজেই বিপর্যস্ত হল । 'মহুয়াল বন্ধু' গাথার দ্বিতীয় অংশের সঙ্গে এ-পর্বের কাহিনীর মিল আছে । তবে এই গাথার কাহিনীতে শেষ পর্যন্ত সাঁচুতী স্বামী ও পুত্রকে বাঁচিয়ে নিজে আত্মবিসর্জন দানের ঘটনা পাওয়া যায় ।

৬০. 'ভেলুয়া', সংগ্রাহক : চন্দ্রকুমার দে, বানিয়াচঙ্গ থেকে সংগৃহীত, সংগ্রহকাল, রচনাকাল কিংবা রচয়িতার নাম অনুল্লেখিত, পংক্তিসংখ্যা ১৪৯৬, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪১ - ২০৭

৬১. 'কমলা রানীর গান', সংগ্রাহক : চন্দ্রকুমার দে, সংগ্রহস্থান অনুল্লেখিত, সংগ্রহকাল : ১৯২৫ সাল, রচয়িতা : অধর চাঁদ (ভণিতায় উল্লিখিত), রচনাকাল : আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ২১১ - ২৩০

৬২. পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খন্ড , দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য ।

Dhaka University Institutional Repository

৬৩. 'মানিকতারা বা ডাকাইতের পালা', সংগ্রাহক : বিহারীলাল রায়, ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত, সংগ্রহকাল : ১৯২৫ সাল, রচয়িতা : নাসির ও আলাইহুল্লা (ভণিতায় উল্লেখিত), রচনাকাল: আনুমানিক : অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ, পংক্তিসংখ্যা : ৮৩২, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৩ - ২৭৪

৬৪. পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য।

৬৫. 'দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদালি', সংগ্রাহক : চন্দ্রকুমার দে, সংগ্রহস্থান, সংগ্রহকাল, রচনাকাল কিংবা রচয়িতার নাম অনুল্লেখিত, পংক্তিসংখ্যা : ৮৪৬, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪৯ - ৩৯০

৬৬. পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য।

৬৭. 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান', সংগ্রাহক : চন্দ্রকুমার দে, সংগ্রহস্থান, সংগ্রহকাল ও রচয়িতার নাম অনুল্লেখিত, রচনাকাল : আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ, পংক্তিসংখ্যা : ৯২২, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩৬ - ৭৮

৬৮. 'মাছুয়া বা', সংগ্রাহক : নগেন্দ্রচন্দ্র দে, ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত, সংগ্রহকাল, রচনাকাল কিংবা রচয়িতার নাম অনুল্লেখিত, পংক্তিসংখ্যা : ৪৭০, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, তৃতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ডি.লিট. কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, মার্চ ১৯৩০, পৃ ১১ - ৩৪

৬৯. পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, তৃতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৫ - ৭

৭০. 'আয়না বিবি', সংগ্রাহক : চন্দ্রকুমার দে, ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত, সংগ্রহকাল : ১৯২৫ সাল, রচনাকাল বা রচয়িতার নাম অনুল্লেখিত, পংক্তিসংখ্যা : ৫১১, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, তৃতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯১ - ২১৬

৭১. 'শ্যাম রায়', সংগ্রাহক : চন্দ্রকুমার দে, কিশোরগঞ্জের মাতুয়ানিবাসী কৈলাশচন্দ্র দে, লাঠগড় নিবাসী শচিনী ঘোষ, মদিনপুর নিবাসী অদ্বৈত দাস এবং ময়মনসিংহের গুরুরকানন নিবাসী কমল দাসের নিকট থেকে সংগৃহীত, সংগ্রহকাল ১৯২২ - ২৫ সাল, রচনাকাল কিংবা রচয়িতার নাম অনুল্লেখিত, পংক্তিসংখ্যা : ৩৯৭, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, তৃতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৩ - ৯৪

৭২. পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, তৃতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭০

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ ২৭১

৭৪. BENGALI FOLK BALLADS FROM MYMENSINGH, IBID, P. 98 - 99

৭৫. 'বীরভীর্থের গান', সংগ্রাহক : বিহারীলাল রায়, সংগ্রহকাল কিংবা সংগ্রহস্থান অনুল্লেখিত, রচয়িতা : সনু বয়াতি, রচনাকাল : ১২৮০ বঙ্গাব্দ, পংক্তিসংখ্যা : ১৫৬, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, তৃতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৫১৫ - ২৬

৭৬. 'শীলা দেবী', সংগ্রাহক : চন্দ্রকুমার দে, সংগ্রহকাল : ১৯২৭ সাল, ময়মনসিংহের জাদবপুর নিবাসী সলু সেখ এবং নন্দগ্রী গ্রামের নকোল দাসের নিকট থেকে সংগৃহীত, রচনাকাল ও রচয়িতার নাম অনুল্লেখিত, পংক্তিসংখ্যা : ৫২০, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, চতুর্থ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ডি. লিট. কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩২, পৃ ৩৬ - ৭০

৭৭. পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, চতুর্থ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯১

Dhaka University Institutional Repository

৭৮. ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত 'শীলাদেবীর পালা' শীর্ষক পালাটির কাহিনী 'শীলা দেবী'র অনুরূপ। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনায় পংক্তি-সংখ্যা : ৬২৮। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকও পালার পূর্ণাঙ্গ রূপ সংগ্রহ করতে পারেননি। তিনি দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত পালার সঙ্গে ময়মনসিংহের কেবতখালী গ্রামের মোহনলাল পালের গৃহে রক্ষিত খাতা মিলিয়ে তার পালাটি সম্পাদনা করেছেন।

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯০-৯১

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯১

৮১. 'রাজা রঘুর পালা', সংগ্রাহক : নগেন্দ্র চন্দ্র দে, সংগ্রহকাল, সংগ্রহস্থান ও রচয়িতার নাম অনুল্লেখিত, রচনাকাল : আনুমানিক ষোড়শ সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকাল, পংক্তিসংখ্যা : ২০১, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৩-৮৯

৮২. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯৩

৮৩. BENGALI FOLK BALLADS FROM MYMENSINGH, Ibid, P. 103-04

৮৪. 'মুকুট রায়', সংগ্রাহকের নাম, সংগ্রহকাল, রচনাকাল, রচয়িতার নাম-সবকিছু অনুল্লেখিত, ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত, পংক্তিসংখ্যা : ৪৫৪, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৩-৫৪

৮৫. পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০৩

৮৬. 'ভারইয়া রাজার কাহিনী', সংগ্রাহক : চন্দ্রকুমার দে, মুক্তাগাছার (ময়মনসিংহ) বিজয় নারায়ণ আচার্য্য মহাশয়ের সাহায্যে নাজির নামক এক ফকির, কুলপুর গ্রামের অন্য এক ফকির (নাম অনুল্লেখিত) এবং খিলুরপাড়া গ্রামের ইশান নামক এক ব্যক্তির নিকট থেকে সংগৃহীত, রচয়িতার নাম, সংগ্রহকাল অনুল্লেখিত, রচনাকাল : আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগ, পংক্তিসংখ্যা : ৫২২, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯৩ - ৮১

৮৮. 'আন্ধা বন্ধু', সংগ্রাহক : চন্দ্রকুমার দে, সংগ্রহকাল : ১৯৩০ সাল, বুদ্ধু নামক হাজং উপজাতি শ্রেণীর এক ব্যক্তি এবং ভঙ্গানাথ নামক নেত্রকোনার খালিয়াজুড়ির এক ভিক্ষাজীবীর নিকট থেকে সংগৃহীত, রচনাকাল ও রচয়িতার নাম অনুল্লেখিত, পংক্তিসংখ্যা : ৪৫৯, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৫-২০৭

৮৯. পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৫১১

৯০. 'বগুলার বারমাসী', সংগ্রাহক : চন্দ্রকুমার দে, সংগ্রহকাল : ১৯৩০ সাল, খালিয়াজুড়ির (নেত্রকোনা) মধ্যবাটী গ্রামের নন্দন বৈরাগী ও কৃষ্ণদাস পাল নামক দুই ব্যক্তির নিকট থেকে সংগৃহীত, রচয়িতার নাম ও রচনাকাল অনুল্লেখিত, পংক্তিসংখ্যা : ৪২৭, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ২১১-৩২

৯১. "The result is a ballad in which three elements, the lyrical, epic and dramatic, are distributed and represented equally." BENGALI FOLK BALLADS FROM MYMENSINGH, Ibid, P. 112

৯২. পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৫১৫

৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৫১৮

৯৪. 'সনু (স্বর্ণ) মালা', সংগ্রাহক : চন্দ্রকুমার দে, সংগ্রহকাল : ১৯৩০ সাল, সংগ্রহস্থান,

Dhaka University Institutional Repository

রচনাকাল কিংবা রচয়িতার নাম অনুল্লেখিত, পংক্তিসংখ্যা : ২৭৮, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, চতুর্থ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৩-৯০

৯৫. "পালাটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং ইহাতে চরিত্রগুলি ফুটিয়া উঠে নাই ।" পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, চতুর্থ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২৭

৯৬. ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনায় 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' সপ্তম খন্ডে প্রকাশিত 'সনু মালার পালা'র কাহিনী সম্পূর্ণ । দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'সনু (স্বর্ণ) মালা' পালার পুরো অংশ 'সনু মালার পালা'র প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে বিবৃত আছে । ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক আরও পাঁচ অধ্যায় নতুনভাবে সংগ্রহ করতে সক্ষম হন ।

নতুন কাহিনী অনুযায়ী, সনমালা সাধুপুত্রের সর্পদংশিত শরীর নিয়ে ভেলায় গমন করার পর এক স্থানে গিয়ে জানতে পারে এক চোখ অন্ধ রাখাল সাধুপুত্রকে বাঁচাতে সক্ষম । রাখালের সন্নিধানে গেলে রাখাল সাধুপুত্রকে বাঁচায় ঠিকই, কিন্তু তৎপূর্বে সনুমালার কাহিনী শুনে তাকে অদৃষ্টলিপি অনুযায়ী, বার বছর সাধুপুত্র থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয় । সনুমালা নির্দেশ পালন করে । সাধুপুত্রকেও রাখাল এ-ঘটনা অবহিত করে বার বছর সনুমালার কাছ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয় । সাধুপুত্র স্বগৃহে ফিরলে রাজকন্যা তার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করে । ফলে সাধু সপরিবারে দেশত্যাগ করে । রাজকন্যাও দেশত্যাগ করে সনুমালার সন্ধান পায় । এদিকে রাজপুত্র সনুমালার সন্ধান পেয়ে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে । ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশিত হলে সনুমালা পিতার সাহায্য কামনা করে । ইতোমধ্যে বার বছর পার হয়ে গেছে । সাধুপুত্রও এসেছে সনুমালার সন্নিধানে । ফলে রাজপুত্রের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় । কিন্তু তার সর্বশেষ নিক্ষিপ্ত তীরে বিদ্ধ হয়ে রাজকন্যা নিহত হয় ।

৯৭. "...প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ভাল করিয়া পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে সর্পদষ্ট স্বামীর প্রাণলাভের জন্য সতী-পত্নীর প্রাণান্ত চেষ্টা শুধু বেহুলা চরিত্রেই বর্ণিত হয় নাই । পূর্বকালের বহু উপাখ্যানে নায়িকাদের এইরূপ প্রচেষ্টার উদাহরণ দেখা যাইত ।" পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, চতুর্থ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২৭

৯৮. পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, চতুর্থ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২৮

৯৯. 'বীরনারায়ণের পালা', সংগ্রাহক : নগেন্দ্রচন্দ্র দে, সংগ্রহকাল : ১৯২৯ সাল, মুক্তাগাছার (ময়মনসিংহ) নিকট সনিদা গ্রামের কালাচাঁদ দাস, সতুরিয়া গ্রামের শেখ পানাউল্লা এবং মেওলিয়া গ্রামের 'কানার বাপ' নামে পরিচিত এক ব্যক্তির নিকট থেকে সংগৃহীত, রচয়িতার নাম অনুল্লেখিত, রচনাকাল : আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দী, পংক্তিসংখ্যা : ৪৬০, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, চতুর্থ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৩-৩১৬

১০০. ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ষষ্ঠ খন্ডে সংকলিত 'কুমার বীরনারায়ণের পালা'র পংক্তি-সংখ্যা ৬৯০ । দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'বীরনারায়ণের পালা'র সবকটি (৪৬০) পংক্তিই ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনায় পাওয়া যাবে । 'কুমার বীরনারায়ণের পালা'র দ্বাদশ ও চতুর্দশ অধ্যায় নতুন । কিন্তু উভয় পালার কাহিনীতে উল্লেখযোগ্য কোনো অসামঞ্জস্য নেই

'বীরনারায়ণের পালা'র আখ্যানভাগের অসম্পূর্ণতা উল্লেখ করে দীনেশচন্দ্র সেন পিতা কর্তৃক বীরনারায়ণের মৃত্যুদন্ডদানের যে প্রবাদের কথা উল্লেখ করেছেন, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক তা শোনেননি । তিনি শুনেছেন, ঘটনার সময় কুমার বীরনারায়ণের মা জীবিত ছিলেন না । স্বার্থপর কুটিল বিমাতা

Dhaka University Institutional Repository

এই সুযোগে জমিদার ও গ্রামবাসীদের উত্তেজিত করে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছিলেন । — এই প্রবাদটিকে সত্যের কাছাকাছি বলে মনে হয় ।

'কুমার বীরনারায়ণের পালা'য় নতুন কাহিনী সংযোজনের মধ্যে আছে : বীরনারায়ণ সোনাকে নিয়ে স্বীয় পিতার নিকট বিচারের আশায় গমনের প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু সোনা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল এই যুক্তিতে যে তার পক্ষে সাক্ষী দেওয়ার কেউ নেই । তাছাড়া এই গাথার সমাপ্তিতে দেখা যায়, বীরনারায়ণ আর ফিরে যাচ্ছে না এবং নদীতীরে বনমধ্যে বছরের পর বছর সোনা তার জন্য নিস্ফল প্রতীক্ষায় দিন অতিবাহিত করছে ।

১০১. 'রতন ঠাকুরের পালা', সংগ্রাহক : চন্দ্রকুমার দে, সংগ্রহকাল : ১৯৩১ সাল, ময়মনসিংহের কাঠখর নিবাসী গাছিম সেখ ও অন্য এক গ্রামের রামচরণ বৈরাগীর নিকট থেকে সংগৃহীত, রচনাকাল ও রচয়িতার নাম অনুল্লেখিত, পংক্তিসংখ্যা : ২৬২, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, চতুর্থ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২৩-৩৭

১০২. 'পীর বাতাসী', সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে, সংগ্রহকাল : ১৯৩০-৩১ সাল, ময়মনসিংহের আজমিরিবাজার নিবাসী বৃন্দাবন বৈরাগী এবং লক্ষ্মীগঞ্জ নিবাসী শ্রীদাম পাটনী ও জগবন্ধু গায়েনের নিকট থেকে সংগৃহীত, রচনাকাল ও রচয়িতার নাম অনুল্লেখিত, পংক্তিসংখ্যা : ৫১২, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, চতুর্থ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪১-৬৪

১০৩. পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, চতুর্থ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, ৫৩৯

১০৪. 'মলুয়ার বারমাসী', ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত, সংগ্রাহকের নাম কিংবা সংগ্রহকালের উল্লেখ নেই, রচয়িতা : কবি কঙ্ক, রচনাকাল : ষোড়শ শতাব্দী, পংক্তি সংখ্যা : ৪৩২, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, চতুর্থ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, ৪০৩-৪২৪

১০৫. ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' ষষ্ঠ খন্ডে সংকলিত 'মলুয়া কন্যার পালা' শীর্ষক গাথাটির কাহিনী সম্পূর্ণ এবং এর পংক্তি-সংখ্যা ৮৫৪ । দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মলুয়ার বারমাসী' গাথায় পংক্তি-সংখ্যা ৪৩২ । 'মলুয়া কন্যার পালা'র শেষের তিনটি অধ্যায় পুরোপুরি নতুন ।

'মলুয়া কন্যার কাহিনী'তে কনাই রাজার শত্রুতার যুক্তি পাওয়া যায় । হাদ্যা ডাকাতের কবলমুক্ত হয়ে রাজপুত্র বসন্তের সহায়তায় মলুয়ার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর কনাই রাজার পুত্র তাকে স্ত্রী হিসেবে লাভের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে কনাই রাজা ক্ষুব্ধ হয়ে শত্রুতাসাধন করে । এই গাথায় মলুয়ার পিতা বসন্তের সঙ্গে কন্যার বিয়ের আয়োজন করে । এদিকে হাদ্যা মলুয়ার অনুসন্ধানে এসে কনাইয়ের সঙ্গে যোগসাজশে মলুয়াকে অপহরণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় । এরপরে কনাই রাজা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মলুয়ার বিরুদ্ধে কলঙ্ক রটনা করে । কলঙ্ক মোচনের জন্য বসন্তের পিতা প্রতিবেশী রাজাদের আমন্ত্রণ জানালে সেখানে কনাই রাজা উপস্থিত হয়ে শত্রুতাসাধন করে । কনাই রাজার শত্রুতার দ্বিতীয়বার বনবাসকালে মলুয়ার সঙ্গে হাদ্যা ডাকাতের পুনর্বার সাক্ষাৎ ঘটে । মলুয়াকে সে লুকিয়ে রাখে । বসন্ত মলুয়ার অনুসন্ধানে এলে হাদ্যাকে পেয়ে বন্দী করে নিয়ে এলে হাদ্যা তার ডাকাতিবৃত্তি গ্রহণের কাহিনীসহ মলুয়ার জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করে কিন্তু মলুয়ার অনুসন্ধান জানাতে অস্বীকৃত হয় । ফলে সে বন্দীত্ব বরণ করে । এদিকে বসন্ত মলুয়ার অনুসন্ধানে বের হয়ে আর প্রত্যাবর্তন করেনা ।

১০৬. 'জীরালনী', সংগ্রাহক : চন্দ্রকুমার দে, ময়মনসিংহের পীর লোহাপুর গ্রামের রজনী কর্মকার ও তাদাই ফকির নামক এক বাউল গায়কের নিকট থেকে সংগৃহীত, সংগ্রহকাল, রচনাকাল ও

Dhaka University Institutional Repository

রচয়িতার নাম অনুল্লেখিত, পংক্তিসংখ্যা : ৫১০, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, চতুর্থ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২৭-৫১

১০৭. ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনায় 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সপ্তম খন্ডে প্রকাশিত 'হরিণকুমার-হীরালনী কন্যার পালা'র কাহিনী 'হীরালনী' গাথার অনুরূপ। 'হীরালনী' গাথায় পংক্তি-সংখ্যা ৫১০। 'হরিণকুমার-হীরালনী কন্যার পালা' গাথায় এই ৫১০ পংক্তিসহ মোট পংক্তি রয়েছে ৯৩৪ টি। এটির আখ্যানভাগ সম্পূর্ণ। শেষ পাঁচটি অধ্যায় সম্পূর্ণ নতুন।
এতে আছে : সাধুপুত্রসহ হীরালনী তার ননবাসী মা ও হরিণকুমারকে ছয়মাস যাবৎ খুঁজেও না পেয়ে যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করছে তখন প্রবল, ঝড়ে পতিত উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সাধুপুত্র কাঠুরিয়াদের দ্বারা উদ্ধার লাভ করে এবং কাঠুরিয়াদের দৌলতে হরিণকুমারের সাক্ষাৎ পায়। পরে হরিণকুমারসহ সাধুপুত্র হীরালনীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে ডাকাতের কবলে পড়ে এবং হীরালনীর সন্ধান লাভ করে। এদিকে গন্ধেশ্বর রাজা কন্যা হীরালনীকে এড়িয়ে প্রথমা স্ত্রীর অনুসন্ধান করে। রানীকে মর্যাদার সাথে রাজগৃহে পুনর্বাসিত করেও রানী হীরালনীর দুঃখজনক সংবাদ পেয়ে নিরুদ্দেশ হয়। এদিকে ডাকাতদের সহায়তায় হরিণকুমার স্বীয় রাজ্য দখল করতে সক্ষম হয়। হীরালনীকে স্ত্রী হিসেবে লাভ করে সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করে। সাধুপুত্র সন্ন্যাস জীবনে ব্রতী হয়।

১০৮. 'সোনারায়ের জন্ম', সংগ্রাহক : চন্দ্রকুমার দে, অন্য কোনো তথ্য উল্লিখিত নয়, পংক্তি-সংখ্যা ২৮০, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, চতুর্থ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬৭-৭৯

১০৯. পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, চতুর্থ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬৩-৬৪ দ্রষ্টব্য।

১১০. 'সোনাই বিবি', সংগ্রাহক : মোহাম্মদ সাইদুর, সংগ্রহকাল : অনুল্লেখিত, কিশোরগঞ্জের কটখা কুড়ের পাড় গ্রাম থেকে সংগৃহীত, পংক্তি-সংখ্যা :২১৪৮, মোমেনশাহী গীতিকা, সম্পাদনায় : বদিউজ্জামান, বাঙলা একাডেমী : ঢাকা, ১৯৭১, পৃ ৪৭-১২৯

১১১. মো. গী. = মোমেনশাহী গীতিকা, সম্পাদনায় : বদিউজ্জামান, বাঙলা একাডেমী : ঢাকা, ১৯৭১। বর্তমান অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিসমূহ উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

১১২. 'চিকাই রাণী', সংগ্রাহক : মোহাম্মদ সাইদুর, সংগ্রহকাল : অক্টোবর ১৯৬২, কিশোরগঞ্জের বগাদিয়া গ্রাম থেকে সংগৃহীত, পংক্তি-সংখ্যা : ৩৩৬, মোমেনশাহী গীতিকা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩১-১৩৪

১১৩. 'মনোয়ার খাঁ দেওয়ান', সংগ্রাহক : মোহাম্মদ সাইদুর, সংগ্রহকাল : অনুল্লেখিত, কিশোরগঞ্জের মুলনাগিয়া গ্রাম থেকে সংগৃহীত, পংক্তি-সংখ্যা : ১৮৮২, মোমেনশাহী গীতিকা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৫-২২৮

১১৪. 'তোতা মিয়া', সংগ্রাহক : মোহাম্মদ সাইদুর, সংগ্রহকাল : অনুল্লেখিত, ময়মনসিংহের কাঠখা কুড়ের পাড় গ্রাম থেকে সংগৃহীত, পংক্তি-সংখ্যা : ২৮৬২, মোমেনশাহী গীতিকা, প্রাগুক্ত, পৃ ২২৯-৩৩৩

১১৫. 'মাধব মালঞ্চি কইন্যা', সংগ্রাহক : মোহাম্মদ সাইদুর, সংগ্রহকাল : অনুল্লেখিত, কিশোরগঞ্জের লোপাদিঘি (নিকলি) থেকে সংগৃহীত, পংক্তি-সংখ্যা ৬৩৪ (গদ্য-বর্ণনার পরিমাণ বেশি), মোমেনশাহী গীতিকা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩৪-৪২২

১১৬. 'গজুল চান ও আইধর চান', সংগ্রাহক : মোহাম্মদ সাইদুর, সংগ্রহকাল : অনুল্লেখিত, কিশোরগঞ্জের গুটিপাদ্দি গ্রাম থেকে সংগৃহীত, পংক্তি-সংখ্যা : ৮৫৪, মোমেনশাহী গীতিকা, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২৩-৪৫৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ময়মনসিংহের গীতিকায় অলঙ্কার

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় নিদর্শনসমূহে অলঙ্কার ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে সংস্কৃতানুসৃতি, শাস্ত্র ও পুরাণনির্ভরতা পরিলক্ষিত হয় — ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহ তা থেকে অনেকটা মুক্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপমান সংগৃহীত হয়েছে সমকালীন সমাজ, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং রচয়িতাগণের স্বীয় জীবনাভিজ্ঞতালব্ধ বস্তু-উপাদান থেকে। অলঙ্কার ব্যবহারের ক্ষেত্রে গাথা-রচয়িতাদের সঙ্গে সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী কবিদের সাযুজ্য কোনো কোনো বিষয়ে পরিলক্ষিত হলেও তাঁরা যে অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত বা অন্যদের নিকট ঋণী — তা মনে হয় না। বরং ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে ব্যবহৃত অলঙ্কারের মাধ্যমে রচয়িতাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তি-অনুভূতি ও অভিরুচিরই পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে।

সুবিদিত যে লোকসাহিত্যে অভিব্যক্ত একান্ত ব্যক্তি-আশ্রয়ী অনুভূতি ও অভিরুচির পরিশীলনমুক্ত অমার্জিত রূপের ভেতরে একটি জাতির লোকায়ত মানসিকতারই প্রতিফলন ঘটে। একারণে কবিতায় ব্যবহৃত উপমান-উৎসকে অনেক সময় প্রত্নপ্রতিমা হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। প্রত্নতত্ত্ব যেমন প্রাচীন কোনো যুগের পরিচয় উদ্ঘাটনের জন্য আকরস্বরূপ, তেমনি কাব্যের অলঙ্কারও একটি যুগের লোকায়ত জীবনের অভিরুচি ও ভাবপ্রবাহের গতিপ্রকৃতিসহ সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে।

একটি বিমূর্ত ধারণা কিংবা উপলব্ধিকে মূর্ত-নির্দিষ্ট এবং অধিকতর মনোগ্রাহ্য ও স্পর্শক্ষম করে তোলার অভিপ্রায় ময়মনসিংহের গীতিকায় অলঙ্কার ব্যবহারের পেছনে ক্রিয়াশীল থেকেছে। কোনো বর্ণনার তাৎপর্যকে উজ্জ্বলতর করা, বিশেষত মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় আবেগদীপ্তার সঞ্চার সাধন — অলঙ্কার প্রয়োগের উদ্দেশ্য হিসেবে প্রতিভাত হয়। চরিত্রের মনোজাগতিক চিন্তাসূত্র উন্মোচনের আগ্রহে কেন অধিকাংশ উপমা-রূপকের ব্যবহার ঘটেছে, তার ব্যাখ্যা এই আবেগময়তার মধ্যে অন্বেষণ করতে হবে। মানবদেহের, বিশেষত নারীদেহের, সৌন্দর্যবর্ণনা, তাদের স্বাধীনমনস্ক প্রণয়াকাঙ্ক্ষা এবং সেই আকাঙ্ক্ষার প্রাপ্তিজনিত হর্ষ ও অচরিতার্থতাজনিত শূন্যতা ও যন্ত্রণা পরিস্ফুটকল্পে অলঙ্কার ব্যবহার অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তাৎপর্যপূর্ণ যে, ময়মনসিংহের গীতিকায় উপমা-রূপকসহ অন্যান্য অলঙ্কার প্রয়োগের উপলক্ষ কিংবা অনুষঙ্গ সর্বদা মানুষ, মানুষের বহিঃসৌন্দর্য কিংবা অন্তঃসৌন্দর্যের উপস্থাপন, তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, যৌবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি এবং তৎজাত উচ্ছ্বাস ও রক্তক্ষরণের পরিস্ফুটন প্রভৃতি।

ময়মনসিংহের গীতিকায় অলঙ্কার ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথমেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এর বস্তুনিষ্ঠতার প্রতি; অতঃপর লক্ষণীয় এর নিসর্গমুখিতা, গ্রামজীবনের সরল স্পন্দন, দুর্লভ ও দূরবর্তী কিন্তু বাস্তবজীবনধারায় পরোক্ষ স্পর্শ আছে এমন উপাদানের প্রাধান্য; সর্বোপরি শাস্ত্র ও পুরাণনির্ভর প্রথাসিদ্ধ উপাদানসমূহের প্রতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনাগ্রহ প্রভৃতি। তবে সৌন্দর্যসৃষ্টিই এসব বৈশিষ্ট্যের প্রধান অভিপ্রায় — হোক তা বস্তুসৌন্দর্য কিংবা ভাবসৌন্দর্য।

Dhaka University Institutional Repository

ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে ব্যবহৃত উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার উজ্জ্বলতর নান্দনিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। তবে এই বৈশিষ্ট্য আধুনিক কবিতার নন্দনচেতনার বৈদগ্ধ্য থেকে ভিন্ন-আয়তনের। তাছাড়া অলঙ্কার প্রয়োগে পুনরাবৃত্তি-দোষ নান্দনিক উৎকর্ষকে যে মাঝে মাঝে ক্ষুণ্ণ করেছে, তা অস্বীকার্য নয়।

ইতঃপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে অলঙ্কার প্রয়োগের ক্ষেত্রে অধিকাংশ উপমান সংগৃহীত হয়েছে প্রাত্যহিক ও লোকায়ত জীবনপ্রবাহ, নিসর্গ এবং দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষময়, ঐশ্বসমৃদ্ধ, চঞ্চল ও চলিষ্ণু জীবনাভিজ্ঞতার অনুপ্রবাহ থেকে। ক্রুর, হিংস্র, অমানবিক ও কঠোর মানসিকতাকে যম, দৈত্য, পাথর, কুকুর, রাক্ষস প্রভৃতি প্রতীকের মাধ্যমে যেমন উপস্থাপন করা হয়েছে, তেমনি নারীসৌন্দর্যের কোমলতা ও কমনীয়তার অনুষঙ্গ হয়েছে চাঁদ, ফুল, পাখী ইত্যাদি। ছিন্নমূল, উন্মূলিত জীবনের উপমান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে শেওলা, কাক, বনের ফুল পশু-পাখী প্রভৃতি। দেহসৌন্দর্যের উপমান হয়েছে যেমন সোনা, সর্পমণি, হরিণী, পূর্ণচন্দ্র, শুকতারা, সন্ধ্যাতারা, কবুতর, শুকপাখী, পদ্মফুল, চাঁপা ফুল, মহুয়া ফুল, মল্লিকা, অপরাজিতা প্রভৃতি, তেমনি সৌন্দর্যহীনতার উপমান হয়েছে বাসী ফুল, জোনাকীর আলো, শুকনো ইক্ষুপাতা, মৃত পদ্মবন, লতাপাতাহীন বৃক্ষ প্রভৃতি। প্রিয়তম বস্তু নির্দেশের জন্য যেমন বুকের রক্ত, কলিজার টুকরো, প্রাণের ধন, নারীর প্রসাধন সামগ্রী প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি মূল্যবান ও অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী চিহ্নিত করার জন্য স্বর্ণ, রত্ন ও হৃদয়রূপ প্রাণের উপমান আহৃত হয়েছে। শরীরের উজ্জ্বল রংকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করার জন্য চাঁদের আলো, বিশেষত পূর্ণিমা বা ভাদ্রমাসের পূর্ণিমার চাঁদের আলো, কাঁচা সোনা, প্রদীপের আলো প্রভৃতি যেমন ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি ঠোঁটের লাল রং নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তেলাকুচ ফল, সিঁদুর প্রভৃতি। পদ্মফুলের ডাঁটার মতো শরীরের গঠন, তুলশী গাছ কিংবা গঙ্গাজলের মতো পবিত্র মন, নিকৃষ্ট অর্থে বামন, ঘোল, আম্রা ফল এবং এরই বিপরীতে উৎকৃষ্ট অর্থে চাঁদ, দধি ও আমের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

অর্থালঙ্কারের ক্ষেত্রে উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও রূপক ব্যবহারে গাথা রচয়িতাগণ যত সিদ্ধহস্ত, সমাসোক্তি, ভ্রান্তিমান, সন্দেহ, ব্যতিরেক, অপহ্নুতি, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি নির্মাণে তত সফল নন। এর প্রধান কারণ, মধ্যযুগে ব্যক্তিস্বত্বের জাগরণের অনুপস্থিতি। সমাসোক্তি, অন্যাসক্ত প্রভৃতি অলঙ্কার সৃষ্টির জন্য ব্যক্তিস্বত্বের যে স্বাবলম্ব কল্পনা ও সংবেদনশক্তির বিকাশ ঘটার প্রয়োজন হয়, মধ্যযুগে তার অনুপস্থিতির কারণেই সূক্ষ্মতর অন্তর্জগৎ-আশ্রয়ী এধরনের অলঙ্কারের উদ্ভব অসম্ভব ছিল। তবে মধ্যযুগের কবিদের অপেক্ষা ময়মনসিংহের গীতিকার রচয়িতাগণের স্বাতন্ত্র্য অবশ্য স্মর্তব্য। মধ্যযুগের কবিগণ যখন ভাবে ও অনুভূতিতে সংস্কৃত-সাহিত্য অনুসারী, প্রথানুগত্যে আবর্তিত, প্রচলিত ধারার গড্ডালিকা প্রবাহে নিমজ্জমান — তখন অশিক্ষিত-পটুত্বের জন্যই হোক, গীতিকার পল্লীকবিরা কল্পনার ঐশ্বর্য ও ঔদার্যে অনেক বেশি সংবেদনশীল, স্বাবলম্ব, আত্মসংবেদনার জগতে বিচরণশীল। একারণে তাঁদের ব্যবহৃত উপমান-উৎসসমূহ এত বিচিত্র, স্বতন্ত্র ও অধুনাস্পর্শী।

শব্দালঙ্কার প্রয়োগেও গাথা-রচয়িতাগণের দক্ষতার পরিচয় সমানভাবে স্পষ্ট। ধ্বন্যুক্তি, ধ্বন্যাত্মক শব্দ কিংবা সকল প্রকার অনুপ্রাস ব্যবহারের মাধ্যমে গীতিকার কাব্যদেহে অর্থদ্যোতনা ও ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তবে অনুপ্রাস ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহারের সাফল্য ও প্রাঞ্জলতা যমক,

Dhaka University Institutional Repository

শ্লেষ ও বক্রোক্তির সৃজনে পরিলক্ষিত হয় না । রচয়িতাগণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শব্দ ব্যবহারে কিংবা এক্ষেত্রে লোকায়ত জীবনধারায় সংঘটিত অর্থবৈভিন্ন্যকে উপস্থাপন করার ব্যাপারে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন । প্রবাদ-প্রবচন ব্যাবহারের ক্ষেত্রেও তাঁদের লোকায়ত জীবনধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সংশ্লিষ্টতার পরিচয় সুস্পষ্ট ।

Dhaka University Institutional Repository

১. অর্থালঙ্কার

কাব্যের বস্তু ও ভাবসৌন্দর্য সৃজনে অর্থালঙ্কারের ভূমিকাই মুখ্য । ময়মনসিংহের গীতিকায় অলঙ্কার প্রয়োগের সফলতার প্রধান অংশ জুড়ে আছে এই অর্থালঙ্কারের নানা বৈচিত্র । উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপকই এক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রভাব এবং দক্ষতা ও সাফল্যের স্বাক্ষর হিসাবে বর্তমান । তবে সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক, ভ্রান্তিমান্, অপহ্নুতি, সন্দেহ, চিত্রকল্প প্রভৃতি অলঙ্কারও পুরোপুরি দুর্লক্ষ্য নয় ।

ক. উপমা

কবিতাকে মধুর, হৃদয়গ্রাহী, সরস, শক্তিশালী ও জীবনানুগ করার ক্ষেত্রে উপমার ভূমিকা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ । উপমার যথার্থ ব্যবহারে রচয়িতার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে গভীরতর বাস্তব উপলব্ধি ও শৈল্পিক দক্ষতার যেমন স্বাক্ষর মেলে, সকল উপমার মধ্য দিয়ে তেমনি একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, লোকায়ত মানস ও ব্যক্তি-অভিরুচির পরিচয় পরিস্ফুট হয় । বিভিন্ন যুগের কবিতায় উপমা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করলে তার মধ্যে সমাজবিবর্তনের লক্ষণগুলি যে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় — তা আজ সর্বজনস্বীকৃত ধারণা । সে কারণে উপমা কবিতায় অত্যন্ত প্রভাবশালী অলঙ্কার । ময়মনসিংহের গীতিকায় উপমা ব্যবহারের চমৎকারিত্ব, উৎকর্ষ ও প্রভাবময়তা সহজেই লক্ষ্য করা যায় ।

এক্ষেত্রে রচয়িতাগণের জীবনঘনিষ্ঠতা, আধুনিক যুগীয় পরিশীলন-মানসিকতা থেকে মুক্ত স্বোপার্জিত রসবোধ, এবং প্রথাবদ্ধতার সীমা অতিক্রম করে বাস্তব জীবন ও সমাজঅভিজ্ঞতার পরিচয় বিধৃত হয়েছে । অধিকাংশ উপমান-উপাদানই সংগৃহীত হয়েছে চলমান জীবনপরিধির মৃত্তিকামূল থেকে, এবং অতি স্বল্প-সংখ্যক উপমানেরই উৎসমূল পুরাণ কিংবা প্রথাগত সাহিত্যধারা ।

উপমান-উৎসের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, উপমাকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় । প্রাত্যহিক জীবনধারা, একান্ত ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা-আশ্রয়ী নিসর্গমূল থেকে উপমান-উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে উপমা রচনা করে গাথা রচয়িতাগণ বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । এক্ষেত্রে উপমান-বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে প্রদীপ, সূর্য, আষাঢ়ের নদীজল, পদ্মবন, বেতের ডগা, মহুয়া ফুল, সবরি কলা, কবুতর-কবুতরী, বর্ষাজল, বকের মাছ ধরা, শ্রাবণের নদী, জলভর্তি কলসী, চিল, বনফুল, কান্ডারী-হীন নৌকা প্রভৃতি ।

মশালের তেজে হইল বন যে উজালা ।
সূর্য্যের পশরে যেমন দিন হইল আলা ॥ (মৈ.গী.পৃ ২০৫)
ভাদ্র মাসের চান্নি যেমন দেখায় গাঙের তলা ।
বৃক্ষতলে গেলে কন্যা বৃক্ষতল আলা ॥ (মৈ.গী.পৃ ২৭০)
চাম্পা না ফুলের মতন কন্যার অঙ্গের বরণরে ।
আষাঢ়িয়া নদীর পানি কন্যার পরথম যৈবনরে ॥
(পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ১৩৪)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম উদাহরণটিতে মশালের আলো সূর্যের আলোর সঙ্গে তুলিত হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে ভাদ্র মাসের চাঁদের আলোর সঙ্গে নায়িকার দেহরূপের ঔজ্জ্বল্যের তুলনা করা হয়েছে। ভাদ্র মাসের মেঘমুক্ত বর্ষাহীন আকাশে চাঁদের আলোর ঔজ্জ্বল্য এত অধিক যে তা জলের গভীরতম প্রদেশে প্রতিবিম্বিত হয়। এমন উজ্জ্বল জ্যোৎস্নাই যেন নায়িকার শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে বৃত্তল আলো করছে। চাঁপা ফুলের মতো যুবতী নারীর শরীরের রং। কিন্তু তার চেয়েও ব্যঞ্জনাময় উপমান আষাঢ়ের নদীজল। আষাঢ়ের নদী জলে পরিপূর্ণ। নায়িকার দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন পূর্ণ নদীর মতোই নবযৌবনের আগমনে পূর্ণায়ত রূপ পাচ্ছে।

এইত না ছিল লীলার সোনার যৈবন।
হেমন্তু নিয়ারে যেমন মরে পদ্মবন ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩০৯)

হেমন্তের বাতাসে একসময়কার প্রস্ফুটিত পদ্মফুল যেমন তার ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ক্রমশ শ্রীহীন ও মৃত্যুন্মুখ হয়, কঙ্কের অবর্তমানে লীলার যৌবনের উদ্দামতা তেমনি হ্রাস পেয়ে তার শরীর হয়ে উঠেছে সৌন্দর্যহীন, সে-ও মৃত্যুপথযাত্রী।

বেতের ডগার মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া।
অঙ্গুলি নির্দেশে লীলা দিল দেখাইয়া ॥ (মৈ.গী.পৃ ২৮৮)

মৃতপ্রায় সুন্দর যুবক বিনাথকে দেখে ভীত, সহানুভূতিতে সিক্ত বাতাসীর যুবতী হৃদয় বেতের ডগার মতো কম্পমান। বেতের ডগার অদৃঢ় কোমলতার সঙ্গে রমণী-হৃদয়ের কোমলতার তুলনা করা হয়েছে। একান্তই প্রাত্যহিক পরিবেশ থেকে এই উপমান-উৎস সংগৃহীত হয়েছে।

ভুঁয়েতে বাইয়া তার পরে লম্বা চুল।
সুন্দর বদন যেমন মহুয়ার ফুল ॥ (মৈ.গী.পৃ ৭২)

ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রকৃতিতে মহুয়া ফুল দুর্লভ নয়। মহুয়া ফুলের দেশ উত্তরবঙ্গের সঙ্গে ময়মনসিংহের প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে। নায়িকার সুন্দর মুখ উপমিত হয়েছে এই আকর্ষণীয় ফুলের সঙ্গে। মহুয়া ফুলের মাদকতা যেন যৌবনের মাদকতার সঙ্গে মিশে গেছে। ভূমিতে প্রলম্বিত লম্বা চুল যে-নারীর মাথায়, সে ব্যতিক্রমধর্মী আকর্ষণ সৃষ্টি করে, এর সঙ্গে মহুয়া ফুলের মাদকতা যুক্ত হয়ে সমগ্র বিষয়টি তৃতীয় একটি মাত্রা অর্জন করেছে।

গেরামে আছয়ে এক চিকন গোয়ালিনী।
যৌবনে আছিল যেমন সবরি-কলা-চিনি ॥ (মৈ.গী.পৃ ১২৩)

গ্রামজীবনে পরিচিত সবরী কলার বাহ্যিক সৌন্দর্য এখানে উপমান হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। সবরী কলার অভ্যন্তরীণ আস্বাদ বা গুণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে নারীর যৌবনের গুণাবলীকে। যৌবনের আচার-আচরণ-উচ্চারণ যেমন মোহনীয়, আনন্দ উদ্রেককারী, সবরী কলার মধুময় আস্বাদনও যেন তেমনি।

হীরা-মতি জ্বলে কন্যা যখন নাহি হাসে।
সুজাতি বর্ষার জলেরে যেমন পদ্মফুল ভাসে ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩৪৩)

Dhaka University Institutional Repository

হাসির মধ্য দিয়ে শুভ্র দন্তের প্রস্ফুটনসহ সমগ্র মুখের যে দীপ্তি প্রকাশিত হয়, তা হীরক-ধাতুর ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে তুলনা প্রথাগত। কিন্তু এখানে বর্ষাজলে ভাসমান পদ্মফুলের সঙ্গে উপমিত হয়ে যুবতীর সৌন্দর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রা অর্জন করেছে। হীরক ধাতুর হাস্যোজ্জ্বলতার সঙ্গে পদ্মফুলের হাস্যোজ্জ্বল সৌন্দর্য একত্রিত হয়ে আমাদের সংবেদনায় নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে।

কৈতরা কৈতরী যেমন খোপাতে বসিয়া।
বাস করে মুখেতে মুখ মিলাইয়া ॥ (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ১০১)

দৈনন্দিন জীবনে কবুতর-কবুতরীর বসবাস শান্ত, নিরুপদ্রব জীবন ও শান্তির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত। প্রাত্যহিক জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে হলে সুখী দাম্পত্য জীবনের সঙ্গে কবুতর-কবুতরীর শান্তিপূর্ণ জীবনের চেয়ে ভালো তুলনা যেন অকল্পনীয়।

বগা যেমন চউখ বুজঞা পগারের ধারে।
সাধু অইয়া বস্যা থাক্যা পুডী মাছ ধরে ॥
মনসুর বয়াতী কয় সেই মতন বইয়া।
বিবি রইল যেমন খাপ ধরিয়া ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩৬৩)

'দেওয়ানা মদিনা' গাথায় বিমাতা আলাল-দুলালকে লোক-দেখানো আদরযত্ন করছেন বিপুলভাবে। কিন্তু অপ্রকাশ্যে তার মনের গভীরে এদের প্রাণহরণের ইচ্ছাটি লালিত রয়েছে। উপযুক্ত সময়ের জন্য অসীম ধৈর্য নিয়ে তিনি অপেক্ষা করছেন। তার এই কপটতার সঙ্গে মাছ শিকারকল্পে বকের আপাত নিরীহপনার তুলনা করা হয়েছে। বক যেমন অপরিসীম ধৈর্য নিয়ে কপটরূপে প্রতীক্ষারত থাকে মাছ শিকারের জন্য, বিমাতার কপটতা ও ধৈর্য তদ্রূপ। উপমান-উৎস হিসেবে বকের মাছ শিকারের প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ অভিনব এবং গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতার ফসল।

ভরা কলসী যেমন নাহি ঝলকে পানি।
সেইমত সুন্দরী লীলার চাইল-চালনী ॥ (মৈ.গী.পৃ ২৭২)

যৌবনের বর্ধিষ্ণু শরীর ও বয়োবৃদ্ধির কারণে যুবতী নারীর আচার-আচরণ-উচ্চারণে চপলতা লোপ পেয়ে ক্রমশ গাম্ভীর্যের সূচনা ঘটে। যৌবনের এই গাম্ভীর্যতাকে উপমিত করা হয়েছে জলভর্তি কলসীর সঙ্গে। গ্রামের গার্হস্থ্য জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলির প্রতি আন্তরিক দৃষ্টি না থাকলে এমন উপমান সংগ্রহ করা কঠিন। যৌবনের আগমনে কোনো কিশোরীর হাসির ঠমক, কন্ঠের উচ্চগ্রাম, চলার গতি — সবকিছুতে যে পরিমিতি সঞ্চারিত হয়, তার সঙ্গে শরীরের পূর্ণায়ত গঠনকে একত্রিত করে জল ভরা কলসীর সাযুজ্য ভাবনা গ্রামজীবনের পটভূমিতে পল্লীকবির উচ্চকল্পনারই স্বাক্ষরবহ।

যেমন কইরা আমার ঘোড়া বনে ছোটা খায়।
তেমন কইরা বেড়াইবা না গঠিব দায় ॥ (মৈ.গী.পৃ ৭৩)

এখানেও উপমান-উপাদানটি সংগৃহীত হয়েছে সম্পূর্ণভাবে প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। মধ্যযুগে শাসক-শক্তির অংশ কাজী গ্রামে মহাক্ষমতাধর ব্যক্তি। তার ঘোড়ার যেমন অবাধ ও মুক্ত বিচরণের ক্ষমতা, তেমনি স্বাধীন বিচরণের সুযোগ তিনি দিচ্ছেন একজনকে। গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই রচয়িতাগণ কাজীর স্বেচ্ছাচারী ভূমিকা প্রত্যক্ষ করে এমন উপমান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ছয়মাসের পথ সাধু একদিনে যায় ।
চিলা যেমুন আসমানেতে উড়িয়া পলায় ।। (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ৩৪৪)

উপমান বস্তু হিসেবে চিলের ব্যবহার মধ্যযুগে অনুপস্থিত । আধুনিক কবিতায় চিল নৈঃসঙ্গ্যের প্রতীক হিসেবে বহুল-ব্যবহৃত । এখানে উড়ন্ত চিলের গতি উপমান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে । ব্যবসায়ীর পালটানা নৌকার গতির সঙ্গে চিলের গতির তুলনা করা হয়েছে । উড়ন্ত চিলের সঙ্গে পাল-টানা নৌকার সাদৃশ্য-কল্পনায় কবিহৃদয়ের ঐশ্বর্যের প্রকাশ ঘটেছে ।

উপমার ক্ষেত্রে প্রাত্যহিক জীবনাভিজ্ঞতার পাশাপাশি প্রথাগত সাহিত্যধারার অনুসৃতিও পরিলক্ষিত হয় । চাঁদ, পদ্ম, শুকতারা, কাঁচা সোনা, জোনাকী, ফুল, মুক্তা প্রভৃতি নারীর দেহ-সৌন্দর্যের উপমান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে । তবে প্রথাগত বা প্রচলিত ধারা থেকে এসব উপমান সংগৃহীত হলেও রচয়িতার সূক্ষ্ম রসবোধ ও কল্পনার ঐশ্বর্য যুক্ত হয়ে এর কোনো কোনো উপমা প্রথাবদ্ধতার সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে ।

নবীন বয়স কন্যা প্রথম যৌবন ।
রূপেতে রোসনাই করে চান্দমা যেমন ।। (মৈ.গী.পৃ ১৩০)
আশ্বিন মাসেতে যেমন পদুমের কলি ।
বৈসনে ঢাকিয়া রাখে নাহি দেখে অলি ।। (মৈ.গী.পৃ ১৩০)
পত্যা তারার হেন তোমার দুই আখি ।
পউদের নাল হেন তোমার অঙ্গ দেখি ।। (পূ.গী চ খ দ্বি স পৃ ৩০৪)

প্রস্ফুটমান পদ্ম যেমন আপন রূপকে ঢেকে রাখে, ভ্রমরের দৃষ্টি থেকে আপন সৌন্দর্যকে লুকিয়ে রাখে, দ্বিতীয় উদাহরণটিতে নায়িকা তার শরীরের রূপ তেমনি বসনাবৃত করে রেখেছে । তৃতীয় উদাহরণে শুকতারার মতো নায়িকার দুই আখির ঔজ্জ্বল্য এবং পদ্মের ডাঁটার মতো তার বিভিন্ন অঙ্গের গঠন । এখানে উপমান-উৎস বহুল ব্যবহারে সৌকর্যহীন হলেও উপস্থাপনার অভিনব ভঙ্গির কারণে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে ।

কিবা মুখ কিবা সুখ ভুরুর ভঙ্গিমা ।
আন্ধাইর ঘরেতে যেমন জ্বলে কাঞ্চা সোনা ।। (মৈ.গী.পৃ ৬৯)

এখানে কাঁচা সোনার দীপ্তির সঙ্গে নায়িকার দেহবর্ণের উজ্জ্বলতার তুলনা করা হয়েছে । কিন্তু অভিনবত্ব ঘটেছে এর প্রথম পংক্তির বাচনভঙ্গিতে । ভ্রূভঙ্গিকে কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করা হয়নি, কিন্তু বলার ভঙ্গিতে আমরা তার অপূর্ব সৌন্দর্যের দীপ্তি যেন প্রত্যক্ষ করতে পারি ।

উপরে যোর ভুরু নীচে নয়ানতারা ।
মধুলোভে পুষ্পে যেমন বৈসাছে ভমরা ।। (মৈ.গী.পৃ ২৭১)
তার মধ্যে দন্ত লীলার নাহি যায় দেখা ।
দুর্লভ মুক্তা যেমন ঝিনুর মধ্যে ঢাকা ।। (মৈ.গী.পৃ ২৭১)

দ্বিতীয় উদাহরণটি অর্থদ্যোতনাময়, কিন্তু সর্বাংশে প্রথাবদ্ধ । প্রথমটির উপমান-উৎস কোনো

Dhaka University Institutional Repository

নতুনত্ব নেই । ভ্রমর ও পুষ্প প্রচলিত উপমান । তবে চোখের সঙ্গে ফুল ও ভ্রূ-র সঙ্গে ভ্রমরের তুলনায় উপমাটি ত্রিমাত্রিক হয়ে উঠেছে ।

এখানে উল্লেখ্য যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে ভ্রূ-ভঙ্গিমা নারীর দেহসৌন্দর্যের একটি বিশেষ উপাদান হিসেবে পরিলক্ষিত হলেও ময়মনসিংহের গীতিকার রচয়িতাগণ এ-বিষয়ে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। এই অনাগ্রহ বুকের সৌন্দর্য চিত্রিত করার ক্ষেত্রেও সমানভাবে পরিলক্ষিত হয় । অথচ সংস্কৃত সাহিত্য ও বৈষ্ণব পদাবলী কিংবা মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য-নিদর্শনে নারীর সৌন্দর্য বলতে যেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবল বুকের সৌন্দর্যকেই বোঝানো হয়েছে। গীতিকার রচয়িতাগণের অনাগ্রহের কারণ, নারী তাদের কাছে ভোগ্য সামগ্রী নয় । নারীকে মানবী হিসেবেই এখানে অধিকতর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ।

মানায়ত না মানে মন দ্বিগুণা উথলে ।
তোষির আগুনে যেমুন ঘুষ্যা ঘুষ্যা জ্বলেরে ।। (পূ গী চ খ দ্বি স পৃ ১৯৪)

প্রণয়দহনের সঙ্গে তুষের প্রজ্জ্বলনের তুলনা মধ্যযুগের সাহিত্যে দুর্লক্ষ্য নয় । তুষের আগুন দৃশ্যমান নয়, কেবলমাত্র অনুভবগ্রাহ্য — এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই প্রণয়দহনের সঙ্গে তার সাযুজ্য ।

আসমানেতে কাল মেঘ চান্দে চাইক্যা রাখে
ভাঙ্গা কেশ পড়ে যখন রে সুন্দর কন্যার মুখে ।।
(পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ১৪৪)

কালো মেঘ দ্বারা আচ্ছাদিত হলেও চাঁদ যেমন তার রশ্মি বিচ্ছুরিত করে, তেমনি কালো কেশের মধ্য থেকে নায়িকার মুখাবয়বের কান্তি বেরিয়ে আসছে । উপমান-উৎস প্রথাগত হলেও ব্যঞ্জনাগত দিক থেকে উপমাটি তাৎপর্যপূর্ণ ।

প্রথাগত উপমান হয়েও কী চমৎকারভাবে তা প্রথাবদ্ধতার বৈচিত্র্যহীনতা অতিক্রম করে অভিনবত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তেমন একটি উদাহরণ,

সাপের মাথায় যেমন থাইক্যা জ্বলে মণি ।
যে দেখে পাগল হয় বাইদ্যার নন্দিনী ।। (মৈ.গী.পৃ ৫)

বস্তুনিষ্ঠতায় উজ্জ্বল এই উপমা । বেদে-জীবনে সাপ, সাপের মাথার মণি অত্যন্ত সুপরিচিত । বেদে-কন্যার রূপবর্ণনা করতে গিয়ে তাই রচয়িতা ঐ বেদে-জীবনের পটভূমিকেই তুলে ধরেছেন । সর্পমণির দুর্লভতা ও ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে মহুয়ার দেহসৌন্দর্য উপমিত হয়ে তার রূপ ব্যঞ্জনা লাভ করেছে ।

পুরাণ-উৎস

ময়মনসিংহের গীতিকার রচয়িতাগণ প্রাত্যহিক জীবনাভিজ্ঞতা থেকেই যদিও উপমান-উৎস সংগ্রহ করেছেন, তবু কিঞ্চিৎ পরিমাণে হলেও পুরাণ-উৎস ব্যবহৃত হয়েছে । উপমা-অলঙ্কারে লক্ষ্মী, সরস্বতী, রতি, মদন, ইন্দ্র, অপ্সরী প্রভৃতি উপমানের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় । নরনারীর দেহ-সৌন্দর্য ও

Dhaka University Institutional Repository

রূপময়তাকে অধিকতর অনুভূতিময় করে তোলার জন্যে এসব উপমানের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনপ্রবাহে উপমান-উপাদান খুঁজে না পেয়েই যেন তারা পুরাণ-উৎসের শরণাপন্ন হয়েছেন। উদাহরণ,

পালঙ্কে শুইয়া কন্যা লক্ষ্মীর সমান।
রূপের তুলনা নাই জগতে বাখান ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৪০৮)
তার আগে এক কন্যা হৈল রূপবতী।
স্বর্গ ছাড়িয়া উপনীত যেমন সরস্বতী ॥ (মৈ.গী.পৃ ১২৩)
নানান জাতি কাপড়েতে হইল সাজন।
রূপেতে জিনিল যেমন রতির মদন ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৬৮)
কি কব সে রূপের কথা কইতে নাহি পারি।
চন্দ্রের সমান রূপ দেখিতে অপ্সরী ॥ (মৈ.গী.পৃ ২৭১)
অধরচান্দে কাইন্দা কয়, রাজা কি করিলে কাম।
তা না হইলে অইত পুত্র ইন্দ্রের সমান ॥ (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ২৩০)

কেবলমাত্র উপমা-অলঙ্কারের ক্ষেত্রেই নয়, উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কারেও আমরা পুরাণ-উৎস ব্যবহারের পরিচয় পাই। শ্রীরামের ধনুক, চন্ডী, সাগর-মথিত বিষ, যম, রাবণ, সীতা প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র ও উপাদানকে উপমান হিসেবে এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।

পরথম যৌবন কন্যার সোনার বরণ তনু।
কপালেতে আঁইক্যা রাখছে শ্রীরামের ধনু ॥ (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ১৪৪)
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদিল ধরায়।
কন্যারে দেখিয়া চন্ডী করে হায় হায় ॥ (মৈ.গী.পৃ ২১২)
পাহাড়িয়া দেহ যেন কাল মেঘের সাজ।
যমদূতগণ সঙ্গে যেন যমরাজ ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৯৯)
শূন্য ঘর পইড়্যা রইছে নাহিক সুন্দরী।
রাবণে হরিয়া নিছে শ্রীরামের নারী ॥ (মৈ.গী.পৃ ৮৭)
নতুন বচ্ছর আইল নয়া যৌবন ফুটে।
সায়র মন্থন বিষ কন্যার বুক ভইরা উঠে ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ১৯৭)

প্রথম উদাহরণে শ্রীরামের ধনুকের সঙ্গে যুবতী নারীর বঙ্কিম ভ্রুযুগলের তুলনা করা হয়েছে। নারী-দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনবৈশিষ্ট্যই তার সামগ্রিক শ্রী নির্মাণে ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে ভ্রুকে বেছে নিয়ে তার নিঁখুত গঠনকে মুখাবয়বের সামগ্রিক রূপ সৃষ্টির প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। চতুর্থ উদাহরণে দেওয়ান কর্তৃক 'মলুয়া' হরণকে রাবণের সীতাহরণের সঙ্গে তুলনা করে অপহরণের সাধারণত্বকে অসাধারণ রূপ দেওয়া হয়েছে। শেষ উদাহরণটি মাত্রাবহুল। যুবতীদেহে নবযৌবন আগমনের সঙ্গে সমুদ্র মন্থন করা বিষের তুলনার কারণ, যৌবন যে কেবল কমনীয় ও মধুময়ই নয়, তারও রয়েছে যন্ত্রণার বহু প্রান্ত। যৌবনের আকাঙ্ক্ষা যেমন সীমাহীন, তেমনি অচরিতার্থতার বেদনাও অপরিসীম। অন্য একটি উপমায় এই বিষয়টি আরও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। "চান্দের ছুরত কন্যা অগ্নি হেন জ্বলে।" (পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি.স.পৃ ২৮৮)। চাঁদ ও আগুনের উপমানে যৌবনের মধুময়তা ও যন্ত্রণার উভয় বৈশিষ্ট্যই পরিস্ফুট হয়েছে। আগুন যেমন নিজে দগ্ধ হয় এবং অন্যকেও

Dhaka University Institutional Repository

দগ্ধ করে, যৌবনেরও যেন রয়েছে তেমন বৈশিষ্ট্য ।

উপমা-অলঙ্কার আলোচনায় আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য । প্রাত্যহিক জীবনাভিজ্ঞতা থেকেই রচয়িতাগণ নারীর ঘন কালো চুলের সঙ্গে গাঢ়-গভীর মেঘের রংকে উপমিত করেছেন । নারীর দীর্ঘ ঘন চুলের মধ্যে যেন কোনো অনির্দেশ্য কল্যাণ-অকল্যাণের বার্তা লুক্কায়িত, রচয়িতাগণের নিকট তা যেন ব্যাখ্যাতীত — একারণেই বারবার দূরবর্তী অচেনা মেঘ উপমান হয়ে এসেছে ।

হাটু বাইয়া পড়ে কেশরে যে দেখে নয়ানে
আসমানের মেঘ যেমুন লুভায় জমিনেরে (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৫০
তোমার যে চান্দমুখ যেমন পউদের ফুল ।
আসমানের কালা মেঘ তোমার মাথার চুল ॥
(পূ.গী.চ.খ দ্বি.স. পৃ ৩০৪)
শিরেত চাচর কেশ মেঘের সমান ।
কোথা সে রাজার বেটা কারে দিব দান ॥
(পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স. পৃ ৪০৭)

একটি উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কার পাওয়া যায়, যেখানে মাথার চুলকে গঙ্গার তরঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । উপমান-চিত্রটি বহুমাত্রিক ।

গঙ্গার তরঙ্গ লীলার দীঘল কেশপাশ ।
যে কেশ শুকাইয়া হইল চাচুলীর আঁশ ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩০৯)

নিঃসঙ্গ-একাকী জীবন, অনাথ জীবন প্রভৃতির উপমান হিসেবে শেওলার ব্যবহার ঘটেছে প্রায়শ । যদিও প্রাত্যহিক জীবন-পরিবেশ থেকে আহৃত হয়েছে এই উপমান-উপাদান, কিন্তু গীতিকা-রচয়িতাগণ ছাড়াও নিঃসঙ্গ-অর্থে শেওলার ব্যবহার মধ্যযুগের সাহিত্যেও লক্ষণীয় ।

নাহি পিতা নাহি মাতা নাহি সোদর ভাই ।
জলের শেওলা-সম ভাসিয়া বেড়াই ॥ (মৈ.গী.পৃ ২৫৪)
জন্মিয়া না দেখি বাপমায়েরে গর্ভসোদর ভাই
সুতের সেহলা যেমুন ভাস্যা ভাস্যা ফিরিরে
(পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স. পৃ ৪৭)
মাও নাই সে বাপ নাই সে রে আমার গর্ভসোদরার ভাই ।
পানির মুখে শেওলার মত আমি ভাসিয়া বেড়াইরে ॥
(পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি.স.পৃ ২১০)

উন্মূলিত, ছন্নছাড়া যাযাবর জীবন কেবল শেওলা দ্বারাই উপমিত হয়নি, উপমান বস্তু হিসেবে এসেছে তীর্থের কাক, বনের পশুপাখী, ফুল প্রভৃতি ।

বাপ নাই মাও নাইরে মায়ের পেটের ভাই ।
তীর্থের না কাউয়া যেমুন উইড়া না বেড়াই
(পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ১৮৯)

Dhaka University Institutional Repository

বাড়ী নাইরে ঘর নাইরে বন্ধো যথায় তথায় থাকি ।
উইরা ঘুইরা ফিরি যেমন বনের পশুপংখী ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩৫)
একেশ্বরী হইয়া লীলা থাকয়ে বিজনে ।
ফুটিয়া বনের ফুল থাকয়ে যেমন বনে ॥ (মৈ.গী.পৃ ২৭২)

প্রসঙ্গত একটি লুপ্ত-উপমার উদাহরণ উল্লেখযোগ্য । স্মর্তব্য যে ময়মনসিংহের গীতিকায় লুপ্ত-উপমা বা প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষার প্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ।

নয়না বচ্ছরের সুনাইগো নবীন কিশোরী ।
গিরের পরদীপ সুনাই সুনাইগো আঙ্গিনা পশরি ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৭৩)

অন্যত্র যেখানে চাঁদের আলোর সঙ্গে দেহসৌন্দর্যের উজ্জ্বলতার তুলনা করা হয়েছে, সেখানে গৃহের প্রদীপের সঙ্গে এই তুলনাটি অসফল বলে মনে হতে পারে । কিন্তু বিশেষ পটভূমির কথা স্মরণ রাখলে উপমাটির বস্তুনিষ্ঠতারই প্রমাণ পাওয়া যাবে । এখানে বিধবা মায়ের দরিদ্র-জীবনের পটভূমিতে সুনাইয়ের রূপ বর্ণনা করা হচ্ছে । সুনাইয়ের দরিদ্র মায়ের গৃহে প্রদীপের উজ্জ্বলতাই অনেক কিছু,যা কেবল গৃহকেই আলোকিত করে না, আঙ্গিনায়ও দীপ্তি ছড়ায়; সুনাইয়ের রূপের ঔজ্জ্বল্যও তদ্রূপ ।

খ. উৎপ্রেক্ষা

উপমা ও রূপক অলঙ্কারের মধ্যবর্তী উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। উপমেয় বস্তু ও উপমানের অভেদ কল্পনায় সংশয় উৎপন্ন হলে এবং সেই সংশয়ে উপমানেরই প্রাধান্য সূচিত হলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয় । ময়মনসিংহের গীতিকায় উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারেরও ব্যবহার ঘটেছে প্রচুর পরিমাণে । অধিকাংশ উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে সম্ভাবনা-বাচক শব্দ অনুপস্থিত বলে ময়মনসিংহের গীতিকায় প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষার সংখ্যাই অধিক ।

প্রাত্যহিক জীবনের মৃত্তিকা-সংলগ্ন বহু উপাদান উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে উপমান হিসেবে আহৃত হয়েছে ।

কাগুনি সুপারি গাছ বায়ে যেন হেলে ।
চলিতে ফিরিতে কন্যার যৌবন পড়ে ঢলে ॥ (মৈ.গী.পৃ ১২৫)
পরথম যৌবন কন্যা সদা হাসিখুসী ।
হাসিলে বদনে ফুটে মল্লিকার রাশি ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৩০)

প্রথম উদাহরণটিতে গ্রামজীবনের প্রাত্যহিকতা সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হয়েছে । লম্বা-চিকন সুপারী গাছ যেমন বাতাসে দোলায়িত হয়, তেমনি এই রমণীর যুবতী দেহও কম্পমান । দ্বিতীয় উদাহরণে সম্ভাবনা-বাচক শব্দ অনুপস্থিত । মল্লিকা ফুলের কমনীয়তা, কোমলতা, উজ্জ্বলতা, শুভ্রতা প্রভৃতির সঙ্গে নায়িকার হাস্যোজ্জ্বল রূপময় মুখমন্ডলের তুলনা করা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

আসমান হইতে জলে তারা যেন খসে ।
সোযারিয়া গাঙের ডেউয়ে সাপল ফুল ভাসে ॥
(পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ২০৭)

রমণীর রূপে নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা দৃষ্ট হওয়ায় মনে হচ্ছে মহাকাশ থেকে নক্ষত্র যেন খসে পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়েছে । শেষ পংক্তিটিতে সম্ভাবনাবাচক শব্দ অনুপস্থিত । এখানে আর একটি তুলনা। নদীর জোয়ার জলে ভাসমান শাপলা ফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ঐ যুবতীর যৌবনের পূর্ণতা ও দেহসৌন্দর্যের উজ্জ্বলতাকে ।

বৈকালীর রাঙা ধনু মেঘেতে লুকায় ।
দিনে দিনে ক্ষীণতনু শয্যাতে শুকায় ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩০৯)
ডালিমের দানা যেনরে দন্ত সারি সারি
চাঁপালিয়া হাসি কন্যা ঠোঁটে রাখে ধরিরে (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৫০)
প্রথম যৌবন কন্যা কমনীয় লতা ।
সে দেহ শুকাইয়া হইল ইক্ষুকের পাতা ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩০৯)
কাঁটায় কাটিয়া কন্যার রক্ত বহে পায় ॥
কাম সিন্দুর যেন আসমানের গায় ।(পূ.গী.খ.দ্বি.সি.পৃ ৯২)

প্রথম উদাহরণটিতে সম্ভাবনা-বাচক শব্দটি অনুপস্থিত । নায়িকার যৌবন ও সৌন্দর্যহানির সঙ্গে বিকালের রংধনুর মেঘাবৃত হওয়ার সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণে ডালিমের দানা আর দাঁতের প্রতি-তুলনা করা হয়েছে। তৃতীয় উদাহরণটিতে সম্ভাবনা-বাচক শব্দ নেই । কিন্তু প্রাত্যহিকতার দিক থেকে এটি তাৎপর্যপূর্ণ । পূর্ণ যৌবনবতী রমণী কমনীয় ও রসবতী লতার মতো, কিন্তু সেই যৌবন যখন বিগত হয়, তখন তাকে রসহীন ইক্ষুপত্রের মতো মনে হয় । যুবতীর কোমল কন্টকবিদ্ধ চরণে রক্তের দাগকে আকাশশরীরে সিন্দুরের চিহ্ন বলে মনে হচ্ছে । চতুর্থ উদাহরণটিতে কবি-কল্পনার ঐশ্বর্য সহজেই লক্ষণীয় ।

উৎপ্রেক্ষার ক্ষেত্রে প্রথানুসরণের উদাহরণও স্বল্প নয় । উপমান-বস্তু কখনও প্রয়োগের অভিনবত্বে অনেক ক্ষেত্রে স্বীয় সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে গেছে ।

চান্দ-সুরুজ যেন ঘোড়ায় চড়িল ।
চাবুক খাইয়া ঘোড়া শূণেতে উড়িল ॥ (মৈ.গী.পৃ ২৬)

নারী-পুরুষকে চাঁদ-সূর্যের উপমায় ভূষিত করার বিষয়টি প্রথাগত । কিন্তু এখানে নদের চাঁদ ও মহুয়া নবজীবনের সূচনায় প্রতিকূল অবস্থা থেকে পলায়নের জন্য যখন ঘোড়ায় চড়ছে, তখন সেই দৃশ্যটিতে চাঁদ-সূর্যের ঘোড়ায় চড়ার সঙ্গে সাদৃশ্য কল্পনা করে ভিন্নতর মাত্রা যোজনা করা হয়েছে ।

মুখখানি দেখি কন্যার যেন চন্দ্রকলা ।
কার গলে দিব কন্যা আপন গিয়ার মালা ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৪০৭)
বাইদ্যা বাইদ্যা করে লোকে বাইদ্যা কেমন জনা ।
আন্দাইর ঘরে থুইলে কন্যা জ্বলে কাঞ্চা সোনা ॥ (মৈ.গী.পৃ ৫)

Dhaka University Institutional Repository

হাটীয়া না যাইতে কইন্যার পায়ে পরে চুল ।
মুখেতে ফুট্যা উঠে কনক চাম্পার ফুল ।। (মৈ.গী.পৃ ৫)
দেখিতে সুন্দর কন্যা বনের হরিণী ।
সপের মাথায় যেন জ্বলে দিব্য মণি ।। (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৩৪৬)

প্রথম উদাহরণে নায়িকার মুখখানা যেন চন্দ্র বলে প্রতীতি হচ্ছে । দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদাহরণে সম্ভাবনা-বাচক শব্দ নেই। বেদে-কন্যার রূপকে কাঁচা সোনা বলে মনে হচ্ছে । তৃতীয় উদাহরণে কোমল-মসৃন-রূপময় মুখমন্ডলের সঙ্গে প্রস্ফুটিত কনক চাঁপার ফুলের সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়েছে । চতুর্থ উদাহরণে যুবতী নারীর সমগ্র রূপকেই সর্পমণির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ।

গ. রূপক

ব্যঞ্জনা সৃষ্টির দিক থেকে রূপক উপমা অপেক্ষাও শক্তিশালী অলঙ্কার । পরিমাণগত বিচারে ময়মনসিংহের গীতিকায় উপমার পরেই রূপকের স্থান । রূপক-অলঙ্কারে উপমেয়-বস্তু পুরোপুরি অস্বীকার্য না হলেও তাকে অপ্রধান করে তোলা হয় এবং উপমানকেই প্রধান করে কেবল তার ধর্ম প্রকাশ করা হয় । গুণ বা ক্রিয়ার বর্ণনা থেকেই এই প্রাধান্য পরিস্ফুট হয় ।

প্রাত্যহিক জীবনমূল থেকেই রূপকালঙ্কারে উপমান-বস্তু আহৃত হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে । বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে উপমান-বস্তুর অভিনবত্ব অকল্পনীয় তাৎপর্যের সৃষ্টি করেছে । 'মহুয়া' গাথায় নদের চাঁদ মহুয়ার কাছে প্রণয় নিবেদন করছে । সরাসরি প্রণয়নিবেদনের নির্লজ্জতার উত্তরে মহুয়া বলছে, এই নির্লজ্জতার জন্য তার জলে ডুবে আত্মহত্যা করা উচিত । এর উত্তরে নদের চাঁদের উক্তিটি ব্যঞ্জনাধর্মিতায়, রূপক সৃষ্টির সফলতার চূড়া স্পর্শ করেছে । নদের চাঁদ বলছে,

কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী ।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি ।। (মৈ.গী.পৃ ১২)

মহুয়ার যৌবনকে গভীর নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে,যে যৌবন-নদী পুরুষদের আত্মহত্যার উত্তম স্থান হতে পারে । এভাবেই প্রাত্যহিক জীবনাভিজ্ঞতা থেকে উপমান আহৃত হয়েছে 'মলুয়া' গাথায় । সেখানে কাজীর কামপ্রবৃত্তিকে কুকুরের লোভের সঙ্গে রূপকায়িত করা হয়েছে ।

দুষমন কুকুর কাজী পাপে দিল মন ।
ঝাটার বাড়ী দিয়া তারে করতাম বিরমুন ।। (মৈ.গী.পৃ ৭৬)

দুষমন কুকুর রূপ কাজী পাপে প্রবৃত্ত হচ্ছে । যৌবন-নদী প্রসঙ্গ অন্যত্রও দেখা যায় ।

ঘরে নাহি থাকে মন নাহি মানে মানা ।
এখনে যৌবন নদী বহিল উজ্যালা ।।(পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ১৪৮)

যে-যৌবন বাঁধ মানে না, তা নদীর সঙ্গে রূপকায়িত হচ্ছে । পরবর্তী পংক্তিতে উজান গতিতে

Dhaka University Institutional Repository

বহমান নদীর সঙ্গে যৌবনের আর সম্পর্ক নেই । যৌবন অপ্রধান হয়ে নদীর উজান গতিই প্রধান হয়ে উঠেছে ।

আষাইঢ়া জোয়ারের জল যৌবন দেখিলে ।
পুরুষ দূরের কথা নারী যায় ভুলে ॥ (মৈ.গী.পৃ ১২৫)

আষাঢ়ের জোয়ারের জলরূপ যৌবন । যৌবনের পরিপূর্ণতাকে রূপকায়িত করা হয়েছে আষাঢ়ের জোয়ারের জলের সঙ্গে ।

কাটিয়া চামর কেশ লো কন্যা আলো গলায় বাঁধিম ।
তোর যৈবন পুষ্প তুল্যা লো কন্যা মালা সে গাঁথিম ॥
(পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স. পৃ ৩২৭)

যৌবন-রূপ পুষ্প দ্বারা মালা গেঁথে গলায় ধারণ করতে আগ্রহী নায়ক । পুষ্পের গুণটিই এখানে প্রধান হয়ে যৌবনকে আড়াল করেছে ।

আইল আইল চৈত্রি মাসরে বসন্ত দারুণ ।
যৌবনের বনে মোর লাগিল আগুন ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৪১৮)

যৌবন-রূপ বন অগ্নিদগ্ধ হচ্ছে চৈত্রের খরদাহে । চৈত্র মাস বসন্তের মাস । বসন্ত কাল যুবক-যুবতীর মনে প্রণয়দহন বৃদ্ধি করে । প্রণয়বাসনা তীব্রতর হয় । যৌবনের প্রণয়দহন বনের অগ্নিদহন হিসেবে রূপকায়িত হয়েছে ।

পুরুষ ভ্রমরা জাতি ফুলের মধু খায় ।
বাসি থইয়া টাটকা ফুলের মধু খাইতে চায় ।
(পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ১৮)

ভ্রমর যেমন ঘুরে ঘুরে ফুলের মধু আহরণ করে, তেমনি চরিত্র-বৈশিষ্ট্য পুরুষেরও । ভ্রমর পুরুষ-রূপী । কেননা সেও 'ধোপার পাট' গাথায় ধোপা-কন্যার সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হয়ে পরে অন্য এক জমিদার-কন্যাকে বিয়ে করে সংসারী হয়েছে । ভ্রমরের রূপকই এখানে যথার্থ ।

রূপকের ক্ষেত্রে প্রধানুসরণের উদাহরণও দুর্লক্ষ্য নয় । উপমান হিসেবে রাক্ষসী বা নদীর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় । যেমন,

বিমাতা রাক্ষসী কিবান জানিতে পারিল ।
গোপন করিয়া কবচ চুরি করিয়া নিল ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৪৩৪)
পিরীতি অজপা মন্ত্র পিরীত কর সার ।
পিরীতি নৌকায় হবে ভবনদী পার ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৩৬৩)

বিমাতা-রূপ রাক্ষসী, পিরীতি-রূপ নৌকা বা ভবরূপ নদী বহু ব্যবহারে জীর্ণ । লোকায়ত জীবনের আধ্যাত্মিক মানসে ভবনদীর ব্যবহার চিরায়ত ।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. সমাসোক্তি

উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কারের সঙ্গে সন্দেহ-অলঙ্কারের সম্পর্ক যেমন ঘনিষ্ঠ, তেমনি রূপক-অলঙ্কারের সঙ্গে সমাসোক্তির। ময়মনসিংহের গীতিকায় সমাসোক্তি অলঙ্কারের উদাহরণ অত্যল্প। রূপক-অলঙ্কারে উপমেয়ে উপমানের স্বরূপের আরোপ ঘটে, সমাসোক্তিতে ঘটে উপমানের ব্যবহার বা অবস্থার আরোপ। রূপক-অলঙ্কারে উপমান-বস্তুই প্রধান, কিন্তু সমাসোক্তি-অলঙ্কারে উপমেয়-বস্তুর উৎকর্ষ প্রকাশ পায়। সমাসোক্তি অলঙ্কারে অচেতন বস্তুর ওপর চেতনার আরোপ ঘটে। কয়েকটি উদাহরণ,

নাসিকা হালিয়া পড়ে শ্বাস বহে ঘনে।
মরণ বসিল আসি নয়নের কোণে ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩০৯)
গর্গের কান্দনে দেখ ঝরে বৃক্ষের পাতা।
উপরে আকাশ কান্দে নীচে বসুমাতা ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩১১)
আইজ কিরে পর্‌ভাতের ভানু ডিঙ্গা বাইয়া যায়।
(পূ.গী.দ্বি.খ. দ্বি.স. পৃ ১৪৭)
পূব সায়রে নাইয়্যা ভানুরে ভোরের ছান করে।
ঐন্যা রথে উঠ্যা ভানু যাইবাইন নিজ পুরে ॥
(পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ২২৮)
আখি মেল্যা চায় পুষ্পের না কলি ভমর জাগে বুকে।
বিদেশী পাইন্যার বাঁশী কোন্ বা সুরে বাজে ॥
(পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ২০০)

প্রথম উদাহরণটি সার্বিক বিবেচনায় শিল্পোৎকর্ষমন্ডিত। মৃত্যুপথযাত্রী যুবতীর জীবনপ্রদীপ চিরদিনের জন্য নিভে যেতে চলেছে। তার দৃষ্টি-আলোও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। মনে হচ্ছে মরণ যেন নয়নের কোণে এসে আসন পেতেছে। মৃত্যুরূপ অবয়বহীন ধারণাটিতে চেতনার সঞ্চার ঘটিয়ে এই উদাহরণটি সার্থক হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়টিতে আকাশ ও পৃথিবীর কান্নার কথা বলা হয়েছে। তৃতীয়টিতে প্রভাতের সূর্যের নৌকা বেয়ে যাওয়ার কথা এবং চতুর্থ উদাহরণটিতে প্রভাতী-সূর্যের স্নান করার কথা উচ্চারিত হয়েছে। শেষ উদাহরণটিতে পুষ্পের কলির ওপর ব্যক্তিত্বের আরোপ ঘটেছে। মনে হচ্ছে কলি যেন আঁখি মেলে চাইছে। উপর্যুক্ত প্রতিটি উদাহরণই শিল্পসার্থকতায় সীমা-অতিক্রমী।

ঙ. চিত্রকল্প

একটি উপমান-চিত্র যখন কেবলমাত্র সরল-চিত্রে সীমাবদ্ধ না থেকে, পাঠক-চিত্তে অনুভূতিময় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে, সংবেদনায় হয়ে ওঠে মাত্রাবহুল, রং ও রেখার কারুকার্যে তার দ্যুতিময়তা ক্যানভাসের চারকোণা সীমা অতিক্রম করে যায় — তখনই তা চিত্রকল্প হয়ে ওঠে। আধুনিক কবিতায় চিত্রকল্প ব্যবহার অত্যন্ত পরিশ্রমী, স্বকীয় প্রতিভাগুণের সৃজনশীল প্রয়াস হিসেবে চিহ্নিত। মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রথানুসৃতির মেধাবী ব্যবহারই ছিল যেহেতু কবিদের স্বভাববৈশিষ্ট্য, সেহেতু চিত্রকল্প সৃষ্টির অবকাশ ছিলনা। তবে ময়মনসিংহের গীতিকায় এমন কিছু উপমান-চিত্র সৃষ্টি হয়েছে, যা মানে-গুণে

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রকল্পের প্রান্ত ছুঁয়েছে বলে দাবি করা অযৌক্তিক হবে না। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ

বিরক্ষ মইরা গেলে যেমুন গো ঝুইরা পড়ে লতা।
লতা যদি শুক্যা গেলগো ঝরে পুষ্প পাতা ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৭৪)

মূল বৃক্ষকে অবলম্বন করে জীবন ধারণ করে যে-লতা, বৃক্ষের মৃত্যুতে সে-লতারও জীবনহানি অনিবার্য হয়ে ওঠে; আর জীবনরসবঞ্চিত লতার দেহ থেকে ফুল ও পাতার ঝরে পড়াও তখন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা-আহৃত এই উপমান-উপাদানকে সুনাইর বিধবা মাতার নিরানন্দময় জীবনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সাধারণ উপমায় উপমান-চিত্রটি হত একতলবিশিষ্ট, এখানে দ্বিতল বিশিষ্ট হয়ে ত্রিমাত্রিকতা লাভ করেছে।

সেজুতিয়া তারা যেমুন জ্বলে দুই আঁখি।
রাঙা রাঙা দুই ঠোঁট সিন্দুরেতে মাখি ॥(পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৪৩০)
বজ্রাঘাতে বৃক্ষ যেমন জ্বলিয়া উঠিল।
হাহাকার করি গর্গ কঙ্কেরে ধরিল ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩১১)

প্রথম উদাহরণটিতে সন্ধ্যাতারার ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে নায়িকার চোখের দৃষ্টির উজ্জ্বলতা এবং সিন্দুরের সঙ্গে ঠোঁটের রংয়ের তুলনা পাশাপাশি উল্লেখিত হয়ে রংয়ের গভীরতা ও আলোর দীপ্তির সমীকৃত রূপ একটি ভিন্ন মাত্রার সৃষ্টি করেছে। সন্ধ্যাতারার আকাশে সিঁদুর-রঙা লাল মেঘ যেন তার সমগ্র সৌন্দর্য নিয়ে নায়িকার মুখমন্ডলে আভাসিত হয়ে ওঠে। 'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় প্রবাসী কঙ্কের বিরহে-কাতরা লীলার মৃত্যুর পর কঙ্ক প্রত্যাবর্তন করে। শ্মশানে গর্গ সাধু কঙ্ককে দেখতে পেয়ে বজ্রপাতে বৃক্ষের অগ্নিদহনের ন্যায় যেন জ্বলে উঠলেন। তাঁর জ্বলে-ওঠা ক্রোধহেতু নয়, আকস্মিকতার কারণে। কঙ্কের নিরুদ্দেশগমনে অনুশোচনাদগ্ধ গর্গ অত্যন্ত ম্রিয়মান ছিলেন, লীলার মৃত্যু তাঁর অপরাধবোধকে আরও প্রজ্জ্বলিত করে তাঁকে নৈরাশ্যের অন্তিম প্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে কঙ্কের আগমন ছিল তাঁর কাছে আশার আলো স্বরূপ। নৈরাশ্যের অতলে নিমজ্জিত অবস্থায় আশার আলো দর্শনে গর্গ কর্তৃক অকস্মাৎ লাভ দিয়ে উঠে কঙ্ককে জড়িয়ে ধরার মধ্যে রচয়িতা অত্যন্ত যথার্থভাবে বজ্রপাতে হঠাৎ বৃক্ষে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠার সাদৃশ্য আবিস্কার করেছেন। এ উপমান চিত্রটি পাঠকচিত্তে যেন বহুমাত্রিক সংবেদনা সৃষ্টি করে। এখানে আধুনিক যুগের সম্প্রসার-বাদীর চিত্ররূপ কল্পনারও যেন স্পর্শ পাওয়া যায়।

আষাঢ় মাস্যা বাঁশের কেরুল মাটি ফাট্যা উঠে।
সেই মত পাও দুইখানি গজন্দমে হাটে ॥ (মৈ.গী.পৃ ১২৫)
আষাঢ় মাসে দীঘলা পান্‌সীরে নয়্যা জলে ভাসে।
সেহি মত সোনাইর যৈবন খেলায় বাতাসে ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৭৬)

প্রথম উদাহরণটিতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব, অর্থাৎ গজগতির ছন্দের সঙ্গে নায়িকার শ্লথ পদবিক্ষেপের তুলনা, সুস্পষ্ট হলেও উপমান-চিত্রটি ভিন্ন মাত্রা অর্জন করেছে অন্য কারণে। প্রথাগত উপমান-উৎসের সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়েছে একান্তই গ্রামজীবনের সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতা-আশ্রয়ী এক অনুভববেদ্য শিল্পদৃষ্টি। আষাঢ় মাসের বৃষ্টিভেজা নরম মৃত্তিকা ভেদ করে, দৃষ্টিগ্রাহ্য নয় এমন গতিতে উত্থিত বাঁশের নয়া ভ্রূণের কোমলতার সঙ্গে নায়িকার কোমল চরণের তুলনা করা হয়েছে। তুলনাটি যেন

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যক্ষভাবে ব্যাখ্যাগম্য নয়, অনেককিছুই যেন অনুভব করে নিতে হয়। দ্বিতীয় উদাহরণটিতে আষাঢ় মাসের নবজলাগমে পূর্ণ নদীর সঙ্গে যুবতী নারীদেহের পূর্ণায়তভাবে বেড়ে ওঠার তুলনাটি যেন আড়াল করা হয়েছে। সম্মুখে এসেছে সেই নদীজলে ভাসমান সুসজ্জিত নৌকার গতিময়তার সঙ্গে সদ্যকৈশোর-উত্তীর্ণ বালিকার চপলতা-চঞ্চলতার সাদৃশ্যটি। কানায় কানায় পূর্ণ নদীজলে মৃদুমন্দ বাতাস যে তরঙ্গ-ছন্দ-চাঞ্চল্য-আনন্দপূর্ণ ধ্বনিময়তার সৃষ্টি করে, যৌবনোদগমে যুবতীশরীরেও যেন অনুরূপ শিহরণ পরিলক্ষিত হয়।

চ. অতিশয়োক্তি

উপমেয়-বস্তু ও উপমান-বস্তুর অভেদ সিদ্ধ হওয়ার ফলে উপমেয় বস্তু পুরোপুরি লুপ্ত হলে, কিংবা এইরূপ বর্ণনা কল্পনাশ্রয়ে যে-কোনো প্রকার লৌকিক সীমা অতিক্রম করলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়। একটি উদাহরণ,

রাজার দোসর সেই আমার সোয়ামী ॥
আমার সোয়ামী সে যে পর্বতের চূড়া।
আমার সোয়ামী যেমন রণ-দৌড়ের ঘোড়া ॥
আমার সোয়ামী যেমন আসমানের চান। (মৈ. গী. পৃ ৭৫-৭৬)

ছ. ব্যতিরেক

উপমান-বস্তু অপেক্ষা উপমেয়-বস্তুর উৎকর্ষ বর্ণিত হলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়। ব্যতিরেক অলঙ্কারের বেশকিছু উদাহরণ ময়মনসিংহের গীতিকায় লক্ষ্য করা যায়। উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক অলঙ্কারের পরেই ব্যতিরেক অলঙ্কারের আধিক্য ঘটার কারণ, রচয়িতাগণ তাদের সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলির দেহসৌন্দর্য বা গুণাবলী সম্পর্কে অতিশয় প্রশংসামুখর ছিলেন। নারীর দেহসৌন্দর্য বর্ণনার ক্ষেত্রেই কেবল ব্যতিরেক অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়নি, পুরুষের সৌন্দর্য, সজ্জিত নগরীর ঔজ্জ্বল্য বর্ণনায়ও এই অলঙ্কারের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

কন্যার কন্ঠসুরে কোইলে পায় লাজ।
দন্ডে দন্ডে ধরে কন্যা নানারঙ্গের সাজ ॥ (মৈ. গী. পৃ ১৩০)
সাজাইল পুরীখানি ঝলমল করে।
এরে দেখ্যা চান্দ যেমন লুকায় অন্ধকারে ॥ (মৈ. গী. পৃ ১৬৬)
পুষ্প না বাগানে কন্যা পুষ্প তুলতে যায়।
মৈলান হইয়া ফুল পাতাতে লুকায় ॥ (মৈ. গী. পৃ ২৭১)
তোমার সুন্দর রূপলো কন্যা চান্দ লাজ পায়।
ভাড়াইয়োনা কন্যা মোরে লো আমার প্রাণ যায় ॥ (মৈ. গী. পৃ ৩২৮)
তাহান রূপের কথা কইতে না জোয়ায়।
পরদীম পসর দেখ আন্ধারে লুকায় ॥ (পূ গী চ খ দ্বি স পৃ ১৬৫)

Dhaka University Institutional Repository

জ. সন্দেহ

উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে উপমান-বস্তু সম্পর্কে পাঠকমনে সংশয় জাগ্রত হয়, কিন্তু সন্দেহ অলঙ্কারে এই সংশয় উপমেয়-উপমান উভয়ের প্রতি। ময়মনসিংহের গীতিকায় সন্দেহ-অলঙ্কারের উদাহরণ অতি-মাত্রায় সীমিত হলেও দু'একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। যেমন,

জাগিয়া দেখ্যাছি কিবা নিশির স্বপন।
কার ঘরের সুন্দর নারী কার পরাণের ধন ॥ (মৈ.গী.পৃ ৫৩)
সন্ধ্যাকালের তারা কিম্বা নিশাকালের চান্দ।
লক্ষ্মীরে জিনিয়া রূপ দেইখ্যা লাগে ধন্দ ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৪৮)

ঝ. ভ্রান্তিমান

অতিশয় সাদৃশ্যবশত উপমেয়-বস্তুকে উপমান-বস্তু বলে ভ্রম উৎপাদিত হয়ে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হলে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হয়। ভ্রমটি মূলত কাল্পনিক, এবং তা কেবলমাত্র কবিপ্রতিভা থেকে উত্থিত হয়। এ ধরনের অলঙ্কারের ব্যবহারও ময়মনসিংহের গীতিকায় সীমিত।

জিনিয়া অপরাজিতা শোভে দুই আঁখি।
ভ্রমরা উড়িয়া আসে সেই রূপ দেখি ॥ (মৈ.গী.পৃ ১২৫)
বাতাসে বসন রঙ্গে যখন উড়ে পড়ে।
ভৃঙ্গ যত উড়িয়া আসি পদ্মফুল ছাইড়ে ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৩০)

ঞ. অপহ্নুতি

উপমেয়-বস্তুকে গোপন করে কিংবা অস্বীকার করে উপমান-বস্তু স্থাপিত হলে অপহ্নুতি অলঙ্কার হয়। এ-ধরনের অলঙ্কারে উপমান-বস্তুর গৌরব প্রকাশিত হয়। ময়মনসিংহের গীতিকায় অপহ্নুতি অলঙ্কারের ব্যবহার অত্যল্প।

পঙ্খী নয় পঙ্খী নয়রে উড়াইয়া দিছে পাল।
এই সে নৌকায় উঠ্যা যাইবাম যা থাকে কপাল ॥ (মৈ.গী.পৃ ২৬)
পান নয় গুয়া নয় লো দুতী ভইরা দিমু বাটা
চুয়া চন্দন নয় লো দুতী কপালে দিমু ফোটা রে।
(পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি.স.পৃ ২৭৫)

ট. ব্যঞ্জনাধর্মী উক্তি

ময়মনসিংহের গীতিকায় নারীর দেহসৌন্দর্য বর্ণনা, নর-নারীর প্রণয়ঘন সংলাপ উচ্চারণ, কিংবা তাদের প্রণয়াবেগ ও প্রণয়যন্ত্রণা, পূর্বরাগ ও অনুরাগ প্রকাশের ক্ষেত্রে রচয়িতাগণ যে ভাষাভঙ্গি ব্যবহার করেছেন, তা কেবল অলঙ্কারসমৃদ্ধই নয়, গভীরতর ভাবব্যঞ্জনামূলক ও অর্থদ্যোতনাময়। ব্যঞ্জনাধর্মী উক্তির কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

কোথায় পাব কলসী কন্যা কোথায় পাব দড়ী ।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি ॥ (মৈ.গী.পৃ ১২)
ভিন দেশী পুরুষ দেখি চান্দের মতন ।
লাজ-রক্ত হইল কন্যার পরথম যৌবন ॥ (মৈ.গী.পৃ ৫৪)
দেশে আছে চাম্পার ফুল ফুট্যা থাকে গাছে ।
সেও চাম্পা মৈলান হবে এই কন্যার কাছে ॥
(পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি.স.পৃ ১৯৮)
লাজেতে হইল কন্যার রক্তজবা মুখ ।
পরথম যৌবন কন্যার এই পরথম সুখ ॥
(পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ৩৯)
লাজে রাঙা রক্ত না জবা কন্যা নোওয়াইল মাথা ।
সরম ভরম কন্যার আগে ছিল কোথা ॥
(পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৩৪৮)

প্রথম উদাহরণটিতে অনুরাগ-পর্যায়ে প্রণয়ী কর্তৃক প্রণয়িনীর যৌবন-রূপ-নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করার রোম্যান্টিক বাসনা ব্যক্ত করা হয়েছে । দ্বিতীয়টিতে প্রথম প্রণয়ী-সন্দর্শনে যুবতী নারীর লাজ-রক্তিম অনুরাগের দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে । তৃতীয়টিতে প্রণয়িনীর প্রথম রূপ-দর্শনে প্রণয়ীর অনুরাগ-সিক্ত মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে । চতুর্থ ও দ্বিতীয় উদাহরণটি সমধর্মী । প্রণয়ীর সঙ্গে প্রথম চারচক্ষুর মিলনে যুবতী নারীর রাগরক্তিম মুখের পাশাপাশি হৃদয়ের স্বপ্ন ও বাসনার আনন্দের কথাও ব্যক্ত হয়েছে চতুর্থ উদাহরণটিতে । শেষ উদাহরণটিও একই ধরনের । প্রথম প্রণয়ী-দর্শনে যুবতী নারীর মধ্যে লজ্জারূপ একটি অনুভূতি এই প্রথমবারের সঞ্চারিত হল । ফলে অবচেতনেই তার মস্তক অবনত হল । শেষ উদাহরণটিতে চমৎকার একটি চিত্ররূপ অঙ্কিত হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

২. শব্দালঙ্কার

কাব্যের সৌন্দর্য বর্ধনের ক্ষেত্রে অর্থালঙ্কারের ভূমিকা সর্বাধিক । তদুপরি শব্দালঙ্কারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য । শব্দের ধ্বনি-আশ্রিত এই অলঙ্কার অনুর্গত সীমাবদ্ধতায় আচ্ছন্ন হলেও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে এর বিচিত্র ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় । ময়মনসিংহের গীতিকায় ধ্বন্যুক্তি, অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ — এই চার ধরনের শব্দালঙ্কারের অস্তিত্বই লক্ষ্যযোগ্য । তবে, বলা বাহুল্য, অনুপ্রাসের বৈচিত্রময় ধ্বনিব্যঞ্জনায় গীতিকা-সমূহের দেহাবয়ব সুষমামন্ডিত ।

ক. ধ্বন্যুক্তি

বর্ণ, শব্দ বা বাক্যের ধ্বনিরূপ সহযোগে অর্থের আভাসময় প্রকাশে বিশেষ সৌন্দর্য সৃষ্টি ধ্বন্যুক্তি অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য । কিন্তু এই ধরনের অলঙ্কার ময়মনসিংহের গীতিকায় অধিকতর পরিমাণে দৃষ্ট হয় না । একই শব্দের একাধিক ব্যবহারে শব্দের যে তৃপ্তিময় অর্থব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়, তার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ :

লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর । (মৈ.গী.পৃ ১২)

'লজ্জা' শব্দটির বারংবার ব্যবহারে নির্লজ্জতার রূপটি চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হয়েছে ।

কিসের গয়া কিসের কাশী কিসের বৃন্দাবন । (মৈ.গী.পৃ ১৯)

এখানেও 'কিসের' শব্দটি বারবার ব্যবহৃত হওয়ায় সবকিছু অস্বীকারের দৃঢ়চিত্ততা প্রকাশিত হয়েছে সুস্পষ্টভাবে ।

টিক্কা না জ্বালাইয়া বিনোদ হুক্কায় ভরে পানি । (মৈ.গী.পৃ ৪৯)

'টিক্কা' ও 'হুক্কা' শব্দে ক-এর দ্বিত্ব ব্যবহারে যে-ধ্বনিব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে, তা হুক্কায় পানি ভর্তি করার শব্দ কিংবা হুক্কা পানের শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে ।

তিন ডাক মারে তারে নষ্টা দুষ্টা বুড়ি ।। (মৈ.গী.পৃ ৭৪)

এখানেও 'নষ্টা', 'দুষ্টা' শব্দদ্বয় দ্বারা বুড়ির নষ্টামি-দুষ্টামি চরিত্রের আভাসময় প্রকাশ পরিস্ফুট হয়েছে ।

রসেতে রসিক নারী কামের কামিনী ।। (মৈ.গী.পৃ ১২৪)

'রসিক' ও 'কামিনী' শব্দের ধ্বনিসাম্যযুক্ত ব্যবহারে উক্ত নারীর স্বভাবটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ।

উইড়া উইড়া আসে ভমররে ফিরা ফিরা যায় । (মৈ.গী.পৃ ৩৮)

'উইড়া' এবং 'ফিরা' উভয় শব্দের দ্বিত্ব ব্যবহারে ভ্রমরের চঞ্চল গতিময় স্বভাবটি আভাসিত হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে দেয় গালি । (মৈ.গী.পৃ ৩৮১)

'ক্ষণে' শব্দটি বারংবার ব্যবহারে মস্তিষ্ককোষের অস্বাভাবিকত্ব পরিস্ফুট হয়েছে ।

তবে এ-পর্বে ধ্বন্যাত্মক বা অনুকরণাত্মক শব্দের ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে এই শব্দগুলি বাংলা ভাষারই অকৃত্রিম সম্পদ । সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয়ের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত এসব শব্দের যথাযথ ব্যবহারে মনের ভাব প্রকাশে সূক্ষ্ম দ্যোতনার সৃষ্টি হয় । ধ্বন্যাত্মক শব্দের সফল ব্যবহারে ময়মনসিংহের গীতিকার রচয়িতাগণের অকৃত্রিমতা, বৈদগ্ধমুক্ত-অভিজ্ঞতানির্ভরতার পরিচয় সুস্পষ্ট হয় । মানব-দেহ বা দেহাংশের গড়ন-গঠন, আলো, রং ও রূপ, সতেজতা, সতর্কতা, বিভিন্ন ধরনের শব্দ এবং নিন্দা প্রকাশ কিংবা ষড়যন্ত্র আঁটার ক্রিয়াসূত্রে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার ঘটেছে । যেমন : গড়ন-গঠন-বিন্যাস-এর বিশেষণ হিসেবে আগল ডাগল, আগল পাগল, ডাগল দীঘল, আউলা ঝাউলা, দাগল-দীঘল, আচরি বিচরি, বাড়ি গুড়ি, দিগল আগল প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে ।

আগল ডাগল আখিরে আসমানের তারা । (মৈ.গী.পৃ ৬)
ডাগল দীঘল আখি যার পানে চায় । (মৈ.গী.পৃ ৫৩)
দাগল-দীঘল কেশ বায়েতে বিরাজে ।। (মৈ.গী.পৃ ১২৫)
বাড়ি গুড়ি (ছোটখাট) ডোমের নারী দিগল আগল কেশ ।
(পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি.স.পৃ ২৭৩)
আচরি বিচরি চুল সখীগণ সঙ্গে । (মৈ.গী.পৃ ১৫৫)
আগল পাগল ভাঙ্গা মন খানি ছুড়া । (মৈ.গী.পৃ ৩৪)
আউলা ঝাউলা অঙ্গের বসন মাথার কেশ খুলা । (মৈ.গী.পৃ ৫৫)

বিভিন্ন ধরনের শব্দ, যেমন : নদীর ঢেউয়ের শব্দ, নদীর বহমানতার শব্দ, শুকনো পাতা ভাঙ্গার শব্দ, রমণীর হাতে চুড়ীর শব্দ, হাসির শব্দ প্রভৃতির বিশেষণ হিসেবে যথাক্রমে অলছতলছ, হলচ্ তলচ্, মড়মড়ি, ঝুনুঝুনু, খলখলি প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ।

বিষম নদীর ঢেউরে অলছতলছ পানি । (মৈ.গী.পৃ ১৮৫)
ছাপাইয়া বহে নদী হলচ্ তলচ্ পানি । (মৈ.গী.পৃ ২৩৫)
ঢেউএ করে বাইড়াবাইড়ি কাছাড় ভাইঙ্গা পড়ে । (মৈ.গী.পৃ ২৪০)
শুকনা পাতার বাসর ভাঙ্গে মড়মড়ি । (মৈ.গী.পৃ ৩৮)
ভূষণের ঝুণুঝুণু শব্দ শুনি কানে । (মৈ.গী.পৃ ৬৯)
দলবলে কেনারাম হাসে খলখলি ।। (মৈ.গী.পৃ ২১৩)
কাওলাকাওলি কর‍্যা সবে তাহার ঘেরিল ।। (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৩০৩)

আলো প্রকাশের জন্য 'ঝিলিমিলি', সতেজতা প্রকাশের জন্য 'আটকা টাটকা', রং-রূপ প্রকাশের জন্য 'হিঙ্গলা-পিঙ্গলা' বা 'আজল কাজল', সতর্কতা প্রকাশের জন্য 'আস্তেব্যস্তে', নিন্দা প্রকাশের জন্য 'কানাকানি', ষড়যন্ত্র প্রকাশের জন্য অন্ধিসন্ধি প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় । উদাহরণ,

আবে করে ঝিলীমিলী নদীর কূলে দিয়া । (মৈ.গী.পৃ ২৬)

Dhaka University Institutional Repository

আটক্যা টাটক্যা পুজার ফুল হাজি ভরা থাকে । (মৈ.গী.পৃ ৩৩)
হিঙালা পিঙালা জটা কটা মুছ দাড়ি । (মৈ.গী.পৃ ৩২)
আজল কাজল মেঘ আকাশের গায় । (মৈ.গী.পৃ ২৪৭)
আস্তে ব্যস্তে নদ্যার চান্দে কান্দে তুইলা লইল ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩৫)
আস্তেব্যস্তে কয় কথা বাপে আর মায় । (মৈ.গী.পৃ ১৫৬)
কানাকানি করে কেউ করে বলাবলি । (মৈ.গী.পৃ ৬২)
আন্ধিসন্ধি করে কত কেমনে মিটে আশ ॥ (মৈ.গী.পৃ ১২৬)

'থলথল'-এই বিশেষ ধ্বন্যাত্মক শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয় :

চলিতে ঢলিয়া পড়ে রসে থলথল । (মৈ.গী.পৃ ১২৪)

এখানে যুবতী রমণীর চলনভঙ্গির সঙ্গে তার দেহ ও মনের অপরিমিত বর্ধমানতাকে পরিস্ফুট করার জন্য 'থলথল' শব্দটির ব্যবহার ঘটেছে । মনের তারুণ্যধর্মী উচ্ছলতার পাশাপাশি মেদবহুল শরীরের স্পন্দন এই শব্দটির মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে ।

খ. অনুপ্রাস

ময়মনসিংহের গীতিকায় সব ধরনের অনুপ্রাসের উদাহরণ পাওয়া যায় । গাথাগুলি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত । সে কারণে অন্ত্যানুপ্রাসের অস্তিত্ব সর্বময় । এছাড়া গুচ্ছানুপ্রাসের বৈচিত্রময় ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায় ॥

১. স্বরবর্ণের সাদৃশ্য ঘটেছে এমন অনুপ্রাসের উদাহরণ,

আগে আগে যান পিতা পাছে শিষ্যচয় ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৯৯)
কইও কইও কইও দূতী কইও মায়ের আগে । (মৈ.গী.পৃ ১৮৪)
না আইল না আইল বন্ধু ক্ষতি নাই সে তাতে । (মৈ.গী.পৃ ১৮৫)
অগতির গতি তুমি তুমি ধর্ম্মের বাপ । (মৈ.গী.পৃ ১৪৬)

প্রথমটির আদিতে এবং পরবর্তীগুলোর মধ্যে স্বরবর্ণের বারংবার ব্যবহারে বাক্য গুলোতে চমৎকার অর্থদ্যোতনা সৃষ্টি হয়েছে ।

২. স্বরবর্ণে নয় বরং ব্যঞ্জনবর্ণের সাদৃশ্যেই অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয় । একটি বর্ণের বারবার উচ্চারণে যে সরল অনুপ্রাসের সৃষ্টি হয়, তার উদাহরণ,

কার কন্যা কেবা বাপ কোথা তোমার বাসা ।
একে একে যত কথা করয়ে জিজ্ঞাসা ॥ (মৈ.গী.পৃ ২৫৪)

৩. ব্যঞ্জনবর্ণের গুচ্ছ বা একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণের ক্রমোচ্চারণে সৃষ্ট গুচ্ছানুপ্রাসের বৈচিত্রে ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহ উজ্জ্বল । গুচ্ছানুপ্রাসের বহুমাত্রিক ও বিপুল আয়তনিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ।

Dhaka University Institutional Repository

পয়ার ছন্দে লিখিত পংক্তিগুলোতে যেমন অন্ত্যানুপ্রাস অবশ্যম্ভাবীরূপে বিদ্যমান তেমনি পংক্তিগুলো যে দুই বা তিন বাক্যাংশ (পদ) দ্বারা গঠিত সেসব বাক্যাংশের মধ্যে পারস্পরিক ও অন্তর্গত ধ্বনিসাদৃশ্য ঘটেছে প্রায়শ ।

৩ক. তিন পদ বিশিষ্ট পংক্তির পরস্পরের মধ্যে এবং প্রতিটি পদের অভ্যন্তরীণ ধ্বনিসাদৃশ্যের উদাহরণ নিম্নরূপ :

কি কর কি কর কন্যা কি কর বসিয়া । (মৈ.গী.পৃ ২৪)
কোলে করি কাকে করি করি দোলা-খেলা । (মৈ.গী.পৃ ১৫৪)

৩খ. তিন পদ বিশিষ্ট পংক্তির পরস্পরের মধ্যে ধ্বনিসাদৃশ্য আছে এবং তিনটির পরিবর্তে মাত্র একটি পদের অভ্যন্তরীণ ধ্বনিসাদৃশ্য আছে, এমন উদাহরণ,

মায়ে কান্দে ঝিএ কান্দে কান্দি জার জার । (মৈ.গী.পৃ ২৫১)
কাইন্দ না কাইন্দ না কন্যা না কান্দিয়ো আর । (মৈ.গী.পৃ ৯)

৩গ. তিন পদ বিশিষ্ট পংক্তির দুইটির মধ্যে পারস্পরিক ধ্বনিসাদৃশ্য রয়েছে, এবং দুইটির মধ্যে অভ্যন্তরীন ধ্বনিসাদৃশ্য রয়েছে, এমন উদাহরণ,

কার কন্যা কোথায় বাড়ী কোথায় বাস কর । (মৈ.গী.পৃ ৩৭)

৩ঘ. তিন পদ বিশিষ্ট পংক্তির প্রত্যেকটির মধ্যে পারস্পরিক ধ্বনিসাদৃশ্য রয়েছে, কিন্তু কোনো পদের অভ্যন্তরীণ ধ্বনিসাদৃশ্য নেই, এমন উদাহরণ,

মা রইলো বাপ রইলো রইলোরে সুদুর ভাই । (মৈ.গী.পৃ ১৯)
একমাস দুইমাস আরে ভালা তিনমাস যায় । (মৈ.গী.পৃ ১৯)
মাও ছাড়ছি বাপ ছাড়ছি ছাড়ছি জাতিকুল । (মৈ.গী.পৃ ২৫)
নাহি পিতা নাহি মাতা নাহি সোদর ভাই । (মৈ.গী.পৃ ২৫৪)
পিতা বন্দুম মাতা বন্দুম বন্দুম জ্যেষ্ঠ ভাই ।(মৈ.গী.পৃ ২৬৪)
ক্ষণে গায় ক্ষণে জোকার (দেয়) ক্ষণে করতালি ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩৮১)

৩ঙ. তিন পদবিশিষ্ট পংক্তির দুইটির মধ্যে পারস্পরিক ধ্বনিসাদৃশ্য আছে এবং মাত্র একটি পদের অভ্যন্তরীণ ধ্বনিসাদৃশ্য আছে, এমন উদাহরণ,

শুন শুন শুনগো বইন মোর কথাটি রাখ । (মৈ.গী.পৃ ১৩)
কিবা মুখ কিবা সুখ ভুরুর ভঙ্গিমা । (মৈ.গী.পৃ ৬৯)
শুন শুন ওহে গো পতি -
পতি আরে বলি যে তোমারে । (মৈ .গী.পৃ ৩৫১)

৩চ. তিনপদবিশিষ্ট পংক্তির দুইটি পদের মধ্যে পারস্পরিক ধ্বনিসাদৃশ্য আছে, কিন্তু একটিরও অভ্যন্তরীণ ধ্বনিসাদৃশ্য নেই, এমন উদাহরণ,

ভাল ঘরে ভাল বরে কন্যার হউক বিয়া ॥ (মৈ.গী.পৃ ১০৬)

Dhaka University Institutional Repository

সেই হাসি সেই কথা সদা পড়ে মনে। (মৈ.গী.পৃ ১১৩)
না দিব না দিব পরাণ আরও দেখি শুনি। (মৈ.গী.পৃ ৩২)

৩ছ. দ্বিপদী পংক্তির ক্ষেত্রে এরূপ পারস্পরিক ও অভ্যন্তরীণ ধ্বনিসাদৃশ্যের উদাহরণ তুলনামূলকভাবে আরও অধিক হারে পরিলক্ষিত হয়। ব্যঞ্জনগুচ্ছের এই ধ্বনিসাদৃশ্য অর্থদ্যোতনা সৃষ্টিতে অনুকূল ভূমিকা পালন করেছে। দ্বিপদী পংক্তিতে দুই পদের মধ্যে পারস্পরিক ধ্বনিসাদৃশ্য ও প্রত্যেকটি পদের অভ্যন্তরীণ ধ্বনিসাদৃশ্য রয়েছে, এমন উদাহরণ নিম্নরূপ :

পথিকে পথিকে যেমন পথে পরিচয় ॥ (মৈ.গী.পৃ ২৩৬)
আর কত কাল সয়রে বন্ধু আর কত কাল সয়। (মৈ.গী.পৃ ৩০৬)

৩জ. দ্বিপদবিশিষ্ট পংক্তির উভয় পদের মধ্যে পারস্পরিক ধ্বনিসাদৃশ্য রয়েছে এবং দুইটির অন্তত একটি পদের অভ্যন্তরীণ ধ্বনিসাদৃশ্য রয়েছে, এমন উদাহরণের সংখ্যাই অধিকতর। কয়েকটি উদাহরণ,

কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার হিয়া। (মৈ.গী.পৃ ১২)
কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী। (প্রাগুক্ত)
বুঝাইলে না বুঝে মন কি দিয়া বুঝাই ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৩)
চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী সই সাক্ষী হইও তুমি। (প্রাগুক্ত)
শুন শুন ঠাকুর ওরে শুন মোর কথা। (মৈ.গী.পৃ ২৫)
খেত খোলা নাই তার, নাই হালের গরু। (মৈ.গী.পৃ ৪৯)
দিনে দিনে তোমার সুদিন হইল গত। (মৈ.গী.পৃ ২০১)
শীতল পাটী পাইয়া তবে শীতল হইল মন। (মৈ.গী.পৃ ২৪১)
কি করিলা রানী আরে কি করিলা তুমি। (মৈ.গী.পৃ ২৪৫)

৩ঝ. দ্বিপদবিশিষ্ট পংক্তির দুই পদের মধ্যে পারস্পরিক ধ্বনিসাদৃশ্য নেই, কিন্তু উভয় পদের প্রত্যেকটিতে অভ্যন্তরীণ ধ্বনিসাদৃশ্য রয়েছে, এমন উদাহরণ নিম্নরূপ :

অভাগিনী মাও মোর কান্দ্যা কান্দ্যা ফিরে ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৬১)
বধুর কাছে কয় কথা কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৮৮)
গান গাহিয়া আমি দেশে দেশে ঘুরি। (মৈ.গী.পৃ ২০১)
যারে দেখে তারে রানী পুত্র পুত্র বলে। (মৈ.গী.পৃ ২২৯)
মেঘ ডাকে গুরু গুরু চমকে চপলা। (মৈ.গী.পৃ ৩০১)

৩ঞ. দ্বিপদবিশিষ্ট পংক্তির উভয় পদের মধ্যে পারস্পরিক ধ্বনিসাদৃশ্য আছে, কিন্তু কোন পদের অভ্যন্তরে ধ্বনিসাদৃশ্য নেই — এমন উদাহরণ,

পড়্যা রইল বাড়ী জমি পড়্যা রইলা তুমি। (মৈ.গী.পৃ ১৬)
বিদায় দেওগো মা জননী বিদায় দেও আমারে। (মৈ.গী.পৃ ১৮)
সাক্ষী হইও চান্দ সুরুয সাক্ষী হইও তুমি। (মৈ.গী.পৃ ১৯)
না দেখিল বাপে আরে না দেখিল মায়। (মৈ.গী.পৃ ২৭)

Dhaka University Institutional Repository

ঝরনীর জল আনে কন্যা আনে বনের ফল । (মৈ.গী.পৃ ৩৫)
না বুনায় ধান কালাই না বুনায় সরু ।। (মৈ.গী.পৃ ৪৯)
আধা কলসী ভরা দেখি আধা কলসী খালি । (মৈ.গী.পৃ ৫৫)
কইতে গেলে মনের কথা কইতে না যুয়ায় । (মৈ.গী.পৃ ১০৪)
সোনার অঙ্গেতে তার সোনার সাজন । (মৈ.গী.পৃ ১৪৭)
আসিব বলিয়া বন্ধু না আসিল ফেরে । (মৈ. গী.পৃ ১৮৫)
কোথায় রইল শাউরী কোথায় সল্লা দূতী । (মৈ.গী.পৃ ১৯১)

৩চ. দ্বিপদবিশিষ্ট পংক্তির মধ্যে ধ্বনিসাদৃশ্যের আর একরূপ বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয় । দুই পদের মধ্যে পারস্পরিক ধ্বনিসাদৃশ্য থাকে না এবং দুই পদের মধ্যে কেবল একটি পদের অভ্যন্তরীণ ধ্বনিসাদৃশ্য থাকে । এমন উদাহরণ,

ছয়মাস যায় কন্যার কান্দিয়া কান্দিয়া ।। (মৈ.গী.পৃ ২২)
এই মত নিত্তি নিত্তি আনাগুনি করে । (মৈ.গী.পৃ ৭৪)
মনের আগুন মনে জ্বলে না করে পরকাশ । (মৈ.গী.পৃ ১২৬)
বন্দী খানায় বন্দী মাধব বুকেতে পাথর । (মৈ.গী.পৃ ১৯০)
কান্দিয়া কান্দিয়া তবে যায় খেলারাম । (মৈ.গী.পৃ ১৯৫)
একে একে যত কথা জিজ্ঞাসয়ে আর । (মৈ.গী.পৃ ২৫৪)
রাখ কি রাখ মনে তাতে ক্ষতি নাই । (মৈ.গী.পৃ ৩৩৭)

৪. যুক্ত ব্যঞ্জনের অনুপ্রাসের উদাহরণ :

অর্দ্ধ অঙ্গে গৌরী শোভে গঙ্গা শোভে মাথে ।। (মৈ.গী.পৃ ২০৭)
পদ্মবনে শুনিয়াছি জন্মেছে পদ্মিনী ।। (প্রাগুক্ত)

৫. ছেকানুপ্রাস বা একানুপ্রাসের উদাহরণ :

কাজল মেঘে সাজল হাসিরে বিজুলীর ঝলা । (মৈ.গী.পৃ ১৭৬)
ললাটে তিলক ছটা দীর্ঘ জটা কেশ ।। (মৈ.গী.পৃ ১৯১)

প্রথমটিতে 'কাজল' ও 'সাজল' শব্দদ্বয়ে ধ্বনিসাম্য আছে, অর্থের পার্থক্য সুদূর । একইভাবে দ্বিতীয় উদাহরণের 'ছটা' ও 'জটা'র ক্ষেত্রে ধ্বনিসাম্য ও অর্থবৈভিন্ন্য লক্ষ্য করা যায় ।

৬. শ্রুত্যনুপ্রাসের উদাহরণ :

ধানদুর্ব্বা দিয়া পরে অর্ঘিয়া পুছিয়া । (মৈ.গী.পৃ ৭১)
নয়নেতে নিদ্রা নাই পেটে নাই অন্ন । (মৈ.গী.পৃ ২৮৯)
বজ্রের কপাট তার বজ্রের খিল দিয়া । (মৈ.গী.পৃ ৩৪৪)

৭. মালানুপ্রাসের উদাহরণ উপরের উদ্ধৃতিগুলোর প্রায়-প্রতিটিতে পরিলক্ষিত হবে । তবু কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখযোগ্য :

Dhaka University Institutional Repository

বাড়ী নাইরে ঘর নাইরে বন্ধো যথায় তথায় থাকি। (মৈ.গী.পৃ ৩৫)

এখানে 'ব', 'র', 'ন', 'থ', 'য়' প্রভৃতি বর্ণের মালানুপ্রাস লক্ষণীয়।

বালিস ভিজিয়া ভিজে নেতের বিছানি। (মৈ.গী.পৃ ১১৩)

এখানে 'ব', 'ভ', 'জ', 'ন' প্রভৃতি বর্ণের মালানুপ্রাস ঘটেছে।

কিসের বাদ্য বাজে আজি নগরে নগরে। (মৈ.গী.পৃ ১৮৬)

এখানে 'র', 'ব', 'জ', 'ন' ও 'গ' ধ্বনির মালানুপ্রাস।

খোল বাজে করতাল বাজে, বাজে একতারা। (মৈ.গী.পৃ ১৯৯)

এখানে 'ল', 'ব', 'জ', 'ক', 'ত' ও 'র' ধ্বনির মালানুপ্রাস লক্ষ্য করা যায়।

ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে অন্ত্যানুপ্রাসের প্রভাব এত ব্যাপক ও সার্বিক যে উদ্ধৃতি-উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়। প্রতিটি পংক্তিতেই অন্ত্যানুপ্রাসের স্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান।

গ. যমক, শ্লেষ ও বক্রোক্তি

যমক, শ্লেষ ও বক্রোক্তির ব্যবহার ময়মনসিংহের গীতিকায় অতি অল্প। এর কারণও স্পষ্ট। এসব অলঙ্কার ব্যবহারে কবিমানসের যে নাগরিক বৈদগ্ধ্য থাকা প্রয়োজন, গীতিকার রচয়িতাগণের তা ছিলনা। নাগরিক অভিরুচি থেকে দূরে বসবাসরত এসব রচয়িতা গ্রামজীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে এধরনের অলঙ্কার ব্যবহারে যেটুকু উদ্যোগী হয়েছেন, তাতেও মননশীলতার পরিবর্তে সরল জীবনাভিজ্ঞতার আভাসই প্রবল।

যমকের উদাহরণ :

কাল যৈবন কাল রাখিতে না পারি। (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ২২৩)
কুল ছাড়িয়া কুলের নারী অকূলে দিল পাও॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি স পৃ ৩৬১)

প্রথম উদাহরণে এক 'কাল' অমঙ্গলসূচক এবং অন্য 'কাল' জীবনের পর্ববিভাগ নির্দেশক। দ্বিতীয় উদাহরণে এক 'কুল' সদ্বংশ নির্দেশ করছে এবং অন্য কূল নদীর তীর নির্দেশক।

শ্লেষ-এর উদাহরণ :

আইল যৌবন-কাল অঙ্গে জ্বলে সোনা। (মৈ.গী.পৃ ১৫৪)
দারুণ গ্রীষ্মের তাপ জ্বলনু অনল। (মৈ.গী.পৃ ৩০০)

প্রথম উদাহরণে 'কাল' একই সঙ্গে অকল্যাণসূচক এবং জীবনের পর্ববিভাগ নির্দেশক। দ্বিতীয় পংক্তিতে 'তাপ' একই সূর্য-তাপ ও প্রিয়বিরহ যন্ত্রণা নির্দেশ করছে। বক্রোক্তির উদাহরণ :

শ্লেষ বক্রোক্তি : স্বর্গপুরী গেছ তুমি আমার লাগিয়া।
পুরস্কার দিব আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া॥ (মৈ.গী.পৃ ১৩৫)

'পুরস্কার' শব্দটি ইতিবাচক হলেও এখানে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কাকুবক্রোক্তি : শুনছনি কেউ করে বিয়া নরপিশাচেরে॥ (মৈ.গী.পৃ ১৪২)

Dhaka University Institutional Repository

মাথায় তুল্যা কেবা নয় পায়ের খরম ॥ (প্রাগুক্ত)

উভয় উদাহরণের উত্তর নেতিবাচক ।

ঘ. বিচিত্র শব্দগুচ্ছের একাধিক ব্যবহারে অর্থদ্যোতনা

ময়মনসিংহের গীতিকার বিভিন্ন গাথায় বিচিত্র শব্দগুচ্ছের পুনঃপুনঃ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে চরিত্রের কোন কোনরূপ মানসিক অবস্থাকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে । নির্দিষ্ট এক গুচ্ছ শব্দের ওপর চাপ প্রয়োগ করায় মনোজগতের প্রকৃত ভাবটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে । কয়েকটি উদাহরণ ঃ

একবার না গেল কন্যা আপন মায়ের কাছে ।
একবার না গেল কন্যা মামীর সদনে ।
একবার না চাইল কন্যা মায়ের মুখপানে ॥
একবার না ভাবিল কন্যা জাতিকুলমান ।
একবার না ভাবিল কন্যা পথের আন্মান ॥
একবার না ভাবিল কন্যা কি হইবে আমার গতি । (মৈ.গী.পৃ ১৪৫)

কমলার মনের একমুখীন প্রবাহ — যা পশ্চাদগামী হতে জানেনা তা - প্রকাশের জন্য 'একবার না ভাবিল' বা 'একবার না গেল' — এই শব্দগুচ্ছগুলি বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে । অপমানের জ্বালায় কোনো কিছু না ভেবে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিরুদ্দেশগামী হওয়ার মধ্যে কমলার মানসিকশক্তির দৃঢ়তা ও সতীত্ব রক্ষার ব্যাপারে পরম আত্মবিশ্বাস এবং সার্বিকভাবে তার চরিত্রের ব্যক্তিত্বময়তাই পরিস্ফুট হয়েছে । অন্যত্র,

সাক্ষী আমার চন্দ্রসূর্য সাক্ষী দেবগণ ।
সাক্ষী আমার তরুলতা সাক্ষী পশুগণ ॥
মায়ের মন্দিরে আমি সাক্ষী করি তারে ।
আগুন-পানি সাক্ষী আমার ডাকি সর্ব্ব দেবতারে ॥
কার্ত্তিক গণেশ সাক্ষী লক্ষ্মী-সরস্বতী ।
জগতের মাতা সাক্ষী দেবী ভগবতী ॥
ইন্দ্রযম সাক্ষী মোর সাক্ষী বসুমাতা ।
এই সকলে সাক্ষী কইরা কই মোর দুঃখের কথা ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৫৩)

জমিদার ও সভাসদগণের নিকট উপস্থিত হয়ে কমলা তার জীবনের দুঃখবর্ণনা করতে গিয়ে বারবার 'সাক্ষী' শব্দটি ব্যবহার করছে । পরিচয় প্রদান সূত্রে একচল্লিশবার এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে । বারংবার উচ্চারণের মাধ্যমে 'সাক্ষী' শব্দটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সত্য উচ্চারণের বিষয়টিকে সুদৃঢ় করা হয়েছে । আর একটি উদাহরণ,

আন্দাইরে ডুইবাছে বন্ধু আরে বন্ধু চন্দ্রসূর্য্যতারা ।
তোমারে দেখিয়া বন্ধু আরে বন্ধু হৈছি আপন-হারা ॥

Dhaka University Institutional Repository

কপালের দোষে বন্ধু আরে বন্ধু বন্দী বাপ-ভাই ।
দোসর দরদী বন্ধু আরে বন্ধু তুমি ছাড়া নাই ।। (মৈ.গী.পৃ ১৬৯)

কমলার স্বগ সংলাপ । বিবাহ-পূর্বকালে ভ্রাতা ও পিতা যখন জমিদারের কারাগারে বন্দী,তখন কমলা জমিদার-পুত্র প্রদীপকুমারের উদ্দেশ্যে এই স্বগত সংলাপ উচ্চারণ করছে । 'বন্ধু আরে বন্ধু' শব্দগুচ্ছটি দশ বার উচ্চারিত হয়েছে । বারংবার উচ্চারণে কমলার নিঃসঙ্গ, একাকীত্ব হৃদয়ের অসহায়ত্ব ও যন্ত্রণাময়তা অভিব্যক্ত হয়েছে । অন্যত্র,

মেওয়া মিশ্রি সকল মিঠা মিঠা গঙ্গাজল ।
তার থাক্যা মিঠা দেখ শীতল ডাবের জল ।।
তার থাক্যা মিঠা দেখ দুঃখের পরে সুখ ।
তার থাক্যা মিঠা যখন ভরে খালি বুক ।।
তার থাক্যা মিঠা যদি পায় হারানো ধন ।
সকল থাক্যা অধিক মিঠা বিরহে মিলন ।। (মৈ.গী.পৃ ৮৪)

বিরহের পরে প্রণয়ী-প্রণয়িনীর পুনর্মিলন যে কত আনন্দময় ও মধুময়, তা 'তার থাক্যা মিঠা' শব্দগুচ্ছটি বারংবার উচ্চারিত না হলে হয়ত প্রকাশিত হত না ।

Dhaka University Institutional Repository

৩. বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শব্দ-ব্যবহার

ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে অর্থদ্যোতনা সৃষ্টির অভিপ্রায়ে বেশ কিছু শব্দের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সোনা, চাঁদ, কাল, পাগল, পরাণ, ধন প্রভৃতি শব্দ তাদের আভিধানিক অর্থ অতিক্রম করে বিশেষ ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রতিটি শব্দ তাদের বিচিত্র ধর্ম ও গুণের প্রকাশ ঘটিয়েছে; আবার রচয়িতাদের মানসিক অবস্থা এবং তৎকালীন সমাজমানসেরও প্রকৃতি পরিস্ফুট হয়েছে এসব শব্দের বৈচিত্রময় ব্যবহারের মাধ্যমে।

ক. যেমন, 'সোনা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে মানবদেহের সৌন্দর্য, দেহের রঙ, মূল্যবান ও প্রিয়তম সামগ্রী নির্দেশ করার জন্য; সুন্দর ও পবিত্রতা, সুখী-সচ্ছলতা, ভালো ও চমৎকারিত্ব প্রভৃতি নির্দেশ করার জন্যও সোনার ব্যবহার ঘটেছে। স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবহারও প্রচুর পরিমাণে লক্ষণীয়। বিশেষ-ভাবে অলঙ্কার এবং মূল্যবান ও প্রিয়তম বস্তু নির্দেশের ক্ষেত্রেই সোনার বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এরূপ ব্যবহারের ফলে তৎকালীন সমাজে উচ্চবিত্ত পরিবারে স্বর্ণালঙ্কারের প্রচুর ব্যবহার, দুর্লভ বস্তু হিসেবে স্বর্ণের প্রতি লোকায়ত দরিদ্রজনদের লোভনীয় আগ্রহ অথচ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অলঙ্ঘনীয় অনুরায়, নারীজাতির নিকট প্রিয়তম সামগ্রী হিসেবে সোনার অবস্থান প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা যায়।

(১) অলঙ্কার হিসেবে সোনা ব্যবহারের কয়েকটি উদাহরণ,

নাকে কানে দিব ফুল কাঞ্চা সোনায় গড়ি ॥ (মৈ.গী.পৃ ২৮)
সোনা দিয়া বেইড়া দিবাম সর্ব্বাঙ্গ শরীর। (মৈ.গী.পৃ ৭৪)
নাকেতে সোনার বেসর আর বলাকা ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৬৮)
হস্তেতে সোনার বাজু সোনার বাতেনা। (প্রাগুক্ত)

(২) প্রিয়তম বস্তু নির্দেশ করার জন্য সোনা ব্যবহারের উদাহরণ,

সোনার কুইল কুডাকে রইস্যা গাছে গাছে ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৪)
আইত যদি সোনার অতিথ যৌবন করতাম দান ॥ (মৈ.গী.পৃ ৫৭)
এই না বিরক্ষে সোনার ফুল গো ফুটে বারমাস ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৭৭)
সোনার কলি আলাল দুলাল রহিলে বাঁচিয়া। (মৈ.গী.পৃ ৩৫৮)

(৩) মূল্যবান বস্তু নির্দেশ করার জন্য সোনা ব্যবহারের উদাহরণ সর্বাধিক। থালা, বাটী, নৌকা, পালঙ্ক, ঘরবাড়ি-জমি, ফসল, ছাতা, কলস, কালি, নতুন-ক্ষুর প্রভৃতি সামগ্রীকে মূল্যবান হিসেবে নির্দেশ করার ক্ষেত্রে সোনার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এমনকি পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর নিকট স্বামীর মূল্য নির্ভরতার কারণে যে অত্যধিক তা নির্দেশ করার জন্যও সোনার বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে।

ছাইড়া যাইতে মন না চলে সোনার বাড়ী জমি ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৪)
পাইক্যা আইছে সাইলের ধান সোনার ফসল ॥ (প্রাগুক্ত)
আমার স্বামী কাঞ্চাসোনা অঞ্চলের ধন। (মৈ.গী.পৃ ৭৬)

Dhaka University Institutional Repository

চলিল সোনার পান্‌সী ভরা নদী দিয়া । (মৈ.গী.পৃ ১৬১)
সোনার কালীতে পত্র সকলি লিখিল । (মৈ.গী.পৃ ১৬৬)
সেই নাপিত কামায় সোনার নরুন-ক্ষুরেতে ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৬৭)
সোনার ছত্র আন্যা ধর চান্দ বিনোদের শিরে ॥ (মৈ.গী.পৃ ৭১)
জলচৌকি সোনার ঝাড়ি তাতে শীতল পানি । (মৈ.গী.পৃ ২৪৭)
সোনার থালে বাড়ে কন্যা চিক্কণ সাইলের ভাত । (মৈ.গী.পৃ ৩৩১)
সোনার বাটীতে রাখে দধি দুগ্ধ ক্ষীর । (প্রাগুক্ত)
সোনার কলসী কাঁকে সঙ্গে সখীগণ । (মৈ.গী.পৃ ১৫৫)
সোনার পালঙ্ক দিবাম সাঙ্গুয়া বিছান । (মৈ.গী.পৃ ৭৪)
সোনার মন্দির দেখে কন্যার রূপে ঝুড়ে ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ১৩৫)
সোণার কপাট রূপার খিলাগো বাপের ভান্ডারে ।
(পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ১৮৭)

(৪) নারীর যৌবন, মানব দেহ, মুখ, ফুলপাতা, কবুতর প্রভৃতির সৌন্দর্য নির্দেশ করার জন্য সোনার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় । উদাহরণ,

জাগিয়া না দেখবাম বন্ধু তোমার সোনামুখ । (মৈ.গী.পৃ ১৬)
আমার বন্ধু চান্দ-সুরুজ কাঞ্চা সোনা জ্বলে । (মৈ.গী.পৃ ৪০)
অঙ্গেতে মাখিয়া তার থইছে কাঞ্চা সোনা ॥ (মৈ.গী.পৃ ২৪৬)
সোনার যৈবন আসি অঙ্গে দেখা দিল ॥ (মৈ.গী.পৃ ২৭০)
গাছে গাছে সোনার পাতা ফুটে সোনার ফুল । (মৈ.গী.পৃ ২৯৯)
সোনালী কৈতরা দেখে সোনা এন জ্বলে ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ২৭৯)

(৫) সংসারের সুখময় সচ্ছলতা ও শান্তিময়তা নির্দেশ করার জন্য সোনার ব্যবহার ঘটেছে,

সোনার সংসার পালখাইন যতন করিয়া ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩৫৮)

(৬) রমণীদেহের রং-রূপ-ঔজ্জ্বল্য কিংবা পাখীর রং-রূপ নির্দেশের জন্য সোনার ব্যবহার :

এইখানে আসিবে কন্যা সোনার বরণ তনু ॥ (মৈ.গী.পৃ ১১১)
মাথায় সোনার ছিট সোনার বরণ পাখী । (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ১৩৯)

(৭) সোনা সুন্দর ও পবিত্র মনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে,

সুন্দর কন্যা সোনার মন হইল উতালা ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ২৯৫)

(৮) ভালো বা চমৎকার অর্থে সোনার ব্যবহার :

কেমন জানি সোণার দেশ সোণার মানুষ আছে । (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ১৮৬)
রসইয়া সোণার মানুষ সেই না দেশে বইসে ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ১৮৭)

খ. উপমা ও রূপক পর্যায়ের আলোচনায় আমরা চাঁদের বৈচিত্রপূর্ণ ব্যবহার লক্ষ্য করেছি ।

Dhaka University Institutional Repository

মানবদেহের সৌন্দর্য, মুখের সৌন্দর্য, শরীরের উজ্জ্বল রং প্রভৃতি নির্দেশ করার জন্য চাঁদের ব্যবহার বিভিন্নভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং ব্যবহার-বৈভিন্ন্যের এই সূক্ষ্মতা নিয়ে ইতঃপূর্বে আলোচনাও হয়েছে। চাঁদের অন্যরূপ ব্যবহারের দু'একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখযোগ্য। চাঁদের চিত্রকল্পময় ব্যবহার :

ঢেউয়ের উপর ভাসে পুনুমাসীর চান ॥ (মৈ.গী.পৃ ১১৮)

নদীজলে ঢেউয়ের ওপর পূর্ণিমার চাঁদের আলোর ঝিকিমিকি যে চমৎকার চিত্রকল্প রচনা করে তার বর্ণনা রয়েছে এই পংক্তিতে। জয়ানন্দের মৃতদেহের সৌন্দর্য বর্ণনার ক্ষেত্রে চাঁদ উপমিত হয়ে এই উপমানচিত্রকল্পের সৃষ্টি করেছে। দেহসৌন্দর্য রূপায়িত করার জন্য চাঁদের উজ্জ্বলতা সৌন্দর্য প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এই ব্যবহারের মধ্যেও প্রকারভেদ লক্ষণীয়। চাঁদের সৌন্দর্য দুর্লভ, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, কেননা তার অবস্থান মর্ত্য থেকে বহুদূরে। একারণে চাঁদ কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের শাসক শ্রেণীর আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে। লোকায়ত মানুষের বাস মর্ত্যে। মর্ত্যের মানুষ যেমন আকাশের চাঁদ ধরতে পারে না, তেমনি লোকায়ত মানুষের সঙ্গে উচ্চবিত্ত জমিদার পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের বিষয়টিও অসম্ভব। 'শ্যামরায়ের পালায় ডোম-বধূর নিকট জমিদার পুত্র শ্যাম রায় প্রণয়নিবেদন করলে ডোমবধূর মুখ থেকে এই অসম্ভব-বাণী উচ্চারিত হতে দেখা যায় :

রাজার ছাওয়াল বন্ধুরে পুনুমাসীর চান
আস্‌মান ছাইড়া কেন বন্ধু জমিনে বিছান রে বন্ধু।
(পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি.স.পৃ ২৭৮)

'ধোপার পাট' গাথায়ও একই অর্থে নায়িকার মুখ থেকে একই রূপ উক্তি ধ্বনিত হয়েছে।

চান্দ হইয়া কেন জমীনে বাড়াও হাত। (পূ.গী.দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ৫)
কিংবা, চান্দ জন্মিলা যেন জমিনের কোলে। (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ১৩৩)

ময়মনসিংহের গীতিকায় দেহসৌন্দর্য, রংয়ের উজ্জ্বলতা, দুর্লভ সামগ্রী, দুর্লভ সৌন্দর্য প্রভৃতি নির্দেশ করার জন্য চাঁদের ব্যবহারের সামাজিক কারণ হিসেবে তৎকালীন পশ্চাদপদ বিদ্যুৎহীন সমাজে অন্ধকার রাত্রিতে চাঁদের আলোর উপযোগিতামূলক ব্যবহার, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অভাব চাঁদের দুর্লভতা সম্পর্কিত ধারণার প্রচলন প্রভৃতি ক্রিয়াশীল ছিল বলে সহজেই ধারণা করা যায়। কয়েকটি উদাহরণে তা আরও স্পষ্ট হবে :

চান্দের পসরে যেমন ঘর হইল উজলা ॥ (মৈ.গী.পৃ ১২৩)
ভাঙা ঘরের চান্দের আলো আন্ধাইর ঘরের বাতি। (মৈ.গী.পৃ ৯৮)
ভাঙা ঘরে চান্দের আলো দিয়াছে বিধাতা। (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৪৪৪)

গ. 'কাল' শব্দটির বৈচিত্র্যময় ব্যবহারেও সমাজমানসের প্রতিফলন লক্ষণীয়। 'কাল' শব্দটি কেবল কালো রং নির্দেশ করার জন্যই ব্যবহৃত হয়নি, তা ব্যবহৃত হয়েছে সময় ও জীবন-পর্ব নির্দেশ করার জন্যও, ব্যবহৃত হয়েছে অন্ধকারকে বৈশিষ্ট্যময় করে তোলার জন্য। লোকায়ত জীবনে মনসামঙ্গলের প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী অকল্যাণমূলক রাত্রি নির্দেশকল্পে এবং ভয়ঙ্কর ও বিষাক্ত সাপের বিশেষণ হিসেবে 'কাল' শব্দটির ব্যবহার সুপ্রচলিত। প্রিয়বিচ্ছেদরূপ যন্ত্রণা কত ভয়ঙ্কর তা পরিস্ফুট করার জন্য কালবিষ রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

	রাড়ী হইয়া সইব কেমনে কালবিষের জ্বালা ॥ (মৈ. গী. পৃ ৯৫)
অমঙ্গলসূচক :	সম্মুখে যে আইল তার কি কালরজনী ॥ (মৈ. গী. পৃ ১৪৫)
	কালরাত্রে খাবে পুত্রে কাল রাতি দিনে ॥ (মৈ. গী. পৃ ২২২)
ভয়ঙ্কর, বিষাক্ত :	ছোবায় ছিল কালসাপ কোন কাম করিল । (মৈ. গী. পৃ ৯৪)
	পিতার জটায় বাস করে কালনাগ । (মৈ. গী. পৃ ২২৮)
সময়, জীবন-পর্ব :	দশ বচ্ছর কালেগো বাপের অকাল মরণ ॥ (মৈ. গী. পৃ ১৭৩)
অসময় :	আকাল হইলোগো অনাবৃষ্টির কারণ ॥ (মৈ. গী. পৃ ১৯৫)
অন্ধকার :	আসমান কালা জমীনরে কালা কাল নিশা যামিনী । (মৈ. গী. পৃ ১৯০)
রং :	আর গণক বলে "কন্যার কাল চক্ষের মণি । (মৈ. গী. পৃ ২৪৩)
	কাল মেঘে সাজ করে ঢাকিয়া গগন । (মৈ. গী. পৃ ৩০১)

ঘ. 'পাগল' শব্দটির ব্যবহারে তেমন বৈচিত্র না থাকলেও প্রায়শ এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় । তীব্র প্রণয়াবেগ, কোন কিছুর প্রতি প্রবল আগ্রহ, রূপলালসা, অধ্যাত্ম-আবেগে বিভোরতা, বিচ্ছেদ-যন্ত্রণায় কাতরতা প্রভৃতি নির্দেশ করার জন্য 'পাগল' শব্দটির ব্যবহার ঘটেছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে তীব্র প্রণয়াবেগ নির্দেশ করার জন্যই এই শব্দটির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে । এক একটি শব্দের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে লোকায়ত জীবনে বিভিন্ন শব্দের অর্থবৈভিন্ন্যের স্বরূপ প্রকাশিত হয় । উদাহরণ,

প্রণয়াবেগ :	পাগল হইয়া নদীয়ার চাঁন ভরমে তিরভুবন ॥ (মৈ. গী. পৃ ১১)
	পাগল হইয়াছি কন্যা তোমার অনুরাগে ॥ (মৈ. গী. পৃ ১৫০)
	আলুই মাথার কেশ পাগলিনী বেশে ॥ (মৈ. গী. পৃ ২৮৯)
প্রবল আগ্রহ :	পদ্ম ফুলের মধু খাইতে ভমরা পাগল ॥ (মৈ. গী. পৃ ২১)
রূপ-লালসা :	দেখিয়া কন্যার রূপ সাধু পাগল হইল । (মৈ. গী. পৃ ২৭)
আধ্যাত্ম-আবেগ :	নাইচা গাইয়া ফিরে যেমন ভাবের পাগল ॥ (মৈ. গী. পৃ ২৩৬)
বিচ্ছেদযন্ত্রণা :	ভার্য্যার লাগিয়া বিপ্র পাগল হইয়া ফিরে । (মৈ. গী. পৃ ২৬৭)
	তারপরে না চিনুয় শেষে হইল পাগল । (মৈ. গী. পৃ ৩৮১)
ক্রোধোন্মত্তা :	লজ্জা আর ক্রোধে গর্গ পাগল হইয়া । (মৈ. গী. পৃ ২৮১)

ঙ. 'প্রাণ' শব্দটি পরাণ হিসেবে উচ্চারিত এবং বহুল-ব্যবহৃত । কখনও প্রিয়তম অর্থে, কখনও প্রণয়ী অর্থে, কখনও হৃদয় অর্থে, আবার কখনও প্রণয়উৎস হিসেবে পরাণ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে । প্রাণের ভাই, প্রাণসই, প্রাণবন্ধু — এই শব্দগুচ্ছগুলো প্রায়শ ব্যবহৃত হয়েছে । উদাহরণ :

প্রিয়-অর্থে :	এক কন্যা আছে মোর পরাণের পরাণ । (পূ. গী. চ. খ. দ্বি. স. পৃ ১৯০)
প্রণয়-উৎস :	প্রাণের পতি সে আমার প্রাণের দেবতা । (মৈ. গী. পৃ ১৫৪)
হৃদয় :	যে নাকি পরাণ দিয়া কিন্যাছিল মোরে । (মৈ. গী. পৃ ৩৮)
প্রণয়ী :	এ সবার বেশী তুমি পরানের পরাণ । (পূ. গী. চ. খ. দ্বি. স. পৃ ১৪২)

চ. 'ধন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ সম্পদ, বিশেষত বৈষয়িক সম্পদ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয় । কিন্তু ময়মনসিংহের গীতিকায় পুত্র-কন্যা, স্বামী-স্ত্রী কিংবা প্রণয়ী-প্রণয়িনী অর্থে শব্দটির লোকায়ত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় । উদাহরণ,

Dhaka University Institutional Repository

সপনের ধন মোর সাক্ষাতে মিলিল ॥(পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ১৪১)
মায়ের বুকের ধন চুরে লইয়া যায় ।(পূ গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৪০৯)
হায় প্রভু কোথা গেলা অনুকূলের ধন । (মৈ.গী.পৃ ৯৪)

Dhaka University Institutional Repository

৪. প্রবাদ - প্রবচন

ময়মনসিংহের গীতিকায় প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহারও বহুল-পরিমাণে দৃষ্ট হয় । লোকায়ত জীবনপ্রবাহের সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত এসব প্রচলিত জনশ্রুতিগুলি গীতিকার রচয়িতাগণ কখনও চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করার জন্য, কখনও তাদের মনোজাগতিক চিন্তাসূত্রকে প্রকাশ করার জন্য, কখনও একটি ঘটনাকে আরও সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করার জন্য ব্যবহার করেছেন । উদাহরণের তালিকা হয়ত দীর্ঘ হলেও ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে কোনটির উল্লেখই অপ্রয়োজনীয় নয় । উদাহরণ,

বিদেশে বিবাসে যদি পুত্র মারা যায় ।
দেশে না জানিবার আগে জানে কেবল মায় ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৮)
অন্ধকারের সাক্ষী তোমরা চান্দ আর ভানু । (মৈ.গী.পৃ ১১১)
মরিচ যতই পাকে তত হয় ঝাল ॥
সময়ে বয়স যায় নাহি যায় রস । (মৈ.গী.পৃ ১২৭)
মাছি মারিয়া করি কেনে দুই হাত কালা । (মৈ.গী.পৃ ১৩৬)
বেঙ্গে কবে শুনেছিস পদ্মের মধু খায় ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৩৭)
কুকুরে কামড়ায় কেবা কুকুরে কামড় দিলে ॥ (প্রাগুক্ত)
চোরা নাহি শুনে দেখ ধর্ম্মের কাহিনী ।
পিশাচে না শুনে রাম অনুরেতে গ্লানি ॥ (মৈ.গী.পৃ ২০১)
বিধির নির্ব্বন্ধ কেবা খন্ডাইতে পারে ॥ (মৈ.গী.পৃ ২২৭)
কামাই করলে খাউয়া আছে সঙ্গে যাউয়া নাই । (মৈ.গী.পৃ ২২৯)
শিরে কইলে সর্পাঘাত ওঝায় কিবা করে । (মৈ.গী.পৃ ২৫২)
দেবের নৈবেদ্য করে কক্কুরে ভক্ষণ । (প্রাগুক্ত)
বিধির বিচিত্র লীলা কে করে খন্ডন ।
কার সাধ্য মারে যদি রাখে নারায়ণ ॥ (মৈ.গী.পৃ ২৬৮)
সাধিলে না থাকে যৈবন যত্নে নাহি আইসে ॥ (মৈ.গী.পৃ ২৭২)
জহুরী জহর চিনে বেনে চিনে সোনা । (মৈ.গী.পৃ ২৭৭)
অনাচারে জাতি নষ্ট, নষ্ট হয় কুল । (মৈ.গী.পৃ ২৭৯)
দুগ্ধ দিয়া কালসাপে করিনু পোষণ । (মৈ.গী.পৃ ২৮০)
কলঙ্কে ঘটিয়া নিল চাঁদের পসর ।
দেবের অমৃত ফল খাইল বানর ॥ (মৈ.গী.পৃ ২৮৭)
বোধনে প্রতিমা আমি ডুবাইলাম জলে । (মৈ.গী.পৃ ৩১১)
কাটা ঘায়ে লুনের ছিটা আর কত সয় । (মৈ.গী.পৃ ৮১)
সাপের ডৌকা পুড়িতে ভাই দেশাচারে মানা ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ২৮৮)
নগর থাক্যা বিজন ভালা আপন থাক্যা পর ।
ঘর থাক্যা বাহির ভালা আশায় করলো ভর ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৩৪৮)
মুনির হইল মতিভ্রম হাতীর খসে পা ।
ঘাটে আস্যা বিনা ঝরে ডুবে সাধুর না ॥ (মৈ.গী.পৃ ১১২)

Dhaka University Institutional Repository

বিনামেঘে হইল যেন শিরে বজ্রাঘাত ।। (মৈ.গী.পৃ ১১৩)

ময়মনসিংহের গীতিকায় একটি বিশেষ অঞ্চলের কথ্যভাষার বাণীভঙ্গি ব্যবহার যেমন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে, তেমনি এখানে সুভাষণময় উক্তির উদাহরণও প্রচুর। গ্রামীণ জীবনের অশিক্ষিত জনমানস ব্যক্তি-অভীপ্সায় উদ্দীপ্ত হলে, স্বাধীন প্রণয়বাসনায় উজ্জীবিত হলে তাদের হৃদয়ের ঐশ্বর্যও কত উৎকর্ষময় হতে পারে, নিম্নোক্ত সুভাষণের উদাহরণগুলো তারই প্রমাণ।

তুমি ত বাগের পুষ্প আমি হইলাম কাটা
জিয়ন মরণে বন্ধুরে দেশে থাকব খোটারে বন্ধু।
(পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি.স.পৃ ২৭৮)

আমরা খাইলে বুঝিবে কি বন্ধু আমের সুয়াদ
ঘোলে কি পাইবা বন্ধুরে দধির আস্বাদ রে বন্ধু।
(পূ.গী.তৃ.খ.দ্বি. স.পৃ ২৭৯)

বাউন হইয়া কেন চান্দে বাড়াই হাত।
পরবোধ দিতে পোড়া মনে না পাই কিছু আর।
(পূ.গী. দ্বি.খ.দ্বি.স.পৃ ৯)

অমিত ছাড়িয়া কেন বিষ হইল ভালা।
বুঝিতে না পার কন্যা গরল বিষের জ্বালা ।। (
(পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ১৯৪)

উপর্যুক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, ময়মনসিংহের গীতিকার রচয়িতাগণ অলঙ্কার ব্যবহারে যে-উৎকর্ষ প্রদর্শন করেছেন, তার উৎস তাদের মেধাবী উচ্চারণ নয়, নয় পুরাণ-উৎস ব্যবহার কিংবা প্রচলিত সংস্কৃতানুসরণে দক্ষতা; রচয়িতাগণের জীবনাভিজ্ঞতা, সমাজজ্ঞান, প্রকৃতিসচেতনতা ও সূক্ষ্ম রসবোধ এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল থেকেছে। প্রাত্যহিক জীবনপ্রবাহ ও নিসর্গজগৎ তথা স্বীয় অভিজ্ঞতার বৃত্ত থেকে তারা যেসব উপমান-উৎস সংগ্রহ করেছেন, সেখানেই তাদের সার্থকতা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অধীত বিদ্যার অভিজ্ঞতাবর্জিত লোকায়ত জনমানসও যে সূক্ষ্ম রসবোধে কত সমৃদ্ধ হতে পারে — ময়মনসিংহের গীতিকার অলঙ্কার আলোচনায় তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ময়মনসিংহের গীতিকায় প্রকৃতির ব্যবহার

ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে প্রকৃতির অনন্যসাধারণ ভূমিকা অনুধাবনযোগ্য। প্রকৃতি এখানে কেবলমাত্র পটভূমি নয়, কাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে, কোথাও চরিত্র-অনুরূপ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কিংবা চরিত্রসমূহের হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। গীতিকাসমূহে বিধৃত প্রকৃতি সাধারণ দৃশ্যবস্তু হিসেবে চিত্রায়িত নয়, বরং ব্যঞ্জনাধর্মী, ইঙ্গিতবহুল ও পরিণামস্পর্শী। ময়মনসিংহের গীতিকায় প্রকৃতি যেন রোম্যান্টিক ভাবধারা-আচ্ছন্ন আধুনিক শিল্পীমনের প্রত্যয় হিসেবে মানুষের বেদনাদগ্ধতা লাঘবে অবদান রাখছে। আধুনিক পরিশীলিত শিল্পীমন থেকে নয়, মধ্যযুগের লোককবিদের হাতে মানুষের হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে একাত্ম করে মেধাবী প্রকৃতির এরূপ ব্যবহার আশ্চর্যজনক বৈকি। আধুনিক রোম্যান্টিক কবিদের নিকট প্রকৃতি যেমন মানুষের বিষাদ বেদনায় অস্থিরচিত্তে সান্ত্বনার কোমল স্পর্শ নিয়ে আসে, সংবেদনশীল চিত্তে আনে প্রণয়মাধুর্য আর কবির অনুভূতিশীল দৃষ্টিতে আনে উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা, ময়মনসিংহের গীতিকায় প্রকৃতি-ব্যবহারের ক্ষেত্রে রচয়িতাদের তেমনই প্রকৃতিবোধ বিস্ময়করভাবে লক্ষণীয়।

ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে প্রকৃতিবর্ণনা ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের মতো বিস্তৃত, পুঙ্খানুপুঙ্খ কিংবা মানবানুভূতি-নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠতা-আচ্ছন্ন নয়, বরং সংক্ষিপ্ত, বাঙ্ময়, সংবেদনশীল ও প্রাণবন্ত। সংস্কৃত সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রকৃতি-ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে ধ্রুপদী রীতি, নাগরিক বৈদগ্ধ্য, প্রথানুকরণ প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়, ময়মনসিংহের গীতিকায় তা অনুপস্থিত। গীতিকাসমূহে চরিত্রের বিশিষ্ট আবেগের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত হয়েছে প্রকৃতিচিত্র, — তাতে রচয়িতার লোকজ মানসিকতা যেমন পরিস্ফুট হয়েছে, তেমনি সাধারণ গ্রামীণ মানুষের অভিজ্ঞতা-আশ্রয়ী জীবনবোধও হয়েছে অভিব্যক্ত।

গীতিকাসমূহে কাহিনীর আয়তনের তুলনায় প্রকৃতিবর্ণনা নিতান্তই ক্ষুদ্র পরিসরে বিধৃত হয়েছে। তবে ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যেও প্রকৃতির ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যময় ও প্রভাববিস্তারশীল। বিচিত্র মানবানুভূতিকে, মানবহৃদয়ের আনন্দ ও যন্ত্রণাকে যথাযথরূপে উপস্থাপনের জন্য প্রকৃতির নানা অভিব্যঞ্জনাময় রূপ অঙ্কিত হয়েছে। চরিত্রসমূহের আনন্দ-বেদনাকে পাঠক-শ্রোতার মনে সঞ্চারিত করার লক্ষ্যও এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল থেকেছে।

ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে কোথাও লক্ষ্যহীন ফটোগ্রাফধর্মী প্রকৃতিবর্ণনার পরিচয় পরিলক্ষিত নয়। চরিত্রসমূহের অভ্যন্তরীণ সমস্যা-সংকট-সংঘর্ষ, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অস্তিত্ববান থাকার জন্য প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম প্রভৃতির অনুষঙ্গী হয়ে প্রকৃতির আবির্ভাব ঘটেছে। ফলে দীর্ঘ প্রকৃতিবর্ণনার পরিবর্তে দুই-চার পংক্তিতেই নিঃশেষিত হয়েছে প্রকৃতি ব্যবহার। চরিত্রসমূহের দুঃখ-দারিদ্র, আনন্দ-বেদনা, আশা-হতাশা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বিচিত্রতর মানসিক গঠনকে ময়মনসিংহের গীতিকার রচয়িতাগণ ভাষাদ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ না করে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকৃতিবর্ণনার মধ্য দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্ফুট করেছেন ।

ক. মহুয়ার প্রতি গভীর অনুরাগবশত নির্জন রাত্রিতে নদের চাঁদ বাঁশী বাজাচ্ছে এবং সেই বাঁশীর সুরশব্দে গভীর নিদ্রা ভেঙ্গে জেগে উঠেছে মহুয়া । প্রণয়ীর বাঁশীর সুর মহুয়ার সদ্যজাগ্রত মনে যে অনির্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার ঘটিয়েছে, 'বউ কথা কও' পাখীর ঘনগভীর কলতানের মধ্য দিয়ে তা পরিস্ফুট করা হয়েছে । গ্রামজীবনে 'বউ কথা কও' পাখীর ডাক প্রণয়লালিত নারীমনে যে গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তারশীল, তা বলা বাহুল্য ।

আসমানেতে চৈতার বউ ডাকে ঘনে ঘন ।
বাশী শুন্যা সুন্দর কইন্যার ভাঙ্গ্যা গেল ঘুম ॥ (মৈ. গী. পৃ ১৪)

খ. পরবর্তীকালে হুমরা কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে মহুয়া যখন নদের চাঁদকে হত্যা করার জন্য নদীর ঘাটে যাচ্ছে, তখনকার প্রকৃতিকে মহুয়ার হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে পরস্পরিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে । নদের চাঁদকে কেন্দ্র করে মহুয়ার মনে যে স্বপ্ন ও আশা লালিত, পিতা হুমরার নির্দেশ তা চরিতার্থ হওয়ার পথে অলঙ্ঘনীয় অন্তরায় সৃষ্টি করেছে । সেকারণে আশার আলো নিভে গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎই হয়ে উঠেছে মহুয়ার নিয়তি ।

ডুবিল আসমানের তারা চান্দে না যায় দেখা ।
সুনালী চান্নীর রাইত আবে পড়ল ঢাকা ॥ (মৈ. গী. পৃ ২৩)

নদের চাঁদ ও মহুয়ার জীবনের সুখস্বপ্নের জ্যোৎস্না হঠাৎ-দুর্ভাগ্যের কালো মেঘে যেন ঢাকা পড়ে গেল ।

গ. মহুয়া ও নদের চাঁদের দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলার পথে হুমরাই কেবল অন্তরায় নয়, সামাজিক অন্তরায়ও এখানে প্রবল । দুর্গম, প্রবল স্রোতসম্পন্ন নদীই এই সামাজিক অন্তরায়ের প্রতীক হিসেবে কল্পিত হয়েছে । পিতৃ-আদেশ লঙ্ঘন করে মহুয়া নদের চাঁদকে হত্যা না করে তার সঙ্গে নিরুদ্দেশযাত্রী হওয়ার পর একটি নির্দিষ্ট দুরত্ব অতিক্রম করে তরঙ্গক্ষুব্ধ নদীর সম্মুখীন হয়েছে । এখানে হুমরা-ভীতির পরিবর্তে সামাজিক ও প্রকৃতি-ভীতি যে নব দম্পতিযুগলের মনে প্রবল, তা-ই দুর্গম নদীরূপে প্রতীকায়িত হয়েছে ।

বিস্তার পাহাড়ীয়া নদী ঢেউয়ে মারে বাড়ি ।
এমন তরঙ্গ নদী কেমনে দিবাম পাড়ি ॥ (মৈ. গী. পৃ ২৬)

ঘ. 'মলুয়া' গাথায় একমাত্র পুত্র চান্দ বিনোদ শিকার-উদ্দেশে দুরদেশে গমন করলে তার বৃদ্ধা মাতা একাকী গৃহে অবস্থান করছে । পুত্রের গৃহ প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব ঘটায় বৃদ্ধা মাতার নিঃসঙ্গ জীবন যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তা প্রকৃতির অব্যাহত গতিময়তা ও অনিবার্য পরিবর্তনশীলতার পটভূমিতে প্রতিস্থাপিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে ।

আশ্বিনে পূবের মেঘ পশ্চিমে ভাস্যা যায় ।
ঘরে থাক্যা কান্দা মরে অভাগিনী মায় ॥ (মৈ. গী. পৃ ৫৪)

ঙ. একমাত্র পুত্রের অনুপস্থিতিতে বৃদ্ধা মাতার নিরালম্ব জীবনের দুশ্চিন্তাগ্রস্ততার রূপ যে কত ভয়াবহ, প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপ অঙ্কনের মধ্য দিয়ে তা আভাসিত করা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে ঝিলিক ঠাডা পড়ে ।
অভাগী জননী দেখ ঘরে পুইরা মরে ।। (মৈ.গী.পৃ ৫০)

বজ্রপাতের বিদ্যুৎদহন নয়, পুত্রের জীবনে দুর্ঘটনা কল্পনা করে বৃদ্ধা মাতার মনে দুশ্চিন্তার অগ্নিদহনের বিষয়টি এখানে প্রতীকায়িত হয়েছে ।

চ. চাঁদ বিনোদকে পুকুরঘাটে প্রত্যক্ষ করে মলুয়ার যুবতীমনে যে অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছে আষাঢ় মাসের বর্ষণসিক্ত ধরণী ও কানায় কানায় পূর্ণ নদীর উচ্ছলতার মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় । মেঘের ডাকের মধ্যে মলুয়া তার প্রিয়তমের কন্ঠধ্বনি যেন শুনতে পাচ্ছে । বর্ষা যুবক-যুবতীর অনুরাগসিক্ত হৃদয়কে যে উদ্বেলিত করে, তাদের প্রণয়বাসনাকে যে তীব্রতর করে তা শাশ্বত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত । চান্দ বিনোদের সঙ্গে মলুয়ার যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ ঘটল, সেদিন রাতে আষাঢ়ের বজ্রবৃষ্টি মলুয়ার প্রণয়াবেগকে যেমন উচ্ছলিত করেছে, তেমনি আকাঙ্ক্ষিতজনের এমন দুর্যোগময় রাতে আবাসের প্রশ্নটি তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্তও করেছে ।

আসমানে থাকিয়া দেওয়া ডাকছ তুমি কারে ।
ঐ না আষাঢ়ের পানি বইছে শত ধারে ।।
গাং ভাসে নদী ভাসে শুকনায় বা ধরে পানি ।
এমন রাতে কোথায় গেল কিছুই না জানি ।। (মৈ.গী.পৃ ৫৭)

ছ. প্রোষিতভর্তৃকা বিরহকাতরা নারীর নৈঃসঙ্গ্যকে বর্ষাঋতুর মেঘের ডাক যে আরও তীব্র ও অনুভববেদ্য করে তোলে তার পরিচয়ও ব্যক্ত হয়েছে সুস্পষ্টভাবে । সাহিত্য-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা নারীর বিরহতপ্ত হৃদয়যন্ত্রণাকে আষাঢ়ের মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি ও বর্ষাশব্দের অভিঘাতে অসহনীয় করে তোলার মানসিক চিত্রটি লাভ করেছি।

মেঘ ডাকে গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে রইয়া ।
সোয়ামীর কথা ভাবে খালি ঘরে শুইয়া ।। (মৈ.গী.পৃ ৮৪)

জ. চান্দ বিনোদকে পতিরূপে লাভ করার পর থেকেই মলুয়াকে নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছে । প্রণয়ীর প্রতি পরম আত্মনিবেদন, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সংযম ও বুদ্ধিমত্তার ফলে মলুয়া সকল অনুরাগকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম সফল হতে পারেনি । প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম-সাধনায় ক্লান্ত মলুয়া সীমাহীন ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে আত্মবিসর্জনে উদ্যোগী হয়। আত্মবিসর্জনকালে মলুয়ার অভিমানাহত ব্যর্থতাক্লিষ্ট জীবনের অসীম শূন্যতাকে কূলহীন সমুদ্রের প্রতীকে আভাসিত করা হয়েছে । ব্যর্থতাবোধ মানুষের জীবনকে এমনই নৈরাশ্যমগ্ন করে তোলে যে মানুষ তার নিম্নগামিতা থেকে উত্তরণের পথতো পায়ই না বরং অসফলতার অতল জলে নিমজ্জনেই যেন তৃপ্তি খুঁজে পায় ।

পূবেতে উঠিল ঝড় গর্জিয়া উঠিল দেওয়া ।
এই সাগরের কূল নাই ঘাটে নাই খেওয়া ।।
ডুবুক ডুবুক নাও আর বা কতদূর ।
ডুইব্যা দেখি কতদূরে আছে পাতালপুর ।। (মৈ.গী.পৃ ৯৯-১০০)

ধাবমান ঝড় ও মেঘের গর্জন সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনেরই প্রতীক যেন ।

Dhaka University Institutional Repository

ঝ. 'চন্দ্রাবতী' গাথায় জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতী প্রতিদিন প্রত্যূষে পূজার ফুল সংগ্রহ করছে একত্রে। প্রকৃতিলালিত দুই বাল্যবন্ধু প্রকৃতির অগোচরে কখন যেন কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছে। জয়ানন্দের মনে যেদিন চন্দ্রাবতীর প্রতি অনুরাগ অঙ্কুরিত হল, তার পরেরদিন প্রভাতে চন্দ্রাবতীর আগমনে প্রতীক্ষারত জয়ানন্দের অনুরাগরঞ্জিত মনের ছবিটি সূর্যোদয়ের মধ্যে আভাসিত করা হয়েছে। সেদিনকার নবোদিত সূর্যের শরীর হলুদরঞ্জিত। দাম্পত্য জীবন শুরুর লগ্নে হলুদ মেখে স্নান করার প্রসঙ্গ রয়েছে। সমগ্র প্রকৃতি চিত্রটি জয়ানন্দের সোনালি স্বপ্নের পটভূমিতে অঙ্কিত হয়েছে।

আবে করে ঝিলিমিলি সোনার বরণ ঢাকা।
প্রভাতকালে আইল অরুণ গায়ে হলুদ মাখা॥

'ঝিলিমিলি' শব্দটি যেমন আনন্দ ও উচ্ছ্বাসময়তার প্রতীক, তেমনি স্বর্ণ-রঙের আভাটিও সুখস্বপ্নের দ্যোতনা সৃষ্টি করছে।

ঞ. 'দেওয়ান ভাবনা' গাথায়ও আমরা মানবমনের নিগূঢ় অনুভূতিকে প্রকৃতির সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে পরিস্ফুট করার সফল প্রয়াস প্রত্যক্ষ করি। মাধবের সঙ্গে সোনাইর নদীতীরে প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ের মধ্যে প্রণয়বাসনা জাগ্রত হয়। রচয়িতা তাদের মানসিক অবস্থাটি ভাষায় বিশ্লেষণ না করে পুলকিত, সুখস্বপ্নবিভোর দুটি মনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকৃতিবর্ণনার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করে তুলেছেন।

গাঙের পারে কেওয়া পুষ্প গন্ধেতে হাইল।
মাধবের সঙ্গে সোনাইর গো পরথম দেখা হইল॥ (মৈ.গী.পৃ১৭৮)

কেওয়া ফুলের গন্ধে কেওয়াবনের বায়ু যেমন আমোদিত হয়ে থাকে, মাধব ও সোনাইর হৃদয়ানুভূতিতে তখন প্রথম অনুরাগের সুগন্ধ যেন তেমনই আস্বাদিত হয়ে ফিরছে।

ট. সোনাইকে দেওয়ান ভাবনার লাঠিয়ালরা যখন অপহরণ করে, তখন তার মন প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে পরিপূর্ণ। তার এই বিক্ষুব্ধ অসহায়ক্লিষ্ট মনে তখন অন্যতর দুশ্চিন্তাও ক্রিয়াশীল। অপহরণের আভাস পেয়ে সে তার প্রণয়ী মাধবকে দেওয়ানের অপহরণ থেকে উদ্ধার করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে মাধব আসেনি, মাধবের না আসার কোনো কারণ নেই, হয়ত সে কোনো দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। অপহরণের গ্লানির মধ্যে প্রিয়জনের মঙ্গলচিন্তা তার হৃদয়ে যে সংঘর্ষ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে, নদীর তরঙ্গাক্ষুব্ধতার মধ্য দিয়ে তা আভাসিত করা হয়েছে।

বিষম নদীর ঢেউরে অলছতলছ পানি।
কি জানি পন্থেতে বন্ধুর ডুবছে নাওখানি॥ (মৈ.গী.পৃ ১৮৫)

'অলছতলছ' শব্দটি যে শাব্দিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে, তাতেই সোনাই-র হৃদয়চাঞ্চল্যের পরিচয় সুপরিস্ফুট হয়েছে।

ঠ. সোনাইর বিরহকাতর মনের নিঃসঙ্গতাকেও প্রকৃতিচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। স্বামী মাধব দেওয়ান কর্তৃক কারাবন্দী। নববধূ সোনাইর স্বামী-বিরহ আরও তীব্রতা লাভ করেছে পৌষের শীতে — যখন পৃথিবী কুয়াসাচ্ছন্ন, মানুষের শরীরে হাড়কাঁপানো শীত — স্বামীর অনুপস্থিতি তখন নববধূর নিকট সবচেয়ে তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে।

পৌষ মাসে পোষা আন্ধি অঙ্গ কাঁপে শীতে।
একেলা শয্যায় শুইয়া বন্ধু বৈদেশেতে॥ (মৈ.গী.পৃ ১৮৭)

Dhaka University Institutional Repository

শীতের ধূসর প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে হৃদয়ের নৈঃসঙ্গ্যবোধের একটি চিরন্তন সম্পর্ক সাহিত্যে যে বারবার উচ্চারিত হয়েছে, তারই প্রকাশ ঘটেছে এখানে ।

ড. প্রকৃতিচিত্রে সোনাই-র মানসিক যন্ত্রণার ছবি আভাসিত হওয়ার উদাহরণ গাথাটির শেষ দৃশ্যে করুণ ব্যঞ্জনা লাভ করেছে । সকল প্রতিবাদ-সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েছে, প্রণয়ী-পতির জীবন রক্ষার জন্য মূর্তিমান কামরূপ দেওয়ানের নিকট আত্মসমর্পণের পরিবর্তে আত্মবিসর্জনকেই শ্রেয় জ্ঞান করেছে সে। তার জীবনের সকল সোনালি স্বপ্নের আলো গাঢ়-গভীর অন্ধকারে আবৃত হয়েছে । আত্মবিসর্জনকালে পৃথিবী, আকাশ ও রাত্রির গভীরতর অন্ধকারময় চিত্রে ব্যঞ্জিত হয়েছে সোনাই-র অসফল জীবনের করুণ বীণাধ্বনি ।

আসমান কালা জমীনরে কালা কাল নিশার যামিনী ।
বিষের কটরা খুলে কন্যা জনম দুঃখিনী ॥ (মৈ. গী. পৃ ১৯০)

'নিশা' এবং 'যামিনী' — দুটি শব্দই অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির প্রতীকশব্দ । এই উভয় শব্দের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অন্ধকারময়তার গাঢ়ত্বকে দ্বিগুণ করে উপস্থাপন করা হয়েছে ।

ঢ. মানবমনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যঞ্জনাময় প্রকৃতি বর্ণনা 'রূপবতী' গাথায়ও প্রত্যক্ষ করা যায় । রাজকন্যা রূপবতীকে নবাবের নিকট অর্পণ করার অনিবার্য নির্দেশ পেয়ে ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিত্বময়ী রানী নবাবের পরিবর্তে বাড়ির চাকর মদনের কাছে নির্জন রাত্রিতে সকলের অগোচরে কন্যা সমর্পণ করেন । মদন গিয়ে যখন রূপবতীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হল, তখন তাকে লক্ষ্য করে রূপবতীর মানসিক অবস্থা : ' আন্ধাইরা নিঝুম রাতি আসমানে জ্বলে তারা ।' কেবলমাত্র রূপবতী নয়, তার মাতাপিতার মনেও নবাবের নিকট কন্যা-সমর্পণের সঙ্কট-রূপ অন্ধকার বিরাজমান এবং সেই অন্ধকারের মধ্যে মদনের আবির্ভাব নক্ষত্ররূপ আলোর ন্যায় । প্রকৃতিচিত্রের সঙ্গে পরস্পরিত করে মানবানুভূতিকে পরিস্ফুট করার আরও অনেক উদাহরণ গীতিকাসমূহে বিধৃত হয়েছে ।

২

প্রকৃতি মানবমনের নিগূঢ় অনুভূতিরই দ্যোতক হয়ে ওঠেনি, কখনও কখনও প্রকৃতির ভূমিকা পরিণামসঞ্চারী হয়ে উঠেছে । মহুয়া-নদের চাঁদের প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় আনুরিকতা বা বিশ্বস্ততার অভাব ছিলনা । উভয়ে উভয়ের জন্য গৃহত্যাগী হয়েছে, সংসারসুখ বিসর্জন দিয়ে অপরিসীম দুঃখভোগ করেছে, কিন্তু তারপরেও তাদের দাম্পত্য জীবন সফল ও স্থায়ী হয়নি, অকালে প্রাণ হারাতে হয়েছে উভয়কে । মহুয়ার প্রতি প্রবল অনুরাগবশত নদের চাঁদের প্রথম যেদিন মধ্যরাতে নিদ্রাভঙ্গ হল এবং শয্যাত্যাগ করে সে মহুয়া-মুখী হল সেদিন ছিল বসন্তের রাত, সে-রাতে কোকিল-কন্ঠ স্তব্ধ ছিল না, কিন্তু কবি সেই কন্ঠে অশুভের ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করেছিলেন ।

ফাল্গুন মাসে চল্যা যায়রে চৈত্র মাসে আসে ।
সোনার কুইল কুডাকে বইস্যা গাছে গাছে ॥ (মৈ. গী. পৃ ১৪)

কোকিল 'সোনার', অর্থাৎ মহুয়া-নদের চাঁদের প্রণয়াবেগ অকলুষিত, পবিত্র, কিন্তু তা সফল হওয়ার নয়, তারই ইঙ্গিতময় শব্দ হিসেবে সোনার কোকিলের কন্ঠ থেকে 'কুডাক' উচ্চারিত হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

এরূপ পরিণামসন্ধারী প্রকৃতি- বর্ণনা 'কমলা' গাথায় লক্ষণীয় । যুবতী কমলার জীবনে নানা দুর্যোগ কেবলমাত্র তার জীবনকেই নয়, সমগ্র পরিবারকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল । এই বিপর্যয়ের ইঙ্গিত কমলার জন্মকালীন প্রকৃতিবর্ণনার মধ্যেই সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে । জ্যৈষ্ঠমাসের ষষ্ঠির দিন শুক্রবার শেষ রাত্রে কমলার জন্ম হয়েছিল । জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রলম্বিত দিনে গ্রীষ্মের দাবদাহ এবং সেদিন ঝড়ের পূর্বাভাস হিসেবে আকাশে ঘনকালো মেঘের ছিল আনাগোনা ।

জৈষ্টি মাসের ষষ্টি দিন শুক্রবার যায় ।
কালামেঘে করে সাজ আসমানের গায় ॥
রাত্রিশেষে জন্ম লয় এই অভাগিনী । (মৈ.গী.পৃ ১৫৪)

৩

ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে প্রকৃতির যে বিচিত্র বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে, তার মধ্যে তার মানবীয় রূপটি অন্যতম । মানবায়িত প্রকৃতি মানুষের সুখ-দুঃখের নিত্য সহচর হয়ে উঠেছে । গীতিকাসমূহে প্রকৃতি মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা বন্ধনে জড়িত । তবে আত্মীয়তা সর্বক্ষেত্রে যে প্রিয়জনরূপে প্রকাশিত হবে, তা নয়, কখনও কখনও তা শত্রুতায়ও পর্যবসিত হয় । সহানুভূতি ও ঔদাসীন্য পরস্পর হাত ধরাধরি করে অবস্থান গ্রহণ করেছে । সুজন প্রতিবেশীর ন্যায় যেমন সে বিপদে সহায়তাকারীর ভূমিকা নিয়েছে, তেমনি কখনও কখনও তার প্রলয়ংকরী রুদ্র রূপেরও প্রকাশ ঘটেছে সমান্তরালভাবে । তবে সহায়তাকারী বন্ধুরূপী প্রকৃতির পরিচয়ই গীতিকাসমূহে অধিকতর লক্ষণীয় ।

কানা মেঘারে তুইন আমার ভাই ।
এক ফোটা পানি দে সাইলের ভাত খাই ॥ (মৈ.গী.পৃ ১২১)

অনাবৃষ্টির মুখে কৃষকগৃহে বৃষ্টিকামনা প্রবলতর হলে সাইলের ধান যাতে নষ্ট না হয়, সাইলের চালের ভাত খাওয়ার বিষয়টি যাতে নিশ্চিত হয়, সেজন্য মেঘের নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করা হচ্ছে । মেঘকে ভ্রাতৃরূপে সম্বোধন করার মধ্যেই প্রকৃতির সঙ্গে লোকায়ত জনজীবনের গভীর হার্দ্য সম্পর্কের পরিচয় পরিস্ফুটিত হয় ।

গীতিকাসমূহে বিপদগ্রস্ত নায়ক-নায়িকাগণ বিশেষত নায়িকাগণ প্রকৃতির সহায়তা কামনায় যখন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, তখন প্রকৃতিকে মানুষের আত্মীয়কল্পনা কিংবা প্রকৃতির মানবায়িত রূপ সবচেয়ে সুপ্রকাশিত হয় । বণিকের ষড়যন্ত্রে নদের চাঁদ নদীতে নিমজ্জিত হওয়ার পর মহুয়ার সহায়তাকারী একমাত্র প্রকৃতি । প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের নিকট মহুয়া নদের চাঁদের অনুসন্ধান করছে । পাখী, তরুলতা, বনের বাঘ-ভালুক, নদীর কুমীর, বনের ময়ুরময়ুরী — সকলের নিকট মহুয়া হৃত নদের চাঁদের অনুসন্ধান কামনা করছে ।

কও কও কও পঙ্খী আরে কও তরুলতা ।
ঢেউয়ের কুলে পইড়া বন্ধু এখন গেল কোথা ॥
শুন আরে বাঘ-ভালুক পরে আমার খাও ।
বন্ধুর উদ্দেশ মোরে পরথাইয়া জানাও ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩০)

আধুনিক সাহিত্যে প্রকৃতির ওপর প্রাণারোপের যে টেকনিক অর্থাৎ সমাসোক্তি অলঙ্কার সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, মধ্যযুগের সাহিত্যে তা অনুপস্থিত । ময়মনসিংহের গীতিকায় এ-পর্যায়ে আমরা

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতিকে সত্তা হিসেবে কল্পনা করার যে-চিত্র লক্ষ্য করি তা রচয়িতাগণের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার।

বিপদগ্রস্তা মহুয়া যেমন নিরুপায়ভাবে প্রকৃতি-নির্ভর হয়ে পড়েছে, তেমনি প্রকৃতিও তার বিপদে সহায়তাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। অন্যসময় হলে বনের হিংস্র প্রাণীকুল হয়ত এমন শিকার লুফে নিত, কিন্তু বিপদাক্রান্ত মহুয়ার প্রতি বনের বাঘ-ভালুক-ভয়ঙ্কর অজগর সকলেই সহানুভূতিশীল, তার প্রতি ভ্রূক্ষেপই করছে না।

বড় বড় বাঘ-ভালুক দূরে সইরা যায়।
অভাগ্যা মহুয়ায় দেখ্যা ফিররা নাহি চায়॥
আকাল মাকাল অজগইরা হরিণ ধইরা খায়।
দুঃখিনী মহুয়ায় দেখ্যা দূরে চল্যা যায়॥ (মৈ.গী.পৃ ৩১)

বিপদগ্রস্ত অসহায় নারীজীবনের একমাত্র সহায়রূপে প্রকৃতির ভূমিকা একাধিক গাথায় লক্ষণীয়। দেওয়ান ভাবনার লাঠিয়ালরা সোনাইকে যখন অপহরণ করছে, তখন প্রকৃতি ভিন্ন অন্য কাউকে অভিযোগ প্রকাশের জন্য সে পায়নি। এই অপহরণ সংবাদ মাধবের নিকট পৌঁছানোর জন্যও সে প্রকৃতিকেই অনুরোধ করছে। দেওয়ান ভাবনার চরম অন্যায় দুরাচারের সাক্ষীও থাকছে এই প্রকৃতিই। চন্দ্র-সূর্য, দিন-রাত্রি, বনের পাখী, নদীতীরবর্তী হিজল বৃক্ষ, কেওয়া ফুল, নদী-নালা, বায়ু, পশুপাখী— সকলের নিকট সোনাই তার অসহায় হৃদয়ের করুণ আর্তি প্রকাশ করছে।

সাক্ষী হইয়ো চান্দ-সুরুয দিবস-রজনী।
বন্ধুর লাগাল পাইলে কইয়ো দুখের কাহিনী॥
উইড়া যাওরে বনের পংখী নজর বহুদূরে।
বন্ধেরে কহিয়ো সুনাই লইয়া গেছে চোরে॥ (মৈ.গী.পৃ ১৮৪)

কঙ্কের নিরুদ্দেশ গমনের পর অসহায় লীলাও কঙ্কের অনুসন্ধান করেছিল মালতী-বকুল ফুল, পোষা পাখী ও ভ্রমরের নিকট। কঙ্কের জন্য প্রতীক্ষারতা লীলার বিরহতপ্ত হৃদয়ের আকুতিও ব্যক্ত হয়েছিল প্রকৃতির নিকট। গোপন প্রণয় এবং প্রণয়জাত বেদনা-অনুভূতি প্রকাশের জন্য নির্বাক প্রকৃতিই একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়। কঙ্কের প্রত্যাবর্তনের বিলম্ব যখন লীলার নিকট অসহনীয় এবং প্রত্যাবর্তনের অসম্ভাব্যতা যখন প্রায়-নিশ্চিত হয়ে উঠেছে, তখন লীলা আকাশের সূর্য, বিদেশ ভ্রমণকারী মাঝি-মাল্লা, সর্বত্রগামী নদীপ্রবাহ, চন্দ্রতারা, সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী, বৃক্ষলতা, পশুপাখী, পালিতা শুকসারী— সকলের কাছে কঙ্কের অনুসন্ধান প্রার্থনা করছে এবং সাক্ষাৎ পেলে লীলার বিরহকাতর হৃদয়ের বার্তা অবহিত করার অনুরোধ জানাচ্ছে।

পাহাড়ে পর্ব্বতে রে নদী তোমার যাওয়া-আসা।
অভাগীরে ছাইড়া বন্ধে কোথায় লইল বাসা॥
লাগাল পাইলেরে তারে কইও লীলার কথা।
মিনতি জানাইয়া কইও দুঃখের বারতা॥ (মৈ.গী.পৃ ২৯৬)

Dhaka University Institutional Repository

৪

প্রকৃতির অন্যবিধ ব্যবহারের উদাহরণও ময়মনসিংহের গীতিকায় পরিদৃশ্ট হয়। নায়িকা তার প্রণয়বাসনা চরিতার্থ করতে পারছে না, কিন্তু তার মনে নায়কের সার্বক্ষণিক সান্নিধ্য-কামনা জাগ্রত হচ্ছে প্রবলভাবে। এমতাবস্হায় বাস্তব থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে প্রকৃতি-নির্ভর হতে হচ্ছে নায়িকাকে। প্রকৃতি-সংলগ্না নায়িকা তার নায়ককে কিংবা নিজেকে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান হিসেবে কল্পনা করে সার্বক্ষণিক সান্নিধ্য লাভের বাসনা ব্যক্ত করেছে। প্রকৃতির এরূপ ব্যবহার প্রকৃতিকে আত্মীয়ভাবনারই নামান্তর। তবে এ-পর্যায়ে গীতিকার চরিত্রসমূহ অনেক বেশি রোম্যান্টিক কল্পনার পরিচয় দিয়েছে।

মহুয়া যখন নদের চাঁদের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনের চিন্তাকে অসম্ভব জ্ঞান করেছে, তখন তার মধ্যে রোম্যান্টিক চিন্তা জাগ্রত হয়েছে। তখন সে ভাবছে নদের চাঁদ যদি ফুল হত, তাহলে তাকে খোঁপায় গেঁথে রেখে তার সার্বক্ষণিক সান্নিধ্য লাভ সম্ভব হত। তবে এটি ময়মনসিংহের গীতিকার নায়িকাদের অনুভূতি প্রকাশের সাধারণ টেকনিকও বটে।

ফুল যদি হইতারে বন্ধু ফুল হইতে তুমি।
কেশেতে ছাপাই রাখতাম ঝাইড়িয়া বানতাম বেনী॥ (মৈ.গী.পৃ ১৫)

মলুয়ার চিন্তা ছিল ভিন্নতর। সে দেখেছে শিকারী চান্দ বিনোদের সঙ্গে সবসময় একটি কুড়া পাখী থাকে। ফলে কুড়া পাখী হওয়ার বাসনা জাগ্রত হয়েছে তার মনে। কেননা কুড়া পাখী হলেই চান্দ বিনোদের সার্বক্ষণিক সান্নিধ্য অর্জন সম্ভব, অন্যথায় নয়।

আমি যদি হইতামরে কুড়া থাকতাম তার সনে।
তার সঙ্গে থাক্যা আমি ঘুরতাম বনে বনে॥ (মৈ.গী.পৃ ৫৭)

কমলার বাসনা আরও ব্যাপক। সে ভাবছে, তার বন্ধু যদি পাখী হত তাহলে হৃদয়রূপ পিঞ্জিরে আবদ্ধ করে তাকে কাছে রাখতে পারত, কিংবা তার বন্ধু যদি হইত ফুল, তাহলে ফুলের মালা গেঁথে গলায় ধারণ করা সম্ভব ছিল, কিংবা তার বন্ধু যদি হত চাঁদ তাহলে সমগ্র রাত্রি জাগ্রত থেকে নির্জনে সেই চাঁদকে দর্শন করা সম্ভব হত।

পাখী যদি হইতারে বন্ধু আরে বন্ধু রাখতাম হৃদ্পিঞ্জিরে।
পুষ্প হইলে বন্ধু আরে বন্ধু গাইথা রাখতাম তোরে॥ (মৈ.গী.পৃ ১৭০)

'দেওয়ান ভাবনায় সোনাই তার প্রণয়ী মাধবকে ভ্রমর, পাখী, ফুল, কাজল ও চাঁদ রূপে কল্পনা করে সার্বক্ষণিক সান্নিধ্যের বাসনা ব্যক্ত করেছে, তেমনি নিজেও ফুল হওয়ার কামনা করেছে। সোনাই ভেবেছে, মাধব যদি ভ্রমর হত তাহলে সে তাকে তার খোপার ফুলে আকৃষ্ট করে ধরে রাখত, কিংবা মাধব যদি হত পাখী তাহলে তাকে পিঞ্জিরে আবদ্ধ করে রাখত, কিংবা সে যদি হত ফুল তাহলে খোঁপায় গুজে রাখত, কিংবা সে যদি হত কাজল তাহলে তাকে চোখের কোনে মেখে রাখত, কিংবা মাধব যদি হত আকাশের চাঁদ তাহলে রাত্রি জেগে অন্যের অগোচরে তাকে দর্শন করা সম্ভব হত। অন্যদিকে সোনাই নিজে কেওয়া ফুল হওয়ার বাসনা করেছে, কেননা কেওয়া বনের কাছে প্রতিদিন মাধব শিকার করতে আসে, কেওয়া ফুল হলে মাধবের সঙ্গে প্রতিদিন সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষী হইলে প্রাণের বন্ধুরে রাখিতাম পিঞ্জরে ।
পুষ্প হইলে প্রাণের বন্ধুরে খোপায় রাখতাম তোরে ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৭৮)

ফুল হইয়া ফুটিতাম বন্ধুরে যদি কেওয়া বনে ।
নিতি নিতি হইত বন্ধু দেখা তোমার মনে ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৮০)

প্রসাধন নারী জীবনের অত্যন্ত প্রিয়সামগ্রী । নায়িকা তার প্রিয়তমকে এই আদরের সামগ্রী প্রসাধনরূপেই অঙ্গে ধরে রাখার কামনা করছে। 'আন্ধা বন্ধু' গাথায় নায়িকা রাজকন্যা তার প্রণয়ীকে চোখের কাজল, অঙ্গের বসন, সিথির সিঁদুর ও সুগন্ধী চন্দন হিসেবে কল্পনা করে অঙ্গে ধারণ করার বাসনা ব্যক্ত করছে ।

নয়ানের কাজল কইরা নয়ানেতে থুইব ॥
... ...
বসন কইরা অঙ্গে পরব মালা কইরা গলে ।
সিন্দুরে মিশাইয়া তোমায় মাখিব কপালে ॥
চন্দনে মিশাইয়া তোমায় করব দেহ শীতল ।(পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ১১৩)

৫

প্রকৃতির সঙ্গে এই আত্মীয়ভাবনা সর্বত্র সমান তালে অগ্রসর হয়নি । প্রকৃতির এই সৌহার্দপূর্ণ সহমর্মী রূপই কখনও কখনও প্রলয়ংকরী হয়ে উঠেছে । অনুরক্ত মিত্রতার পরিবর্তে তখন তার শত্রুতার রূপই প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে । ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুররূপে তখন সে সকল মানবীয় অনুভূতিকে দলিত-মথিত করেছে । জনজীবনের দুর্দশার কারণ ঘটিয়েছে প্রকৃতির এই রুদ্ররূপ । আশ্বিনের প্লাবনে মাঠের ফসলহানি হলে চান্দ বিনোদ(মলুয়া)নিঃস্ব সর্বস্বহারায় পরিণত হয়েছিল । মামুদ উজ্জ্যাল (আয়না বিবি) ঝড় কবলিত হয়ে ব্যবসায়িক উপার্জন ও নৌকা হারিয়ে নিজেও নিমজ্জিত হয়েছিল নদীজলে । বাণিজ্য উদ্দেশে বের হয়ে বিনাথও (পীর বাতাসী) পথিমধ্যে অন্ধকার রাত্রিতে ভয়ঙ্কর মেঘ-গর্জন ও প্রবল বায়ুবেগে তরঙ্গ ক্ষুব্ধ নদীতে নৌকাসহ নিমজ্জিত হয়েছিল ।

রাত্রি নিশাকালে শুন দেয়ার গরজন ॥
মেঘেতে আসমান ছাইল তুফান হইল ভারী ।
কতেক পানসীর দেখ কাছি লইল ছিড়ি ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৩৪৫)

'জীরালনী' গাথায়ও নদীতে প্রবল ঝড়ের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ঝড়ের উপাদান হিসেবে সেখানেও ভয়ঙ্কর মেঘগর্জন, বজ্রপাত, নদীর তরঙ্গক্ষুব্ধতা, জলরোষ এবং প্রবল বায়ুতাড়না ও তরঙ্গহিল্লোলে বণিকের নৌকানিমজ্জনের চিত্রগুলি পরপর দৃশ্যমান হয় ।

সাজ্যা আইল বার দেওয়া ঘন ঘন ডাকে ।
বান পাথালে পড়ে চৌদ্দ ডিঙ্গা পাকে ॥
ঘুরিতে ঘুরিতে ডিঙ্গা বেসামাল হইল ।
পর্ব্বত পরমান ঢেউ গর্জ্জিয়া উঠিল ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৪৫০)

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতির কোমল ও ভয়ঙ্করতা, তার ধাত্রী ও স্বৈরাচারী রূপ, মানবানুভূতির সঙ্গে অর্থাৎ মানবের সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বেদনা, বিরহ-পুলক, সাচ্ছল্য-দারিদ্র প্রভৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকৃতিচিত্রের উপস্থাপনায় ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহ তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে ।

৬. বারমাসী ও প্রকৃতি

সংবেদনশীল, অনুভূতিময়, ব্যঞ্জনাধর্মিতা ছাড়াও সাধারণ প্রকৃতিচিত্র অঙ্কিত হয়েছে ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে । ঋতুবৈচিত্রের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে সেই প্রকৃতি-রূপ । ময়মনসিংহের গীতিকা-সমূহে প্রিয়বিরহে কাতর নরনারীর বিশেষত নারীর দুঃখযন্ত্রণাময় বারমাসী বর্ণনায় এই ঋতুবৈচিত্র চিত্রিত হয়েছে । স্মর্তব্য যে, বারমাসী দুঃখবর্ণনার রীতি সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যসূত্রে বাংলা সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করেছে । মধ্যযুগের সাহিত্যে এর ব্যাপক প্রচলন পরিলক্ষিত হয় । ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে বারমাসীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও এর প্রভাব মধ্যযুগীয় সাহিত্যের মতো ব্যাপক নয় । ময়মনসিংহের গীতিকার বারমাসীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এখানে যেমন প্রকৃতির বৈচিত্রময় পরিবর্তনশীলতার পটভূমিতে বিরহযন্ত্রণার স্বরূপ অভিব্যক্তি লাভ করেছে, তেমনি বারমাসীর যন্ত্রণাসূত্রে উপস্থাপিত হয়েছে সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত প্রকৃতিচিত্র ।

ময়মনসিংহের গীতিকার সাতটি গাথায় প্রোষিতভর্তৃকা নারীর প্রিয়বিরহকাতর দুঃখবর্ণনাকে বারমাসী রীতিতে প্রকৃতিরূপের সঙ্গে পরস্পরিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে । একটি গাথায় (মহুয়া) বিরহতপ্ত নায়কের দুঃখবর্ণনা পরিলক্ষিত হয় । পূর্ণ বারমাসের দুঃখবর্ণনা রয়েছে কেবল চারটি গাথায় (কমলা, দেওয়ান ভাবনা, বগুলার বারমাসী ও মলুয়ার বারমাসী) । অন্যত্র কোনটিতে ছয় মাসের (কঙ্ক ও লীলা এবং বীর নারায়ণের পালা), কোনটিতে আট মাসের (মহুয়া), আবার কোনটিতে (মলুয়া) নয় মাসের দুঃখবর্ণনায় পরিচয় পাওয়া যায় ।

'মহুয়া' গাথায় বেদের দল বামনকান্দা গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর নদের চাঁদ মহুয়ার সন্ধানে গৃহত্যাগী হয়েছে । বৈশাখ মাস থেকে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত অনুসন্ধান করে সে মহুয়ার সাক্ষাৎ পেয়েছে । এই আটটি মাসের দুঃখবর্ণনায় গড়ে উঠেছে নদের চাঁদের বারমাসী । অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এই বর্ণনা মাত্র চৌদ্দ পংক্তিতে নিঃশেষিত। এক এক ঋতুর কথা মাত্র দুই পংক্তিতে ব্যক্ত করা হয়েছে । কেবলমাত্র ভাদ্র-আশ্বিন মাসে যখন দেশে দুর্গাপূজা, সেইসময়কার বর্ণনাটি একটু দীর্ঘ ।

ভাদ্র-আশ্বিন মাস আসে এই মতে ।
দিন রাইত নদীয়ার ঠাকুর খুঁজে নানান মতে ॥
বাড়ীতে দুর্গার পূজা কান্দে বাপ মায় ।
খালি মন্ডপ রইলরে পইড়া নদীয়ার ঠাকুরের দায় ॥ (মৈ.গী.পৃ ২১)

'মহুয়া' গাথায় যে কেবল নায়কেরই বারমাসী বর্ণনা পাওয়া যায় তাই নয়, এখানে পথ যাত্রার মধ্য দিয়ে দুঃখতাপ ব্যক্ত হচ্ছে, কিন্তু অন্যত্র নায়িকার বারমাসী গৃহে কিংবা বনে আবদ্ধ স্থির জীবনে সংঘটিত হয় । 'মলুয়া' গাথায় চান্দ বিনোদ শিকার-উদ্দেশে গৃহত্যাগী হলে গৃহে মাঘ থেকে আশ্বিন এই নয়টি মাস মলুয়ার দরিদ্রময়তার মধ্যে বিরহকাতরতা চরমরূপ ধারণ করে। এখানেও বারমাসী বর্ণনা

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, মাত্র ষোলটি পংক্তিতে নয় মাসের বর্ণনা শেষ হয়েছে । প্রকৃতির সঙ্গে পরস্পরিত করে উপস্থাপিত হয়েছে এই দুঃখবর্ণনা ।

জৈষ্ঠ্যমাস আম পাকে কাউয়ায় করে রাও ।
কোন বা দেশে আছে বন্ধু নাহি জানে তাও ॥
আইল আষাঢ়মাস মেঘের বয় ধারা ।
সোয়ামীর চান্দ মুখ না যায় পাশরা ॥ (মৈ.গী.পৃ ৮৩)

'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় কঙ্কের নিরুদ্দেশগমনের পর লীলার বিরহদুঃখ অঙ্কিত হয়েছে । ফাল্গুন মাস থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত ছয় মাস কাল পরিধিতে ব্যক্ত এই বারমাসী দুঃখবর্ণনা তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ অর্থাৎ নব্বই পংক্তিতে ছয়মাসের বিরহকাতরতা ব্যক্ত হয়েছে । প্রতি মাসের ঋতুবৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করে তার পটভূমিতে দুঃখের তীব্রতার রূপ পরিস্ফুট করা হয়েছে । উদাহরণস্বরূপ শ্রাবণ মাসের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃতিযোগ্য । শ্রাবণমাসে চাতক পাখীর ডাকে লীলার বিরহী হৃদয়ের যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে, 'বউ কথা কও', অর্থাৎ পাপিয়া পাখীর ডাককে লীলার হৃদয়যন্ত্রণার সঙ্গে একাত্ম করে উপস্থাপন করা হয়েছে, পাপিয়ার ডাককে কান্না বলে মনে হচ্ছে এবং মনে হচ্ছে লীলারই মতো সেও হয়ত কাউকে ডাকছে ।

রৈয়া রৈয়া চাতক ডাকে বর্ষে জলধর ।
না মিটে আকুল তৃষা পিয়াসে কাতর ॥
... ...
শাউনিয়া ধারা শিরে বজ্রধরি মাথে ।
'বউ কথা কও' বলি কান্দি ফিরি পথে ॥
কাহারে শুধাওরে পাখী আমি নাহি জানি ।
আমিও তোমার মত চির বিরহিনী ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩০২)

লীলার দুঃখবর্ণনা পূর্ণ বার মাসের না হলেও প্রতি মাসের বিরহ-বর্ণনা সামগ্রিকতাস্পর্শী এবং লীলার অন্তর্গত যন্ত্রণাকে পরিস্ফুট করার ক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করেছে ।

'বীরনারায়ণের পালা'য় জমিদারপুত্র বীরনারায়ণের সঙ্গে সোনার বনবাসজীবন সুখেই কাটছিল । কিন্তু জমিদারপ্রেরিত লোকদের দ্বারা বীরনারায়ণ অপহৃত হলে সোনার বিরহকাল শুরু হয় । ফাল্গুন থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত কালপরিধিতে বিধৃত এই বিরহবর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, মাত্র চৌদ্দ পংক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে। তবে সংক্ষিপ্তির মধ্যেও প্রকৃতিবর্ণনার পটভূমিতে সোনার অসহায়ক্লিষ্ট বিরহ জীবনের যন্ত্রণা পরিস্ফুট করার ক্ষেত্রে সার্থকতা লক্ষণীয় । ফাল্গুন মাসে প্রবাহিত বসন্তের বাতাসের মধ্যে সোনার দিন কোনোভাবে কেটে গেলে রাত আর অতিবাহিত হতে চায় না । চৈত্র মাসের চৈতালী বাতাসে বিরহতাপিত হৃদয় শীতল হয় না , বৈশাখ মাসে কোকিলের ডাকে প্রণয়ী কন্ঠের কথা স্মরণ হয় এবং তাতে হৃদয়দগ্ধতা আরো বৃদ্ধি পায়, জ্যৈষ্ঠ মাসের খররোদের চেয়েও প্রণয়ীবিচ্ছেদের যন্ত্রণা অধিক বলে মনে হয় , আষাঢ় মাসের ঘন বর্ষার মধ্যেও সোনার শরীরে যেন অগ্নি প্রজ্জলিত হচ্ছে, শ্রাবণ মাসে পদ্মপুষ্পের প্রস্ফুটন লক্ষ্য করে প্রণয়ীর বিচ্ছেদের কথা অধিকতরভাবে স্মরণ হচ্ছে, কেননা সে থাকলে ঐ পুষ্প তুলে দিত এবং সোনা তা খোপায় গুঁজতে পারত । চৈত্র মাসের বর্ণনাটি উদ্ধৃতিযোগ্য :

চৈত্রনা মাসরে বন্ধু আরে চৈতালা বাতাসে ।

Dhaka University Institutional Repository

তাপিত বক্ষ শীতল না হয় গো
আমার বন্ধু কোন্ দেশেরে ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৩১৫)

পূর্ণ বার মাসের দুঃখবর্ণনা যে চারটি গাথায় লক্ষ্য করা যায়, তার মধ্যে বগুলা ও মলয়ার বারমাসীর যন্ত্রণাই সামগ্রিকতাস্পর্শী। কমলার বারমাসী প্রিয়-বিরহকাতরতা থেকে নয়। চাকলাদার-কন্যা কমলার প্রতি লালসাসক্ত কর্মচারীর প্রতিশোধ গ্রহণের ফলে কমলার জীবনে যে লাঞ্ছনা সৃষ্টি হয়, তার পরিসমাপ্তি ঘটে এক বছর পরে। কমলার জীবনের বছরকালীন এই লাঞ্ছনার ইতিহাসকে কেন্দ্র করে বারমাসী অঙ্কিত হয়েছে। প্রতিটি মাসের প্রকৃতির ঋতুবৈচিত্রের পটভূমিতে লাঞ্ছিত জীবনের যন্ত্রণা সুদীর্ঘ ক্যানভাসে উপস্থাপিত হলেও প্রিয়বিরহকাতরতা না থাকায় কমলার বারমাসী বর্ণনা শিল্পসার্থক নয়। এদিক থেকে সংক্ষিপ্ত হলেও 'দেওয়ান ভাবনা'র সোনাইর বারমাসী বর্ণনা শিল্পসফল, অনুভববেদ্য। এক বছর আষাঢ় মাস থেকে অন্য বছরেরর জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত বছরকালের ব্যাপ্তিতে চিত্রিত এই দুঃখ-বর্ণনার জন্য মাত্র ছত্রিশটি পংক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বর্ণনার এই সংক্ষিপ্তির মধ্যেও শব্দ ব্যবহারের সূক্ষ্মতার জন্য বর্ণনাটি হয়েছে লক্ষ্যভেদ্য। যেমন,

পৌষ গেল মাঘরে গেল ফাল্গুন আইল।
বসন্তে যৌবন-জ্বালা দ্বিগুণ বাড়িল ॥
কি বুঝিবা আরে দূতী কাল বসন্তের জ্বালা।
যার ঘরেতে নাই সে পতি যৈবতী একেলা ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৮৮)

প্রকৃতিসংলগ্ন এই মনোবেদনার প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ মাসের গ্রীষ্মকালীন দাবদাহে আরও ব্যাপ্তি লাভ করেছে। এ পর্যায়ের ভাষা অধিকতর ব্যঞ্জনাময়, সূচীভেদ্য।

জ্যৈষ্ঠ মাসেতে দূতী গাছে পাকনা আম।
কপাল বাইয়া পড়ে কন্যার জৈষ্ঠ্যমাস্যা ঘাম ॥
তালের পাতা লইয়া বাতাস করে যত দাসী।
বাতাসে কি শীতল হয় মন যার উদাসী ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৮৮)

প্রকৃতিচিত্র এখানে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছে পাকা আম, কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে, এমন গ্রীষ্মকালে জমিদারের পুত্রবধূকে দাসীগণ তালের পাখা দিয়ে শীতল করার চেষ্টা করছে, কিন্তু প্রিয়বিরহকাতরা সোনাইয়ের অন্তর্জ্বালা পাখার বাতাসেতো শীতল হতে পারে না।

বিরহযন্ত্রণার তীব্রতা 'বগুলার বারমাসী' গাথায়ও লক্ষ্য করা যায়। বণিক-বধূ বগুলার প্রতি রাজপুত্র লালসাগ্রস্ত। রাজপুত্রের ষড়যন্ত্রের শিকার বণিক বাণিজ্যব্যপদেশে বিদেশযাত্রী। ষড়যন্ত্রের ফলে তার গৃহ প্রত্যাবর্তনেও ঘটছে অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্ব। বণিকের প্রত্যাবর্তনের বিলম্বের অবসরে রাজপুত্র বগুলাকে করায়ত্ত করতে প্রয়াসী। এক অগ্রহায়ণে বাণিজ্যে গমন করেছে বণিক, প্রত্যাবর্তন করেছে অন্যবছর কার্তিক মাসে। এই একবছরকালের বিরহযন্ত্রণার বর্ণনায় চিত্রিত হয়েছে বগুলার বারমাসী। বগুলার বারমাসী বর্ণনাটি অত্যন্ত দীর্ঘ, একশ পচাশি পংক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতিটি মাসের প্রকৃতি-চিত্র অঙ্কনের পট-ভূমিতে বগুলার দুঃখবর্ণনা যেমন উপস্থাপিত হয়েছে, তেমনি চিত্রিত হয়েছে ঐসময় বিরহ ঘুচলে প্রণয়ীর সঙ্গে কেমন আনন্দকাল কাটত তার স্বপ্নকল্পনা। এরূপ আনন্দময় ভবিষ্যৎ স্বপ্নচিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে বগুলার বারমাসী বর্ণনাটি ময়মনসিংহের গীতিকার অন্য বারমাসী অপেক্ষা ব্যতিক্রমধর্মী অভিব্যঞ্জনালাভ

Dhaka University Institutional Repository

করেছে । একটি উদাহরণ ঃ

এহিতনা জ্যৈষ্ঠ মাসারে গাছে নানা ফল ।
জীবন যৌবন মোর সকলই বিফল ॥
জলটুঙ্গি ঘর মোর পইড়া আছে খালি ।
... ...
যদি ঘরে থাকত বন্ধু কোলেতে লইয়া ।
জলটুঙ্গি ঘরে নিদ্রা যাইতাম শুইয়া ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ২২৩-২৪)

বগুলার বারমাসীতে যেমন ভবিষ্যৎ সুখের কল্পচিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তেমনি মলয়ার বারমাসীতে অঙ্কিত হয়েছে অতীত সুখের স্মৃতিচিত্র । মলয়াকে বন থেকে উদ্ধার করেছিল থলভূমের রাজপুত্র বসন্ত। কিন্তু মলয়ার বণিকপিতা বসন্তের নিকট কন্যা সমর্পনে সম্মত ছিলেননা ।পিতৃমত অগ্রাহ্য করে মলয়া পতিরূপে বরণ করেছিল বসন্তকে, কিন্তু প্রতিবেশী রাজাগণ মলয়ার সুখে বাধ সেধেছিল, মলয়াকে বনবাস যেতে হয়েছিল প্রিয়বিরহকাতরতার জন্য দ্বিতীয়বারের বনবাসজীবন ছিল অধিকতর যন্ত্রণাময় । অল্পদিনের দাম্পত্যজীবনের সুখস্মৃতি রোমন্থন ছিল এই যন্ত্রণা লাঘবের উপায় । এক ফাল্গুন থেকে পরবর্তী মাঘ মাস পর্যন্ত পূর্ণ বছরকালীন বারমাসী বর্ণনায় একশত আটন্নটি পংক্তি ব্যবহৃত হয়েছে । সুখময় স্মৃতিচারণার একটি উদাহরণ,

আইল আইল চৈত্রি মাসরে বসন্ত দারুণ ।
যৌবনের বনে মোর লাগিল আগুন ॥
পুষ্প যেমুন পাগল হইয়া সম্ভাষে ভ্রমরে ।
যাচিয়া দিলাম মধু ভিন্ন দেশী কুমারে ॥
... ...
মলয়ের হাওয়া বয় কোকিলা করে গান ।
বন্ধুর মুখেতে তুল্যা দেই চুয়া পান ॥
গাথিয়া ফুলের মালা বন্ধুরে পরাই ।
পুষ্পের শীতলা শেষে শুইয়া নিদ্রা যাই ॥। (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ৪১৮)

বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় রূপাঙ্কন এবং তার পটভূমিতে বিরহদগ্ধ নারীর হৃদয়যন্ত্রণাকে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে যে-কয়টি বারমাসী বর্ণনা অঙ্কিত হয়েছে, তা ব্যঞ্জনাময়তা, প্রকৃতিসংলগ্নতা ও অনুভববেদ্যতার দিক দিয়ে মধ্যযুগের বারমাসী সাহিত্যে ব্যতিক্রমধর্মী তাৎপর্য অর্জন করেছে । এর একটি অন্যতম কারণ, ময়মনসিংহ গীতিকার চরিত্রসমূহ বিশেষত নারী-চরিত্রগুলো যেমন প্রকৃতিলালিত, প্রকৃতিসংলগ্ন তেমনি প্রকৃতি-শাসিত ও প্রকৃতিনিয়ন্ত্রিত । প্রকৃতির সঙ্গে এরূপ ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের কারণেই তাদের দুঃখবর্ণনা এতটা হৃদয়স্পর্শী ও সূচীভেদ্য হতে পেরেছে ।

৭. ঋতুবৈচিত্র ও প্রকৃতি

বারমাসী বর্ণনাসূত্রে ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে বিভিন্ন ঋতু ও মাসের যে বৈচিত্র্যরূপ অঙ্কিত হয়েছে, তার মধ্যে আমরা বাংলাদেশের প্রকৃতির একটি অনুরক্ত, বস্তুনিষ্ঠ ও মনোগ্রাহী চিত্র প্রত্যক্ষ করি ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার প্রকৃতি প্রতিটি মাসে কিংবা ঋতুতে যে বৈচিত্র্য রূপ ধারণ করে — একটি আর-একটি থেকে তা কেবল রঙে, রেখায়ই ভিন্নরূপী নয় — বায়ুবেগ, বায়ুপ্রবাহ, বৃক্ষের পত্র ধারণ কিংবা পত্রঝরা, নদীজলের হ্রাস-বৃদ্ধি, ফুল-ফলের সুলভ-দুর্লভতা, পাখীর আগমন-নির্গমন, শস্যের আবাদ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে নানারূপী হয়ে ওঠে। ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে বারমাসী বর্ণনার বাইরেও প্রকৃতিচিত্র অঙ্কিত হয়েছে, কিন্তু তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বারমাসী বর্ণনায়ই ঋতুবৈচিত্র্যের সমাহার পরিলক্ষিত হয়। আমরা প্রতিমাসের ভিন্ন ভিন্নরূপগুলো উপস্থাপন করলে তা থেকে গীতিকা রচয়িতাদের বস্তুনিষ্ঠ প্রকৃতি চিত্রায়ণের পরিচয় পাওয়া যাবে।

বৈশাখ মাসের বর্ণনায় আছে : নতুন বছরের শুরুতে প্রকৃতি নতুন সাজে সজ্জিত হয়, বৃক্ষ নতুন পত্র ও মুকুল ধারণ করে, প্রস্ফুটিত হয় রক্তজবা ও গন্ধরাজ, ফলে চারিদিকে ভ্রমর ও মৌমাছির সুরেলা কন্ঠ ধ্বনিত হয়, কিন্তু সূর্যের তাপ অত্যন্ত প্রখর, তাতে শরীর দগ্ধ হয়, কোকিল বিদায় মাগে এই মাসে, গাছে থাকে আমের গুটি (কোথাও গাছে পাকা আমের কথাও বলা হয়েছে)।

বৈশাখ মাসেতে হয় রবি খরতর।
গাছেতে পাকিল আম অতি সুবিস্তর ॥ (মৈ.গী.পৃ ১১৪)

অন্যত্র, বৈশাখ মাসেতে গাছে আমের কড়ি।
পুষ্প ফুটে পুষ্পডালে ভ্রমর গুঞ্জরি ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৫৮)

অন্যত্র, নতুন বৎসর আইল ধরি নব সাজ।
কুঞ্জে ফুটে রক্তজবা আর গন্ধরাজ ॥
গাছে ধরে নবপত্র নবীন মুকুল।
চারিদিকে শুনি মধুমক্ষিকার রোল ॥
এহিত বৈশাখ মাস অতি দুঃসময়।
দারুণ রৌদ্রের তাপে তনু দগ্ধ হয় ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩০০)

জ্যৈষ্ঠ মাসের দিনগুলো সকল মাস অপেক্ষা যেমন দীর্ঘ, তেমনি এই মাসে রৌদ্রতাপও সর্বাপেক্ষা অধিক। ফুলে-ফলে শোভিত বৃক্ষরাজি, বিভিন্ন ধরনের পাকা ফলের সুঘ্রাণে চারিদিকে বহুধরনের পাখীর কলকাকলীতে মুখর প্রকৃতি, নতুন নতুন পাখী উড়ে আসে, চলে যায়, বিশেষ করে জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছে পাকা আমের বিষয়টি একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে, রৌদ্রের দাবদাহে কপাল বেয়ে ঘাম ঝরে এই মাসটিতে।

জ্যৈষ্ঠ মাসেতে দূতী গাছে পাকনা আম।
কপাল বাইয়া পড়ে কন্যার জ্যৈষ্ঠমাস্যা ঘাম ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৮৮)

অন্যত্র, জ্যৈষ্ঠমাস জ্যেষ্ঠরে সকল মাসের বড়।
ফলে-ফুলে তরু-লতা দেখিতে সুন্দর ॥
আম পাকে জাম পাকে পাকে নানান ফল।
মন সাধে ডালে বসি বিহঙ্গসকল ॥
নানা গীতি গায়রে তারা নানান ফল খায়।
অচেনা অজানা দেশে উড়িয়া বেড়ায় ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩০০)

Dhaka University Institutional Repository

আষাঢ় মাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল : খাল-বিল-নদী-নালায় জলবৃদ্ধি। নতুন বর্ষার আগমনে ধরণী সিক্ত হয়, গ্রীষ্মের দাবদাহে সঙ্কুচিত লতাগুল্মবৃক্ষ পুনরায় প্রাণ ফিরে পায়, শুকনো নদী ভরে ওঠে কূল কূল পানিতে, এমন ভরাজলে বণিকেরা বাণিজ্যব্যপদেশে বিদেশযাত্রী হয়, মেঘগর্জনে বর্ষার আভাস পাওয়া যায়, কোড়া পাখীর ডাক শোনা যায়।

আইল আষাঢ় মাস জলের বাড়ে ফেনা। (মৈ.গী.পৃ ৫০)

কিংবা, আইল আষাঢ় মাস মেঘের বয় ধারা। (মৈ.গী.পৃ ৮৩)

কিংবা, আষাঢ় মাসেতে দেখ ভরা নদীর পানি। (মৈ.গী.পৃ ১৫৯)

কিংবা, আষাঢ় মাসেতে নদীর কূলে কূলে পানি। (মৈ.গী.পৃ ১৮৭)

এই আষাঢ় মাসে,

হাতেতে সোনার ঝাড়ি বর্ষা নামি আসে।
নবীন বরষা জলে বসুমাতা ভাসে ॥
সঞ্জীবন সুধারাশি কে দিল ঢালিয়া।
মরা ছিল তরুলতা উঠিল বাচিয়া ॥
শুক্না নদী ভরে উঠে কূলে কূলে পানি।
বাণিজ্য করিতে ছুটে সাধুর তরনী ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩০১)

শ্রাবণ মাসে বর্ষা এমনই প্রবল যে পাথরও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সমস্ত আকাশ থাকে মেঘে ঢাকা। এসময় দেশে পালিত হয় মনসা পূজা, বিলের মধ্যে কোড়া পাখীর ডাক তখন তীব্র, তা শুনে জমিদারপুত্রগণ শিকারে বের হয় পান্সী চড়ে, বেদের নারীরা তীব্র বর্ষার জলে নৌকা নিয়ে দেশ-বিদেশ গমন করে, এমন ঘন বর্ষায় কদম্বের ফুল প্রস্ফুটিত হয়, প্রস্ফুটিত হয় জলপদ্ম ও কেওয়া ফুল, প্রবল মেঘগর্জন ও বজ্রপাতে ধরণী কম্পিত হয় এমাসে, পেখম ধরে ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য করে।

শ্রাবণ মাসেতে দেখ ঘন বরিষণ।
বিলের মধ্যে কোড়া-কোড়ি করয়ে গর্জন ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৬০)

কিংবা, শায়ন মাসেতে দূতী পূজিলা মনসা। (মৈ.গী.পৃ ১৮৭)

অন্যত্র, কাল মেঘে সাজ করে ঢাকিয়া গগন।
ময়ূর-ময়ূরী নাচে ধরিয়া পেখম ॥
কদম্বের ফুল ফুটে বর্ষার বাহার।
লতায় পাতায় শোভে হীরামন হার ॥
... ...
শ্রাবণ আসিল মাথে জলের পসরা।
পাথর ভাসাইয়া বহে শাউনিয়া ধারা ॥
জলেতে কমল ফুটে আর নদী-কূল।
গন্ধে আমোদিত করি ফুটে কেওয়া ফুল ॥ (মৈ.গী.পৃ ৩০১)

ভাদ্র মাসে গাছে যেমন পাকা তাল থাকে, তেমনি গৃহস্থ ঘরে তালের পিঠা তৈরির ধুম পড়ে যায়। ভাদ্র মাসের চাঁদের আলো অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং তার ফলে জলের অনেক গভীরে সেই আলো পরিদৃষ্ট হয়। এমাসে সময়বিচারে রাত ছোট এবং এমাসে বণিকেরা বাণিজ্য থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করত।

Dhaka University Institutional Repository

ভাদ্র মাসেতে দূতী গাছে পাকন তাল । (মৈ.গী.পৃ ১৮৭)

কিংবা, ভাদ্র মাসে তালের পিঠা খাইতে মিষ্ট লাগে ।

... ...

ভাদ্র মাসের চান্নি গেল বুসনাইর বাথার ॥

ভাদ্র মাসের চান্নি দেখায় সমুদ্রের তলা । (মৈ.গী.পৃ ১৬২)

কিংবা, আইল আইল ভাদ্রমাস রাত্রিখানা ছোট ।

... ...

ভাদ্রের নিরল চান্নি নদী নালা ভাসে ।

বাণিজ্য করিয়া সাধু ফিরে আপন দেশে ॥ (পূ.গী.চ.খ.দ্বি.স.পৃ ৪২১)

আশ্বিন মাসের একটি বৈশিষ্ট্যই বিধৃত হয়েছে । এমাসে দেশে দুর্গাপূজার আয়োজন উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা থাকে ধরণী ।

ভাদ্র গেছে আশ্বিন আইল দুর্গাপূজা দেশে ।

আনন্দ-সায়রে ভাস্যা বসুমাতা হাসে ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৬২)

কিংবা, আশ্বিন মাসেতে দূতী দুর্গাপূজা দেশে । (মৈ.গী.পৃ ১৮৭)

কার্তিক মাসে কার্তিক পূজার অনুষ্ঠান উপলক্ষে সারারাত ধরে আনন্দ-কোলাহল হয়, বাজনা বাজে, সঙ্গীতের আয়োজন করা হয় । গৃহের যুবতী ও বধূরা বিভিন্নভাবে সাজসজ্জা করে । কার্তিক মাসে নদীর পানি হ্রাস পেতে শুরু করে ।

কার্তিক মাসেতে দেখ কার্তিকের পূজা ।

পরদীমের ঘট আকি বাতির করে সাজা ॥

সারা রাত্রি হুলামেলা গীত বাদ্যি বাজে ।

কুলের কামিনী যত অবতরঙ্গো সাজে ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৬২)

কিংবা, কার্তিক মাসেতে দূতী শুকায় নদীর পানি । (মৈ.গী.পৃ ১৮৭)

অগ্রহায়ণ মাসে শীতের কুয়াসা পড়া শুরু হয় । মাঠে ধান পাকে, পাকা ধানের ভারে ধানগাছগুলি এলিয়ে পড়ে । পাকা ধান কেটে কৃষক মাথায় বহন করে ঘরে নিয়ে আসে । প্রথম ধান দিয়ে লক্ষ্মীকে নিবেদন করা হয় । এ মাসেই অনুষ্ঠিত হয় লক্ষ্মীপূজা । ফসলের আগমনে গৃহস্থ ঘরে আনন্দ প্রবাহিত হয় , নতুন চালের শিরণী ও পিঠা তৈরি হয়।

আঘন মাসেতে দূতী শীতের কুয়াসা । (মৈ.গী.পৃ ১৮৭)

অন্যত্র, অগ্রহায়ণ মাসে, পাকা ধানে সবু শস্যে পৃথিবী ভরিল ॥

লক্ষ্মীপূজা করে লোকে আসন পাতিয়া ।

সাথে ধান গিরস্থ আসে আগ বাড়াইয়া ॥

জয়াদি জুকার পড়ে প্রতি ঘরে ঘরে ।

নয়া ধানের নয়া অন্নে চিড়া পিঠা করে ॥

পায়েস খিচুরী রান্ধে দেবের পারণ ।

লক্ষ্মীপূজা করে লোকে লক্ষ্মীর কারণ ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৬২)

Dhaka University Institutional Repository

পৌষ মাসের দিনগুলি সময়বিচারে সকল মাসের তুলনায় ছোট, সেকারণে পৌষ মাসকে ছোট বোন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অন্ধকারাচ্ছন্ন কুয়াসা নামে এই মাসে। শীতের দিন কিভাবে কেটে যায়, তা টের পাওয়া যায় না। পৌষের শীতে শরীর কাঁপে।

পোষ মাসের পোষা আমি সংসারে আনায় ॥
সকলের ছোট বোন পোষ মাস হয় ॥
চোক মেলাইতে দেখ কত বেলা হয় ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৫৫)

অন্যত্র, পৌষ মাসে পোষা আমি, অঙ্গ কাঁপে শীতে। (মৈ.গী.পৃ ১৮৭)

মাঘ মাসের শীত সবচেয়ে ভয়াবহ। মাঘ মাসের শীতে শুধু শরীর কাঁপে না হাড়ও কাঁপে। রাত এমন দীর্ঘ যে পোহাতে চায় না।

পোষ গেল মাঘ আইল শীতে কাপে বুক।
... ...
শীতের দীঘল রাতি পোহাইতে না চায়। (মৈ.গী.পৃ ১৫৫-৫৬)

ফাল্গুন মাসে গাছে গাছে নানা ফুল ফোটে। মালতী আর বকুলে আমোদিত হয় ধরণী। খঞ্জনা পাখীর ডাক, কোকিলের কুহুতানে মুখরিত হয় সমগ্র পৃথিবী।

আইল ফাল্গুন মাস বসন্ত বাহার।
লতায় পাতায় ফুটে ফুলের বাহার ॥
... ...
ভ্রমরা কোকিলকুঞ্জে গুঞ্জরি বেড়ায়।
সোনার খঞ্জন আসি আঙ্গিন জুড়ায়। (মৈ.গী.পৃ ১৫৬)

অন্যত্র, দারুণ ফাল্গুন মাস গাছে নানান ফুল।
অন্যত্র, মালঞ্চ ভরিয়া ফুটে মালতী-বকুল ॥ (মৈ.গী.পৃ ১৯৯)

চৈত্র মাসে চৈতালী বায়ু প্রবাহিত হয়। দক্ষিণা সমীরণ বহু দূর সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়। গাছে গাছে নতুন পাতা জন্মে, নতুন নতুন ফুল প্রস্ফুটিত হয়, পুষ্পবনে ভ্রমরের গুঞ্জনধ্বনি শোনা যায়, বৃক্ষ ডালে বসে কোকিল ডাকে, পুষ্পে বসে ডাকে ভ্রমর, এসময়ে পূজা উপলক্ষে ঢাক-ঢোল-শঙ্খ বাজে, নতুন বস্ত্র পরে নর-নারীরা আমোদে মাতে।

চৈত মাসেতে দূতী বহিছে চৈতালী। (মৈ.গী.পৃ ১৮৮)

অন্যত্র, দারুণ চৈত্রের হাওয়া দূর হইতে আসে।
... ...
গাছে গাছে সোনার পাতা ফুটে সোনার ফুল।
কুঞ্জেতে গুঞ্জরী উঠে ভ্রমরার রোল ॥
ডালে বসে কোকিল ডাকে পুষ্পেতে ভ্রমর। (মৈ.গী.পৃ ২৯৯)

অন্যত্র, আইল চৈত্রির মাস আকাল দুর্গাপূজা।
নানা বেশ করে লোকে নানারঙ্গের সাজা ॥

Dhaka University Institutional Repository

ঢাক বাজে ঢোল বাজে পূজার আঙ্গিনায় ।
ঝাক ঝাক শঙ্খ বাজে নটী গীত গায় ॥
... ...
কারুয়া টাঙ্গাইয়া করে ঘর মনোহর ॥
পাড়া-পড়ুসি সবে সাজে নূতন বস্ত্র পরি । (মৈ. গী. পৃ ১৫৭)

উপরে বর্ণিত সাধারণ প্রকৃতিচিত্র বারমাসীগুলোতেই অঙ্কিত হয়েছে। অন্যত্র, প্রকৃতি এসেছে চরিত্রের বিশেষ মানসিক অবস্থাকে পরিস্ফুট করার লক্ষ্য থেকে । বারমাসীগুলোতেও প্রকৃতি-ব্যবহার যে লক্ষ্য-হীনভাবে হয়েছে বা কেবলমাত্র প্রকৃতিবর্ণনার জন্যই হয়েছে — তা নয়, এখানেও নরনারীর বিরহকাতর মানসিকতাকে স্ফুটতর করার এক আনুর্গরজে প্রকৃতিচিত্র অঙ্কনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় । এ কারণে বলা যায়, ময়মনসিংহের গীতিকায় প্রকৃতি ব্যবহার পূর্বাপর উদ্দেশ্যপূর্ণ, চরিত্রসমূহের মনোজগতের রূপবৈচিত্রকে ব্যঞ্জনাময় ও পরিস্ফুট করার শৈল্পিক লক্ষ্য থেকে করা হয়েছে । ময়মনসিংহের গীতিকার রচয়িতারা প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মাধুর্য বর্ণনায় কেন আগ্রহী হননি, তার একটি কারণ হতে পারে : শ্রোতাসতর্কতা । তারা জানতেন যে প্রকৃতি গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । ফলে ঐসব শ্রোতাদের নিকট প্রকৃতির সাধারণ বর্ণনা তাৎপর্য বহন করবে না ।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ধর্মীয় অনুশাসনমুক্ত, ব্যক্তিজীবন-অভীপ্সায় উজ্জীবিত, স্বাধীনমনস্ক নারীপ্রাধান্যবিশিষ্ট উপজাতীয় সংস্কৃতি-প্রভাবিত, এক বৈশিষ্ট্যময় প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশে ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের উদ্ভব ঘটেছে। আর্থ-সামাজিক কাঠামো বিচারে বঙ্গভাষী-অঞ্চলের তৎকালীন সামন্ত-সংহিতা থেকে ময়মনসিংহ-এলাকা বিচ্ছিন্ন ছিল না, কিন্তু রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যই গীতিকার উদ্ভবের পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল। নরনারীর ধর্মচিন্তাঊর্ধ্ব ও সামাজিক বিভেদমুক্ত স্বাধীন প্রণয়াবেগ, একান্ত ব্যক্তি-অভিরুচিকেই সবকিছুর উর্ধ্বে গণ্য করা এবং তা চরিতার্থ করার জন্য জীবনের ঝুঁকি গ্রহণেও দ্বিধাহীন থাকার দৃঢ়চিত্ততা, শাস্ত্রনির্ভর নয় স্বীয় অভিরুচি ও মানবীয় প্রতিশ্রুতিনির্ভর নীতিবোধে অটল থাকা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের মহৎ ও উজ্জ্বল উদাহরণ সৃষ্টি করেছে গীতিকার জনসমষ্টি।

লোকসাহিত্যকে যে সামাজিক ইতিহাসের আকরশিলা বলা হয়, বলা হয় কোনো বিশেষ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও তাদের মন ও মনন বিকাশের পারম্পর্য চিহ্নিতকরণের প্রামাণ্য দলিল, — তা ময়মনসিংহের গীতিকার ক্ষেত্রেও অধিকতর সত্য হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণী ও বৃত্তির মানুষের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যসহ তাদের জীবনাচার ও জীবনোপকরণের একটি সামগ্রিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে গীতিকাসমূহে। শাসক ও অত্যাচারী শোষক চরিত্র হিসেবে নবাব, দেওয়ান, রাজা বা জমিদার, কাজী প্রভৃতি পদাধিকারের মানুষের নির্ভেজাল চিত্রের পাশাপাশি অঙ্কিত হয়েছে দরিদ্র, বঞ্চিত, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উন্মূলিত কৃষকসমাজ, উদীয়মান বণিকশ্রেণীসহ বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের প্রাত্যহিক জীবনচিত্র। তাদের জীবনাচার ও জীবনোপকরণ মধ্যযুগের সমাজ-জীবনের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে সহায়ক হয়েছে।

শাসক-শক্তির সঙ্গে উদ্ভবযুগের বণিকশ্রেণীর দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল থাকলেও বণিক শ্রেণীর হাতে নগদ অর্থের প্রাচুর্য ও প্রতিপত্তির ফলে এই বিরোধ তত প্রকটরূপে গীতিকাসমূহে চিত্রায়িত হয়নি। বরং সে তুলনায় কৃষকসমাজ ও সাধারণ প্রজার সঙ্গে শাসকশ্রেণীর দ্বন্দ্বের তীব্রতা অধিক প্রত্যক্ষ ও মাত্রাহীন। মধ্যযুগের শাসক-শক্তির নিপীড়ন-বৈশিষ্ট্যের প্রায়-সকল উপাদানই গীতিকাসমূহে বর্তমান। অন্যদিকে কৃষকসমাজের ক্রমক্ষয়িষ্ণুতার পাশাপাশি চিত্রিত হয়েছে বণিক শ্রেণীর ক্রমবর্ধিষ্ণু, বিকাশোন্মুখ, গতিময় ও উদ্ধত রূপ। শাসকের উৎপীড়ন, বণিকের অবাধ বিকাশ, প্রতিকূল প্রকৃতি ও শোষণ-ঋণে ওষ্ঠাগত-প্রাণ কৃষক ও প্রজাসাধারণের বস্তুনিষ্ঠ জীবনচিত্র উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার তরঙ্গমুক্ত, নিস্পন্দ, বৈচিত্র্যহীন জীবনধারাই উন্মোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বৈচিত্র্যবর্জিত, তরঙ্গহীন এই সমাজে জীবনধারণ ও জীবনোপকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কিছু মাত্রায় বৈষম্য পরিলক্ষিত হলেও ধর্মবিশ্বাস এবং সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রভাব সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যেই ছিল সমানভাবে ক্রিয়াশীল । সার্বিক সামাজিক পশ্চাৎপদতার কারণেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত হয়ে কৃষক ও বণিকের একইভাবে সর্বস্বহারায় পরিণত হওয়া যেমন ছিল স্বাভাবিক, তেমনি প্রাত্যহিক জীবনধারায় স্নান কিংবা পানীয় জল সংগ্রহের জন্য কুলবধূদের নদী-নির্ভরতার ক্ষেত্রে কৃষক-বণিক-সাধারণ প্রজায় কোনো বৈভিন্ন্য ছিল না ।

তাছাড়া ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে নরনারীর যে-প্রণয়াবেগ মহিমান্বিতরূপে চিত্রায়িত হয়েছে, তা অতিক্রম করে গেছে শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের সকল সীমাবদ্ধতা । সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্যে ধর্মবোধ-ঊর্ধ্ব, কেবল ব্যক্তি-অভিরুচি-আশ্রয়ী প্রণয়মহিমা চিত্রায়ণে ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের ভূমিকাই 'এক ও অনন্য' । বাংলা সাহিত্যে প্রথম সম্প্রদায়নিরপেক্ষ শিল্পনিদর্শন হিসেবেও ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহ তাৎপর্যমন্ডিত । ময়মনসিংহের গীতিকায় বিধৃত নরনারীর প্রণয়াবেগের একটি উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য হল : তা একান্তভাবে লৌকিক ও জাগতিক হয়েও দেহসর্বস্ব নয় । প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় নারীর দেহকে এবং দেহসৌন্দর্যকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করেও তা দেহাতীত মাধুর্য অর্জন করেছে । অনির্বচনীয়ত্বের আস্বাদযুক্ত হয়ে এই প্রণয় শরীরকে অবলম্বন করে বর্ধিত হয়েও শারীরিক আবর্তে নিঃশেষিত হয়নি । তাই বলে এ-প্রণয় বায়বীয়ও নয়, এর উৎসমূলে রয়েছে দেহসৌন্দর্যের প্রচন্ড মাদকতা, কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তার আবেদন শরীরের বাহ্যিক রূপকে ভেদ করে স্থান করে নিয়েছে অন্তর্ময় হৃদয়মূলে । যা থেকে জন্ম নিয়েছে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস, একনিষ্ঠা, পরস্পরের জন্য আত্মবিসর্জনেও দ্বিধাহীনতা । এর কারণ, তাদের প্রণয়বৃক্ষের শেকড় প্রোথিত ছিল জীবনের মৃত্তিকা-মূলে । নির্জন নদীতীরে সন্ধ্যান্ধকারের রোমান্সধর্মী পরিবেশে এই বৃক্ষ বর্ধিষ্ণু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা প্রাত্যহিক জীবনধারার সঙ্গে গভীরতর সম্পর্ক হারায়নি এক মুহূর্তের জন্যও । মৃত্তিকাসংলগ্নতার কারণেই সৌন্দর্যের উন্মাদ-করা মাদকতার স্পর্শে, অনুরাগের দীপ্তিতে ও হৃদয়মথিত আবেগে কম্পমান হয়েও যেমন তাদের প্রণয় শরীরসর্বস্বতায় নিঃশেষিত হতে পারেনি, তেমনি হয়ে উঠতে পারেনি একান্তভাবে বায়বীয় ।

স্মর্তব্য যে ময়মনসিংহের গীতিকায় ধর্মপ্রসঙ্গ অনুপস্থিত নয়, কিন্তু ধর্মচিন্তার পরিবর্তে ধর্মাচ্ছন্নতামুক্ত জীবনতৃষ্ণা ও ব্যক্তিজীবনঅভীপ্সারই জয় হয়েছে । ধর্ম তার শাস্ত্রীয়-বিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করে সামাজিক রূপ লাভ করেছে । প্রণয়ে একনিষ্ঠা এবং তা সফল করার ব্যাপারে এমনকি জীবনের ঝুঁকি গ্রহণেও দ্বিধাহীনতা, স্বাধীনভাবে পতিনির্বাচন, এবং ব্যক্তি-অভিরুচি-আশ্রয়ী সতীত্বচিন্তাই নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক উপাদান হয়ে উঠেছে । সতীত্বভাবনা হয়ে উঠেছে নারীধর্মের দ্যোতক । পশ্চাৎপদ সমাজকাঠামোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী না হয়েও ব্যক্তি-অভিরুচিকে চরিতার্থ করার দৃঢ়তায় নারী চরিত্রগুলো যে প্রাণৈশ্বর্যের পরিচয় দিয়েছে, তা-ই তাদেরকে ব্যক্তিত্বের মহিমায় দীপ্যমান করে তুলেছে । মধ্যযুগের সাহিত্য-নিদর্শনসমূহে ব্যক্তির উপস্থিতি থাকলেও ধর্মাচ্ছন্নতার ফলে ব্যক্তিত্বের জাগরণ অনুপস্থিত । ময়মনসিংহের গীতিকাই এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম ।

চরিত্র-সৃজনে রচয়িতাগণের বাস্তবোচিত দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি চরিত্র-উপস্থাপনে তাঁদের

Dhaka University Institutional Repository

নিরাসক্ত মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। গীতিকার রচয়িতাগণ মানবোচিত বৈশিষ্ট্যসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রগুলোকে বিন্যাস করেছেন। অর্থাৎ চরিত্রসমূহকে একান্তভাবে মানবীয় ও লৌকিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করে তুলেছেন। চরিত্র-উপস্থাপনের ক্ষেত্রে রচয়িতাগণ চরিত্রসমূহের সবলতা ও সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ না করে আচার-উচ্চারণের মাধ্যমে তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ উন্মোচন করেছেন।

কাহিনীবিন্যাসে নাটকীয়তা, সংলাপধর্মিতা, দৃশ্যময়তা ও চিত্রময়তার সুসমন্বয় ঘটেছে। কোথাও কোথাও গীতময় পরিচর্যার উদাহরণ, আবার কোথাও প্রকৃতিসংলগ্নতার বৈচিত্র্যময় সমাহারও লক্ষ্য করা যায়। স্বগত ও দ্বিমাত্রিক সংলাপ উচ্চারণের রীতি ময়মনসিংহের গীতিকার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। একই সময়ে দুইয়ের অধিকজনের সংলাপ উচ্চারণের কোনো দৃশ্য অঙ্কিত হয়নি। মঞ্চে অভিনয়-উপযোগী করে রচনার জন্য নাটকীয় ও সংলাপধর্মী-উপাদানের প্রাধান্য ঘটেছে। সংলাপধর্মী দুটি দৃশ্যময় পরিচর্যার মধ্যে রচয়িতার সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত চিত্রময় বর্ণনা সংযোগসাধন করেছে। কোথাও কোথাও রচয়িতা কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় চরিত্রকে বিকশিত করে তোলার মধ্য দিয়ে সমগ্র ঘটনা উপস্থাপন করেছেন। ঘটনাবিন্যাসের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বাক্য ব্যবহার পরিহারের মধ্য দিয়ে রচয়িতার অসাধারণ পরিমিতিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সকল ঘটনার বিবরণ না দিয়ে কখনও কখনও কেবলমাত্র ইঙ্গিতের মাধ্যমে পাঠকের কল্পনার ওপর নির্ভরশীল হয়ে ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা করার রীতি ব্যবহৃত হয়েছে — পরিমিতি-বোধের উজ্জ্বল স্বাক্ষর এটি। প্রাত্যহিক জীবন পরিবেশের মধ্যেই রোমান্সধর্মিতার আবহ নির্মাণ করা হয়েছে। কাহিনীবিন্যাসে বারমাসী বর্ণনা চমৎকারিত্ব, প্রকৃতিসংলগ্নতা ও নাটকীয় পরিচর্যা প্রভৃতি দিক থেকে তাৎপর্যমন্ডিত। গ্রামীণ জীবনে সাধারণভাবে উচ্চারিত বাচনভঙ্গির ব্যবহারও আখ্যানভাগের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্রাজিক রস সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহ যে ব্যতিক্রমধর্মী হয়ে উঠেছে, তার মূল কারণ এর জীবনমুখী বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ গাথার ট্রাজিক পরিণাম আবেদনে যেমন অনুরাগস্রুয়ী, তেমনি চরিত্রের অনুর্গত ত্রুটি-দুর্বলতা এই পরিণাম সংঘটনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করায় তা হয়ে উঠেছে শিল্পসুষমামন্ডিত।

ময়মনসিংহের গীতিকায় অলঙ্কার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংস্কৃতানুসরণ, প্রথানুসরণ, শাস্ত্র বা পুরাণ-নির্ভরতা প্রভৃতির পরিবর্তে রচয়িতাগণের স্বীয় জীবনাভিজ্ঞতালব্ধ বস্তু-উপাদান থেকে উপমান সংগ্রহের প্রয়াস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যক্তি-অনুভূতি ও অভিরুচি নির্ভর হয়ে স্বীয় আশিক্ষিত মানসের রসবোধ দ্বারাই তাঁরা সমৃদ্ধ ও শিল্পসার্থক করে তুলেছেন গীতিকার কাব্যদেহকে। পল্লী-কবিগণ নিজেদের কল্পনার ঐশ্বর্য ও ঔদার্য দ্বারা অনেক বেশি সংবেদনশীলতা, স্বাবলম্ব-অনুভব ও আত্মসংবেদনার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের সৃষ্ট অলঙ্কার-সমূহ হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্যময়, স্বতন্ত্র মেজাজের ও অধুনাস্পর্শী।

ময়মনসিংহের গীতিকায় মানুষের হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে পরস্পরিত করে প্রকৃতি-ব্যবহারের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্য যখন প্রকৃতি ব্যবহারে সংস্কৃতানুসারী, ধ্রুপদী রীতি অবলম্বনে বৈচিত্র্যহীন, তখন ময়মনসিংহের গীতিকায় এই রীতি পরিহার তাৎপর্যপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে বিস্তৃত, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রকৃতি উপস্থাপনের রীতি পরিহৃত হয়েছে। পরিবর্তে প্রকৃতিবর্ণনায় যুক্ত হয়েছে সংক্ষিপ্তিবোধ, ব্যঞ্জনাময়তা ও সংবেদনশীলতা। প্রকৃতি হয়ে উঠেছে মানবীয় সত্তারই অংশ। চরিত্রের বিশিষ্ট আবেগানুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত হয়েছে প্রকৃতিচিত্র। চরিত্রসমূহের আনন্দ-বেদনা-যন্ত্রণাকে পাঠক-শ্রোতার মনে যথাযথভাবে সঞ্চারিত করার লক্ষ্যে প্রকৃতির অভিব্যঞ্জনাময় ব্যবহার এখানে শিল্পসার্থকতা লাভ করেছে।

একানুভাবে সম্প্রদায়নিরপেক্ষ জীবনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি, মানবীয় অনুভূতিকে প্রাধান্য দান, শাস্ত্র ও ধর্মনিষ্ঠার পরিবর্তে ব্যক্তি-অভিরুচিকেই মহত্তর বিবেচনা প্রভৃতি কারণে ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহ জীবনধর্মে ও শিল্পমূল্যে হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র, ব্যতিক্রমধর্মী, আবেদনে সর্বজনীন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিল্পোত্তীর্ণ ও অধুনাস্পর্শী।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

ক. আলোচ্য গীতিকাসমূহ

১. মহুয়া : 'মৈমনসিংহ-গীতিকা', দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৭৩ (প্র.প্র ১৯২৩)

: (বাইদ্যা কন্যা মহুয়া), 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা', প্রথম খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৭০

২. মলুয়া : 'মৈমনসিংহ-গীতিকা', দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

: (সুন্দরী মলুয়া), 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা', প্রথম খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

৩. চন্দ্রাবতী : 'মৈমনসিংহ-গীতিকা', দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

: 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা', প্রথম খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

৪. কমলা : 'মৈমনসিংহ-গীতিকা', দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

: (কমলা কন্যা), 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা', তৃতীয় খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), ফার্মা কে.এল.মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৭১

৫. দেওয়ান ভাবনা : 'মৈমনসিংহ-গীতিকা', দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

: (সুনাই সুন্দরী), প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, তৃতীয় খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

৬. দস্যু কেনারামের পালা : 'মৈমনসিংহ-গীতিকা', দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

: (দস্যু কেনারাম), 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা', প্রথম খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

৭. রূপবতী : 'মৈমনসিংহ-গীতিকা', দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

: (রাজকন্যা রূপবতী), 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা', দ্বিতীয় খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), ফার্মা কে.এল.মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৭১

৮. কঙ্ক ও লীলা : 'মৈমনসিংহ-গীতিকা', দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

: (লীলা কন্যা কবি কঙ্ক),'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা', তৃতীয় খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

৯. দেওয়ানা মদিনা : 'মৈমনসিংহ-গীতিকা', দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

: 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা', দ্বিতীয় খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

১০. কাজল রেখা : 'মৈমনসিংহ-গীতিকা', দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

১১. ধোপার পাট : পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯২৬

: (কাঞ্চন কন্যা), প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, দ্বিতীয় খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

১২. মৈষাল বন্ধু : 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', দ্বি.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

: (মইষাল বন্ধু-সাঁজুতী কন্যা), প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, চতুর্থ খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৭২

১৩. কাঞ্চনমালা : 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', দ্বি.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. ভেলুয়া	:	'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', দ্বি.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত।
	:	(ভেলুয়া সুন্দরী-মদন সাধুর পালা), প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ষষ্ঠ খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৭৪
১৫. কমলা রানীর গান	:	'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', দ্বি.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত।
	:	(কমলা রানী), 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা', দ্বিতীয় খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত।
১৬. মানিকতারা বা ডাকাইতের পালা	:	'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', দ্বি.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত।
	:	(মাণিকতারা ডাকাইত), 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা', চতুর্থ খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত।
১৭. মদনকুমার ও মধুমালা	:	'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', দ্বি.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত।
১৮. দেওয়ান ইশা খাঁ মসনদালি	:	'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', দ্বি.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত।
	:	(দেওয়ান ঈশা খাঁর পালা), 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা', সপ্তম খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৭৫
১৯. ফিরোজ খাঁ দেওয়ান	:	'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', দ্বি.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত।
	:	(ফিরোজ খাঁ দেওয়ান-সখিনা বিবির পালা), 'প্রাচীন পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা', পঞ্চম খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), ফার্মা কে.এল.মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৭৩

Dhaka University Institutional Repository

২০. মান্ধুর মা : 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', তৃতীয় খন্ড দ্বিতীয় সংখ্যা, দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৩০

: (মণির ওঝা ও মান্ধুর মাও পালা), 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা', দ্বিতীয় খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত।

২১. আয়না বিবি : পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', তৃ.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

: প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, প্রথম খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

২২. শ্যামরায় : 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', তৃ.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত।

: (শ্যাম রায়ের পালা), 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা', প্রথম খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

২৩. গোপিনীকীর্তন : 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', তৃ.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

: (মহিলা কবি সুনার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন), 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা', ষষ্ঠ খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

২৪. বারতীর্থের গান : 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', তৃ.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

: (বারোতীর্থের গান বা রাজা ভগদত্তের পালা), প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, পঞ্চম খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

২৫. শীলা দেবী : 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', চতুর্থ খন্ড দ্বিতীয় সংখ্যা, দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৩২

: 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা', তৃতীয় খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

২৬. রাজা রঘুর পালা : 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', চ.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

: 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা', সপ্তম খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

২৭. মুকুট রায় : 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', চ.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

২৮. ভারাইয়া রাজার কাহিনী : 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', চ.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

: (ভারাইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী), 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা', তৃতীয় খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

২৯. আন্ধা বন্ধু : 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', চ.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

: 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা', পঞ্চম খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

৩০. বগুলার বারমাসী : 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', চ.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

: (সদাগর কন্যা বগুলা), প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, দ্বিতীয় খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

৩১. চন্দ্রাবতীর রামায়ণ : 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', চ.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

: (কবি চন্দ্রাবতী দেবী রচিত রামায়ণ), প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, সপ্তম খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

৩২. সন্নমালা : 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', চ.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

: (সন্নমালার পালা), 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা', সপ্তম খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

৩৩. বীরনারায়ণের পালা : 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', চ.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

: (কুমার বীরনারায়ণের পালা), 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা', ষষ্ঠ খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

৩৪. রতন ঠাকুরের পালা : 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', চ.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

: প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, সপ্তম খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

৩৫. পীর বাতাসী : 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', চ.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

: (পীর বাতাসী কন্যা), প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, দ্বিতীয় খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

৩৬. রাজা তিলক বসন্ত : 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', চ.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

৩৭. মলয়ার বারমাসী : 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', চ.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

: (মলয়া কন্যার পালা), 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা', ষষ্ঠ খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

৩৮. জীরালনী : 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', চ.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

: (হরিণকুমার-জিরালনী কন্যার পালা), প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, সপ্তম খন্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

৩৯. সোনারায়ের জন্ম : 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা', চ.খ.দ্বি.স., দীনেশচন্দ্র সেন (সংক), প্রাগুক্ত ।

৪০. সোনাই বিবি : 'মোমেনশাহী গীতিকা', বদিউজ্জামান (সম্পা), বাঙলা একাডেমী : ঢাকা, ১৯৭৯

৪১. চিলাই রানী : 'মোমেনশাহী গীতিকা', বদিউজ্জামান (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

৪২. মনোয়ার খাঁ দেওয়ান : 'মোমেনশাহী গীতিকা', বদিউজ্জামান (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

৪৩. তোতা মিয়া : 'মোমেনশাহী গীতিকা', বদিউজ্জামান (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

৪৪. মাধব মালঞ্চি কন্যা : 'মোমেনশাহী গীতিকা', বদিউজ্জামান (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

৪৫. গকুল চান ও আইধর চান : 'মোমেনশাহী গীতিকা', বদিউজ্জামান (সম্পা), প্রাগুক্ত ।

খ. মূল গ্রন্থ

মৈমনসিংহ-গীতিকা (পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা) (চতুর্থ সংস্করণ) : শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, রায় বাহাদুর, বি.এ.,ডি.লিট কর্তৃক সঙ্কলিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৩

পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা : রায় বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, বি.এ., ডি.লিট্., কর্তৃক সঙ্কলিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯২৬

পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, তৃতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা : রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডি.লিট্. কর্তৃক সঙ্কলিত এবং সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩০

পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, চতুর্থ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা : রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ডি.লিট্. কর্তৃক সঙ্কলিত এবং সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩২

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা প্রথম খন্ড : সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায় , কলিকাতা, ১৯৭০

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা দ্বিতীয় খন্ড : সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৭১

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা তৃতীয় খন্ড : সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক, ফার্মা কে.এল.মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৭১

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা চতুর্থ খন্ড : সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, ফার্মা কে.এল.মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৭২

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা পঞ্চম খন্ড : সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, ফার্মা কে.এল.মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৭৩

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা ষষ্ঠ খন্ড : সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, ফার্মা কে.এল.মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৭৪

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা সপ্তম খন্ড : সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, ফার্মা কে.এল.মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৭৫

মোমেনশাহী গীতিকা : সম্পাদনায় : বদিউজ্জামান, বাঙলা একাডেমী: ঢাকা, ১৯৭১

গ. সহায়ক গ্রন্থ

অজয় রায় : 'বাঙলা ও বাঙালী', বাংলা একাডেমী সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, (প্র.স. ১৩৭৬)

অতুল সুর, ড. : 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস', জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৭৬

অরবিন্দ পোদ্দার : 'মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ', তৃতীয় মুদ্রণ, উচ্চারণ, কলিকাতা, ১৯৮১, (প্র.প্র. ১৯৫২)

: 'মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যবিচার', উচ্চারণ, কলিকাতা, ১৯৮৫

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' (খ্রীস্টীয় দশম-বিংশ শতাব্দী), মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৬৬

আকরম হোসেন, সৈয়দ : 'বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', বাংলা একাডেমী : ঢাকা, ১৯৮৫

Dhaka University Institutional Repository

আতোয়ার রহমান : 'লোকসাহিত্যের কথা', বাংলা একাডেমী : ঢাকা, ১৯৮৪

আনিসুজ্জামান : 'স্বরূপের সন্ধানে', জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৬

আন্তোনোভা, কো., গ্রি.বোনগার্দ-লেভিন,গ্রি.কতোভ্স্কি : 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২ (বাংলা অনুবাদ : মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিজেন শর্মা)

আলাউদ্দিন আল আজাদ : 'শিল্পীর সাধনা', তৃতীয় সংস্করণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৩৭৫

আলি নওয়াজ : 'ময়মনসিংহ-গীতিকা', সিটি লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬৯

আশরাফ সিদ্দিকী (সম্পা.) : কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী, বাঙ্‌লা একাডেমী : বর্ধমান হাউস : ঢাকা, ১৯৬৫

আশরাফ সিদ্দিকী, ডক্টর : 'লোক-সাহিত্য' (দ্বিতীয় খন্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮০, (প্র.স. ১৯৬৩)

আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলার লোক-সাহিত্য' (প্রথম খন্ড : আলোচনা), তৃতীয় সংস্করণ, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা ১৯৬২, (প্র.প্র.১৯৫৪)

: রবীন্দ্রনাথ ও লোক-সাহিত্য, এ.মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৯৭৩

এনামুল হক, ডক্টর মুহম্মদ : 'মুসলিম বাংলা-সাহিত্য', তৃতীয় সংস্করণ, পাকিস্তান পাবলিকেশান্স্, ঢাকা, ১৯৬৮, (প্র.স. ১৯৫৭)

ওয়াকিল আহমদ : 'বাংলার লোক-সংস্কৃতি', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪

ওহীদুল আলম : 'চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

কডওয়েল, ক্রিস্টোফার : 'ইলিউশ্যন অ্যান্ড রিঅ্যালিটি' (বাস্তব ও বিভ্রম), অনুবাদ : রণেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, পপুলার লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৮২

: 'স্টাডিজ ইন এ ডায়িং কালচার', অনুবাদ : রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পপুলার লাইব্রেরী , কলিকাতা, ১৯৮৫

Dhaka University Institutional Repository

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় : 'মধ্যযুগে বাঙালা', গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলিকাতা, ১৩৩০

কেদারনাথ মজুমদার : 'ময়মনসিংহের ইতিহাস' ও 'ময়মনসিংহের বিবরণ', পুনর্মুদ্রণ, জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ, ১৯৮৭

ক্ষেত্র গুপ্ত : 'প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন', গ্রন্থ নিলয়, কলিকাতা, ১৩৬৬

গোপাল হালদার : 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা', প্রথম খন্ড (প্রাচীন ও মধ্য যুগ), প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৪

গোর্কি, ম্যাক্সিম : 'প্রসঙ্গ : সাহিত্য', মেহের কবীর অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৯

চিত্তরঞ্জন দেব : 'পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ', কলিকাতা, ১৯৫৩

জসীমউদ্‌দীন : 'ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়', পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৮

জীবনানন্দ দাশ : 'কবিতার কথা', চতুর্থ সংস্করণ, সিগনেট প্রেস, কলিকাতা, ১৩৮৭, (প্র.স. ১৩৬২)

টলস্টয়, লিও : 'শিল্পের স্বরূপ', অনুবাদ : দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮১

তারানাথ ভট্টাচার্য : 'বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস : প্রাচীন পর্ব', এস.গুপ্ত ব্রাদার্স, কলিকাতা, ১৯৬২

দীনেশচন্দ্র সেন : 'আশুতোষ স্মৃতিকথা', ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯৩৬

: 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (দুই খন্ডে), নবম সংস্করণ, সম্পাদনা : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৬, (প্র.স. ১৮৯৬)

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : 'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা', দ্বিতীয় সংস্করণ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, ১৯৫৮

Dhaka University Institutional Repository

নীহাররঞ্জন রায় : 'বাঙালীর ইতিহাস', আদি পর্ব (দুই খন্ডে), প্রথম সাক্ষরতা সংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ), পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলিকাতা, ১৯৮০, (প্র. স. ১৩৫৬)

নুর মহম্মদ টোনা (সংগ্রহ ও সম্পা.) : খুলনার লোক সাহিত্য, কালানুর প্রকাশনী, খুলনা, ১৯৭৯

পাভলভ, ভ.ই. : 'ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত' (আঠারো শতকের শেষাশেষি থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি), প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৮, (বাংলা অনুবাদ : বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় : ১৯৮৪)

পাভলভ, ভ.ই., ভ.গ. রাস্ত্যান্নিকোভ, গ.ক.শিরোকভ : 'ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ' (১৮ শতক থেকে ২০শ শতকের মাঝামাঝি), উপসংহার এবং সম্পাদনা : র.আ. উলিয়ানভস্কি, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৬, (বাংলা অনুবাদ : বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় : ১৯৭৬)

ফক্স, র‍্যাল্ফ : 'নভেল এ্যান্ড দ্য পিপ্‌ল্‌', অনুবাদ : সর্বজিৎ সেন ও সিদ্ধার্থ ঘোষ, বঙ্গানুবাদ প্রকাশ, পপুলার লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৮০

বদিউজ্জামান (সম্পা.) : 'রংপুর গীতিকা' (প্রথম খন্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭

: 'সিলেট গীতিকা' (প্রথম খন্ড), বাংলা একাডেমী,ঢাকা,১৯৬৮

বরুণকুমার চক্রবর্তী : 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস', সাহিত্যশ্রী, কলিকাতা, ১৩৮৪

বিনয় ঘোষ : 'বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব', অরুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৮৬

: 'শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ', দ্বিতীয় সংযোজিত সংস্করণ, অরুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৮০, (প্র.স. ১৯৪০)

ভূদেব চৌধুরী : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম পর্যায়), পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮২

Dhaka University Institutional Repository

: 'বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮২

মনসুরউদ্দীন, মুহম্মদ (সংগৃহীত ও সম্পা.) : 'হারামণি' (প্রথম খন্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ, হাসি প্রকাশনালয়, ঢাকা, ১৩৭৩, (প্র.স. ১৩৩৭ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

: 'হারামণি' (লোকসঙ্গীত সংগ্রহ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৫৯

: 'হারামণি' (লোক-সঙ্গীত সংগ্রহ) সপ্তম খন্ড, বাঙলা একাডেমী : বর্ধমান হাউস : ঢাকা, ১৩৭১

: 'হারামণি' (৮ম খন্ড), বাংলা একাডেমী : ঢাকা, ১৯৭৬

মনিরুজ্জামান : 'বাংলাদেশে লোক সংস্কৃতি সন্ধান : ১৯৪৭-৭১', বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২

মনিরুজ্জামান, ডক্টর মোহাম্মদ (সম্পা.) : 'ঢাকার লোক-কাহিনী', দ্বিতীয় প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০, (প্র.প্র. ১৯৬৫)

: 'যশোরের লোক-কাহিনী', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪

মফিজুল ইসলাম : 'লোককাহিনী', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

মযহারুল ইসলাম, ডক্টর : 'ফোকলোর পরিচিতি এবং লোক সাহিত্যের পঠন-পাঠন', পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪, (প্র.প্র. ১৯৬৭)

: 'লোক কাহিনী সংগ্রহের ইতিহাস', স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৩৭৬

মার্কস, কার্ল ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস : 'উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে', প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭১

: 'প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ' (১৮৫৭-১৮৫৯), প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭১ .

রওশন ইজদানী : 'মোমেনশাহীর লোক-সাহিত্য', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৬৪

Dhaka University Institutional Repository

রণেশ দাশগুপ্ত : 'শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে', দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ভবন, ঢাকা, ১৩৭৯, (প্র.প্র. ১৩৭৩)

: 'আলো দিয়ে আলো জ্বালা', জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭০

: 'আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ', জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'লোকসাহিত্য', পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ, কলিকাতা, ১৯৭১, (প্র.প্র.১৩১৪)

রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রথম খন্ড (প্রাচীন যুগ), ষষ্ঠ সংস্করণ, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৪

: বাংলা দেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড (মধ্যযুগ), পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৮০

রাম শরণ শর্মা : 'ভারতের সামন্ততন্ত্র' (চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী), কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৭৭, (বাংলায় অনুবাদ : শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায়)

শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ : 'বাংলা সাহিত্যের কথা', প্রথম খন্ড (প্রাচীন যুগ), শোভন সংস্করণ, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৫৮, (প্র.স. ১৯৫৩)

: 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (দ্বিতীয় খন্ড - মধ্যযুগ), রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৩৭১

শিবচন্দ্র লাহিড়ী, ডঃ : 'বাঙলা কাব্যে উপমালোক' (১ম খন্ড), গ্রন্থ-নিলয়, কলিকাতা, ১৯৬৫

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৮০

Dhaka University Institutional Repository

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার : 'মার্কসীয় দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতি', মনীষা, কলিকাতা, ১৯৮৬

সনৎকুমার মিত্র : 'রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য', লিপিকা, কলিকাতা, ১৩৭৮

সাত্তার, আবদুস্ : 'আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮

: আরণ্য সংস্কৃতি, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৭

সামীয়ুল ইসলাম : উত্তর বাংলার লোক সাহিত্য (গান ও মেয়েলী গীত), নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৩

সুকুমার সেন : 'বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খন্ড অপরার্ধ (সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দ), তৃতীয় সংস্করণ, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭৫

সুখময় মুখোপাধ্যায় : বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ), ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৬২

সুখময় মুখোপাধ্যায় (সম্পা.) : 'ময়মনসিংহ-গীতিকা', পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ভারতী বুক স্টল, কলিকাতা, ১৯৮২

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ', হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফাউন্ডেশন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৩৯০

সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, ডঃ : 'কাব্য-শ্রী', দ্বিতীয় সংস্করণ, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং, প্রাইভেট, লিঃ, কলিকাতা, ১৩৭১

হাফিজ, আবদুল : 'আধুনিক সাহিত্যচর্চা', মুক্তধারা, ঢাকা, ১৩৮২

: লোককাহিনীর দিক-দিগন্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬

হুমায়ুন কবির : 'বাঙলার কাব্য', আহমদ ছফা সম্পাদিত, খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা, ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. সহায়ক প্রবন্ধ

দীনেশচন্দ্র ও পূর্ববঙ্গগীতিকার প্রামাণিকতা প্রসঙ্গে : ডঃ দুসান ঝাভিতেল, 'দৈনিক স্বাধীনতা', কলিকাতা, ২২ এপ্রিল ১৯৬২

দীনেশচন্দ্র ও পূর্ববঙ্গগীতিকার প্রামাণিকতা প্রসঙ্গে : চিত্তরঞ্জন দেব, 'দৈনিক স্বাধীনতা', কলিকাতা, ১৩ মে ১৯৬২

দীনেশচন্দ্র ও পূর্ববঙ্গগীতিকার প্রামাণিকতা প্রসঙ্গে : রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'দৈনিক স্বাধীনতা', কলিকাতা, ২৭ মে ১৯৬২

মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার প্রামাণিকতা প্রসঙ্গে : বীরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, 'দৈনিক স্বাধীনতা,' কলিকাতা, ১২ জুন ১৯৬২

বাংলার কৃষক-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা চন্দ্রকুমার : প্রদীপকুমার দে, 'দৈনিক স্বাধীনতা', কলিকাতা, ৫ আগস্ট ১৯৬২

মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্য : মুহম্মদ এনামুল হক, "ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০" (সংকলন গ্রন্থ), সম্পাদক : মুহম্মদ আব্দুল হাই, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বৈশাখ ১৩৭১, পৃ ৩৮-৫৩

পূর্ব পাকিস্তানের লৌকিক পুরাকাহিনী ও লোকগীতিকা : ডক্টর মযহারুল ইসলাম, 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা', ঢাকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭১

বাঙলাদেশ : আকরম হোসেন, "বাঙলাদেশ" (সংকলন গ্রন্থ), সম্পাদনায় : মনসুর মুসা, বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ ১-৪৩

বাঙলার লোকসংস্কৃতিঃ উৎস ও ঐতিহ্যঃ ওয়াকিল আহমেদ, "বাঙলাদেশ" (সংকলন গ্রন্থ), প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৯-৬৭

Dhaka University Institutional Repository

ময়মনসিংহ গীতিকা : আলি নওয়াজ, "ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি" (সংকলন গ্রন্থ), জেলা বোর্ড, ময়মনসিংহ, মার্চ ১৯৭৮, পৃ ৫২-৮০

ময়মনসিংহ : গোলাম সামদানী কোরায়শী, "ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি" (সংকলন গ্রন্থ), জেলা বোর্ড, ময়মনসিংহ, মার্চ ১৯৭৮, পৃ ১-২৯

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকায় সমাজের ছবি : সাঈদ-উর রহমান, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা', সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, একবিংশ সংখ্যা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, পৃ ১৪৯-৬৬

ময়মনসিংহ গীতিকা, তৎকালীন সমাজ ও প্রাসঙ্গিক কথা : আলি নওয়াজ, "মুহম্মদ এনামুল হক স্মারকগ্রন্থ", মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃ ১৩০-৫৩

ভারতে কৌম থেকে আঞ্চলিক সমাজ-সমাজ-গঠনের প্রক্রিয়া-প্রসঙ্গে : নজরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা', ঢাকা, সম্পাদক : আনিসুজ্জামান, চতুর্থ খন্ড, ডিসেম্বর ১৯৮৬, পৃ ১৩-৪২

ভারতবর্ষীয় গ্রাম — তার উদ্ভবের সময়কাল এবং কাঠামোগত অভিঘাতের প্রশ্ন : নজরুল ইসলাম, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা', ঢাকা, সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অষ্টবিংশ সংখ্যা, জুন ১৯৮৭, পৃ ১৯-৪৫

এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রসঙ্গে : এম. মোকাখখারুল ইসলাম, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা', প্রাগুক্ত, পৃ ৬২-৭৮

মৈমনসিংহ গীতিকায় মোটিফ : দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, 'ভগ্নাংশ', শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৪, কলিকাতা

মৈমনসিংহ গীতিকা প্রসঙ্গে : নুরুল হুদা, "রবীন্দ্র প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ" (সংকলন গ্রন্থ), সুগ্রন্থ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ ৯-১৯

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

Belyaev, Albert : 'The Ideological Struggle and Literature', Progress Publishers, Moscow, 1978, (F. P. 1975)

Eliot, T.S. : 'Selected Essays', Faber and Faber Ltd, London, third enlarged edition reprinted 1976, (F.P. 1932)

Gorky, Maxim : 'On Literature', (1909-31), Progress Publishers, Moscow,

Lubbock, Percy : 'The craft of Fiction', Jonathan Cape, London, 1960, (F.P. 1921)

Lunacharsky, A. : 'On Literature and Art', Progress Publishers, Moscow, Second revised edition 1973, (F.P. 1965)

Nurul Islam Khan (Editor) : 'Bangladesh District Gazetteers MYMENSINGH', Bangladesh Government Press, Dhaka, 1978

Progress Publishers (Compilation) : 'Socialist Realism in Literature and Art' (A collection of Articles), Progress Publishers, Moscow, 1971

Zbavitel, Dr. Dusan : 'Bengali Folk-Ballads From Mymensingh and The Problem of Their Authenticity', University of Calcutta, Calcutta, 1963